বঙ্গদেশের ইতিহাস

মধ্যযুগ : প্রথম পর্ব

ডক্টর সুশীলা মণ্ডল, এম-এ, ডি-ফিল্,
অধ্যক্ষা, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়
(মেদিনীপুর)
প্রণীত

প্রকাশ মন্দির প্রাইভেট লিঃ
৩নং কলেজ রো : কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

গত বৎসর দোল পূর্ণিমায় এই গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছিল। একটি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া আবার দোল পূর্ণিমার পুণ্য তিথি ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বিগত দোল পূর্ণিমার সেই আনন্দ ও উদ্দীপনা আজ কোথায়! এই গ্রন্থ রচনায় যাঁহার উৎসাহ ও প্রেরণা ছিল সর্বাধিক এবং বঙ্গদেশের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হইবে, ইহাই ছিল যাঁহার স্বপ্ন, আমার সেই পরম শ্রদ্ধেয় মাস্টার মহাশয়' আজ এই মর্ত্ত্যলোকের বন্ধন ছিন্ন করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি ভাবিতে পারেন নাই এত শীঘ্র তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইবে; আমরাও ভবিতে পারি নাই এত শীঘ্র আমরা তাঁহার স্নেহচ্ছায়া হইতে বঞ্চিত হইব। কিন্তু ইহাই জগতের চিরন্তন ধারা। আজ মনে পড়িতেছে—এক বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থের মুদ্রিত ভূমিকাখানি দেখিয়াই তিনি কত আনন্দিত হইয়াছিলেন! অনাবিল আনন্দের দীপ্তিতে সেই দিন তাঁহার মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তখন ভাবিতেও পারি নাই যে, এইভাবে এই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিতে হইবে।

শৈশব হইতে বিশ্বাস করিয়াছি মানুষের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। গভীর বেদনার মধ্য দিয়া আজ উপলব্ধি করিতেছি মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তা। মানুষের জীবন নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর; কিন্তু তদপেক্ষাও বড় কথা—মানুষের জীবন বড় অনিশ্চিত। কখন যে কাহার পরপারের ডাক আসিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। আর পরপারের ডাক যাহার আসে, পৃথিবীর কোন আকর্ষণই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। মানুষ একাকী আসে, একাকীই সে কোন্ অজ্ঞাত লোকে চলিয়া যায়—কেহই সেই রহস্য আজও ভেদ করিতে পারে নাই। তবুও আমরা বিশ্বাস করি আত্মা অবিনশ্বর—যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, আত্মীয়স্বজনের স্মৃতিতর্পণে তিনি পরিতৃপ্তি লাভ করেন—শ্রদ্ধার অর্ঘ্য তিনি গ্রহণ করেন। তাই এই ভক্তিঅর্ঘ্য আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাস্টার মহাশয় ৺ ডঃ **মাখনলাল রায়চৌধুরী, এম. এ., এল-এল. বি., পি. আর. এস., ডি. লিট.; শাস্ত্রী মহোদয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইল।** এই গ্রন্থের পরিশিষ্টের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিতে করিতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার আত্মার পরিতৃপ্তি এবং তাঁহার প্রিয় দেশবাসীর কোন প্রয়োজন সাধিত হইলেই হইবে এই গ্রন্থের সার্থকতা।

ইতি;
শ্রদ্ধাবনতা
সুশীলা

গোপ প্রাসাদ, মেদিনীপুর

সূচীপত্র

বিষয়-বস্তু **পত্রাঙ্ক**

ভূমিকা

একাদশ শতকের প্রথম ভাগে (১০২৮ খ্রীঃ) বিখ্যাত মুসলিম মনীষী আল্‌বেরুণী তাঁহার বিখ্যাত কিতাব-উল্‌-হিন্দ্‌ গ্রন্থে অভিযোগ বা শ্লেষ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হিন্দুগণ বক্তব্যবিষয়ে ঐতিহাসিক ক্রম অথবা পারম্পর্য রক্ষা করেন না। রাজা অথবা রাজন্যবর্গের বংশানুক্রমিক সিংহাসনারোহণ এবং রাজত্বকাল সম্বন্ধে হিন্দুগণ অত্যন্ত উদাসীন, এই বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহারা প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহারা রাজা বা রাজবংশ সম্বন্ধে গল্প এবং কাহিনীর অবতারণা করেন।"[১] এই অভিযোগ ভিত্তিহীন নহে। সংস্কৃত অথবা ভারতীয় লৌকিক ভাষায় লিখিত বর্তমান আদর্শানুযায়ী ইতিহাস রচিত হইয়াছিল কি না, অথবা রচিত হইয়া থাকিলেও সেই ইতিহাসের রূপ কি প্রকার ছিল, এই সম্পর্কে আলোচনা বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় নিষ্প্রয়োজন। বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত ম্যাকডোনাল্ড বলেন, "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে ইতিহাস-বোধ বা ইতিহাস-চেতনা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।" কাহারও মতে হিন্দুগণ ধর্মার্থ-কামমোক্ষকে[২] আশ্রয় করিয়া সমাজ বা জাতির ইতিহাস রচনা করিতেন, বিশেষ কোন ব্যক্তির জীবনের ঘটনাকে তাঁহারা একান্তভাবে আলোচনা করেন নাই। অনেকে পুরাণ ও ইতিহাসকে পঞ্চম-বেদ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী, কালিদাসের শকুন্তলা, বাণভট্টের হর্ষচরিত প্রভৃতি কাব্য ও নাটক ইতিহাস-আশ্রিত। এই আলোচনাও এই ভূমিকায় অপ্রাসঙ্গিক।

ইহা সত্য যে, মুসলমান আগমনের পর হইতেই ভারতবর্ষে ঘটনামূলক ইতিহাস রচনার সূচনা হইয়াছে। ঘটনামূলক ইতিহাস রচনা ভারতের ইতিহাসে ইসলামের বিশেষ অবদান—অবশ্য যুগে যুগে ইতিহাসের আদর্শ, রূপ ও ব্যাখ্যা পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসের মূল উপজীব্য—ঘটনার যথার্থ বিবৃতি—এখনও ইতিহাস রচয়িতৃগণের প্রধান অবলম্বন। প্রায় প্রত্যেক মুসলমান খলিফা, সুলতান, বাদশাহ ও আমীর তাঁহাদের দরবারে ঘটনা-লেখক (ওয়াকিয়া নবিস) নিযুক্ত করিতেন। তাঁহারা প্রভুর জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা—যুদ্ধবিগ্রহ, জন্ম, বিবাহ ও

---

১) "Unfortunately the Hindus do not pay much attention to historical order of things. They are very careless in relating the chronological succession of their kings and when they are pressed for information and are at a loss not knowing what to say, they invariably take to tale-telling." *Kitab-Ul-Hind.* Tr. Sachau p. 59.

২) ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পুরাবৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥ মহাভারত

মৃত্যুর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এমন কি যুদ্ধের বিবরণ-লেখকও যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর অনুসরণ করিতেন। অনেক বাদশাহ তাঁহাদের জীবনী-লেখক নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; কোন কোন বাদশাহ স্বয়ং আত্মজীবনী রচনা করিয়াছেন।

বাঙ্গলাদেশে বিভিন্ন তুর্ক-আফঘান বংশ প্রায় সার্ধ তিনশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছে। উহাদের মধ্যে প্রধান দুইটি বংশ—ইলিয়াসশাহী বংশ একশত সাত বৎসর, হুসেন-শাহী বংশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। এই উভয় বংশের সুলতানদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, এই সুলতানদের মধ্যেও কেহই দরবারী ইতিহাস রচনায় উৎসাহ প্রদান করেন নাই এবং কেহ আত্মজীবনীও রচনা করেন নাই। মুঘল যুগে দিল্লীর দরবারে এবং প্রাদেশিক দরবারেও দরবারী-ইতিহাস রচিত হইয়াছিল—জীবনী লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু তুর্ক-আফঘান যুগে সমসাময়িক কালের রচিত বাঙ্গলাদেশের কোন দরবারী ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় না।

মুঘল যুগের মতন তুর্ক-আফঘান যুগে বিশেষ কোন বিদেশী পর্যটক, রাজদূত, চিকিৎসক, বণিক বা ধর্মপ্রচারক বঙ্গদেশে আগমন করেন নাই। সুলতানী যুগে মরক্কোদেশীয় পর্যটক ইবন বাতুতা, চৈনিক দোভাষী মা-হুয়ান এবং বণিক ফেসিঙ বাঙ্গলাদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারাই বাঙ্গলাদেশের যৎসামান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তুর্ক-আফঘান যুগে দিল্লীর সুলতানগণ বাঙ্গলাদেশকে অবাঞ্ছিতদেশ বা 'নরক' অথবা বুলঘকপুর বা বিদ্রোহের দেশ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। দিল্লী হইতে বাঙ্গলার দূরত্ব, বাঙ্গলার উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ু, বাঙ্গলার খরস্রোতা নদনদী, বাঙ্গলার অবিশ্রান্ত বর্ষাধারা এবং দুর্ধর্ষ হস্তিবাহিনী দিল্লীর সুলতানদের মনে ভীতি সঞ্চার করিত। দিল্লীর সুলতানের সহিত বাঙ্গলার সুলতানদের সংঘর্ষ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রাক্ মুঘল যুগের বঙ্গের বাহান্ন জন শাসক ও সুলতানের মধ্যে দিল্লীর বশংবদ ছিলেন অনধিক পনর জন। ইলতুৎমিস বাঙ্গলাদেশে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; বলবন বিদ্রোহী শাসনকর্তা তুঘরিলকে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন এবং স্বীয় পুত্র বুঘরা খানকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া বঙ্গদেশ নিরাপদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। খালজী বংশের আগমনের সময় হইতেই বঙ্গদেশ স্বাধীন হইল। মুহম্মদ তুঘলক বহু চেষ্টা করিয়াও বঙ্গে দিল্লীর নিশ্ছিদ্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ফিরুজ তুঘলক দুইবার অভিযান পরিচালনা করিয়াও বঙ্গদেশ জয় করিতে পারেন নাই। তারপর হইতে হুমায়ুন কর্তৃক বঙ্গবিজয় পর্যন্ত বঙ্গদেশ নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছিল।

দিল্লীর সহিত বঙ্গের এই সম্বন্ধ দিল্লীর পক্ষে সম্মানজনক ছিল না ; সুতরাং দিল্লীর দরবারী ইতিহাসলেখকগণ বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ করেন নাই। দিল্লীর দরবারী ইতিহাসে বঙ্গ সম্বন্ধে যেসকল উল্লেখ আছে, ঐগুলি খণ্ড খণ্ড এবং হিন্দুস্থানের বৃহত্তর ইতিহাসের অতি সামান্য অংশমাত্র। মীনহাজউদ্দীন সিরাজের তবকাত-ই-

নাসিরী, আমীর খসরুর কিরাণ-উস-সাদাইন, বারানী এবং আফিফের তারিখ-ই-ফিরুজশাহী, ইসামীর ফতুহ-উস্-সালাতীন, ইয়াহিয়া-বিন সরহিন্দির তারিখ-ই-মুবারকশাহী প্রভৃতি গ্রন্থে খণ্ড খণ্ড ভাবে দিল্লীর সহিত সংশ্লিষ্ট বঙ্গ রাজদরবারের ঘটনাবলী বর্ণিত আছে ; কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে পারম্পর্য রক্ষা করিয়া বাঙ্গলার এই ঘটনাগুলি বর্ণিত হয় নাই। পরবর্তিকালে সম্রাট আকবরের সময়ে আবুল ফজল, আবুল ফৈজী, বদায়ুনী এবং নিজামউদ্দীন বক্সী,-জাহাঙ্গীরের সময়ে মির্জা নাথান (বাহার-ই-স্তান-ই-গয়বী রচয়িতা),—শাহজাহানের সময়ে কাসিম হিন্দু-শাহ-ফেরিস্তা,—মুঘল যুগের পরবর্তিভাগে গোলাম হুসেন তাবা তাবাই, গোলাম হুসেন সলিম, সলীমউল্লা প্রভৃতি ইতিহাসলেখকগণ খণ্ড খণ্ড ভাবে বাঙ্গলা সম্পর্কিত ঘটনাগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। এই অসম্পূর্ণ বাঙ্গলার ইতিহাসগুলি ব্যতীত তুর্ক-আফঘান যুগে কোন মুসলমান-রচিত ধারাবাহিক বাঙ্গলার ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতে তুর্ক-আফঘান রাজত্বের সমকালে মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ মোঙ্গল জাতি বাগদাদ ধ্বংস করিয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গে বহু মুসলিম রাজ্যও ধ্বংস হইয়া গেল। মুসলিম যুগের ধারা অনুসারে বহু মুসলিম জ্ঞানী, গুণী, লেখক, কবি রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতেন এবং রাজদরবারকে আশ্রয় করিয়াই জীবিকানির্বাহ করিতেন। মোঙ্গল কর্তৃক বিতাড়িত বহু মুসলিম আমীর ইলতুৎমিস, বলবন, মুহম্মদ তুঘলক, ফিরুজ তুঘলক প্রভৃতি সুলতানের দরবারে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে কিংবা পৃথকভাবে বহু মুসলিম সুধী, জ্ঞানী-গুণীও দিল্লীর দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দিল্লীর ঐশ্বর্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা লাভেই সন্তুষ্ট হইতেন এবং দিল্লী হইতে বহু দূরে, বঙ্গের উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ু তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। একমাত্র সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের সময়ে এবং পরবর্তী কালে সুলতান আজমশাহের সময়ে দিল্লীর এবং বহির্ভারতীয় কতিপয় সুধীকে বাঙ্গলার দরবারে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। এই সমস্ত মুসলিম সুধী যদি বঙ্গে আগমন ও স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেন এবং দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতেন, তবে হয়ত' বঙ্গের মুসলিম যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা সম্ভব হইত। অন্যদিকে হয়ত' বঙ্গদেশে মুসলিম কৃষ্টি, ফারসী ভাষা ও আরবী লিপি প্রচলিত হইত। কিন্তু বঙ্গদেশে যেসমস্ত তুর্ক-আফঘান সুলতান রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন অসিজীবী এবং নিরক্ষর। লুণ্ঠন ও ইসলামধর্ম প্রচারে তাঁহাদের যতটা উৎসাহ ছিল, কৃষ্টি প্রচারে ততটা উৎসাহ ছিল না। সেই জন্যই বঙ্গদেশে মুসলিম অধিকারের প্রাথমিক যুগে মুসলিম অধিকার বিস্তারের সঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতি ও ভাষা বাঙ্গালী জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বঙ্গদেশেই মুসলিম সুলতানগণ আনুষ্ঠানিকভাবে স্থানীয় বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। ফলে বাংলা ভাষা বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ভাষারূপে গৃহীত হইয়াছিল। এই তথ্য বাঙ্গলায় মুসলিম শাসনের বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য যেসমস্ত সুফী, উলেমা, আউলিয়া ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে আগমন

করিয়াছিলেন এবং স্থায়ী ভাবে বসবাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রচিত কয়েকটি অলৌকিক কাহিনী বা "কেচ্ছা-কহানী" ও গল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ—অবশ্য কেচ্ছা-বর্ণিত ঘটনাগুলি অনেক স্থলেই ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত হইয়াছিল। সেই রচনাগুলি ইতিহাসের প্রামাণ্য উপাদানরূপে গৃহীত হইতে পারে না, যেমন—কুতুব-উল্-আলম ও রাজা গণেশের ধর্মান্তর কাহিনী। বিভিন্ন উলেমা, আউলিয়া ও সুফী একই কাহিনীকে বিভিন্নযুগের ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত বিভিন্ন ভাবে সংযুক্ত করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে—আসমানতারার সহিত রাজা গণেশের বিবাহ, গণেশ-পুত্র যদুমল্লের ধর্মান্তরগ্রহণ, সুবর্ণধেনুব্রত, যদুমল্লের সহিত ফুলজানির বিবাহ। একটি কাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, শ্রীহট্টের আউলিয়া শাহজালাল প্রতিদিন প্রভাতে মক্কায় গমন করিতেন এবং মক্কার মসজিদে প্রভাতী নমাজ পাঠ করিয়া দ্বিপ্রহরের পূর্বেই হিন্দুস্থানে তাঁহার দরগায় প্রত্যাবর্তন করিতেন। এই সমস্তই জনশ্রুতি—এগুলিরও কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

মুসলিমগণ বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিল, বঙ্গদেশে অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, দেশ শাসন করিয়াছিল ; কিন্তু এই দেশ জয়, অধিকার বিস্তার ও শাসনের রূপ কি ছিল—তাহা অনুধাবন প্রয়োজন। মুসলিম বিজয়ের প্রাথমিক প্রেরণা ছিল লুণ্ঠন, পরোক্ষ প্রেরণা ছিল ধর্মপ্রচার এবং ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রচারের বিলাস। ইসলামের আবেদন ছিল সর্বাত্মক—অর্থাৎ জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ইসলামের আদর্শ ও জীবনধারা প্রচারের চেষ্টা ছিল মুসলিম শাসনের অচ্ছেদ্য অংশ। অবশ্য বাঙ্গলায় মুসলিম বিজয়ের প্রথম পর্বে ইসলাম প্রচারের রূপ ভিন্ন প্রকার ছিল। কারণ, তুর্ক-আফঘান জাতি ছিল ইসলামের সর্বশেষ গোষ্ঠী। আরবদেশে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছিল ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে। তুর্ক-আফঘানগোষ্ঠী ইসল্যামধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল দশম ও একাদশ শতাব্দীতে। এই পাঁচশত বৎসরের ব্যবধানে ইসলাম ধর্মের উন্মাদনাও বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গলাদেশ বিজয় করিয়াছিল তুর্ক-আফঘান জাতি। ইসলামের প্রারম্ভিক উন্মাদনা ও আবেদন এই জাতিগুলির মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই—তাহাদের চিন্তাধারা ও কর্মপ্রচেষ্টা ছিল বহুলাংশে সামঞ্জস্য-মূলক। অন্যদিকে বাঙ্গালী জাতির মন, চিন্তাধারা ও কর্মপ্রচেষ্টা ছিল ন্যুনাধিক পরিমাণে প্রাচীন উত্তর-ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বিদ্রোহাত্মক না হইলেও সহানুভূতি বিহীন। বহিরাগতদের ধর্ম, চিন্তা ও ভাবধারা বাঙ্গালী সম্পূর্ণ গ্রহণও করে নাই, আনুষ্ঠানিক ভাবে বর্জনও করে নাই। বঙ্গের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু এবং পুনঃপুনঃ নদীর গতি পরিবর্তনে বাঙ্গালী হিন্দু পরিবর্তন এবং বিবর্তনকে সহজভাবে গ্রহণ করিতেই অভ্যস্ত হইয়াছিল এবং বিদেশী বিধর্মী মুসলমানের সহিতও তাহারা সেই কারণেই সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারিয়াছিল। বহিরাগত তুর্ক-আফঘান জাতির বাঙ্গলায় রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করিলে এই সামঞ্জস্যমূলক সমন্বয়ী ভাবটিই প্রতিভাত হয়।

তুর্ক-আফঘান জাতি বাঙ্গলাদেশ জয় করিয়া প্রথমেই আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিত বিধর্মীর দেশকে ইসলামের দেশ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে, বিজয়ের জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছে, আল্লাহর উপাসনার জন্য মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে; তাহারা মসজিদের জন্য ইমাম নিযুক্ত করিয়াছে, মসজিদের ব্যয়ের জন্য ভূমিদান করিয়াছে, মুসলিম রাজ্যের বিচার-ব্যবস্থার জন্য তাহারা কোরাণের নির্দেশ গ্রহণ করিয়াছে। সেই উদ্দেশ্যে আরবী ভাষাবিদ্ মোল্লা, উলেমা ও কাজী নিযুক্ত করিয়াছে। রাজ্য জয় ও ইসলাম প্রচার সমান্তরালভাবেই অগ্রসর হইয়াছে। হয়ত' বা কোন সুলতানগোষ্ঠী অচিরকাল মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে স্থানে মুসলিম সুলতান কর্তৃক মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল সে স্থান হইতে উহা নিশ্চিহ্ন হয় নাই—স্থানান্তরিতও হয় নাই। মুসলিম অধিকার বিস্তারের চিহ্নস্বরূপ মসজিদগুলি প্রায় অক্ষত অবস্থায় দীর্ঘকাল বিদ্যমান ছিল। সমাধির উপর সৌধ নির্মাণ মুসলিম সমাজে আত্মীয়স্বজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন, মৃত পীর, সুফী এবং আউলিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনও পুণ্য অর্জনের সোপানরূপে গৃহীত হইত। এই মসজিদগুলি হিন্দু বা মুসলিম কেহই উৎখাত করে নাই। মুসলিম অধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাধিগুলিও বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে মুসলিম বিজয়ের সাক্ষীস্বরূপ অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে।

বঙ্গে মুসলিম অধিকার বিলুপ্তি এবং ইংরাজ অধিকার স্থাপনের অব্যবহিত পরেই ইংরেজগণ বাঙ্গলাদেশ সম্বন্ধে সংবাদ জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইল। পলাশী যুদ্ধের সাত বৎসরের মধ্যেই কোম্পানীর গবর্ণর ভ্যান্‌সিটার্টের নির্দেশক্রমে সলীমউল্লা তারিখ-ই-বাঙ্গলা শীর্ষক একখানি বাঙ্গলার ইতিহাস রচনা করেন (১৭৬৪ খ্রীঃ)। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্ল্যাডউইন (Gladwin) সলীমউল্লা প্রণীত তারিখ-ই-বাঙ্গলার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতবর্ষের ভাগ্যক্রমে এই সময়ে স্যার চার্লস উইলকিনস স্যার উইলিয়ম জোন্স এবং এইচ, টি, কোলব্রুক প্রমুখ সুধীবর্গের ব্যক্তিগত উৎসাহ ও সমবেত চেষ্টার ফলে বাঙ্গলার সাংস্কৃতিক জীবনে এক অপূর্ব স্পন্দন অনুভূত হইল।

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গোলাম হুসেন সলীম নামক একজন মৌলবী মুসলিম শাসনে সুবা বাঙ্গলার একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেন। এই গোলাম হুসেন সলীম ছিলেন মালদহে কোম্পানির জনৈক স্থানীয় কর্মচারী জর্জ উডনি সাহেবের ডাক মুন্সী—অনেকটা বর্তমান যুগের ডাক-বিভাগের পোষ্টমাষ্টারের মতন। গোলাম হুসেন কোম্পানীর ফারসী চিঠিপত্র, ফরমান এবং দলিলদস্তাবেজগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। এই উপলক্ষ্যে গোলাম হুসেন সরকারী দপ্তরের প্রাচীন কাগজপত্র, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। জর্জ উডনির নির্দেশক্রমে এই কার্যের জন্য তিনি নানা গ্রন্থ পাঠ করেন; স্থানীয় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করেন; পরিশেষে রিয়াজ-উস-সালাতীন প্রণয়ন করেন (রিয়াজ-উপদেশ, সালাতীন-রাজন্যবর্গ)। এই গ্রন্থখানির মূল উপাদান তারিখ-ই-বাঙ্গলা গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। অথচ গোলাম হুসেন

কোথাও সলীমউল্লার ঋণ স্বীকার করেন নাই। এই গ্রন্থের কলেবর যথেষ্ট বৃহৎ—১২০০ হইতে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৫৫৭ বৎসরের ইতিহাস। পুস্তকখানির মধ্যে বহু ভ্রমপ্রমাদ রহিয়াছে। গোলাম হুসেন তাঁহার ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি তাঁহার পাঠকবর্গকে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন—"অতীতের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা এই পুস্তকের মধ্যে অনেক দোষত্রুটি দেখিতে পাইবেন। সেইগুলি নিজেরা সংশোধন করিয়া লইবেন। It is desired of people conversant with past times, that if they detect any mistake or oversight, they will overlook it in as much as this humble man is not free from shortcomings, and further that, according to their capacity, they will correct the mistakes and defects and if they cannot do so, they will be good enough to overlook them—(Translation by Abdus Salam p. 4)." গোলাম হুসেনের এই উক্তি তাঁহার উদার ও মুক্ত মনেরই পরিচায়ক।

রিয়াজ-উস-সালাতীন গ্রন্থে উল্লিখিত তারিখগুলি নানাস্থানে ভ্রান্তিপূর্ণ; কারণ মুদ্রা ও শিলালিপির সঙ্গে প্রায়ই উহাদের সঙ্গতি নাই। অবশ্য মুদ্রাগুলিও অনেক স্থলে বিকৃত, অক্ষরগুলি অস্পষ্ট। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে আবদুস সালাম কৃত রিয়াজ-উস-সালাতীনের অনুবাদ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার চার্লস স্টুয়ার্ট (Sir Charles Stewart) তাঁহার History of Bengal প্রকাশ করেন। বহুকাল পর্যন্ত স্যার চার্লস স্টুয়ার্টের History of Bengal বাঙ্গলার ইতিহাস রচনায় প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে বিবেচিত হইত। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবাসী কার্যালয় স্যার চার্লস স্টুয়ার্টের গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে। বঙ্গবাসী সংস্করণের ভূমিকায় লিখিত আছে—"Stewart's History of Bengal is not only the best but also the first work that was ever been written on the subject". স্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাস প্রায় রিয়াজ-উস-সালাতীনের অনুবাদ; অবশ্য উহার মধ্যে British Factory Records হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত রহিয়াছে।

কিন্তু পরবর্তী কালে মুদ্রাতত্ত্ববিদ স্যার এডওয়ার্ড টমাস (Sir Edward Thomas) ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে Journal of the Asiatic Societyতে—On the Initial Coinage of Bengal শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে স্যার এডওয়ার্ড টমাসের বিখ্যাত গ্রন্থ Chronicles of the Pathan Kings of Delhi প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এইচ, ই, ব্লকম্যান (H. E. Blockmann) J A S B পত্রিকাতে শিলালিপির ভিত্তিতে কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রণীত মুদ্রা বিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তকে (Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal) তুর্ক-আফঘান যুগের ইতিহাসের অনেক

ভুলত্রুটি সংশোধিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশের পরে স্যার চার্লস্ স্টুয়ার্টের History of Bengal এবং গোলাম হুসেনের রিয়াস-উস-সালাতীন গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়া গেল। সূক্ষ্মবুদ্ধি বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম হইতে রিয়াজ-উস-সালাতীনের তথ্য পরিবেশন ও দৃষ্টিভঙ্গী নিন্দার্হ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ রজনীকান্ত চক্রবর্তী রচিত 'গৌড়ের ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড' প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাস প্রায় অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইত। অবশ্য ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশ ছিল ভারতে বৃটিশ রাজত্বের হৃদপিণ্ডস্বরূপ। সুতরাং বাঙ্গলাদেশের ইংরাজী বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষায় এবং বাংলা বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় বাঙ্গলার ইতিহাস পঠিত হইত। এই সময়ে বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে কয়েকখানি বাঙ্গলার ইতিহাস রচিত হইযাছিল, যথা—John Clark Marshman প্রণীত—History of Bengal (১৮৩৯ খ্রী:)। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র সেন রচিত 'বাঙ্গলার ইতিহাস' বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাঙ্গলার ইতিহাস। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে 'বঙ্গেতিহাস' নামক একখানি বাঙ্গলার ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকরূপে পাঠ করিয়াছিলেন (সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ১৮ পৃ:)। এই সময়ে মার্সম্যানের History of Bengalএর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্সম্যানের পুস্তকের শেষাংশ অনুবাদ করিয়া 'বাঙ্গলার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ (মুসলিম যুগ)' প্রকাশ করেন। ১৮৩৭-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংরেজী ভাষা ও ইতিহাসের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইল। ক্রমশঃ বাঙ্গলার ইতিহাস ইংলণ্ডের ইতিহাসের তুলনায় পাঠ্যপুস্তক-তালিকা হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র ঋষিসুলভ দূরদৃষ্টি লইয়া বাঙ্গলার ইতিহাস জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা করিলেন। বাঙ্গলার ইতিহাসের প্রতি বেদনা ও অভিমানসঞ্জাত একটি অনুরাগ তাঁহার উপন্যাসগুলিতে চিত্রিত হইয়াছে— দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গলার ইতিহাসের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগ প্রমাণ করে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মৃণালিনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র অনেকাংশে বাঙ্গলার ইতিহাস রচয়িতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে গৌড়েশ্বরের সভার বর্ণনা অপূর্ব। বাঙ্গালীর মনে স্বদেশ-প্রীতি ও স্বজাতি-প্রীতির জাগরণে এই উপন্যাসগুলির দান অতুলনীয়। বাঙ্গলার ইতিহাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দান এখনও সম্পূর্ণ আলোচিত হয় নাই।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ব্লকম্যানের মুসলিম যুগের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল—Contributions to the Geography and History of Bengal (Muhammedan period, 1203-1538 A.D.). ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ রোপার লেথব্রিজ (Roper Lethbridge) An Early Introduction to the History and Geography of Bengal প্রকাশ করেন।

"ষ্টুয়ার্ট সাহেবই হউন বা লেথব্রিজ সাহেবই হউন—ইংরেজরচিত বা ইংরেজ-লিখিত ইতিহাস—বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর যথার্থ ইতিহাস নহে।" (বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—বঙ্গদর্শন, ১২৮৭ অগ্রহায়ণ)—বঙ্কিমের এই মত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ঐতিহাসিক চেতনা জাগ্রত জাতির প্রাণের লক্ষণ। সুপ্ত জাতির মনে যেমন ভাবীকালের ইতিহাসসৌধ নির্মাণের স্পৃহা বা উদ্যম থাকে না, তেমনই অতীত ইতিবৃত্ত জানিবার আগ্রহও থাকে না। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বাঙ্গলা তথা ভারতের যেসকল ইতিহাস রচিত হইয়াছে কিংবা পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে যতটুকু আলোক-সম্পাত হইয়াছে উহা প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের গবেষণার ফল। এই গবেষণার মূলে জাতীয় জাগরণ বা গৌরববোধ ছিল না—ছিল বিশুদ্ধ জ্ঞানসাধনার প্রবর্তনা। এই গবেষণাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে ইংরেজী ভাষায়। ইংরেজীর কঠিন প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গে সাধারণ বাঙ্গালীর প্রবেশাধিকার ছিল না। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতির সেই দুর্গম পথে অগ্রসরের আগ্রহও ছিল না। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে আগমন হইল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (১২৮০, ভাদ্র) 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার'-শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলার ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করেন। তারপর ক্রমশঃ 'বাঙ্গালীর বাহুবল', (১২৮১, শ্রাবণ), 'বাঙ্গলার ইতিহাস' (১২৮১, মাঘ) 'বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (১২৮৭, অগ্রহায়ণ) প্রকাশ করিয়া তিনি বাঙ্গালীর মনে এক নূতন ইতিহাস-চেতনা সঞ্চার করেন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বাঙ্গালীকে আহ্বান করিলেন—"বাঙ্গলার ইতিহাস চাই, নইলে বাঙ্গলার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গলার ইতিহাস রচনা করি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার পশ্চাতে অন্যতম প্রেরণা ছিল তিনি বাঙ্গালীর কলঙ্ক মোচন করিবেন, বাঙ্গালীজাতিকে আত্মসচেতন করিবেন, বাঙ্গালীর মনে স্বদেশ-প্রীতি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিবেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ইংরেজের বেতনভোগী রাজভৃত্য। ভৃত্যের পক্ষে প্রভুর বিরুদ্ধে উষ্মা জাগ্রত করা সহজ ও সাধারণ ব্যাপার নহে। প্রত্যক্ষভাবে সমসাময়িক ভারতে এইরূপ কার্য সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র, সাহিত্যের মধ্য দিয়া অতি সূক্ষ্মভাবে কখনও আদর্শ ব্যঞ্জনা করিয়া, কখনও আঘাত করিয়া, কখনও ব্যঙ্গরস সৃষ্টি করিয়া, কখনও বিস্মৃত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার করিয়া বাঙ্গালী জাতির মনে অপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপূজার মন্ত্র "বন্দেমাতরম্"। বাস্তবিক পক্ষে ফরাসী বিদ্রোহের সূচনায় ভল্‌টেয়ারের ভূমিকার অনুরূপ ছিল ভারতের বিপ্লবে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা। শ্লেষ, কটূক্তি, বিশ্লেষণ, আঘাত, রাজপুরুষ ও বিদেশী বণিকের চরিত্রাঙ্কণ ও দুর্নীতি ব্যাখ্যা করিয়া বাঙ্গালী জাতির মনে বঙ্কিমচন্দ্র এক নূতন চেতনা সৃষ্টি করিলেন। ভল্‌টেয়ারের পক্ষে পরিবেশ ছিল সহজ, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে পরিবেশ ছিল অত্যন্ত কঠিন; কারণ, ফরাসী দেশে রাজা ও রাজপুরুষ ছিলেন ফরাসী দেশের সন্তান; ভল্‌টেয়ারের

স্বজাতীয়। বঙ্কিমের দেশে রাজা ও রাজপুরুষ ছিলেন বিদেশীয়—বিজাতীয়। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র পরোক্ষে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্য দিয়া বাঙালীর মনে এক অপূর্ব উন্মাদনা সঞ্চার করিলেন। বাঙ্গলার ঐতিহাসিক উপাখ্যান পাঠ করিয়া বাঙালীর মনে নব চেতনার উন্মেষে, বাঙ্গালী জাতির জাগরণে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির দান অত্যন্ত মূল্যবান। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' সংস্থা স্থাপনের উদ্যোগপর্ব সমাপ্ত করিয়া যজ্ঞাগ্নি সংযোগের পূর্বেই তিরোধান করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইল ২৯শে এপ্রিল, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান হইল ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। বাঙ্গলার ইতিহাস রচনা ও সংস্কারে সাহিত্য পরিষদের দান নগণ্য নহে।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের সমিধ্ আহরণ ব্যর্থ হয় নাই। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্তের খুল্লতাত শশীচন্দ্র দত্ত Bengal নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকখানি নাতিদীর্ঘ হইলেও চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত Reminiscences of the Mahommedan Era বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থের সহিত সংশ্লিষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকা বাঙ্গলার ইতিহাস-সাহিত্যে অবিস্মরণীয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ধারাবাহিক ভাবে সাধনা পত্রিকায় 'সিরাজউদ্দৌল্লা' গ্রন্থ প্রকাশ আরম্ভ করেন (১৮৯৫ খ্রীঃ)। দুই বৎসর পরে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে (১৩০৫ সাল) 'সিরাজউদ্দৌল্লা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে মন্তব্য করিলেন --"বাঙ্গলার ইতিহাসে তিনি যে স্বাধীনতার যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন, সেজন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যে ধন্য হইয়া থাকিবেন। (ভারতী, ১৩০৫ সাল, শ্রাবণ)। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বাঙালী জানিল ও বুঝিল যে, ইংরাজ কর্তৃক পরিবেশিত বাঙ্গলা দেশের ইতিহাসের উপাদান বিনা বিচারে গ্রহণীয় নহে।

অক্ষয়কুমারের সিরাজউদ্দৌল্লার সঙ্গে সঙ্গে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (নবাবী আমল, ১৩০৪ সাল), নিখিল নাথ রায় 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' এবং 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' রচনা করেন (১৩০৮ সাল)। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার রাজশাহী হইতে 'ঐতিহাসিক চিত্র' শীর্ষক একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার "সূচনা" লিখিয়া বাঙ্গালীর ইতিহাস-সাধনার রুদ্ধ উৎসমুখ উন্মোচন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া 'কথা ও কাহিনী' রচনা করিয়া বাঙালীর মনে শিখ, মারাঠা এবং রাজপুত বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনার প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাঙ্গলাদেশের ঐতিহাসিক ঘটনা, বীরপুরুষ বা বীরনারীর আখ্যান রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোন কাহিনীর উপজীব্য বলিয়া স্মরণ করেন নাই। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 'কথা'কাব্য রচনার সময়েও রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই বিস্মৃতি বাঙালীর মনকে পীড়া দেয়।

বাঙালীর ইতিহাস রচনার প্রচ্ছদপটে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস একটি বিরাট স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রথম স্তরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ছিল একমাত্র সাহিত্যের ইতিহাস; দ্বিতীয় স্তরে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে

"স্টুয়ার্ট সাহেবই হউন বা লেথব্রিজ সাহেবই হউন—ইংরেজরচিত বা ইংরেজলিখিত ইতিহাস—বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর যথার্থ ইতিহাস নহে।" (বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—বঙ্গদর্শন, ১২৮৭ অগ্রহায়ণ)—বঙ্কিমের এই মত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ঐতিহাসিক চেতনা জাগ্রত জাতির প্রাণের লক্ষণ। সুপ্ত জাতির মনে যেমন ভাবীকালের ইতিহাসসৌধ নির্মাণের স্পৃহা বা উদ্যম থাকে না, তেমনই অতীত ইতিবৃত্ত জানিবার আগ্রহও থাকে না। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বাঙ্গলা তথা ভারতের যেসকল ইতিহাস রচিত হইয়াছে কিংবা পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে যতটুকু আলোকসম্পাত হইয়াছে উহা প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের গবেষণার ফল। এই গবেষণার মূলে জাতীয় জাগরণ বা গৌরববোধ ছিল না—ছিল বিশুদ্ধ জ্ঞানসাধনার প্রবর্তনা। এই গবেষণাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে ইংরেজী ভাষায়। ইংরেজীর কঠিন প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গে সাধারণ বাঙ্গালীর প্রবেশাধিকার ছিল না। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতির সেই দুর্গম পথে অগ্রসরের আগ্রহও ছিল না। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে আগমন হইল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (১২৮০, ভাদ্র) 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার'-শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলার ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করেন। তারপর ক্রমশঃ 'বাঙ্গালীর বাহুবল', (১২৮১, শ্রাবণ), 'বাঙ্গলার ইতিহাস' (১২৮১, মাঘ) 'বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (১২৮৭, অগ্রহায়ণ) প্রকাশ করিয়া তিনি বাঙ্গালীর মনে এক নূতন ইতিহাস-চেতনা সঞ্চার করেন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বাঙ্গালীকে আহ্বান করিলেন—"বাঙ্গলার ইতিহাস চাই, নইলে বাঙ্গলার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গলার ইতিহাস রচনা করি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার পশ্চাতে অন্যতম প্রেরণা ছিল তিনি বাঙ্গালীর কলঙ্ক মোচন করিবেন, বাঙ্গালীজাতিকে আত্মসচেতন করিবেন, বাঙ্গালীর মনে স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিবেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ইংরেজের বেতনভোগী রাজভৃত্য। ভৃত্যের পক্ষে প্রভুর বিরুদ্ধে উষ্মা জাগ্রত করা সহজ ও সাধারণ ব্যাপার নহে। প্রত্যক্ষভাবে সমসাময়িক ভারতে এইরূপ কার্য সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র, সাহিত্যের মধ্য দিয়া অতি সূক্ষ্মভাবে কখনও আদর্শ ব্যঞ্জনা করিয়া, কখনও আঘাত করিয়া, কখনও ব্যঙ্গরস সৃষ্টি করিয়া, কখনও বিস্মৃত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার করিয়া বাঙ্গালী জাতির মনে অপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপূজার মন্ত্র "বন্দেমাতরম্"। বাস্তবিক পক্ষে ফরাসী বিদ্রোহের সূচনায় ভল্‌টেয়ারের ভূমিকার অনুরূপ ছিল ভারতের বিপ্লবে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা। শ্লেষ, কটূক্তি, বিশ্লেষণ, আঘাত, রাজপুরুষ ও বিদেশী বণিকের চরিত্রাঙ্কণ ও দুর্নীতি ব্যাখ্যা করিয়া বাঙ্গালী জাতির মনে বঙ্কিমচন্দ্র এক নূতন চেতনা সৃষ্টি করিলেন। ভল্‌টেয়ারের পক্ষে পরিবেশ ছিল সহজ, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে পরিবেশ ছিল অত্যন্ত কঠিন; কারণ, ফরাসী দেশে রাজা ও রাজপুরুষ ছিলেন ফরাসী দেশের সন্তান; ভল্‌টেয়ারের

স্বজাতীয়। বঙ্কিমের দেশে রাজা ও রাজপুরুষ ছিলেন বিদেশীয়—বিজাতীয়। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র পরোক্ষে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্য দিয়া বাঙালীর মনে এক অপূর্ব উন্মাদনা সঞ্চার করিলেন। বাঙ্গলার ঐতিহাসিক উপাখ্যান পাঠ করিয়া বাঙালীর মনে নব চেতনার উন্মেষে, বাঙ্গালী জাতির জাগরণে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির দান অত্যন্ত মূল্যবান। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' সংস্থা স্থাপনের উদ্যোগপর্ব সমাপ্ত করিয়া যজ্ঞাগ্নি সংযোগের পূর্বেই তিরোধান করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইল ২৯শে এপ্রিল, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান হইল ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। বাঙ্গলার ইতিহাস রচনা ও সংস্কারে সাহিত্য পরিষদের দান নগণ্য নহে।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের সমিধ্ আহরণ ব্যর্থ হয় নাই। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্তের খুল্লতাত শশীচন্দ্র দত্ত Bengal নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকখানি নাতিদীর্ঘ হইলেও চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত Reminiscences of the Mahommedan Era বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থের সহিত সংশ্লিষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকা বাঙ্গলার ইতিহাস-সাহিত্যে অবিস্মরণীয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ধারাবাহিক ভাবে সাধনা পত্রিকায় 'সিরাজউদ্দৌলা' গ্রন্থ প্রকাশ আরম্ভ করেন (১৮৯৫ খ্রীঃ)। দুই বৎসর পরে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে (১৩০৫ সাল) 'সিরাজউদ্দৌলা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে মন্তব্য করিলেন —"বাঙ্গলার ইতিহাসে তিনি যে স্বাধীনতার যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন, সেজন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যে ধন্য হইয়া থাকিবেন। (ভারতী, ১৩০৫ সাল, শ্রাবণ)। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বাঙালী জানিল ও বুঝিল যে, ইংরাজ কর্তৃক পরিবেশিত বাঙ্গলা দেশের ইতিহাসের উপাদান বিনা বিচারে গ্রহণীয় নহে।

অক্ষয়কুমারের সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে সঙ্গে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (নবাবী আমল, ১৩০৪ সাল), নিখিল নাথ রায় 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' এবং 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' রচনা করেন (১৩০৮ সাল)। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার রাজশাহী হইতে 'ঐতিহাসিক চিত্র' শীর্ষক একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার "সূচনা" লিখিয়া বাঙ্গালীর ইতিহাস-সাধনার রুদ্ধ উৎসমুখ উন্মোচন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া 'কথা ও কাহিনী' রচনা করিয়া বাঙালীর মনে শিখ, মারাঠা এবং রাজপুত বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনার প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাঙ্গলাদেশের ঐতিহাসিক ঘটনা, বীরপুরুষ বা বীরনারীর আখ্যান রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোন কাহিনীর উপজীব্য বলিয়া স্মরণ করেন নাই। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 'কথা' কাব্য রচনার সময়েও রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই বিস্মৃতি বাঙালীর মনকে পীড়া দেয়।

বাঙালীর ইতিহাস রচনার প্রচ্ছদপটে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস একটি বিরাট স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রথম স্তরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ছিল একমাত্র সাহিত্যের ইতিহাস; দ্বিতীয় স্তরে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে

রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান আবিষ্কার করা হইল। বাংলা ভাষার সম্যক আরম্ভ হইয়াছিল মুসলিম যুগে, মুসলিম রাজদরবারে, মুসলিম আমীর এবং সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায়। সুতরাং বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনার আদিপর্বে গল্প ও উপাখ্যানের মধ্যে অনেকস্থলে মুসলিম নায়ক-নায়িকার উল্লেখ ছিল। এই সমস্ত উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া উপাখ্যান-বর্ণিত মুসলিম সুলতান বা আমীরদের সময়, চিন্তাধারা বা ঘটনার সামঞ্জস্য করা যায়। বাংলা লোকসাহিত্যে বাঙ্গলার ইতিহাসের প্রচুর উপাদান প্রচ্ছন্নভাবে ইতঃস্তত: বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের নির্যাস অদূরভবিষ্যতে বাঙ্গলার রাজনৈতিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করিবে, এই আশা কল্পনাবিলাস নহে।

বিংশ শতাব্দীতে রচিত বাঙ্গলার মুসলিম যুগের ইতিহাসের মধ্যে সর্ব প্রথম উল্লেখযোগ্য ইতিহাস 'বাঙ্গলার নবাবী আমল' (অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ইংরাজের দেওয়ানি লাভ পর্যন্ত)'। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত এই বিরাট গ্রন্থখানি ৫৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। আমাদের গ্রন্থের সঙ্গে ঘটনার দিক দিয়া এই পুস্তকের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু বাঙ্গলার মুসলিম যুগের ইতিহাস রচনায় বাঙালীও যে মৌলিক এবং স্বাধীন গবেষণা করিতে পারে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নিখিলনাথ রায় প্রমুখ ইতিহাস-রচয়িতাগণ তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন।

১৯০ খ্রীষ্টাব্দে যদুনাথ সরকার History of Aurangzib প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে মুঘল যুগের বাঙ্গলার ইতিহাসের ঘটনা খণ্ড খণ্ড ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে স্টুয়ার্ট্ সাহেবের History of Bengal-এর একখণ্ড বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রিয়াজ-উস-সালাতীন গ্রন্থের টীকাসহ ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের টীকার মধ্যে অনেক নূতন তথ্য সন্নিবেশিত রহিয়াছে। আবদুস সালাম কৃত টীকা সত্ত্বেও সমসাময়িক শিলালিপি, মুদ্রা ও প্রত্নতত্ত্বের সমর্থন ব্যতিরেকে রিয়াজ-উস-সালাতীনকে প্রামাণ্য ইতিহাসরূপে গ্রহণ করা যায় না। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রাণ গুপ্ত রিয়াজ-উস-সালাতীনের টীকাসহ অনুবাদ প্রকাশ করেন। রামপ্রাণ গুপ্তের টীকা ও আবদুস সালাম কৃত অনুবাদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'বাঙ্গলার নবাব মীর কাসিম' প্রকাশ করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত' প্রকাশ করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখিলেন, 'বখতিয়ার খালজীর সপ্তদশ অশ্বারোহী বাঙ্গলা জয় করিয়াছিল' একথা অবিশ্বাস্য। ১৯০৫-১৯১১ খ্রীঃ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাঙালীর মনে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। এই আলোড়ন বাঙ্গলার ইতিহাসের ক্ষেত্রেও অনুভূত হইল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে লর্ড কার্জন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য—ভারতের প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষণ। এই সময়ে প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা বা জরিপ (Archaeological Survey) আরম্ভ হয়; মুদ্রা আবিষ্কার, মুদ্রা সংরক্ষণ ও পাঠোদ্ধারের চেষ্টা আরম্ভ হয়; সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে জাদুশালা স্থাপিত হয়। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদগুলি এই সমস্ত জাদুশালায় সংরক্ষিত হইয়াছে। কলিকাতায় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীও এই সময় স্থাপিত হইল—সেখানে প্রাচীন পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি

সংরক্ষিত হইল। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল এবং রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব লণ্ডন-এ বহু ভারতীয় পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত রহিয়াছে। এই সময় হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিল এবং প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার স্থাপিত হইল। স্যার আশুতোষের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Post Graduate Department এবং গবেষণাগার স্থাপিত হয়। বাঙ্গলার ইতিহাস সংকলনে স্যার আশুতোষের দান অবিস্মরণীয়। এই সময়ে Imperial Record Office স্থাপিত হইল। এই ইম্পিরিয়েল রেকর্ড অফিসের অনুকরণে ভারতের বিভিন্ন করদরাজ্যে, প্রাদেশিক কেন্দ্রে এবং বৃহৎ শহরে স্থানীয় রেকর্ড অফিস স্থাপিত হইল। পরবর্তী কালে এই ইম্পিরিয়েল রেকর্ড অফিস ইণ্ডিয়ান আরকাইবস্ (Indian Archives) নামে পরিচিত হইয়াছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। লর্ড কার্জনের প্রেরণায় উৎসাহিত হইয়া বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি গবেষণাগার ও সংস্থা স্থাপিত হইল, যেমন—উত্তরবঙ্গে বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি। অচিরে বিভিন্ন জিলার ইতিহাস রচিত হইতে আরম্ভ করিল।

এই সময় হইতে Archaeological Survey Journal, Numismatic Survey Journal, Asiatic Society Journal, Epigraphica Indica, Epigraphica Indo Moslemica, Calcutta Review, Bengal Past and Present এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ, আলেখ্য ও গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে রজনীকান্ত চক্রবর্তীর 'গৌড়ের ইতিহাস', মনমোহন চক্রবর্তীর 'মালদহের ইতিহাস', সতীশ মিত্রের 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস', কৈলাশচন্দ্র সিংহের 'ত্রিপুরার ইতিহাস' (রাজমালা), অচ্যুত চৌধুরীর 'শ্রীহট্টের কথা,' কেদার নাথ মজুমদারের 'ময়মনসিংহের ইতিহাস', যতীন্দ্রমোহন রায়ের 'ঢাকার ইতিহাস', আবিদ আলির Memories of Gaur and Pandua, উপেন্দ্র রায় চৌধুরীর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এই গ্রন্থগুলির অধিকাংশই শিলালিপি, মুদ্রা, কিংবদন্তী, স্থানীয় ছড়া ও সংগীতের উপর নির্ভর করিয়া রচিত—সুতরাং সর্বক্ষেত্রে নির্ভুল বা অবিসংবাদিত নহে।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে রজনীকান্ত চক্রবর্তী 'গৌড়ের ইতিহাস' প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বাঙ্গলার মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস বর্ণিত আছে। বঙ্গদেশে মুসলিম অধিকার বিস্তারের ইতিহাস রচনায় এই গ্রন্থখানি একটি অমূল্য উপাদান।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে রমাপ্রসাদ চন্দ 'গৌড়ের রাজমালা' এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'গৌড়লেখমালা' প্রকাশ করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের The Palas of Bengal এবং 'বাঙ্গলার ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলির সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই; কিন্তু বাঙ্গলাদেশের ইতিহাস রচনায় এই গ্রন্থ দুইটি বিভিন্ন দিক হইতে নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছে।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে W. U. R. Gourlay, I. C. S. বাঙ্গলা দেশের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রয়াস পান। তখন বাঙ্গলার শাসনকর্তা ছিলেন সুপণ্ডিত, সুসাহিত্যিক,

বিদ্যোৎসাহী এবং ঐতিহাসিক Lord Ronaldshay. তাঁহার উৎসাহে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায়, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি বাঙালী ঐতিহাসিক এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনিশ্চয়তার মধ্যে এই গ্রন্থ প্রণয়ন প্রচেষ্টা স্থগিত হইয়া গেল।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গলার ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)' প্রকাশিত হয়। শিলালিপি, মুদ্রা, তাম্রশাসন, মসজিদ, কূপ, তোরণ, প্রাসাদ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষের উপর নির্ভর করিয়া এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। সংবাদ সম্পদে এই গ্রন্থখানি অপূর্ব এবং মুসলিমযুগের বাঙ্গলার ইতিহাস রচনার শ্রেষ্ঠতম নির্ভরযোগ্য উপাদান। বর্তমানে এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণ আবশ্যক।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ডঃ ভট্টশালী Coins & Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal প্রকাশ করেন। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র কলেবর। তৎসত্ত্বেও এডওয়ার্ড টমাসের Chronicles of the Pathan kings নামক বিরাট গ্রন্থের ভাষ্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভট্টশালী মহাশয় অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থ লিখিবার পূর্বেই কতকগুলি সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লইয়াছেন এবং স্বীয় সিদ্ধান্তগুলির সমর্থনে মুদ্রা হইতে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন। একই প্রমাণের যে-অংশ তাঁহার সিদ্ধান্তের অনুকূল তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা গণেশ, দনুজমর্দন ও মহেন্দ্রদেবের আলোচনায় তাঁহার এই ত্রুটিগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অন্যথা মুদ্রাতত্ত্বের আলোচনায় তাঁহার উৎসাহ ও পরিশ্রম প্রশংসনীয়। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে পাঠান সুলতানদের পর্যায়ক্রম নির্ধারণে ভট্টশালী মহাশয়ের মত অনুসরণ করা হইয়াছে। রাজশাহী বিভাগের Inspector of Schools রূপে কাজ করিবার সময় Stapleton সাহেব বাঙ্গলার মুসলিম সুলতানদের বংশপঞ্জী সংকলনে অভূতপূর্ব ধৈর্যের সহিত পরিশ্রম করেন। স্টেপলটন সাহেবের সংকলিত এই গ্রন্থ-তালিকা (Stapleton's Bibliography and List of Inscriptions) বঙ্গদেশের মুসলিম ইতিহাস রচনায় বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে।

এই সকল পুস্তকে পরিবেশিত সংবাদ বিবরণ-মূলক। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল ঘটনার ব্যাখ্যান, ব্যাখ্যা নহে। মুঘল যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রায় দুইশত বৎসর একটি রাজবংশ বাঙ্গলাদেশ শাসন করিয়াছিল। শাহজাহানের চারি বৎসরের বিদ্রোহ ব্যতীত বাঙ্গলার সিংহাসনের জন্য এই সময়ে বঙ্গদেশে কোন যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয় নাই। মুঘল যুগের শাসনে এবং সংস্থায় একটা ধারাবাহিকতা ছিল। মুঘল যুগের নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বাঙ্গলার কৃষি, বাণিজ্য এবং সম্পদ গঠনে বহুভাবে সাহায্য করিয়াছিল। তুর্ক-আফঘান যুগের বাহান্ন জন শাসক ও সুলতানের মধ্যে প্রায় ত্রিশজনের অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছিল—গড়ে এক-একজন সুলতান কিঞ্চিদধিক সার্ধ ছয় বৎসর শাসন পরিচালনা করিয়াছিলেন। সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব এবং রক্তপাত ছিল তুর্ক-আফঘান যুগের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এই যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা সহজসাধ্য হয় নাই।

সমগ্র বঙ্গদেশে মুসলিম অধিকার যুগপৎ একদিনে স্থাপিত হয় নাই। এমন কি বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে তিনজন শাসনকর্তা তিনটি রাজধানীতে (লক্ষ্ণৌতি, সোনারগাঁও এবং সাতগাঁও) একই সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্বাধীন রাজ্যগুলিও একদিনে বিজিত হয় নাই। উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা, কুচবিহার, চট্টগ্রাম ও বঙ্গোপসাগরের দ্বীপগুলি অধিকার করিতে মুসলমানদিগকে প্রায় দুইশত বৎসর চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। হয়তো কোন অঞ্চল কোন দুর্ধর্ষ তুর্ক-আফঘান বীর কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্বে বা সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্বের অবকাশে সেই রাজ্যগুলি হিন্দু অথবা মুসলমানদের হস্তগত হইয়াছে। পরবর্তী সুলতান পুনরায় নূতন করিয়া সেই অঞ্চল বিজয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং বঙ্গদেশে মুসলিম অধিকার বিস্তারের ইতিহাসও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলার মুসলিম ইতিহাসের আদিপর্ব রচনায় বাঙ্গলার প্রতিবেশী রাজ্যের ইতিহাস হইতেও নানাপ্রকার উপাদান সংগৃহীত হইতেছে। উড়িষ্যার মাদলা পঞ্জিকা, আসামের বুরুঞ্জী এবং বাঙ্গলার কুলপঞ্জী, শিলালিপি এবং মুদ্রার মধ্যে নানাপ্রকার ঐতিহাসিক উপাদান নিহিত রহিয়াছে। আধুনিক যুগের বাঙ্গলার লোক-সাহিত্যের মধ্যেও বহু ঐতিহাসিক উপদান রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া ধর্ম এবং সমাজের ইতিহাস।

মুসলমানগণ কোন অঞ্চল জয় করিলেই মসজিদ নির্মাণ করিতেন, মৃত সুলতানের সমাধিসৌধ নির্মাণ করিতেন। আমীর, সেনাপতি, আউলিয়া, সুফী অথবা পীর পুণ্যলোভে অথবা জনহিতার্থে কূপ খনন করিতেন, মাদ্রাসা স্থাপন করিতেন; সৌধগাত্রে কিংবা প্রাচীরে, ভিত্তিগাত্রে, শিলালিপিতে স্বীয় নাম, পিতৃপরিচয় এবং হিজরী সনের উল্লেখ করিতেন। এইরূপ পরিচয়-ফলক মুসলমান কৃষ্টির একটি অঙ্গ। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই মুসলিম সুলতান মুদ্রা প্রচলন করিতেন। এই মুদ্রাগাত্রে স্বীয় নাম, সিংহাসনারোহণের তারিখ (সন-ই-জুলুস), কখনও বা পিতার নাম উল্লিখিত থাকিত। অনেক মুদ্রার মধ্যে টাঁকশালের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। প্রাক্ মুঘল যুগের পঞ্চাশ জন শাসক ও সুলতানের মধ্যে ছাব্বিশ জনের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং একুশটি টাঁকশালের নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। এই মুদ্রা ও টাঁকশালের অবস্থান বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি বিষয় অনুমান করা যায়; যথা—সুলতানদের নাম ও পরিচয়, সিংহাসনারোহণ ও শাসন-কাল, রাজ্যের বিস্তৃতি বা আয়তন। একই সময়ে একাধিক সুলতানের মুদ্রা আবিষ্কার হইতে ধারণা হয় যে, ঐ সময়ে সিংহাসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল। মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতুর উৎকর্ষতা বা নিকৃষ্টতা হইতে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা অনুমান করা যায়। মুদ্রার রূপ ও অক্ষর হইতে সুলতানের শিল্পবোধ ও সৌন্দর্যপ্রীতির ধারণা করা যায়। আলোচ্য গ্রন্থে এই সমস্ত উপাদানের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য' রচনার অবসরে বহুস্থানে লোককথা, গীতিকা, ছড়া ও গাঁথা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ডক্টর সুকুমার সেন তাঁহার 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে কয়েকটি ঐতিহাসিক কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই কাহিনীগুলির প্রচ্ছদপটে ঐতিহাসিক ঘটনায় সন্ধান দিয়াছেন। সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁহার 'ইতিহাস আশ্রিত বাংলা কবিতা' গ্রন্থে (পৃঃ ৪-১৮) বাংলা ভাষায় লিখিত কতকগুলি ধর্মাশ্রিত ঐতিহাসিক কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। এই কাহিনীগুলির প্রচ্ছদপটে ঐতিহাসিক ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। এই আলোচনার অবসরে তিনি রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ (চতুর্দশ শতাব্দীতে লিখিত) বিশ্লেষণ করিয়া মুসলমানের বিনা আয়াসে বঙ্গদেশ বিজয়ের পটভূমিকা রচনা করিয়াছেন; 'যবন যোদ্ধাকে' ধর্মঠাকুর নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ধর্মঠাকুর 'ব্রাহ্মণদের অন্যায়-অত্যাচার রোধ করিবার জন্যই কৈলাস ত্যাগ করিয়া যবনরূপে মর্তে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।' চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে ফিরুজশাহ তুঘলককে 'যবন বেশধারীধর্ম'-রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। অবশ্য ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, ফিরুজ তুঘলক অত্যন্ত ধর্মান্ধ ও হিন্দুবিদ্বেষী সুলতান ছিলেন। চৈতন্যকাব্যের মধ্যেও বাঙ্গলার মুসলিম অধিকারের আদিপর্বের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। বাঙ্গলার ব্রতকথা, ডাক ও খনার বচন, গোপীচন্দ্রের গান, আম্বার গম্ভীরা, শেখ শুভোদয় প্রভৃতির অন্তর্গত কাহিনী, ছড়া ও গানগুলি বহু ঐতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত বহন করে। ঐগুলির মধ্যে সমসাময়িক বাঙালী সমাজের নানাপ্রকার সংবাদ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এখনও এইগুলিকে অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক তথ্যরূপে গ্রহণের সময় আসে নাই। ত্রিপুরার রাজমালা, বাঙ্গলার মঙ্গলকাব্য এবং মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতায় অনূদিত মহাভারতে চট্টগ্রামের পরাগল খান, ছুটিখান ও হুসেন শাহ সম্বন্ধে নানাপ্রকার কাহিনী জড়িত রহিয়াছে। গাজীর গান-এর মধ্যেও মুসলমান গাজীর অর্থাৎ বিধর্মীহন্তা মুসলিম বীরের কাহিনীর বহু ইঙ্গিত রহিয়াছে।

'আরাকানের বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে আরাকান বিজয়ের কাহিনীর উল্লেখ আছে। চট্টগ্রামের কবি মুহম্মদ খান রচিত 'মুক্ত-লহো-ছান' কাব্যটির মধ্যে চট্টগ্রামে প্রথম মুসলিম আগমনের সংবাদ রহিয়াছে। রুকনউদ্দীন বরবক শাহের সময়ে চট্টগ্রামে একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। পর্তুগীজ বিবরণীতে তুর্ক-আফঘান যুগে বঙ্গোপসাগরের অন্তর্বর্তী দ্বীপপুঞ্জে মুসলিম অধিকার বিস্তারের জন্য সংঘর্ষের ইতিহাস পাওয়া যায়। সোনারগাঁয়ে পাঠান সুলতান ফকরউদ্দীন মুবারক শাহ সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম জয় করেন।

তুর্ক-আফঘান যুগের অন্তভাগে বঙ্গদেশে কয়েকজন ভূম্যধিকারীর (ভুঁইঞা) উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলা ছড়া, গান, কিংবদন্তী এবং কুলপঞ্জীতেও তাঁহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়; তাঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত বারজন সাধারণতঃ বার ভুঁইঞা নামে পরিচিত। এই ভুঁইঞাদের মধ্যে আটজন হিন্দু ও চারজন মুসলমান ছিলেন। তাঁহারা বহিরাগত পর্তুগীজ ও আরাকানী মগ এবং উত্তর-পশ্চিম হইতে আগত মুঘলদের প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বারভুঁইঞাদের যথার্থ ইতিহাস লিখিত হইলে বঙ্গদেশে মুসলিম অধিকার বিস্তারের ইঙ্গিতপূর্ণ আলেখ্য রচিত হইবে।

বাঙ্গলার মুসলিম যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড' (History of Bengal. Vol.-II) প্রকাশ করে। এই পুস্তকের লেখকগণের অধিকাংশই বঙ্গের সুপরিচিত ইতিহাসকার এবং ইহার সংকলয়িতা বিখ্যাত ইতিহাসবিদ স্যার যদুনাথ সরকার। পুস্তকখানি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম হইতে নবম

অধ্যায়ে তুর্ক-আফগান যুগের ইতিহাস, দশম হইতে দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে মুঘল যুগের ইতিহাস এবং তৎপরে মুসলিম রাজত্ব অবসানের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। বিচ্ছিন্ন অধ্যায়গুলির মধ্যে পারম্পর্য রক্ষিত হয় নাই এবং ঘটনার প্রচ্ছদপটও অঙ্কিত হয় নাই। প্রত্যেক লেখকই স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। এই সকল ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও ইহা বঙ্গে মুসলিম অধিকার বিস্তার সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব' প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে বাঙ্গলাদেশের তুর্ক-পূর্ব যুগের ইতিবৃত্ত আংশিক আলোচিত হইয়াছে। যদিও আমাদের গ্রন্থের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই, তবুও ইহাতে বাঙ্গলায় মুসলমান আগমনের পূর্বে বাঙালীর সমাজ এবং রাষ্ট্রের রূপ ও রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে। সত্যই এই গ্রন্থখানি তথ্যবহুল; বাঙ্গলার ইতিহাস অপেক্ষা বাঙালীর ইতিহাসরূপেই গ্রন্থখানি আলোচনীয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রমেশচন্দ্র মজুমদার রচিত 'বাঙ্গলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থেও তুর্কী-পূর্ব বঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রচ্ছদপট অঙ্কিত হইয়াছে।

বর্তমান গ্রন্থে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর পারস্পরিক সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে এবং ঘটনার প্রচ্ছদপট অঙ্কনের চেষ্টা করা হইয়াছে; বিচ্ছিন্ন ঘটনা অপেক্ষা ঘটনাপ্রবাহের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে; পুরাতন উপাদানের নূতন ব্যাখ্যা এবং নূতন সমীক্ষাও করা হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি বিশেষ কোন নূতন উপদান আবিষ্কারের ভিত্তিতে রচিত হয় নাই—বিবিধ উপাদান সংযোজিত করিয়া এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া **বঙ্গদেশের ইতিহাস** (মধ্যযুগ—প্রথমপর্ব) রচিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের অলোচনাকাল ১২০০-১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ; বিষয়বস্তু বঙ্গদেশে মুসলিম অধিকার বিস্তারের প্রথম পর্ব। এই পর্বে বঙ্গের সহিত দিল্লীর শাসন-সম্পর্ক, দিল্লী কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তাগণের এবং বঙ্গের স্বাধীন সুলতানবর্গের কার্যকলাপ আলোচিত হইয়াছে। ১২০০ খ্রীঃ হইতে ১২৮৭ খ্রীঃ পর্যন্ত দিল্লী কর্তৃক নিযুক্ত শাসক-বর্গের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে; দিল্লী কর্তৃক নিযুক্ত হইলেও বঙ্গের মুসলিম শাসকবর্গ সামান্যমাত্র সুযোগ লাভেই স্বাধীনতা ঘোষণার চেষ্টা করিতেন। ঘিয়াসউদ্দীন বলবন বঙ্গদেশকে দিল্লীর অধীনে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় পুত্র বুঘরা খানকে বঙ্গের শাসক নিযুক্ত করিয়া বঙ্গের উপর দিল্লীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যেই বলবনের পৌত্র কায়ুমাসকে হত্যা করিয়া খালজী আমীর জালালউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ফলে বঙ্গদেশ পুনরায় দিল্লী হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। বলবনী বংশ দিল্লী হইতে বিতাড়িত হইলেও স্বাধীনভাবে বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিল (১২৮৭-১৩২৮ খ্রীঃ)। খালজীগণ মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধ ও দাক্ষিণাত্য বিজয় প্রচেষ্টাতে সতত বিব্রত ও ব্যস্ত ছিলেন; বঙ্গদেশের প্রতি দৃষ্টিদানের অবসর বা সময় তাঁহাদের ছিল না। দিল্লীতে তুঘলক বংশ প্রতিষ্ঠিত হইলে তুঘলক সুলতানগণ বঙ্গদেশে দিল্লীর অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুহম্মদ তুঘলক বাঙ্গলার অন্তর্বিদ্রোহ নিরসনকল্পে বঙ্গে

একই সময়ে একাধিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং বঙ্গের শাসনব্যবস্থা নূতনভাবে গঠন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু দিল্লী হইতে বিতাড়িত আমীর ইলিয়াস শাহ বঙ্গে স্বাধীন **ইলিয়াস শাহী** রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। স্বয়ং ফিরুজ তুঘলক বহু চেষ্টা করিয়াও ইলিয়াস শাহ কিংবা তাঁহার পুত্রকে বশীভূত করিতে পারেন নাই।

তৈমুরের আক্রমণে তুঘলক শক্তি বিধ্বস্ত হইলে দিল্লীর সুলতানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইয়া গেল। সৈয়দবংশের সময়ে দিল্লীর সুলতানগণ আত্মরক্ষায় সতত বিব্রত ছিলেন; সুতরাং তাঁহারাও বঙ্গের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপের অবসর পান নাই। তৈমুরের আক্রমণের চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলাদেশে **রাজা গণেশ** কর্তৃক হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও দিল্লীর সুলতানের পক্ষে সেখানে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং বাঙ্গলায় মুসলমান রাজ্য, রাজত্ব ও সমস্যার সমাধান বাঙালী মুসলমানই করিয়াছিল। একমাত্র জৌনপুরের শার্কী সুলতান মামুদ শাহ একবারমাত্র বাঙ্গলাদেশের প্রান্তসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শার্কী সুলতানগণ বঙ্গদেশে জৌনপুরের অধিকার স্থাপন করিতে পারেন নাই।

গণেশী বংশের পরেই বঙ্গদেশে **ইলিয়াস শাহী** বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু জমিদারগণ স্ব স্ব প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ আত্মকলহে এত বেশী বিপর্যস্ত হইয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য হাবসী দেহরক্ষী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই হাবসী দেহরক্ষিগণই বাঙ্গলার সিংহাসন অধিকার করিলেন। **হাবসী রাজত্বে** বঙ্গদেশ অত্যাচারে অনাচারে 'পরিত্রাহি' আর্তনাদ করিয়াছিল। হুসেন শাহ নির্যাতিত বঙ্গবাসীর পরিত্রাতারূপে বঙ্গের অতি দুর্দিনে আবির্ভূত হন এবং বঙ্গদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। **হুসেন শাহী বংশ** পঁয়তাল্লিশ বৎসর বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। তারপর আসিল শূরবংশ। শূরবংশের আগমনের পূর্বেই আমাদের আলোচনা সমাপ্ত।

সুতরাং দেখা যায় যে, বংশগতভাবে বলবনী বংশ ১২৮৭-১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দ (৪১ বৎসর), ইলিয়াসশাহী বংশ ১৩২৮-১৪১০ খ্রীষ্টাব্দ (৮২ বৎসর), ১৪৪২-১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দ (৪৫ বৎসর) পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকাল ১৪১০-১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দ (৩২ বৎসর) পর্যন্ত ছেদচিহ্ন রচনা করিয়াছিল গণেশী বংশ। ইলিয়াস শাহী বংশের সময়ে মরক্কোদেশীয় পর্যটক ইবন বাত্তুতা বাঙ্গলার সমৃদ্ধির এবং চীনদেশীয় পরিব্রাজক মা-হুয়ান বাঙ্গলার পূর্বদেশীয় বাণিজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

তারপর আসিল **হাবসী রাজত্ব** (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রীঃ)। এই হাবসীগণ না ছিল আরব, না ছিল তুর্ক-আফঘান। তাহারা ছিল আফ্রিকার আবিসিনিয়ার অধিবাসী দুর্ধর্ষ, যুদ্ধব্যবসায়ী ক্রীতদাস। তাহাদের কোন বংশধারা কিংবা বংশপরিচয় ছিল না। আট বৎসরব্যাপী চারিজন হাবসী সুলতানের রাজত্ব বাঙ্গলার চরম দুর্দিন। হুসেন শাহ হাবসী শাসনের অবসান করিয়া মুসলিম শাসনের কলঙ্ক অপনয়ন করেন। ১২৮৭ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৪৫ বৎসর বঙ্গদেশে চারিটি রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছে—বলবনী বংশ, ইলিয়াশ সাহী বংশ, গণেশী বংশ এবং হুসেনশাহী

বংশ। বলবন ছিলেন তুর্ক (আলবারী), ইলিয়াস শাহ ছিলেন আফঘান, রাজা গণেশ ছিলেন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ এবং হুসেন শাহ ছিলেন সম্ভবতঃ আরব, কিন্তু জীবনদৃষ্টিতে বঙ্গদেশীয় মুসলমান। হাবসী মামলুক সুলতানদের কোন বংশগত মর্যাদা ছিল না। বাঙ্গলায় বলবনী বংশের উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্য নাই। ইলিয়াস শাহী বংশ ছিল কালের পরিমাপে দীর্ঘতম। এই সময়ে বাঙ্গলার ভৌগোলিক সংস্থান, অপ্রীতিকর জলবায়ু, বঙ্গের প্রাচীন সংস্কার, হিন্দু ও তুর্ক-আফঘানগণের গ্রহণশীল মনোভাব মিলিত হইয়া বঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে হিন্দু-মুসলমান মিলিত শাসন স্থাপন করিয়াছিল, বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান সমবেত ভাবে দিল্লীর সুলতানের বিরোধিতা করিয়াছিল এবং বঙ্গদেশে মুসলিম শাসন আংশিক ভাবে নিরঙ্কুশ করিয়াছিল। হাবসী সুলতানগণ অত্যাচারী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অত্যাচারের লক্ষ্য ছিল মুসলিম আমীর-ওমরাহ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ। হাবসী শাসনে দূরাঞ্চলের হিন্দু প্রজা বিশেষ অত্যাচারিত হয় নাই, কারণ তাহারা মুসলিম শাসকবর্গের সংস্পর্শের বাহিরে ছিল এবং হিন্দুগণ সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।

হুসেন শাহী রাজত্ব বঙ্গে মুসলমান অধিকার বিস্তারের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি। ইলিয়াস শাহী যুগে যে সমন্বয়ীধারা আরম্ভ হইয়াছিল তাহার পূর্ণ পরিণতি হইল হুসেন শাহের রাজত্বকালে। প্রয়োজনবোধে হুসেন শাহ কর্তৃক হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ, হিন্দুর বন্ধুত্ব কামনা এবং হিন্দু ভাবধারার পৃষ্ঠপোষকতা আকস্মিক নহে। মালাধর বসু, সুবুদ্ধি রায়, শ্রীকর নন্দী, রূপ-সনাতন, অনুপ প্রভৃতি সুধী ও বিচক্ষণ কর্মচারিবর্গ ইলিয়াসশাহী যুগের অবদান। হুসেন শাহের রাজত্বকালে তাঁহারা বঙ্গের রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। হুসেনশাহী রাজত্বের গৌরব অংশতঃ ইলিয়াসশাহী বংশের প্রাপ্য।

হুসেন শাহের রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাঙ্গলার ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাবধারার একটি বিশেষ পরিণতি। শ্রীচৈতন্যের জীবনের ঘটনাবলী হুসেনশাহী বংশের সমকালীন। শ্রীচৈতন্যের জীবনকাল ১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ এবং হুসেনশাহী বংশের রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দ। সুচতুর হুসেন শাহের কার্যকলাপ চৈতন্যদেবকে ধর্মপ্রচারে পরোক্ষ সহায়তা করিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপে আবির্ভাব একটি ইঙ্গিতপূর্ণ ঘটনা। লক্ষ্মণসেন লক্ষ্মণাবতী হইতে গঙ্গাতীরবর্তী নবদ্বীপে রাজ-আবাস পরিবর্তিত করেন। তাঁহার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই লক্ষ্মণাবতী নগরীর বহু গুণী-জ্ঞানী, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, ধনিক ও বণিক নবদ্বীপে বসবাস আরম্ভ করেন। ফলে নবদ্বীপে বাঙ্গলার সংস্কৃতিকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। লক্ষ্মণসেন বোধ হয় নবদ্বীপে একাদশ বৎসর (১১৮৯-১২০০ খ্রীঃ) বসবাস করিয়াছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে নবদ্বীপে কোন প্রাসাদদুর্গ নির্মিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। সুতরাং মুসলমান সুলতানগণ নবদ্বীপ অপেক্ষা লক্ষ্ণৌতি, দেবকোট, গৌড়, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি সুরক্ষিত স্থানে শক্তিকেন্দ্র স্থাপন সমীচীন বিবেচনা করিয়াছিলেন। মুসলিম বিজয়ের পরে নবদ্বীপ প্রায় পরিত্যক্তই রহিয়া গেল। অতএব মুসলমান রাজপুরুষ এবং মোল্লাদের ধর্মান্ধ দৃষ্টির বাহিরে বাস করিয়া নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং সুধীবর্গ শাস্ত্র ও ধর্মালোচনার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ যদি নবদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করিত, তাহা হইলে নবদ্বীপের

দেবতাবিগ্রহ, মন্দির-চতুষ্পাঠী প্রভৃতি হিন্দু সংস্কৃতির নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। লক্ষ্মণ সেনের পর হইতে শ্রীচৈতন্যের আগমনকাল পর্যন্ত প্রায় তিনশত বৎসর হিন্দু সংস্কৃতির ধারা নবদ্বীপে ন্যূনাধিক নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়াছিল। সুতরাং নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব অস্বাভাবিক ঘটনা নহে। অবশ্য ইসলাম ধর্মের প্রতিরোধকল্পে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণই স্মৃতিশাস্ত্রের প্রাচীন এবং পৌরাণিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডের পুনঃ প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত সংস্কার এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদরূপেই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব।

বাঙ্গলায় মুসলিম বিজয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, আরব জাতি বঙ্গদেশ জয় কিংবা শাসন করে নাই। বাঙ্গলায় মুসলিম শাসনের প্রথম পর্বে তুর্ক-আফঘানগণ বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিল; তাহারা ছিল ধর্মান্তরিত মুসলমান। তুর্ক-আফঘান জাতি কর্তৃক অনুসৃত ইসলাম এবং আরব জাতি কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলামের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। সময়ের ব্যবধান ছিল পাঁচশত বৎসর। আরবে ইসলাম প্রবর্তন ৬১০ খ্রীষ্টাব্দ, ভারতে স্থায়ী মুসলিম বিজয় ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দ; এই সুদীর্ঘ সার্ধ ছয়শত বৎসরের মধ্যে ইসলামের রূপ বহুধা পরিবর্তিত হইয়াছিল। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তুর্ক-আফঘানগণ আরব জাতি হইতে অধিকতর উদার ছিল। আরব জাতি ধর্ম ও সমাজকে অচ্ছেদ্য বলিয়া বিবেচনা করিত। যেখানে আরব জাতি ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়াছে, সেখানেই তাহারা কোরাণ-বর্ণিত সামাজিক আদর্শ, কোরাণের ভাষা ও লিপি প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছে। তুর্ক-আফঘান জাতি ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে আরবের, কিন্তু সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়াছে ইরাণের। তাহাদের জন্মভূমি মধ্য-এশিয়ার জীবনধারাও তাহারা সম্পূর্ণ বর্জন করে নাই। অন্যদিকে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে, তাহারা সামঞ্জস্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিল, তাহারা বাঙ্গলাদেশে ইসলামাতিরিক্ত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। বঙ্গের তুর্ক-আফঘান সুলতানগণ হিন্দুদিগকে গ্রামাঞ্চলে প্রাচীন সামাজিক সংস্কার, জাতিভেদ, দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ ব্যাপারে বাস্তবক্ষেত্রে বিশেষ বাধা প্রদান করেন নাই। অবশ্য মোল্লা ও কাজিগণ সুযোগ উপস্থিত হইলে বিধর্মী নিপীড়ন করিয়া, হিন্দু নারী বিবাহ করিয়া অথবা হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করিয়া 'স্বর্গের পথ পরিষ্কার' করিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই।

তুর্ক-আফঘান যুগের লক্ষণীয় বিষয় এই যে, বাঙ্গলাদেশে মুসলিম শাসকবর্গ ছিলেন সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং শাসিত বিধর্মী হিন্দু প্রজাবর্গ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। শাসনের প্রথম পর্ব হইতেই তুর্ক-আফঘান সুলতানগণ হিন্দু প্রজাবর্গকে সৈন্যবিভাগে যোগদানের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী হিন্দুগণ ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত করে নাই এবং ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিরোধিতা করে নাই। এমন কি রাজা গণেশ হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিলেও হিন্দু প্রজাবর্গ উল্লসিত হয় নাই। গণেশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার পুত্র যদুমল্ল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া 'পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত' করিয়াছিলেন। মুসলমান সুলতানগণও ধর্মীয় ও বিচার-বিভাগ ভিন্ন প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই হিন্দুগণের সহযোগিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমান সমবেত ভাবেই দিল্লীর সৈন্যকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

বঙ্গের প্রায় অর্ধশতাধিক তুর্ক-আফঘান শাসক এবং সুলতানগণের মধ্যে দশ বার জন ব্যতীত কেহই দিল্লীর বাদশাহের অনুগ্রহের প্রত্যাশী ছিলেন না। কেহ বা নামমাত্র মৌখিক বশ্যতা স্বীকার করিতেন। অনেক সুলতানই দিল্লীর সহিত সংঘর্ষ ও সংস্পর্শ পরিহার করিয়া চলিয়াছিলেন। বঙ্গের বিদ্রোহী সুলতানগণও বঙ্গের হিন্দু প্রজার উপর নির্ভর করিতেন। বঙ্গদেশে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাহান্ন জন সুলতান রাজত্ব করিয়াছেন এবং এই সময়ে দিল্লীতে ছেষট্টি জন সুলতান রাজত্ব করিয়াছেন। দিল্লীর সিংহাসন অপেক্ষা বঙ্গের সিংহাসন অধিকতর নিষ্কণ্টক ছিল। উত্তর-পশ্চিম হইতে দিল্লীর বিরুদ্ধে বহু অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল—মোঙ্গলবীর চিঙ্গিস খান, কুত্‌লুঘ খান তরমিসরি খান, তগি খান, কিসলু খান, চাঘতাই বীর তৈমুর লঙ্, বাবর দিল্লীর সুলতান-গণকে ভীতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং তুলনামূলক ভাবে এই যুগে বাঙ্গলার পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল। উত্তর-পূর্ব দিক কিংবা চীন হইতে বঙ্গদেশ আক্রান্ত হয় নাই। বরং বাঙ্গলার সুলতানগণই প্রতিবেশী রাজ্য মিথিলা, উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা ও আরাকান পর্যন্ত হস্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন এবং এই সমস্ত অভিযানে বঙ্গের হিন্দু প্রজাবর্গ মুসলমানদের সহায়তা করিয়াছিল।

বঙ্গের মুসলিম অধিকার প্রধানতঃ নগর এবং দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া স্থাপিত হইয়াছিল। মুসলিম সুলতানগণ কোথাও নগরে নগরে মসজিদ, সমাধি, মাদ্রাসা এবং কোথাও হামাম নির্মাণ করিয়াছেন। মুসলিম সৈন্যবাহিনী গ্রামাঞ্চলে বিশেষ পদার্পণ করে নাই। অবিশ্রান্ত বর্ষা, খরস্রোতা নদী, কর্দমাক্ত পথ অভিযান ব্যপারে বাধা সৃষ্টি করিত। হিন্দু প্রজাবর্গ স্বভাবতঃ ছিল নিরুপদ্রব। হিন্দু কৃষক ক্ষেত্রে চাষ করিত, নবশাখ শিল্পদ্রব্য উৎ-পাদন করিত, বৈশ্য ব্যবসায় করিত, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণ পূজা-পার্বণ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। গ্রামাঞ্চলে গ্রামবৃদ্ধ এবং সমাজপতিগণ সাধারণ বিবাদের মীমাংসা করিতেন; অত্যন্ত গুরুতর প্রয়োজনে কদাচিৎ কাজি অথবা রাজপুরুষের শরণাপন্ন হইতেন। সুতরাং তুর্ক-আফঘান যুগে গ্রামাঞ্চলে বাঙ্গলার সভ্যতা ও শাসনব্যবস্থা অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ ছিল।

এই যুগের বঙ্গের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, বঙ্গের মুসলিম সুলতানগণ মুসলিম ধর্মের ভাষা আরবী অথবা দিল্লীর সুলতানগণের রাজভাষা ফারসী বাঙ্গলাদেশে প্রচলন করেন নাই। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বঙ্গদেশেই ভারতীয় মুসলিমগণের সংস্কৃতির বাহন ফার্সী বা উর্দু ভাষাও প্রচলিত হয় নাই। বরং বঙ্গের মুসলিম সুলতানগণ বঙ্গভাষা ও বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতাই করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আদিপর্ব তুর্ক-আফঘান সুলতানগণের পৃষ্ঠপোষকতার বহু স্মারক ধারণ করিয়া আছে।

তুর্ক-আফঘান যুগের বাঙ্গলার ইতিহাস এখনও অসম্পূর্ণ। এই গ্রন্থের আলোচনা প্রধানতঃ রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরিশিষ্টে খণ্ড-খণ্ড ভাবে কতকগুলি নূতন তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে; পরিশিষ্টগুলি এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শ্রীসুশীলা মণ্ডল

কলিকাতা.

পুস্তকে ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী

ইংরাজীতে অনূদিত ফারসী গ্রন্থ

মীনহাজউদ্দীন সিরাজ	তবকাত্-ই-নাসিরী
আমীর খসরু	কিরাণ-উস্-সাদাইন
ইসামী	ফতুহ -উস্-সালাতিন
জিয়াউদ্দীন বারাণী	তারিখ-ই-ফিরুজশাহী
শামসী-ই-সিরাজ আফিফ	তারিখ-ই-ফিরুজশাহী
আবুল ফজল	আইন-ই-আকবরী
আবদুল কাদির বদায়ুনী	মুন্তাখাব-উত্-তাওয়ারিখ
নিজামউদ্দীন বক্সী	তবকাত্-ই-আকবরী
কাসিম হিন্দু শাহ ফেরিস্তা	তারিখ-ই-ফেরিস্তা
মিরজা নাথান	বহার-ই-স্তান গায়বী
গোলাম হুসেন তবাতবাই	সিয়ার-উল-মুতাখরিন
সলীমউল্লা	তারিখ-ই-বাঙ্গলা
গোলাম হুসেন সলীম	রিয়াজ-উস-সালাতিন

স্থানীয় ইতিহাস

সূর্যকুমার ভুঁইয়া	আসাম বুরুঞ্জি
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	উড়িষ্যার ইতিহাস
"	বাঙ্গলার ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	নবাবী আমল
আনন্দচন্দ্র রায়	বার ভুঁইয়া
বৃন্দাবনচন্দ্র পুতিতুণ্ডী	চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস
কুমুদনাথ মল্লিক	নদীয়া কাহিনী
অচ্যুতচন্দ্র চৌধুরী	শ্রীহট্টের কথা
কৈলাসচন্দ্র সিংহ	ত্রিপুরার ইতিহাস
আনন্দচন্দ্র রায়	ফরিদপুরের ইতিহাস
রাধারমণ সাহা	পাবনার ইতিহাস
নিখিলনাথ রায়	মুর্শিদাবাদের ইতিহাস
রজনীকান্ত চক্রবর্তী	গৌড়ের ইতিহাস
যতীন্দ্রমোহন রায়	ঢাকার ইতিহাস
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	বিক্রমপুরের ইতিহাস
প্রভাসচন্দ্র সেন	বগুড়ার ইতিহাস
কেদারনাথ মজুমদার	ময়মনসিংহের ইতিহাস
রাজকুমার চক্রবর্তী	সন্দ্বীপের ইতিহাস
নবীনচন্দ্র লোধ	নোয়াখালির ইতিহাস
বিধুভূষণ ভট্টাচার্য	হাওড়া-হুগলীর ইতিহাস
গৌরহরি মিত্র	বীরভূমের ইতিহাস

যোগেশচন্দ্র বসু — মেদিনীপুরের ইতিহাস
ত্রৈলোক্যনাথ পাল — তমলুকের ইতিহাস
অভয়পদ মল্লিক — বিষ্ণুপুরের ইতিহাস
সুরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ — পূর্ববঙ্গে মহেশ্বরী পরগণা
কালিকাপ্রসাদ দত্ত — কুচবিহারের ইতিহাস

সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক গ্রন্থ

দীনেশ চন্দ্র সেন — বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য
" — বৃহৎ বঙ্গ
" — ময়মনসিংহ গীতিকা
আশুতোষ ভট্টাচার্য — মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস
সুকুমার সেন — মুসলমানী বাংলা সাহিত্য
মনোরঞ্জন চৌধুরী — চৌধুরীর লড়াই (নোয়াখালি)
মনসুরউদ্দীন আহম্মদ — হারা মাণিক (ভূমিকা)
ক্ষিতিমোহন সেন — মধ্যযুগের বাঙালীর সাধনা
সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় — ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা
সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের কালক্রম
বিনয় ঘোষ — পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি
খলিলুর রহমান — দরবার-ই-আওয়ালিয়া (বাংলা)
" — পীর শাহ জালাল
এনামুল হক্ — বঙ্গে সুফী ধর্ম
পশুপতি চট্টোপাধ্যায় — পীর খানজাহান আলী
রসুল আমিন — খানকা শরীফ (ফুরফুরা)
নীহাররঞ্জন রায় — বাঙালীর ইতিহাস
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় — বাউল সংগীত ও সাধনা
অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী — বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত
কৃষ্ণদাস কবিরাজ — চৈতন্য-চরিতামৃত
বসন্তরঞ্জন রায় — চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন

BOOKS IN ENGLISH

Thomas E. — *On The Initial Coinage of Bengal* J A S B. 1867.
Bhattasali N. K. — *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, London, 1922.*
Ravenshaw J. H. — *Gaur—Its Ruins and Inscriptions.*

Gait E.	*History of Assam.*
Cunningham A.	*Report of the Archaeological Survey of India*, Vol. XV.
Elliot and Dowson	*Translation of the History of India as told by its own Historians*, Vol. II & III. in summary
Sarkar Sir J. N. Qunungo Dr. K. R. Dutt Dr. K. K. Sen Dr. S. N. Habibullah Dr. A B.M. Roy Prof. N. B.	*Contributors to the History of Bengal.* Part II, published by the Dacca University.
Husain Agha Mahadi	*Rihala* of Ibn Battuta (relavant chapters on Bengal.)
Das Gupta Dr. Sashibhusan	*Obscure Religious Cults of Bengal.*
Karim Abdul	*Social History of the Muslims in Bengal.*
Titus	*Indian Islam.* London, 1930
Habbullah Dr. A. B. M.	*Foundation of Muslim Rule in India.*
Haq Enamul	*The Sufi Movement in India.* Islamic Culture, Vol. I-II.
Ahmad A.	*History of Shah Jalal and his Khadims in* Sylhet, 1914.
Allen B. C.	*Assam District Gazetteers*, Sylhet, 1905.
Das Gupta T. C.	*Aspect of Bengali Society from Old Bengali Literature*, Calcutta University, 1935.
Das Gupta J. N.	*Bengal in the 16th Century*, Calcutta University, 1914.
Jarett H. S.,	*Ain-i-Akbari*, Vols. II. ' English translation, Second Edition, Corrected and annotated by Sir Jadunath Sarkar, Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1949.
Khan Abid Ali.	*Short Notes on the Ancient Monuments of Gaur and Pandua*, Malda, 1913. *Memoirs of Gour and Pandua*, Edited by H. E. Stapleton, Calcutta, 1931.
Law N N.	*Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule* (by Muhammadans), London, 1916.

Sen D. C. — *The folk Literature of Bengal,*

Dani A. H. — *Bengal Islamic Architecture.*

Shaikh Subhodaya (English translation from Manuscript)
Calcutta University, 1920.

Roychoudhury M. L. — *State & Religion in Mughal India.*

TRAVEL ACCOUNTS

Gibb H. A. R. — *Travels of Ibn Battuta.*

Ma Huan — *Ying Yai Sheng lan.*

Fei-sin — *Sing Ch'a sheng lan.*
Portions relating to Bengal. *Viswa Bharati Annals,* Vol. I. Pp 117-127.

Stapleton H. — Bibliography and List of Inscriptions and articles in the *Bengal Past and Present.*

JOURNALS

Blochmann H.
Contributions of the History and Geography of Bengal, J A S B. 1870-75.

Dani A H.
First Muslim Conquest of Lakhnor, Indian Historical Quarterly. Vol. XXX, Pp 11-18.
House of Raja Ganesh of Bengal. Journal of the Asiatic Society of Bengal.Vol. XVIII. Pp 121-169.
Bibliography of Muslim Inscriptions of Bengal.
(Appendix to the Jourual of the Asiatic Society of Pakistan, Vol. II, 1957.

Rahim A.
Chittagong under Pathan Rule in Bengal. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Pp 21-30.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী
সংস্কৃত শিক্ষায় মুসলমানের পৃষ্ঠপোষকতা। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা
Vol. XLIV. Number I.

Nadvi S.
Literary Progress of the Hindus under Muslim Rule. Islamic Culture. Vol. XII. Page 424-433.

Rizvi S. A. A.
Education in Muslim India. Calcutta Review. Vol. XXV

Habib Mohammad
Indo Moslem mystics, Muslim University Journal Vol. IV. 1937

বঙ্গদেশের তুর্ক-আফঘান শাসক ও সুলতানবর্গ

১২০০—১৫৩৭ খ্রীঃ

খালজী আমীর গোষ্ঠী

(১২০০-১২২৭ খ্রীঃ)

১২০০-১২০৬ খ্রীঃ ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খালজী—বন্ধু আলী মরদান কর্তৃক নিহত

১২০৬-১২০৭ ,, আলী মরদান ও মুহম্মদ শীরাণের মধ্যে যুদ্ধ।

১২০৭-১২০৮ ,, ইজউদ্দীন মুহম্মদ শিরান খালজী—আমীর অথবা হিন্দুরাজা কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত।

১২০৮-১২১০ ,, হুসামউদ্দীন আইয়াজ—সাময়িক ভাবে শাসনকর্তৃপদ হইতে বিচ্যুত।

১২১০-১২১৩ ,, আলাউদ্দীন আলী মরদান—আমীরগণ কর্তৃক নিহত।

১২১৩-১২২৭ ,, হুসামউদ্দীন আইয়াজ—পুনর্নিযুক্ত ; সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন উপাধি গ্রহণ, ইলতুৎমিসের দ্বিতীয় পুত্র নাসিরউদ্দীন কর্তৃক পরাজিত ও নিহত।

দিল্লীর দাস গোষ্ঠীর অধীনে বঙ্গের শাসকবর্গ

(১২২৭-১২৮৭ খ্রীঃ)

১২২৭-১২২৯ খ্রীঃ নাসিরউদ্দীন মামুদ (ইলতুৎমিসের দ্বিতীয় পুত্র)—স্বাভাবিক মৃত্যু।

১২২৯-১২৩০ ,, ইখতিয়ারউদ্দীন বলকা খালজী—ইলতুৎমিস কর্তৃক পরাজিত ও নিহত।

১২৩০-১২৩১ ,, আলাউদ্দীন জানী—নিহত ও তাঁহার ছিন্নশির দিল্লীতে প্রেরিত।

১২৩১-১২৩৬ ,, সাইফউদ্দীন আইবক—বিষ প্রয়োগে নিহত।

১২৩৬-১২৪৫ ,, ইজউদ্দীন তুঘরিল তুঘান খান—স্বাভাবিক মৃত্যু।

১২৪৫-১২৪৭ ,, কমরউদ্দীন তামার খান কিরান—স্বাভাবিক মৃত্যু।

১২৪৭-১২৫১ ,, জালালউদ্দীন মাসুদ শাহ জানী—প্রথম জীবনে বিতাড়িত।

১২৫১-১২৫৭ ,, ইখতিয়ারউদ্দীন উজবুক তুঘান খান (সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন)—পরাজিত এবং কারাগারে মৃত্যু।

১২৫৭-১২৫৮ ,, জালালউদ্দীন মাসুদ শাহ জানী – স্বাভাবিক মৃত্যু।

১২৫৮-১২৫৯ ,, ইজউদ্দীন বলবন উজবুক—পরাজিত ও নিহত।

১২৫৯-১২৬৫ খ্রীঃ তাজউদ্দীন আরসালান খান—স্বাভাবিক মৃত্যু।
১২৬৫-১২৬৮ ,, তাতার খান—বলবন কর্তৃক বিতাড়িত।
১২৬৮-১২৭২ ,, শের খান—বিষপ্রয়োগে নিহত।
১২৭২-১২৭৮ ,, আমিন খান—স্বাভাবিক মৃত্যু।
১২৭৮-১২৮৩ ,, মুঘিসউদ্দীন তুঘরিল—পরাজিত ও মস্তক দ্বিখণ্ডিত।

বঙ্গের বলবনী বংশ
(১২৮৭-১৩২৮ খ্রীঃ)

১২৮৩-১২৮৭ খ্রীঃ নাসিরউদ্দীন বুঘরা খান—(ঘিয়াসউদ্দীন বলবনের দ্বিতীয় পুত্র ; পিতা কর্তৃক বঙ্গের শাসক নিযুক্ত)
১২৮৭-১২৯১ ,, বুঘরা খান (বাঙ্গলার স্বাধীন সুলতান)—স্বাভাবিক মৃত্যু।
১২৯১-১৩০১ ,, রুকনুউদ্দীন কাইকায়ুস—সম্ভবতঃ নিহত।
১৩০১-১৩২২ ,, শামসুউদ্দীন ফিরুজ শাহ—স্বাভাবিক মৃত্যু।
১৩০৭-১৩০৯ ,, জালালউদ্দীন মামুদ শাহ (লক্ষ্মণাবতীতে যুক্তশাসক)—সম্ভবতঃ অস্বাভাবিক মৃত্যু।
১৩১০-১৩২২ ,, ঘিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ (পূর্ববঙ্গের যুক্তশাসক)—বিতাড়িত।
১৩১৭-১৩১৮ ,, শিহাবউদ্দীন বুঘরা শাহ (পশ্চিমবঙ্গের যুক্তশাসক)—সম্ভবতঃ অস্বাভাবিক মৃত্যু।
১৩২২-১৩২৪ ,, ঘিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ (সমগ্র বাঙ্গলার শাসক)—বিতাড়িত।
১৩২৪-১৩২৭ ,, নাসিরউদ্দীন ইব্রাহিম শাহ—সম্ভবতঃ নিহত।
১৩২৭-১৩২৮ ,, ঘিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ—চর্ম উৎপাটনে নিহত।

তুঘলক বংশের অধীনে বঙ্গের শাসকবর্গ
(১৩২৮-১৩৪২ খ্রীঃ)

১৩২৮-১৩৩৮ খ্রীঃ বহরাম তাতার খান (পূর্ববঙ্গের শাসক)—স্বাভাবিক মৃত্যু।
১৩২৮-১৩৩৯ ,, কাদির খান—(উত্তরবঙ্গের শাসক)—পরাজিত ও নিহত।
১৩২৮-১৩৩৯ ,, ইজউদ্দীন আজম-উল-মুলক (দক্ষিণ বঙ্গের শাসক)—মৃত্যু অজ্ঞাত।
১৩৩৯-১৩৪২ ,, আলাউদ্দীন আলী শাহ বা আলী মুবারক (পশ্চিমবঙ্গের শাসক) —ইলিয়াস শাহ কর্তৃক নিহত (?)।
১৩৩৯-১৩৪৯ ,, ফকরুউদ্দীন মুবারক শাহ (পূর্ববঙ্গের শাসক)—স্বাভাবিক মৃত্যু।
১৩৪৮-১৩৫২ ,, ইখতিয়ারউদ্দীন গাজী শাহ (পূর্ববঙ্গের শাসক)—পরাজিত ও নিহত।

বঙ্গদেশে ইলিয়াস শাহী বংশ (আদি পর্ব)

(১৩৪২-১৪১৪ খ্রীঃ)

১৩৪২-১৩৫৮ খ্রীঃ শামসুউদ্দীন ইলিয়াস শাহ—স্বাভাবিক মৃত্যু।
১৩৫৮-১৩৯৩ „ প্রথম সিকন্দর শাহ—বিদ্রোহী আমীর কর্তৃক নিহত।
১৩৯৩-১৪০৯ „ ঘিয়াসউদ্দীন আজম শাহ—সম্ভবতঃ রাজা গণেশ কর্তৃক নিহত।
১৪০৯-১৪১০ „ সাইফউদ্দীন হামজা শাহ—মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত।
১৪১২-১৪১৩ „ শিহাবউদ্দীন বায়াজিদ শাহ—মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত।
১৪১৪ „ আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ—নিহত।

বঙ্গদেশে স্বাধীন হিন্দু রাজবংশ (গণেশী বংশ)

(১৪১০-১৪৪২ খ্রীঃ)

১৪১০-১৪১৪ খ্রীঃ রাজা কংস (গণেশ)—স্বাধীন নরপতি।
১৪১৫-১৪১৬ „ জালালউদীন মুহম্মদ শাহ (যদুসেন, যদুমল্ল)।
১৪১৭-১৪১৮ „ রাজা গণেশ (স্বীয় পুত্রকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং বঙ্গের সিংহাসন পুনরধিকার করেন)—স্বাভাবিক মৃত্যু।
১৪১৮-১৪৩১ „ জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ (পুনঃ স্থাপিত)—স্বাভাবিক মৃত্যু।
১৪১৮-১৪১৯ „ মহেন্দ্রদেব—স্বাভাবিক মৃত্যু।
১৪৩২-১৪৪২ „ শামসুউদ্দীন আহম্মদ শাহ (রাজ গণেশের পৌত্র)—নিহত।

ইলিয়াস শাহী বংশ (অন্তঃপর্ব)

(১৪৪২-১৪৮৭ খ্রীঃ)

১৪৪২-১৪৫৯ খ্রীঃ নাসিরউদ্দীন মামুদ শাহ—স্বাভাবিক মৃত্যু।
১৪৫৯-১৪৭৪ „ রুকনুউদ্দীন বরবক শাহ—স্বাভাবিক মৃত্যু।
১৪৭৪-১৪৮১ „ শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ—স্বাভাবিক মৃত্যু।
১৪৮২ „ সিকন্দর শাহ (২য়)—সিংহাসনচ্যুত ও নিহত।
১৪৮২-১৪৮৭ „ জালালউদ্দীন ফতে শাহ—নিহত।

হাবসী সুলতানবর্গ

(১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রীঃ)

১৪৮৭-খ্রীঃ সুলতান বরবক—নিহত।

১৪৮৭-১৪৯০ „ সাইফউদ্দীন ফিরুজ শাহ—স্বাভাবিক মৃত্যু।

১৪৯০-১৪৯১ খ্রীঃ নাসিরউদ্দীন মামুদ শাহ—স্বাভাবিক মৃত্যু।

১৪৯১-১৪৯৩ „ শামসউদ্দীন মুজফ্ফর শাহ (সিদি বদর)—যুদ্ধে নিহত

বঙ্গে হুসেন শাহী বংশ

(১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রীঃ)

১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ—স্বাভাবিক মৃত্যু।

১৫১৯-১৫৩২ „ নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহ—যুদ্ধে নিহত।

১৫৩২ „ আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ (২য়) নিহত।

১৫৩২-১৫৩৭ „ ঘিয়াসউদ্দীন মুহম্মদ শাহ (৩য়)—যুদ্ধে নিহত।

---

* উপরে উল্লিখিত তারিখগুলি স্যার যদুনাথ সরকার সংকলিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গদেশের ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সর্বক্ষেত্রে এই তারিখগুলি অবিসংবাদিত নহে।

বঙ্গদেশের ইতিহাস

মধ্যযুগ : প্রথম পর্ব

প্রথম অধ্যায়

বঙ্গদেশের ভৌগোলিক পরিচয়

বঙ্গদেশের নাম পরিচয়

সূচনা : বঙ্গদেশ বা বাঙ্গলাদেশ ভারতের পূর্ব-সীমান্তে একটি প্রদেশ। মুঘলযুগে এই দেশ 'সুবা বাঙ্গলা' নামে পরিচিত ছিল। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এই 'বাঙ্গলা' নামের ব্যাখ্যাও রহিয়াছে। 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে 'আল্' (সংস্কৃত আলি—পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় আইল) যুক্ত হইয়া 'বাঙ্গাল' বা 'বাঙ্গলা' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে[১]। 'আল্' শব্দে কেবল শস্যক্ষেত্রের আলি বা সীমানির্দেশক গণ্ডীরেখাকেই নির্দেশিত করে না; ক্ষুদ্র-বৃহৎ বাঁধকেও বুঝায়। বঙ্গদেশ নদীমাতৃক—বৃষ্টিপাতও এই দেশে প্রচুর। সুতরাং বৃষ্টি ও বন্যার প্রবল জলস্রোতকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং শস্যক্ষেত্র ও বাস্তুভূমিকে রক্ষার জন্য বাঁধ ছিল এই দেশে অপরিহার্য। যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত স্বল্প, ভূমি উষর (যেমন বীরভূম), সে সকল অঞ্চলে বর্ষার জল সঞ্চিত রাখিবার জন্য বাঁধের প্রয়োজন হইত এবং এখনও প্রয়োজন হয়। প্রাচীন লিপিতে এই প্রকার বহু বাঁধের উল্লেখ আছে[২]। এই প্রকার বাঁধ বা বাঁধের নিদর্শন এখনও এই দেশের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়, যেমন রংপুর-বগুড়া অঞ্চলে ভীমের জাঙ্গাল বা ডাইঙ্গ (সম্ভবতঃ কৈবর্তরাজ ভীম)। বীরভূম-শিউড়ি অঞ্চলেও এইরূপ বাঁধের উল্লেখ আছে। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে আবুল ফজলের ব্যাখ্যার অর্থ করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশ 'আলি-বহুল'; এই আলিগুলিই বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য। এই 'আলি' বা বাঁধ আবুল ফজলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; সেইজন্যই তিনি বঙ্গ নামের সহিত আল্ প্রত্যয় যুক্ত করিয়া দেশটির নূতন নামকরণ করিয়াছেন বঙ্গাল বা বাঙ্গলা[৩]।

আবুল ফজলের বঙ্গাল

মধ্যযুগে বঙ্গদেশ : মধ্যযুগে ইওরোপীয় পর্যটকদের বিবরণীতে সর্বত্রই এই দেশ *Bengala* নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণস্থিত সাগরটির নাম *Galfo de Bengala*, or The Bay of Bengal, ফারসী ভাষায় খালিজ-ই-বাঙ্গালা। সুতরাং মধ্যযুগের Bengala—বর্তমান 'বাঙ্গলাদেশ' বা 'বঙ্গদেশ' একই দেশের নাম বা সমার্থবোধক। মধ্যযুগে বঙ্গদেশ বলিতে অবিভক্ত বঙ্গের সমগ্র অংশকেই বুঝাইত এবং

---

১) The original name of Bengal was *Bang*. Its former rulers raised mounds measuring ten yards in height and twenty in breadth throughout the province which were called *al*. From this suffix the name *Bengal* took its rise and currency, *Ain-i-Akbari*, Tr. by Jarrett, Vol. III, pp. 120, 141.

২) বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড়া তাম্রশাসন, *Inscriptions of Bengal*, Vol. III, p. 132.

৩) বাঙ্গালীর ইতিহাস, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, ৮৪-৮৭ পৃঃ।

কোন কোন দিকে উহা বর্তমান সীমানাও অতিক্রম করিয়াছিল। প্রাচীন যুগে বঙ্গ বা বঙ্গাল বলিতে যে দেশখণ্ড নির্দেশিত হইত, উহা বর্তমান বঙ্গ বা বাঙ্গলাদেশের সমার্থক নহে। বঙ্গ ও বঙ্গাল প্রাচীন বঙ্গদেশের দুইটি জনপদমাত্র ছিল—অথচ এই দুইটি জনপদের নামানুসারেই মধ্যযুগে সমগ্র প্রদেশটি পরিচিত হইয়াছিল।

বাঙ্গলা নামের উৎপত্তি

প্রাচীনতম ঐতিহাসিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, বজ্র (অথবা ব্রহ্ম), তাম্রলিপ্ত, সমতট, বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। এই জনপদগুলির প্রত্যেকটিই ছিল পৃথক এবং স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ হইতেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জনপদগুলি এক নামে ঐক্যবদ্ধ হইতে আরম্ভ করে। সম্ভবতঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর মগধে কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তির অভ্যুদয় হয় নাই, স্বাভাবিক ভাবেই দেশ অরাজক ছিল। সেই অরাজকতার সুযোগ পশ্চিমবঙ্গের এই জনপদগুলি গ্রহণ করিয়াছিল। কারণ মৌর্য ও গুপ্তযুগে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ না হইলেও উহার অধিকাংশ অঞ্চল মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাটগণের শাসনাধীন ছিল এবং মৌর্য ও গুপ্তবংশের মতন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার ক্ষমতা বাঙ্গলার জনপদগুলির ছিল না। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজ শশাঙ্ক এই প্রচেষ্টাকে পূর্ণ রূপ প্রদান করেন। মহারাজ শশাঙ্ক বর্তমান মালদহ, মুর্শিদাবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া উৎকল পর্যন্ত ভূভাগ এক রাষ্ট্রীয় ঐক্যে আবদ্ধ করিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে কর্ণসুবর্ণে। সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইল। মহারাজ শশাঙ্ক এবং পাল নরপতিগণ বঙ্গাধিপতি হওয়া সত্ত্বেও গৌড়াধিপ, গৌড়েশ্বর বা গৌড়েন্দ্র নামে পরিচিত হইলেই গৌরব অনুভব করিতেন। লক্ষ্মণসেন যে মুহূর্তে গৌড় অধিকার করিলেন, তিনিও হইলেন গৌড়েশ্বর[১]।

প্রাচীনযুগে বঙ্গদেশ : বিভিন্ন জনপদ-সমষ্টি

প্রকৃত পক্ষে অষ্টম শতক হইতেই বাঙ্গলার তিনটি জনপদ গৌড়, পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন এবং বঙ্গ সমগ্র দেশটির সমার্থক হইয়া উঠিল। অবশ্য তখনও বিভিন্ন জনপদ এবং উহাদের নাম-স্মৃতি ত ছিলই; নূতন নূতন বিভাগীয় নামেরও উৎপত্তি হইতেছিল—যেমন পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গলা অঞ্চলে বঙ্গাল, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ ও সমতট; উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে বরেন্দ্রী; তাম্রলিপ্ত অঞ্চলে দণ্ডভুক্তি এবং পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় (ব্রহ্ম ও সুহ্ম)। এই সকল বিভাগের মধ্যে উপবিভাগও ছিল—কিন্তু ক্রমে সমস্ত জনপদ ও বিভাগগুলি এই তিনটি জনপদের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। রাঢ়ের মত প্রাচীন জনপদও গৌড় নামের মধ্যেই ক্রমে নিজেকে বিলীন করিয়া দিল। মহারাজ শশাঙ্ক এবং পাল নরপতিগণ পশ্চিমবঙ্গের অধিপতি হইলেও রাঢ়াধিপতি না বলিয়া গৌড়াধিপতি বলিয়াই নিজেদের পরিচয় প্রদান করিতেন। বরেন্দ্রী পাল নৃপতিগণের পিতৃভূমি হইলেও বরেন্দ্রী-অধিপতি বলিয়া কোথাও নিজেদের উল্লেখ নাই। পুণ্ড্রাধিপ উপাধিও পাল নৃপতিগণ কখনও গ্রহণ করেন নাই। পাল ও

গৌড়ের অভ্যুদয়

---

১) লক্ষ্মণসেনের মাধাই লিপি, *Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.* New Series, Vol. V, p. 473. *Inscriptions of Bengal*, III, p. 106.

সেন নৃপতিগণের লক্ষ্যই ছিল গৌড়াধিপতি নামের গৌরব অর্জন। মহারাজ শশাঙ্কের সময় হইতে বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল বা জনপদকে এক রাষ্ট্রীয় ঐক্যে আবদ্ধ করিবার যে প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিল পাল ও সেনযুগে। কিন্তু বঙ্গ জনপদ তখনও উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লইয়া গৌড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপেই সগৌরবে বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী সাধারণতঃ গৌড়ীয় বা গৌড়দেশীয় বলিয়াই অভিহিত হইয়াছে। গৌড় বলিতে এক সময় সমগ্র বঙ্গদেশকেই নির্দেশ করিত[১]।

গৌড় ও বঙ্গ জনপদ

গৌড় নামে সমগ্র বাঙ্গলার জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যে প্রচেষ্টা মহারাজ শশাঙ্ক এবং পাল ও সেন নৃপতিগণ করিয়াছিলেন, সে প্রচেষ্টা সার্থক হয় নাই—গৌড় নামের সে সৌভাগ্যলাভ হয় নাই; সে সৌভাগ্য লাভ করিল **বঙ্গ**—যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানদণ্ডে ঘৃণিত ও অবহেলিত এবং পাল ও সেন নরপতিগণের নিকট অপ্রিয় ও অবাঞ্ছিত। বাঙ্গলার বিভিন্ন জনপদ উহাদের প্রাচীন পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, সমতট, বঙ্গ, বঙ্গাল, হরিকেল ইত্যাদি নামের ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করিয়া যখন বঙ্গ নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ করিল, তখন ভারত-ইতিহাসের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। পাঠানযুগে সমগ্র বাঙ্গলাদেশ বঙ্গ নামে পরিচিত হইতে আরম্ভ করিল এবং সম্রাট আকবরের যুগে সমগ্র বঙ্গদেশ **সুবা বাঙ্গলা** নামে অভিহিত হইল।

বঙ্গ নামের প্রচলন

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অগস্ট স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে কূটকৌশলী ইংরেজের ভেদনীতি ও ভারতীয় মুসলিমগণের আত্মনিয়ন্ত্রণবোধের ফলে ভারতের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গও দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রগতভাবে বিচ্ছিন্ন হইলেও দুই বঙ্গের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং ইহাদের পৃথক সত্তা নির্ধারণও সুকঠিন। মধ্যযুগে বঙ্গ এইরূপ দ্বিধাবিভক্ত ত ছিলই না, বরং বঙ্গের বাহিরেও বহু অঞ্চল বাঙ্ বা সুবা বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাক্-মুঘল-যুগের বাঙ্গলার ইতিহাস আমাদের আলোচ্য বিষয়। সুতরাং সেই অবিভক্ত বঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের আলোচনা অগ্রসর হইবে।

মধ্যযুগের অবিভক্ত বঙ্গদেশ

বঙ্গদেশের ভৌগোলিক পরিচয় তিন ভাগে আলোচিত হইতে পারে—

(ক) বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সংস্থান ও সীমারেখা,

(খ) বঙ্গদেশের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু,

(গ) বঙ্গদেশের যাতায়াত ও বাণিজ্য-পথ।

---

১) গৌড়ের খ্যাতি সমস্ত উত্তরভারত ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল—পশ্চিম পঞ্জাব এবং বঙ্গদেশের কিয়দংশ গৌড় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ, গৌড়ীয় রীতি, গৌড়ীয় সমাজ-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিশেষণ গৌড়ের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে। পঞ্জাবের উত্তর ও পূর্বস্থিত হিমালয়ের অন্তর্গত কাশ্মীর, পুঞ্চ, সুকেত, মণ্ডী এবং জুব্বার পার্বত্য রাজ্যের রাজগণ বাঙ্গলার সেন রাজবংশের সন্তান বলিয়া গর্ব করেন। মণ্ডী ও সুকেত রাজবংশের কুলপঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে, লক্ষ্মণসেনের বংশধর শূরসেন ১২৫৯ বিক্রমাব্দে মুসলিম কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া প্রয়াগে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শূরসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রূপসেন পঞ্জাবে গমন করিয়া রূপর নামক রাজ্য স্থাপন করেন এবং কাশ্মীর, পুঞ্চ, মণ্ডী, সুকেত, জুব্বার প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করেন।

(ক) বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সংস্থান সীমারেখা

কোন স্থান বা দেশের সীমা উহার ভৌগোলিক সংস্থান ও ভূপ্রকৃতি এবং রাষ্ট্রনির্দিষ্ট সীমারেখা দ্বারা নির্দেশিত হইতে পারে। সেই স্থান বা দেশের রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক সীমারেখা যে এক এবং অভিন্ন হইবে, উহার কোন নিশ্চয়তা নাই। রাষ্ট্রীয় সীমা পরিবর্তনশীল—রাষ্ট্রের উত্থান-পতন ও ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সীমারেখা সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। পর্বত, সমুদ্র, নদনদী এবং ভূপ্রকৃতিও কখন কখন রাষ্ট্রসীমা নির্ধারণ করে এবং প্রাচীন ইতিহাসে উহাই ছিল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে রাষ্ট্রসীমা বহু ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক সীমাকে উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছে। বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি রাষ্ট্রকে এই শক্তি প্রদান করিয়াছে; কারণ, যন্ত্রবিজ্ঞানের কল্যাণে কোন স্থানই আর দুর্গম নহে—দূর আর দূর নহে।

বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সংস্থান, ভূপ্রকৃতি ও রাষ্ট্রনির্দিষ্ট সীমারেখা

কোন কোন দেশে ভূপ্রকৃতিই ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সীমারেখা নির্দেশ করে এবং উহা প্রায় অপরিবর্তনীয়। এক জাতি ও জনত্ব এবং ভাষার ঐক্য দ্বারাও কোন দেশ বা রাষ্ট্রের সীমারেখা নির্ধারিত হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমার আবেষ্টনীর মধ্যেই জাতি ও ভাষাগত ঐক্য গড়িয়া উঠে। প্রাচীন বাঙ্গলাদেশেও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলার জন ও ভাষার এই ঐক্য একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগে সম্পূর্ণ বিপরীত মুসলিম ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ ও সংঘাতে বাঙ্গালী জাতি আত্মসচেতন হইয়া উঠিয়াছিল এবং বাঙ্গলা ভাষা ও সংস্কৃতি স্বীয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই জন, ভাষা ও সংস্কৃতির একত্ব-বৈশিষ্ট্য লইয়াই বর্তমান বঙ্গদেশ; এবং এই দেশ বিশিষ্ট ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা বেষ্টিত। আধুনিক রাষ্ট্রসীমা অবশ্য এই ভৌগোলিক সীমা অনুসরণ করে নাই। কিন্তু ইতিহাস-রচয়িতার পক্ষে প্রাকৃতিক সীমারেখা অনুসরণ করাই সঙ্গত—কারণ প্রায় সকল দেশের লোকচরিত্র এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর ভূপ্রকৃতির প্রভাব ও গুরুত্ব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই, বরং বহুক্ষেত্রেই বাঙ্গলাদেশের ভৌগোলিক সংস্থান ও ভূ-প্রকৃতি এই দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সুপ্রাচীন কাল হইতেই উত্তর-পশ্চিম ভারত ও উত্তর ভারত বিদেশী আক্রমণে বারংবার পর্যুদস্ত, বিপন্ন ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশ উত্তর ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশ বলিয়া সেই বিদেশী আক্রমণের স্রোত বাঙ্গলাকে বিশেষ-ভাবে স্পর্শ করে নাই এবং মধ্যযুগের পূর্ব পর্যন্ত কোন বিপর্যয় বা বিক্ষোভও সৃষ্টি করে নাই। মধ্যযুগেও দেখা যায় যে, রাজধানী দিল্লী হইতে বাঙ্গলার দূরত্ব, নদীবহুলতা ও উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু, দিল্লীর সুলতান বা বাদশাহগণকে বাঙ্গলা অভিযানে আতঙ্কিত করিয়াছে এবং মধ্যযুগে সুযোগ উপস্থিত হইলেই দিল্লীর রাজশক্তির বিরুদ্ধে বাঙ্গলা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে—সেইজন্যই দিল্লীর তুঘলক সুলতানগণ

বঙ্গদেশের ভূপ্রকৃতি জাতি ও ভাষাগত ঐক্য

দেশের ইতিহাস ও লোকচরিত্রের উপর ভূপ্রকৃতির প্রভাব

দিল্লী সুলতানগণের বঙ্গভীতি

বাঙ্গলাকে বুঘলকপুর বা বিদ্রোহ-নগরী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গলাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া বাঙ্গলার রাজনৈতিক ঐক্য সমূলে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের সীমারেখা : বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সীমারেখা, জাতি ও ভাষার ঐক্য লইয়া আধুনিক যুগের যে বঙ্গদেশ, উহার উত্তর সীমায় সিকিম ও নগাধিরাজ হিমালয়ের শৃঙ্গ, শুভ্র তুষারকিরীট কাঞ্চনজঙ্ঘা। উহার নিম্ন উপত্যকায় বাঙ্গলার উত্তরতম জেলা দার্জিলিং (দুর্জয়লিঙ্গ) ও জলপাইগুড়ি। এই দুই জেলার পূর্ব ও পশ্চিমে যথাক্রমে ভুটান ও নেপাল রাজ্য। উত্তর-পূর্বদিকে কোচবিহার ও রংপুর ব্রহ্মপুত্র নদ স্পর্শ করিয়াছে। এই ব্রহ্মপুত্র নদই প্রাচীনকালে পুণ্ড্রবর্ধন ও কামরূপ রাজ্যের সীমা নির্দেশ করিত। কখনও কখনও কামরূপের রাজ্যসীমা করতোয়া নদী অতিক্রম করিয়া বাঙ্গলার উত্তরতম জেলা রংপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি অতিক্রম করিয়া বিহারের প্রাচীন কৌশিকী বা কুশী (কোশী) নদী স্পর্শ করিয়াছে। বর্তমানে কুশী নদী উত্তর-বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়া গঙ্গায় প্রবাহিত হইতেছে অথচ প্রারম্ভে এই নদী ছিল পূর্ববাহিনী এবং ব্রহ্মপুত্র-গামিনী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া উত্তরবঙ্গের সমগ্র অঞ্চলে প্রবাহ (খাত) পরিবর্তন করিতে করিতে কুশী বহু পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে এবং পূর্ববাহিনী কুশী হইয়াছে দক্ষিণবাহিনী। মহানন্দারও এইরূপ বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। মহানন্দাও ছিল পূর্ববাহিনী এবং করতোয়া-অভিমুখিনী। কুশী ও মহানন্দার এই-রূপ পরিবর্তনের ফলেই গৌড়, লক্ষ্মণাবতী ও পাণ্ডুয়া অঞ্চল নিম্ন জলাভূমিতে পরিণত হয় এবং অস্বাস্থ্যকর ও মনুষ্যবাসের অনুপযোগী বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। একদিন কুশী ও মহানন্দাই দক্ষিণের সুসভ্য জাতি এবং উত্তরের কোচ, মেচ, কিরাত প্রভৃতি অর্ধসভ্য বা অসভ্য পার্বত্য জাতির মধ্যে ব্যবধান রচনা করিয়াছিল[১]। মধ্যযুগে উত্তর-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিমতম প্রান্ত কামরূপ, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি মধ্যযুগে বাঙ্গলার সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান এবং সংস্কৃতিকেই গ্রহণ করিয়াছিল।

বঙ্গের উত্তর সীমা

কুশী নদীর গতি পরিবর্তন

বাঙ্গলাদেশের পূর্ব সীমায় উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ, মধ্যভাগে গারো, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়, দক্ষিণে লুসাই, চট্টগ্রাম ও আরাকান শৈলশ্রেণী। গারো, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া শৈলশ্রেণীর বিন্যাস দেখিলে স্পষ্টই মনে হয়, বঙ্গদেশের সীমা এই পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বরাক ও সুরমা নদীর উপত্যকা মেঘনা উপত্যকারই (ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা) উত্তরাংশ মাত্র। এই দুই উপত্যকার মধ্যে কোন প্রাকৃতিক সীমা বা প্রাচীর নাই বলিয়াই প্রাচীন ও মধ্যযুগে পূর্ববঙ্গের এই কয়েকটি জেলার, বিশেষতঃ পূর্ব-ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা জেলার সংস্কার ও সংস্কৃতি অতি সহজেই শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এখনও শ্রীহট্ট এবং কাছাড়ের সমাজ ও সংস্কৃতি পূর্ব-বাঙ্গলার জেলাগুলির সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত। সিলেট সরকার সুবা বাঙ্গলার অন্তর্গত ছিল। কাছাড়ের প্রান্ত পর্যন্ত শ্রীহট্ট

বঙ্গের পূর্ব সীমা

[১] *History of Bengal*, Dacca University, Vol. I, p. 8.

জেলা এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল[১]। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দেও এই দুইটি জেলা ঢাকা বিভাগের সীমান্তর্গত ছিল। দক্ষিণ-পূর্বে পার্বত্য ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও আরাকানের শৈলশ্রেণী বাঙ্গলাদেশকে লুসাই অঞ্চল ও ব্রহ্মদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।

বঙ্গের পশ্চিম সীমা

বঙ্গের পশ্চিম সীমা বর্তমান সীমারেখা অপেক্ষাও বিস্তৃততর ছিল। বর্তমান মালদহ ও দিনাজপুর জেলার উত্তর ও পশ্চিম সীমাই বর্তমানে উত্তর বঙ্গের পশ্চিম সীমা নির্দেশ করিতেছে। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই সীমা দক্ষিণে গঙ্গার তটরেখা অনুসরণ করিয়া বর্তমান দ্বারভাঙ্গা জেলার পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দ্বারভাঙ্গা বোধ হয় দ্বার-বঙ্গ (বঙ্গের দ্বার) শব্দেরই আধুনিক রূপ। পূর্ণিয়া সরকার (কুশী নদীর পূর্বভাগে বর্তমান পূর্ণিয়া জেলার কতকাংশ) সম্রাট আকবরের সময়ে সুবা বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন কালে বিহার ও মিথিলার সঙ্গে উত্তর-বঙ্গের গৌড়, পুণ্ড্র ও বরেন্দ্রীর ভূপ্রকৃতি ও ভাষাগত পার্থক্য অতি অল্পই ছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে মিথিলা ছিল বাঙ্গালী পণ্ডিতদের জ্ঞানতীর্থ। বিদ্যাপতি কেবল মিথিলারই কবি নহেন, বাঙ্গালীরও পরমপ্রিয় কবি। উত্তরবঙ্গ এবং শ্রীহট্টের কোন কোন অঞ্চলে মৈথিলী স্মৃতিশাস্ত্রের প্রচলন ছিল—বাচস্পতি মিশ্রের স্মৃতিগ্রন্থের বহু পাণ্ডুলিপি শ্রীহট্টে সংরক্ষিত আছে। উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর-বিহারের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান রচিত হইয়াছে মধ্যযুগে। বঙ্গদেশের প্রবেশপথ-রূপে উত্তর-বিহার অঞ্চলের এই দ্বারবঙ্গ নামও মুসলমানগণেরই প্রদত্ত। এই দুই অঞ্চলের মধ্যেও মেঘনা ও সুরমা উপত্যকার মতই প্রাকৃতিক বা ভূপ্রকৃতিগত বিশেষ কোন ব্যবধান বা পার্থক্য নাই।

তেলিয়াগড় ও শকরীগলির গিরিবর্ত্ম—বঙ্গদেশের প্রবেশপথ

উত্তর-বিহারের দক্ষিণ সীমাস্থিত রাজমহল পাহাড়কে স্পর্শ করিয়া গঙ্গানদী বাঙ্গলার সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাজমহলের উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গাতীর স্পর্শ করিয়াই তেলিয়াগড় ও শকরীগলির সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম ছিল বাঙ্গলার প্রবেশপথ। এই প্রবেশপথ রক্ষা করিতে পারিলেই বঙ্গের নিরাপত্তা সম্বন্ধে বহুলাংশে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত। এই কারণেই এই গিরিবর্ত্মের সন্নিকটে গড়িয়া উঠিয়াছিল লক্ষ্মণাবতী, গৌড়, পাণ্ডুয়া, তান্ডা ও রাজমহল প্রভৃতি মধ্যযুগীয় বাঙ্গলার রাজধানীসমূহ। রাজমহল ও গঙ্গার দক্ষিণে বর্তমান সাঁওতাল পরগণা প্রাচীন উত্তর-রাঢ়ের (ব্রহ্ম) উত্তর-পশ্চিমতম অংশ। ভবিষ্যপুরাণে এই ভূমিকে বলা হইয়াছে "অজলা, উষর ও জঙ্গলময় ভূমি"; এই স্থানে আছে স্বল্পস্থানব্যাপী লৌহখনি, তিনভাগ জঙ্গল, একভাগ গ্রাম ও স্বল্পমাত্র উর্বরভূমি। ইহাই হিউয়েন সাঙ বর্ণিত 'কজঙ্গল'[২]। সপ্তম শতকে রাজা জয়নাগের বপ্পঘোষবাট পট্টোলীতে ঔদম্বরিক 'বিষয়' নামক ক্ষুদ্র জনপদের উল্লেখ আছে[৩]। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বাঙ্গলার ঔদম্বর সরকার

---

১) মধ্যযুগে বাঙ্গলা, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২৫ পৃঃ

২) *Travels of Huen Tsang*, Ed. by Watters, Vol. II, p. 183.

৩) *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, Vol. XIX, p. 81. *Epigraphica Indica*, Vol. XVIII, p. 60.

নদ ও উহার উপত্যকা, পূর্বে আসমুদ্র-বিস্তৃত গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের শৈলশ্রেণী। উত্তর-পশ্চিমে দ্বারবঙ্গ বা দ্বারভাঙ্গা পর্যন্ত সমভূমি; পশ্চিমে রাজমহল, সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর, মানভূম, সিংভূম, কেওঞ্জর, ময়ূরভঞ্জের পর্বতময় গৈরিক মালভূমি; সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বঙ্গের উত্তরে সুউচ্চ পর্বত, দুই পার্শ্বে পূর্ব ও পশ্চিমে সুকঠিন শৈলভূমি, দক্ষিণে বিস্তীর্ণ সমুদ্র এবং মধ্যভাগে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সমভূমি। ইহাই বাঙ্গলার ভৌগোলিক পরিচয়।

(খ) বঙ্গদেশের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু

পৃথিবীর সকল দেশেই জাতীয় চরিত্র এবং ইতিহাসের উপর ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুর প্রভাব অপরিসীম। বঙ্গদেশেও এই সাধারণ নিয়মেই লোকচরিত্র ও ইতিহাস গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলার অসংখ্য নদনদী এই দেশকে সুজলা-সুফলা ও শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিয়াছে। নদী-উপনদীগুলি যাতায়াত ও অন্তর্বাণিজ্যের সহায়তা করিয়া দেশকে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যশালী করিয়াছে। সমুদ্রোপকূলবর্তী বন্দরগুলি বহির্বাণিজ্যের সহায়তা করিয়াছে। এই সকল বন্দর হইতে বণিক ও নাবিকগণ দেশদেশান্তরে কেবল বিপুল বাণিজ্যসম্ভারই বহন করে নাই—ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং ভারতাত্মার বাণীও দেশবিদেশে প্রচার কবিয়াছে। নদনদী ও গিরিসমুদ্র দ্বারা প্রাচীন বাঙ্গলার জনপদসীমা এবং রাষ্ট্রসীমা নির্ধারিত হইয়াছে। এই দেশের নদনদী, বনপ্রান্তর, জলবায়ুর উষ্ণ আর্দ্রতা, ঋতুক্রম, নদীবিধৌত নিম্নভূমি, বনময় তরাই অঞ্চল ও সমুদ্র উপকূল, এই দেশের লোকচরিত্র, সমাজবিন্যাস এবং ইতিহাসকেও গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। সেইজন্যই বাঙ্গলাদেশ তথা বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে এই দেশের ভৌগোলিক সংস্থান ও ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কারণ, দেশখণ্ড বা উহার ভৌগোলিক সংস্থান হইল ঐতিহাসিক কাহিনী ও ঘটনাবলীর রঙ্গমঞ্চ এবং ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি অথবা ইতিহাসবর্ণিত নারীপুরুষ সেই রঙ্গমঞ্চের অভিনেতৃবর্গ। সুতরাং কোন দেশ বা জাতির ইতিহাস জানিতে হইলে একমাত্র অভিনেতৃবর্গকে জানিলেই চলিবে না, সমভাবে জানিতে হইবে রঙ্গমঞ্চ অর্থাৎ ভৌগোলিক সংস্থান ও ভূপ্রকৃতিকে; কারণ, অভিনয়কে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার পশ্চাতে রঙ্গমঞ্চের অবদানও থাকে অনেকখানি।

বঙ্গের ইতিহাসের উপর ভূপ্রকৃতির প্রভাব

ভূগোল ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ

বাঙ্গলার ভূপ্রকৃতি নির্ধারণ করিয়াছে বাঙ্গলার পাহাড়পর্বত ও নদনদী এবং উহা নির্ণীত হইয়াছে ঐতিহাসিক যুগের বহু পূর্বেই। ঐতিহাসিক কালেও ভূপ্রকৃতির স্বল্পবিস্তর পরিবর্তন হইয়াছে এবং হইতেছে। নদীবাহিত পলল মৃত্তিকা এবং বন্যাপ্লাবিত মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া কিংবা ভূমিকম্প অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে নূতন ভূখণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে বা পুরাতন ভূমি পরিত্যক্ত হইয়াছে—বিনষ্ট হইয়াছে। এই নূতন ভূমির সৃষ্টি এবং পুরাতন ভূমির বিনাশ—উভয়েরই কারণ প্রধানতঃ নদীপ্রবাহের পরিবর্তন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বঙ্গে ভূপ্রকৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ নষ্ট হয় নাই।

বঙ্গের নদনদী

বাঙ্গলা নদীমাতৃক দেশ—ক্ষুদ্র-বৃহৎ অসংখ্য নদনদী ও উহাদের শাখা-উপশাখা বাঙ্গলার প্রাণ। বাঙ্গলার নদনদী বাঙ্গলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে, বাঙ্গলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। এই নদীগুলিই বাঙ্গলার আশীর্বাদ এবং কখনও কখনও বাঙ্গলার ভাগ্যে অভিশাপও হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল নদনদী উচ্চতর ভূমি হইতে প্রচুর পলল বহন করিয়া ব-দ্বীপ বঙ্গের নিম্নভূমি রচনা করিয়াছে এবং এখনও এই সৃষ্টিকার্য অব্যাহত গতিতেই চলিয়াছে। সেইজন্য উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের কিয়দংশ ব্যতীত বঙ্গের প্রায় সমগ্র অঞ্চলই ভূতত্ত্বের দিক হইতে নবসৃষ্ট ভূমি—কোমল ও কমনীয়। এই কমনীয় ভূমির উপর দিয়াই ঐতিহাসিক কালে বাঙ্গলার নদনদীগুলি উদ্দাম উচ্ছল প্রাণলীলায় প্রবাহের পর প্রবাহ পরিবর্তন করিয়া নব নব প্রবাহে প্রবাহিত হইয়াছে—বর্ষা ও বন্যার প্রবল জলধারাকে নূতনতর প্রবাহে বহিয়া লইয়া গিয়াছে। সহসা এই প্রবাহ-পরিবর্তনে কত সুরম্য নগর, বন্দর, বিপণি, কত জনবহুল গ্রাম, শস্যশ্যামল প্রান্তর, কত মঠ, মন্দির, মানুষের কত কীর্তি ধ্বংস হইয়াছে। অন্যদিকে সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যবিভব লইয়া কত জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলার নদনদীগুলিই প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক—সমতলভূমির নদনদীর তীরেই গ্রাম, নগর ও বন্দরের পত্তন, ঘনতম বসতি এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার।

বঙ্গদেশের উপর নদনদীর প্রভাব

বাঙ্গলার ভূপ্রকৃতিতে নদীর প্রবাহ-পরিবর্তন, পুরাতন নদীর বিলোপ এবং নূতন নদীর সৃষ্টি কোনটাই অস্বাভাবিক নহে। সুপ্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত কত পুরাতন নদী বিলুপ্ত হইয়াছে—কত খরস্রোতা নদী শীর্ণা, ক্ষীণস্রোতা হইয়া পড়িয়াছে, কত নদী নূতন প্রবাহে নূতনতর আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া প্রবাহিত হইয়াছে—উহার আংশিক বিবরণ পাওয়া যায় বাঙ্গলার সমসাময়িক ভূমিচিত্রে। বর্তমান বাঙ্গলার নদীগুলির যে প্রবাহপথ ও আকৃতি-প্রকৃতির সহিত আমাদের পরিচয়, একশত বৎসর পূর্বেও উহা এইরূপ ছিল না। এই পরিবর্তনের ফলেই ব্রহ্মপুত্র-গামিনী পূর্ববাহিনী কুশী আজ গঙ্গাগামিনী দক্ষিণমুখিনী। উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান নদী কুশী বিহারের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা; যমুনার খাতে আজ ব্রহ্মপুত্রের নূতন প্রবাহ বহিতেছে। ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতকের পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ বণিক, রাজ-কর্মচারী এবং এদেশীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অনেক বিবরণীতে মধ্যযুগীয় বাঙ্গলার নদনদী ও জনপদের বিনাশ, সৃষ্টি ও ক্রমবিবর্তনের চিত্র পাওয়া যায়। কেবল এই সকল চিত্রে নহে—আল্ বেরুণী (১০১৭-১০২৭ খ্রীঃ), ইবনবাত্তুতা (১৩২৮-১৩৫৪ খ্রীঃ), রালফ্ ফিচ (১৫৯৯ খ্রীঃ) প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী, বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গল, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, গোবিন্দদাসের কড়চা, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি জাতীয় সাহিত্যগ্রন্থে এবং সমসাময়িক মুসলিম ইতিহাসেও এই পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশে নদনদীর গতি পরিবর্তন

নদীপ্রবাহের নিরন্তর পরিবর্তনেও বঙ্গদেশের ভূপ্রকৃতির বিশেষ কোন উল্লেখ-

যোগ্য মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। ভূপ্রকৃতি অনুসারে বঙ্গদেশকে প্রধানতঃ চারিটি সুনির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত করা যায় :—

(১) পশ্চিমবঙ্গের পুরাতন ও নবসৃষ্ট ভূমি, (২) উত্তরবঙ্গের পুরাতন ও নবসৃষ্ট ভূমি, (৩) পূর্ববঙ্গের পুরাতন ও নবসৃষ্ট ভূমি, (৪) মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গের নবসৃষ্ট ভূমি (এখানে পুরাতন ভূমি নাই)।

(১) পশ্চিমবঙ্গের পুরাতন ও নবসৃষ্ট ভূমিঃ রাজমহলের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পুরাতন ভূমি দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজমহল, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংভূম ও ধলভূমের মালভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই মালভূমির পূর্বপার্শ্বে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশের উচ্চতর গৈরিক ভূমি। এই অঞ্চলও পূর্বোক্ত মালভূমি অঞ্চলেরই অন্তর্গত। মালভূমি অঞ্চল পর্বতময়, অনুর্বর ও অরণ্য-সমাকীর্ণ। এই অঞ্চলে শালবন ও খনিজ সম্পদ প্রচুর। প্রাচীন উত্তর-রাঢ়ের কিয়দংশ, দক্ষিণ-রাঢ়ের পশ্চিমাংশ ও তাম্রলিপ্ত জনপদের কতকাংশ এই মালভূমি ও গৈরিক ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণ-রাঢ়ের পূর্বাংশ (রাণীগঞ্জ, আসানসোলের পার্বত্য অঞ্চল, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চল, মেদিনীপুরের শালবনী-ঝাড়গ্রাম অঞ্চল) এই পুরাতন ভূমির নিম্নাংশ। এই সকল পার্বত্য উচ্চ গৈরিক অঞ্চল ভেদ করিয়াই অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদী সমভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। এখনও এই নদীগুলি পার্বত্য 'লালমাটি' বহন করিয়া আনিতেছে। এই পুরাতন ভূমির নিম্নাংশ বা সমতল অংশ নদীবাহিত জলধারায় পুষ্ট এবং নদীবাহিত পলল মৃত্তিকায় উর্বর ; সুতরাং বৃক্ষবহুল ও শস্যশ্যামল। এই সমতলভূমি পূর্বোক্ত নদনদী ও ভাগীরথীর প্রবাহ দ্বারা সৃষ্ট নবভূমি। বর্ধমানের পূর্বাংশ, মুর্শিদাবাদের বহুলাংশ, বাঁকুড়ার স্বল্পাংশ, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুরের পূর্বাংশ এই নবসৃষ্ট ভূমি।

রাঢ় অঞ্চল

পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতির বর্ণনা বা সন্ধান প্রাচীন লিপি ও পুরাণ-ইতিহাসে পাওয়া যায়। রাজা হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্টের ভুবনেশ্বর শিলালিপিতে রাঢ় দেশের অজলা জঙ্গলময় অঞ্চলের উল্লেখ আছে[১]। ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ড অংশে রাঢ়ীখণ্ড জাঙ্গল নামে এক দেশের উল্লেখ রহিয়াছে। বৈদ্যনাথ, দেওঘর, বক্রেশ্বর, বীরভূম ও অজয়নদ এই দেশের অন্তর্গত। এই অঞ্চলের তিনভাগ জঙ্গল, অধিকাংশ ভূমি উষর ও অনুর্বর—স্বল্পাংশ মাত্র গ্রাম ও জনপদ। এই অঞ্চলই হিউয়েন সাঙ-বর্ণিত কয়জঙ্গল, কজঙ্গল বা কাজঙ্গল (ক-চু-ওয়েন-কিলো)। বর্তমানে কাঁকজোল এই অঞ্চলের স্মৃতি বহন করিতেছে। তাঁহার লেখায় এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, এই অঞ্চলের উত্তর সীমা গঙ্গা হইতে দূরবর্তী নহে। এই অঞ্চলের দক্ষিণ দিকের বনময় প্রদেশে বন্যহস্তী প্রচুর। দেশখণ্ড উর্বর ও শস্যশ্যামল, জলবায়ু উষ্ণ। হিউয়েন সাঙের বর্ণনা হইতে মনে হয়, তিনি অজয়,

হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় কজঙ্গল

১) হরিবর্মার সামন্তসার তাম্রশাসন, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৫ পৃঃ

দামোদর ও ভাগীরথী উপত্যকার শস্যশ্যামল সমতলভূমির কথাই বলিতেছেন। তিনি ঐ অঞ্চল অতিক্রম করিয়াই তাম্রলিপ্তে গমন করেন। এই অঞ্চলের লোকচরিত্র সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"এই দেশে মানুষ গ্রামে ও নগরে বাস করে। তাহারা স্পষ্টবাদী, গুণবান ও বিদ্যাচর্চার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।"

তাম্রলিপ্তের ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে হিউয়েন সাঙ বলিয়াছেন—"এই অঞ্চলের ভূমি সমতল, জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র—শস্য ও ফলফুল প্রচুর। তাম্রলিপ্ত নগর একটি প্রসিদ্ধ সমুদ্র-বন্দর। এই দেশে জলপথ ও স্থলপথের সমন্বয় হইয়াছে।" তাঁহার বর্ণনা হইতে মনে হয়, হিউয়েন সাঙ পশ্চিমবঙ্গের নবভূমি, বিশেষতঃ মেদিনীপুরের পূর্বাংশের কথা বলিতেছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, এই অঞ্চলের লোকেরা রূঢ়ভাষী কিন্তু সাহসী।

হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় তাম্রলিপ্ত

তাম্রলিপ্ত হইতে হিউয়েন সাঙ কর্ণসুবর্ণে গমন করেন। সেই সময়ে কর্ণসুবর্ণ লোকবহুল সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। জনগণ সচ্চরিত্র ও বিদ্যানুরাগী ছিল। কর্ণসুবর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলার 'কানসোনা' বলিয়াই অনুমিত হয়। তিনি কর্ণসুবর্ণের নিকটবর্তী এক সুবৃহৎ বৌদ্ধবিহারের বর্ণনা দিয়াছেন। সেই বৌদ্ধবিহারের নাম লো-টো-মো-চিহ্—রক্ত মত্তি বা রক্তমৃত্তিকা, বর্তমান রাঙ্গামাটি। রাঙ্গামাটিও মুর্শিদাবাদ জেলারই অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য রাঙ্গামাটি নামটি অর্থব্যঞ্জক। এই রাঙ্গামাটি সমতল হইলেও এই ভূভাগের উপরে নিম্নস্তরে রাজমহল ও সাঁওতাল পরগণার পার্বত্য গৈরিক মাটির আভাস প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু অংশ যে এই গৈরিক মালভূমির অন্তর্গত, উহা লালবাগ, রাঙ্গামাটি প্রভৃতি নামের মধ্য দিয়াই প্রমাণিত হয়। অবশ্য বঙ্গদেশে একাধিক রাঙ্গামাটির নাম পাওয়া যায় এবং প্রায় প্রতিটিই বঙ্গের কোন-না-কোন পুরাতন ভূমি বা পার্বত্য গৈরিক ভূমির অন্তর্ভুক্ত।

কর্ণসুবর্ণ

হিউয়েন সাঙের কজঙ্গল, তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণের বিবরণ পাঠে মনে হয়, তিনি পশ্চিমবঙ্গের পূর্বাংশের সমতল ভূখণ্ডের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। পশ্চিমাংশের পার্বত্য উষর গৈরিক বনময় প্রদেশের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় নাই। অবশ্য হিউয়েন সাঙ ভারতে আগমন করেন বৌদ্ধতীর্থ-দর্শনপ্রয়াসী, বৌদ্ধধর্মানুরাগী অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থিরূপে। বৌদ্ধবিহার ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলি সহজগম্য জনবহুল সমতল সমৃদ্ধ অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। হিউয়েন সাঙ সুপরিচিত পথরেখা অনুসরণ করিয়াই সেই সকল বৌদ্ধতীর্থ ও জ্ঞানকেন্দ্রে গমন করিয়াছিলেন—সুতরাং উষর, অনুর্বর, অরণ্যময় ও জনবিরল স্থানে গমনের কোন প্রয়োজন তাঁহার হয় নাই, অথচ মধ্যযুগে ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খালজী যখন বঙ্গে অভিযান করেন, তখন তিনি বাঙ্গলার স্বাভাবিক প্রবেশপথ রাজমহলের নিকটবর্তী তেলিয়াগড় ও শকরীগলির গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া বাঙ্গলায় প্রবেশ করেন নাই। তিনি পাটনা হইতেও অভিযান আরম্ভ করেন নাই। ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন উত্তর ভারত হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া মুনেরের (বর্তমান পাটনার আঠাশ মাইল দূরে) দক্ষিণে শোণ অতিক্রম করেন। তারপর তিনি বিহার-শরিফ হইতে যাত্রা করিয়া গয়া জেলার মধ্য দিয়া

হিউয়েন সাঙের পথরেখা

পূর্ব-দক্ষিণে অগ্রসর হইলেন এবং ঝাড়খণ্ডের উষর বনভূমি অতিক্রম করিয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন[১]। অবশ্য অধ্যাপক হাসান আসকারী অনুমান করেন যে, ইখ্‌তিয়ার-উদ্দীন কুশী অতিক্রম করিয়া গঙ্গার পূর্বতীর অনুসরণপূর্বক নবদ্বীপে উপস্থিত হন। ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনের অভিযানপথের বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি প্রাচীন রাঢ় অঞ্চলের পার্বত্য বনময় মালভূমি (পশ্চিমবঙ্গের পুরাতন ভূমি) অতিক্রম করিয়াই বঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই অনুমানের আরও একটি কারণ আছে—মুহম্মদ ইখ্‌তিয়ার নবদ্বীপে প্রবেশের পূর্ব রাত্রি নবদ্বীপের দশ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমের অরণ্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন[২]।

ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনের পথরেখা

(২) উত্তরবঙ্গের রাতন ও নবসৃষ্ট ভূমি ঃ বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশের পুরাতন ভূমির একটি রেখা রাজমহলের উত্তরে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া মালদহ, রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুরের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিয়াছে। এই রেখা ব্রহ্মপুত্রের দুই তীরে বিস্তৃত হইয়া আসামের শৈলশ্রেণী স্পর্শ করিয়াছে। এই অঞ্চলের ভূমি পার্বত্য গৈরিক ও স্থূল বালুকাময়। রংপুর, গোয়ালপাড়া এবং কামরূপেই এই পুরাতন ভূমির বিস্তৃতি অধিকতর।

বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্রভূমি

রংপুরের পশ্চিমাংশ, বগুড়া-রাজশাহীর উত্তরাংশ এবং দিনাজপুরের পূর্বাংশ ব্যাপিয়া একটি গৈরিক অঞ্চল বিস্তৃত রহিয়াছে। এই অঞ্চলই মুসলিম ইতিহাসকার বর্ণিত বরিন্দ বা বরেন্দ্রভূমি[৩]। বরেন্দ্রভূমির উত্তরে হিমালয়ের সানুদেশে তরাই অঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর জলীয় নিম্নভূমি। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা এবং পুর্ণিয়ার কিয়দংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। বরেন্দ্রীর গৈরিক ভূমি অনুর্বর পুরাতন ভূমি। কিন্তু উহার পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ আত্রাই, মহানন্দা, কুশী, পদ্মা, পুনর্ভবা ও করতোয়ার পলল মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত নবভূমি। এই অঞ্চলের পুরাতন ভূমির রেখাটুকু ব্যতীত নবভূমির সকল অংশই সমতল, উর্বর এবং সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা। বরেন্দ্রী জনবিরল। পদ্মা, আত্রেয়ী, করতোয়ার সমতলভূমিতেই ঘন জনবসতি। এই অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল প্রাচীন পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীর সমৃদ্ধ জনপদগুলি। সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিতে বরেন্দ্রভূমির যে শস্যসমৃদ্ধির এবং ধনৈশ্বর্যের বিবরণ দেখা যায় তাহাও সম্ভবতঃ এই সমভূমি অঞ্চলেরই দান।

জনবিরল বরেন্দ্রী

---

১) "Md. Bakhtyar's starting point in his Bengal expedition was Behar which means the city of Behar Sharif and not Patna. His line of advance from upper India was most probably across the Son river, somewhat south of Muner, then through Behar Sharif and the Gaya district and eastward and southwards through Jharkhand to Nadia."—*History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, pp. 6 ff.

২) "From his last night's resting place in the woods some 20 miles north-west of Nabadwip, Muhammad Bakhtyar started his march at sunrise."—*History of Bengal*, Dacca University, Vol. II., p. 7.

৩) The *Tabqat-i-Nasiri* mentions Barinda as a wing of the territory of Lakhnauti on the eastern side of the Ganges. The evidence of the Indian literature and inscription proves that it includes considerable portions of the present. Bogra, Rajshahi and Dinajpur districts.—*Tabqat-i-Nasiri*, Eng. Tr. by Raverty. p.569.

বরেন্দ্রভূমি প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনেরই এক সুবৃহৎ অংশ। কখনও কখনও বরেন্দ্রী বলিতে পুণ্ড্রবর্ধনকেই বুঝাইত। হিউয়েন সাঙ পুণ্ড্রবর্ধনেও আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণীতে উল্লিখিত আছে যে, এই অঞ্চল সমৃদ্ধ ও জনবহুল ছিল। প্রতি জনপদ সরোবর, পুষ্পোদ্যান ও বিরামকানন-শোভিত ছিল—ভূমি আর্দ্র ও সমতল ; শস্যসম্ভার প্রচুর ; জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও মৃদু ; জনসাধারণ জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

পুণ্ড্রবর্ধন

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলার ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু উত্তর-বঙ্গেরই অনুরূপ ; হিউয়েন সাঙের কামরূপ বিবরণের সহিত উত্তরবঙ্গের বিবরণের যথেষ্ট সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য দেখা যায়। সেখানেও ভূমি সমতল ও আর্দ্র ; জলবায়ু মৃদু। কামরূপের লোকেরা খর্ব ও কৃষ্ণকায় এবং সদাচারী হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের প্রকৃতি হিংস্র। বিদ্যার্থিরূপে তাহারা পরম অধ্যবসায়ী। ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনের তিব্বত অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে কামরূপবাসীদের আচরণে তাহাদের হিংস্র স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ কামরূপরাজ ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনকে তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া সৈন্য পরিচালনার অনুমতি দিলেও কামরূপবাসিগণ তাঁহারই আদেশে প্রত্যাবর্তনপথে মুসলিম সৈন্যগণের দুরবস্থার সুযোগে পথরোধ করিয়াছিল[১]।

পশ্চিমবঙ্গের মত উত্তরবঙ্গেও পুণ্ড্রবর্ধনের সমতলভূমির সহিতই হিউয়েন সাঙের পরিচয় হইয়াছিল। বরেন্দ্রীর উচ্চ গৈরিক অঞ্চলের সহিত তাঁহার পরিচয়ের সুযোগ হয় নাই। রাঢ় এবং উত্তরবঙ্গের ভূপ্রকৃতি এবং পদ্মা-ভাগীরথীর প্রবাহ-পথ বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় এক সময়ে পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীর সঙ্গে রাঢ়ভূমির ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। ভাগীরথী যখন গৌড়কে দক্ষিণে রাখিয়া উত্তর-পূর্ববাহিনী হইয়া দক্ষিণে বহিত এবং পদ্মা যখন সম্পূর্ণ পূর্ববাহিনী ছিল তখন পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীর কতক অংশ (মালদহ জেলা) রাঢ়ভূমির সহিতই যুক্ত ছিল। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগও এই দুই অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর ছিল। পূর্ববঙ্গের সহিত তখন পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীর যোগাযোগ ছিল না বলিলেই চলে। পুণ্ড্র-বরেন্দ্রী এবং রাঢ়-তাম্রলিপ্তই পলল মৃত্তিকায় গঠিত বঙ্গদেশের প্রাচীনতর নবভূমি।

রাঢ়-বরেন্দ্রীর যোগাযোগ

(৩) পূর্ববঙ্গের পুরাতন ও নবসৃষ্ট ভূমি : পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলই নবভূমি। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা ও মেঘনার পলল মৃত্তিকায় সৃষ্ট এই অঞ্চল। এইজন্যই এই অঞ্চলের বহুস্থান দ্বীপ নামে আখ্যায়িত। এই নবভূমির উত্তর-পূর্বে এবং দক্ষিণ-পূর্বে গারো, খাসিয়া জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের শৈলশ্রেণী। এই শৈলশ্রেণীর সানুদেশ কোথাও গৈরিক বালুকাময় এবং কোথাও বা কঠিন বালুকার শক্ত স্তরময়। কাছাড় জেলার উত্তরাংশ, পার্বত্য ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পুরাতন ভূমির অন্তর্ভুক্ত। ঢাকা-ময়মনসিংহের একটি বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া একটি পার্বত্য অরণ্যময় গৈরিক ভূমি রহিয়াছে। এই অঞ্চলেই মধুপুর এবং ভাওয়ালের গড়। এই অঞ্চলের উপরের স্তরের লালমৃত্তিকা এবং নিম্নস্তরের লাল বালুকা অজয়-বরাকর

---

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. by Raverty, p. 569.

উপত্যকার লাল বালুকা ও গৈরিক মৃত্তিকারই অনুরূপ। পূর্ব-বাঙ্গলার অবশিষ্ট অংশ নবগঠিত ভূমি এবং সর্বত্র খালবিল এবং সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি-সমাকীর্ণ।

পূর্ববঙ্গের নবসৃষ্ট ভূমি

কিন্তু পূর্ববঙ্গের এই নবভূমিরও দুইটি সুস্পষ্ট বিভাগ রহিয়াছে। ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের গঠন পুরাতন বা এই অঞ্চল পূর্বে গঠিত হইয়াছে। খুলনা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি ও সমতল চট্টগ্রামের নবভূমি পরে সৃষ্ট হইয়াছে। ঢাকা, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরায় প্রাপ্ত মূর্তি, লিপি ও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এই অঞ্চলের সমৃদ্ধি ও সভ্যতার নিদর্শন। এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়াই প্রাচীনবঙ্গের সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্বাঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই অঞ্চলের তুলনায় খুলনা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি ও সমতল চট্টগ্রামের নবভূমিতে প্রাচীন বঙ্গের সভ্যতার নিদর্শন অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(৪) মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গের নবসৃষ্ট ভূমি : মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গে পুরাতন ভূমির অস্তিত্ব কোথাও নাই। এই অঞ্চল সম্পূর্ণই নবসৃষ্ট ভূমি—পদ্মা-ভাগীরথী-মধুমতীর সৃষ্টি; নদীয়া জেলার কিয়দংশ, যশোহর, খুলনা এবং চব্বিশ পরগণা জেলা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন সমতট রাজ্যও এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সমতট জনপদ

সমতট জনপদ সমতল ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সম্বন্ধে একাধিক লিপি-প্রমাণ রহিয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে ডবাক-নেপাল-কর্তৃপুর-কামরূপের সহিত (৪র্থ শতাব্দী) এবং বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় পুণ্ড্র-তাম্রলিপ্ত-বর্ধমান বঙ্গের সঙ্গে সমতট জনপদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙ সমতটেও আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে (৭ম শতাব্দী) অনুমিত হয় যে, সমতট কামরূপের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল[১]। সপ্তম শতকের শেষভাগে ইৎসিঙ সমতটে **রাজভট্ট** নামে একজন নরপতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইৎসিঙের উল্লিখিত রাজভট্ট এবং আস্রফপুর তাম্রশাসনের (৭ম শতাব্দী) রাজরাজভট্ট অভিন্ন বলিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। রাজরাজভট্টের রাজধানী ছিল কর্মান্ত বা ত্রিপুরা জেলার বড়কামতায়। দামোদরদেবের অপ্রকাশিত মেহার-তাম্রশাসনের (১২৩৪ খ্রীঃ) ইঙ্গিত হইতে মনে হয়, ত্রিপুরা জেলাই ছিল সমতটের প্রধান কেন্দ্র[২]। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার একটি পাণ্ডুলিপি (১০১৫ খ্রীঃ) হইতে জানা যায় যে, একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই অঞ্চল পট্টিকেরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সমতটের রূপ

দ্বাদশ শতকে সমতটের পশ্চিম সীমা মধ্যবঙ্গ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমে প্রাচীন খাড়ি-মণ্ডল (চব্বিশ পরগণা জেলার খাড়ি পরগণা) স্পর্শ করিয়াছিল। সমতটের অর্থ—'তটের সহিত যাহা সমান স্তরে বর্তমান' অর্থাৎ সমুদ্রশায়ী নিম্নদেশ। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর হইতে মেঘনা-মোহনা পর্যন্ত নিম্ন সমভূমিই ছিল সমতট অঞ্চল। মুসলিম ইতিহাসে এবং মধ্যযুগের সাহিত্যে এই অঞ্চল 'ভাটি' অঞ্চল নামে অভিহিত। লামা তারানাথ এই অঞ্চলের আখ্যা দিয়াছেন 'বাটি'।

---

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. 1, p. 17.

২) Epigraphia Indica Vol. XXVI.

রাজ্যাঙ্ক ৪, ১১৫৬ শক

প্রাচীন বঙ্গ এই সমতট অঞ্চলের উত্তরাংশ মাত্র। পাল ও সেন যুগে বঙ্গ পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গুপ্তযুগে পুণ্ড্র ও বঙ্গ দুইটি পৃথক রাষ্ট্রবিভাগ ছিল। একাদশ শতকের শেষভাগে বঙ্গের দুইটি বিভাগ কল্পিত হইয়াছিল; একটি বঙ্গের উত্তরাঞ্চল—এই অঞ্চলের উত্তর সীমা ছিল পদ্মা এবং অন্যটি অনুত্তর বঙ্গ বা বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল। এই অঞ্চল ছিল সমুদ্রশায়ী—খাল-বিল-নদী-নালা সমাকীর্ণ। 'অনুত্তর বঙ্গ' সম্ভবতঃ কোন বিশিষ্ট নাম নহে—দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বর্ণনাত্মক নাম এবং এই অঞ্চলই সম্ভবতঃ সমতট অঞ্চল[১]।

বঙ্গ-বঙ্গাল পৃথক জনপদ

একাদশ শতক হইতে প্রাচীন বঙ্গের একটি বিভাগের একটি নূতন নাম পাওয়া যায়—**বঙ্গাল**। বিজ্জল কলচুর্যের অবলুর লিপি, রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপি এবং আরও কয়েকটি দক্ষিণী লিপিতে 'বঙ্গাল' নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। কয়েকটি লিপিতে বঙ্গ ও বঙ্গাল নামের একত্র উল্লেখও দেখা যায়। ইহাতে অনুমিত হয় যে, বঙ্গ ও বঙ্গাল পৃথক জনপদ ছিল। মুসলমান যুগেও এই জনপদ পৃথক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। শামস-ই-সিরাজ আফিফের তারিখ-ই-ফিরুজশাহী গ্রন্থে এই দুই জনপদকে পৃথক বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে[২]।

একাদশ শতকে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপি হইতে জানা যায় যে, চোলসৈন্য দণ্ডভুক্তি (প্রাচীন তাম্রলিপ্ত, বর্তমান দাঁতন) ও তক্কণ রাঢ় (দক্ষিণ রাঢ়) জয় করিলে বঙ্গাল-রাজ গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিতে বাধ্য হন। বঙ্গ নামের উল্লেখ এই লিপিতে নাই। সুতরাং অনুমিত হয় যে, দক্ষিণ রাঢ়ের পূর্বপার্শ্বেই ছিল বঙ্গাল দেশ এবং বঙ্গদেশ গঙ্গা-ভাগীরথী এই দুই জনপদের মধ্যবর্তী ছিল। গোবিন্দচন্দ্র যে বংশের সন্তান, সেই বংশ হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ ও ত্রিপুরার অধিপতি ছিল। বিক্রমপুর অঞ্চলে গোবিন্দ-চন্দ্রের দুইটি লিপিও উদ্ধার হইয়াছে; সুতরাং এই অঞ্চলও গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া অনুমিত। এই সকল লিপি-প্রমাণ হইতে অনুমিত হয় যে, একাদশ শতকে বঙ্গাল বলিতে প্রায় সমস্ত পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের তটশায়ী অঞ্চল নির্দেশ করিত। ইহার কতক অংশই ছিল সমতট। চন্দ্রদ্বীপ এবং হরিকেলও তখন ছিল বঙ্গাল দেশের অংশ। মানিকচন্দ্র রাজার গানের—"ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল, লম্বা লম্বা দাড়ি।"—পদ হইতে অনুমিত হয় যে, ভাটি শব্দটি বঙ্গাল বা বাঙ্গাল শব্দের সমার্থবোধক। বঙ্গাল বা বাঙ্গাল দেশের কেন্দ্র ছিল পূর্ববঙ্গ[৩]।

বঙ্গদেশের ভাটি অঞ্চল

বাঙলার জলবায়ু: বাঙলার অসংখ্য নদনদী এবং পাহাড়পর্বত বাঙলার ভূপ্রকৃতি নির্ধারণ করিয়াছে। এই ভূপ্রকৃতি প্রভাবান্বিত করিয়াছে বাঙলার জলবায়ুকে। হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে ভূপ্রকৃতি প্রসঙ্গে জলবায়ুর ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। বাঙলার জলবায়ু সাধারণতঃ নাতিশীতোষ্ণ; কিন্তু নদীয়া, বীরভূম, বর্ধমান এবং মেদিনীপুরের কিয়দংশে গ্রীষ্মের প্রতাপ প্রখরতর। অন্যত্র জলবায়ু

উষ্ণ ও আর্দ্র। বঙ্গদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য—পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য। এই বৃষ্টিপাতের কারণ ভারত মহাসাগর হইতে উত্থিত মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ। এই বায়ুপ্রবাহ হিমালয়, গারো, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে প্রতিহত হওয়ার ফলে উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে প্রচুর বারিপাত হয়। বসন্ত ঋতুতে বায়ুপ্রবাহ ভিন্ন এবং উহার প্রভাবও ভিন্ন। ফাল্গুন-চৈত্র মাসের এই বসন্তবায়ু 'মলয় পবন' নামে কবির অর্ঘ্য লাভ করিয়াছে। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ীর 'পবন-দূত' কাব্যে বসন্তবায়ুর রূপক আভাস রহিয়াছে। এই বায়ুপ্রবাহ উত্তর ও পূর্ববাহী এবং মলয় পর্বতকে স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত বলিয়াই ইহার নাম 'মলয় পবন'।

বঙ্গের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য

বারিবাহী মৌসুমী বায়ুর কোন বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক উল্লেখ ও বর্ণনা পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে বাঙ্গলা দেশে অবিরল বৃষ্টিপাতের ইঙ্গিত রহিয়াছে; তিরুমলয় লিপিতে বলা হইয়াছে, বঙ্গদেশে বারিপাতের বিরাম নাই। বর্ষায় অবিরল বৃষ্টিপাত পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। "প্রাচ্যভূমি বঙ্গ প্রচুর জল এবং বারিপাতের দেশ" এই বর্ণনা পাল-লিপির উক্তিতেও পাওয়া যায়—"দেশে প্রাচি প্রচুরপয়সি স্বচ্ছমপীয়ং তোয়ং।" বাঙ্গালী কবি জয়দেব বর্ষার ঘনগম্ভীর মেদুর আকাশকে "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" বলিয়া যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন, উহাও বাঙ্গলারই আকাশ।

বাঙ্গালীর চরিত্র ও বঙ্গের ইতিহাসের উপর জলবায়ুর প্রভাব : বঙ্গের ভৌগোলিক সংস্থান, ভূপ্রকৃতি এবং জলবায়ু দেশবাসীর চরিত্র ও ইতিহাসকে গভীর-ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে বঙ্গের বিভিন্ন জনপদ-বাসীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বঙ্গ সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা; সুতরাং বঙ্গদেশের কৃষক বা জনসাধারণকে জীবিকানির্বাহ বা খাদ্যোৎপাদনের জন্য কঠোর শ্রম করিতে হয় না। সুতরাং বাঙ্গালী পার্বত্য অঞ্চল ও মরু অঞ্চলের অধিবাসীদের মতন কষ্টসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহা ব্যতীত বঙ্গের জলবায়ুর উষ্ণ-আর্দ্রতা বহুক্ষেত্রে বাঙ্গালীর চরিত্রকে স্থান-বিশেষে ক্লান্তি ও অবসাদে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

কোমল বাঙ্গালী চরিত্র

পালযুগের মধ্যভাগ পর্যন্ত দেখা যায় যে, বঙ্গদেশ ব্যবসাবাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করিয়া বহির্বিশ্বের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিল—কূপমণ্ডুকতা কিংবা ভাগ্যনির্ভরতা বাঙ্গালীর চরিত্রকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। বহু দূর-দেশের সংস্পর্শ, বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং দুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চ বাঙ্গালীর জীবনে আনিয়া দিয়াছিল শক্তি, উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস। ক্রমে একাদশ শতাব্দী হইতে আরবজাতি কর্তৃক সমুদ্রপথ অধিকারের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্রোত রুদ্ধ হইয়া গেল। সমাজ তখন একান্তভাবে ভূমি ও কৃষিনির্ভর হইয়া উঠিল—বাঙ্গালীর জীবন স্বাভাবিক কারণেই কূপমণ্ডুক, রক্ষণশীল ও ভাগ্যনির্ভর হইয়া উঠিল। কারণ রৌদ্র, বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝার মধ্যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া কৃষক সোনার ফসল উৎপাদন করিল, হঠাৎ যখন সেই শস্য বন্যা, শিলাবৃষ্টি কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে

বহির্বাণিজ্যের অবনতি ও উহার পরিণাম

বিনষ্ট হইয়া যাইত, তখন প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অক্ষম কৃষককে পরাজয়ের বেদনা ও ক্ষোভ লইয়াই এই ক্ষতিকে স্বীকার করিতে হইত; এবং দৈবদুর্বিপাককে ভাগ্যের বিধান বলিয়াই সে গ্রহণ করিত। সুতরাং বাণিজ্য-বিচ্যুত, কৃষিনির্ভর বাঙ্গালীসমাজ আত্মশক্তিতে আস্থাহীন এবং ভাগ্যনির্ভর হইয়া উঠিয়াছিল।

কৃষিনির্ভর সমাজের পরিণতি

কৃষিনির্ভর সমাজের গতি শান্ত ও স্তিমিত; এই শান্ত জীবনের মাধুর্য আছে, কিন্তু বাহিরের প্রবল আঘাতকে সর্বদা সহ্য করিবার শক্তি এই সমাজের থাকে না। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে বাঙ্গালীর জীবনেও এই বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল। দুর্ধর্ষ মুসলিম আক্রমণকারিদল যখন প্রচণ্ড সামরিক শক্তিতে প্রবল গতিবেগে বঙ্গদেশ অধিকার করিল, তখনও শান্তগতি মৃদুচ্ছন্দ বাঙ্গালীসমাজ সেই গতি প্রতিরোধ করিতে পারে নাই; কিংবা যখন এই মুসলিম জাতি দেশের শাসনভার গ্রহণ করিল তখন বঙ্গের গ্রাম্যজীবনে এবং কৃষিনির্ভর সমাজে কোন প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয় নাই। ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালীর দৈবনির্ভরতা ঘুচিল না, কিংবা আত্মবিশ্বাসও ফিরিয়া আসিল না। অতএব বিদেশী বিজেতা মুসলিমশক্তির বিরুদ্ধেও বাঙ্গালীসমাজে তেমন প্রবল প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় নাই।

বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে বাঙ্গালীর অনভ্যস্ততা

ভৌগোলিক সংস্থানের দিক হইতে বঙ্গদেশ আর্যাবর্ত বা উত্তর ভারতের পূর্ব-প্রত্যন্ত প্রদেশ। বহুদিন পর্যন্ত এই প্রদেশ ছিল আর্যাবর্তের সীমার বাহিরে। ভারতবর্ষের ধনৈশ্বর্যে প্রলুব্ধ হইয়া যখন যুগে যুগে বৈদেশিক জাতি উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর ভারতকে বিধ্বস্ত করিয়াছে, তখন বঙ্গদেশ ছিল এই সকল আক্রমণ-কারিদিগের স্পর্শের বাহিরে। উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারতের অধিবাসিগণ যখন এই সকল বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ প্রয়াসে সাহসী ও রণনিপুণ হইয়া উঠিয়াছিল, বাঙ্গালী তখন শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করিতেছিল। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধের প্রয়োজন বাঙ্গালীর জীবনে বিশেষ আসে নাই; সুতরাং যখন মুহম্মদ ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন বিন বখ্‌তিয়ার খালজী ঝঞ্ঝার বেগে বঙ্গদেশের উপর আসিয়া পড়িলেন, তখন সেই প্রবল আক্রমণের স্রোতকে প্রতিরোধ করিবার মত সাহস, রণকৌশল ও আত্মবিশ্বাস বাঙ্গালী জাতির ছিল না; ফলে মুসলিম সেনাবাহিনী অতি অল্পায়াসেই বঙ্গবিজয়ে সমর্থ হইয়াছিল।

সংস্কৃতি সমন্বয় ও বাঙ্গালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত প্রদেশ; সুতরাং বহুদিন এই অঞ্চল আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির বহির্ভূত ছিল। আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবাহ বহুদিন পর্যন্ত বঙ্গভূমিকে স্পর্শ করিতে পারে নাই এবং যখন সেই প্রবাহ বঙ্গদেশে পৌছিল, তখন উহার বেগ গভীর ও ব্যাপক হয় নাই। সমাজের উচ্চস্তরেই আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি সীমাবদ্ধ ছিল। একমাত্র বৌদ্ধ ধর্ম এবং সংস্কৃতিই উচ্চবর্ণ ব্যতীত বঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মধ্যে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গঙ্গার পশ্চিমতীরে পশ্চিমবঙ্গে আংশিক প্রসারলাভ করিলেও গঙ্গার পূর্ব ও উত্তর তীরে সেই প্রবাহ গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ইহার অন্য কারণও আছে। আর্যগণ বিজেতার উন্নাসিকতা লইয়াই আর্যাবর্তের এই প্রত্যন্ত প্রদেশের অধিবাসিদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা

ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়াছে—ফলে, বাঙ্গলার আর্যেতর ধর্ম এবং সংস্কৃতি এই আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে স্বচ্ছন্দমনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। গাঙ্গেয় উপত্যকার তীরবর্তী ভারতবাসী যে ভাবে যতখানি রক্ষণশীলতা লইয়া আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করিয়াছিল, বঙ্গদেশবাসী তাহা করে নাই। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও উচ্চতর দুইটি শ্রেণীর বাহিরে এই ধর্ম-সংস্কৃতির বন্ধনও ছিল অতি শিথিল। উত্তর-গাঙ্গেয় অঞ্চল এবং বঙ্গদেশের মনোভাবের এই পার্থক্যের মূলেও রহিয়াছে বঙ্গের ভূপ্রকৃতি এবং ভৌগোলিক সংস্থান। আর্য-সংস্কৃতির কেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়াই উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির কঠোর রক্ষণশীলতা বাঙ্গালী চরিত্রকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই।

নদীমাতৃক বাঙ্গলার রূপ

বাঙ্গালীর রক্তে রক্ষণশীলতা যে বদ্ধমূল হয় নাই, তাহার আরও একটি কারণ রহিয়াছে—বঙ্গদেশ নদীমাতৃক। এই সকল নদীপ্রবাহের গতি নিয়তই পরিবর্তিত হইয়াছে এবং হইতেছে। সুতরাং পরিবর্তন ও বিবর্তনকে গ্রহণই বাঙ্গালী চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফলে বঙ্গদেশে আর্য, আর্যেতর, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, পৌরাণিক ও অপৌরাণিক ধর্ম এবং সংস্কৃতির এক বৃহৎ সমন্বয় ও সাঙ্গিকরণ সাধিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ সকল ধর্ম এবং সংস্কৃতিকেই আপন করিয়া লইয়াছিল। যুগ যুগ ধরিয়া পরিবর্তন-বিবর্তনে অভ্যস্ত হইয়াছিল; অতএব বাঙ্গালীসমাজ মধ্যযুগে বিপরীত সংস্কৃতিসম্পন্ন বিধর্মী মুসলিমকেও গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই।

(গ) যাতায়াত ও বাণিজ্যপথ

মানুষ যেমন একক বাঁচিতে পারে না, তেমনই কোন দেশ বা জাতি অন্যদেশ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে পারে না। প্রত্যেক জাতিই অন্য জাতির উপর নির্ভরশীল। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম, জনপদ ও রাষ্ট্র বর্তমান যুগে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষের প্রথম এবং প্রধান প্রচেষ্টা হইল আত্মরক্ষা ও জীবনধারণের প্রয়াস এবং সেই প্রয়াসের সঙ্গে সমভাবেই থাকে আত্মবিকাশের প্রচেষ্টা। এই জীবনধারণ ও আত্মবিকাশের প্রেরণায় মানুষ দুর্গম গিরি লঙ্ঘন করে—দুস্তর সমুদ্র অতিক্রম করে; অরণ্য-পর্বত লঙ্ঘন করিয়া, সাগর-নদী অতিক্রম করিয়া মানুষ যে সকল নূতন পথ নির্মাণ করে, সেগুলি এক দিনে বা এক যুগেই গঠিত হয় না, বা বিনষ্ট হয় না। সুতরাং কোন দেশ বা জাতির পরিচয় বা ইতিহাস জানিতে হইলে এই সকল পথের পরিচয়ও জানা প্রয়োজন।

বঙ্গের জলপথ

বাঙ্গলাদেশ নদীমাতৃক—পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে অর্থাৎ নিম্নশায়ী অঞ্চলগুলিতে স্থলপথ অপেক্ষা নৌকাযোগে যাতায়াতই প্রশস্ততর। এই অঞ্চলের নদনদী ও উহাদের শাখা-প্রশাখা বাহিয়া অসংখ্য জলপথ ছিল। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে যত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাদের প্রত্যেকটিতেই এবং সমসাময়িক ও প্রাচীন সাহিত্যে এই সকল জলস্রোত ও জলযানের প্রচুর উল্লেখ ও উপমা রহিয়াছে। নদনদী-প্রবাহ প্রাচীনকালে জলপথ নির্ণয় করিত এবং অদ্যাপি করে। নদীপ্রবাহের পরিবর্তনের

সঙ্গে সঙ্গে জলপথও পরিবর্তিত হয়—নদীপ্রবাহ যখন পুরাতন স্রোত পরিবর্তন করিয়া নব নব স্রোতে প্রবাহিত হয়, জলপথও তখন নব স্রোতধারা অনুসরণ করে।

বঙ্গের স্থলপথ

এই সকল জলপথ ব্যতীত প্রাচীন লিপিতে যে সকল গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি একটু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যায়—গ্রামের প্রান্তসীমায় রাজপথের উল্লেখ; অনেক সময় এই পথগুলিই একাধিক গ্রামসীমা অথবা ভূমি নির্দেশ করিত—তারই নিদর্শনস্বরূপ এই পথগুলির উল্লেখ। এইগুলিই গ্রাম হইতে গ্রামে, এবং নগরে ও বন্দরে বিস্তৃত ও সংযুক্ত ছিল। "জঙ্গল কাটিয়া, পাহাড় ভাঙ্গিয়া, মাটি ভরাট করিয়া" নূতন গ্রাম-নগর পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার যাতায়াত-পথও গড়িয়া উঠে। এই সকল সাধারণ যাতায়াত-পথ ব্যতীত দেশের প্রান্তাতিপ্রান্ত বিস্তৃত এবং দেশের সীমা অতিক্রম করিয়াও বহু স্থলপথ এবং জলপথ বিস্তৃত ছিল। সেই সকল পথেই চলিয়াছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য, তীর্থ-পরিক্রমা, ধর্ম-সংস্কৃতি প্রচার ও দিগ্বিজয়ীর সমরাভিযান।

বিদেশী পর্যটকের বিবরণীতে বঙ্গের পথ পরিচয়

প্রাচীন বঙ্গের অন্তর্বাণিজ্যের উপযোগী স্থলপথের বিবরণ অতি অল্পই পাওয়া যায়। প্রাচীন লিপি, সমসাময়িক সাহিত্য এবং বিদেশী পর্যটকদের বিবরণীতে কয়েকটিমাত্র প্রান্তাতিপ্রান্ত বিস্তৃত পথের ইঙ্গিত রহিয়াছে। বিদেশী পর্যটক ও ইতিহাসকারগণ বাণিজ্য সম্বন্ধেই কৌতূহলী ছিলেন—তাঁহাদের বিবরণীতে সেই সকল পথের ন্যূনাধিক বিবরণ পাওয়া যায়। কেবল ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ, ইৎসিঙ প্রভৃতি প্রাচীন পরিব্রাজকগণ বাঙ্গলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত, এক জনপদ হইতে অপর জনপদ, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পর্যটন করিয়াছেন। তাঁহাদের বিবরণীতে এই সকল পথের আংশিক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল পথ কেবল অন্তর্বঙ্গ পথ নহে—এই সকল পথই বঙ্গদেশের সহিত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সংযোগ রক্ষা করিত এবং মধ্যযুগেও এই পথগুলি বিদ্যমান ছিল; কথিত আছে যে, পাল সেনাবাহিনী বঙ্গের রাজধানী হইতে পশ্চিমে পঞ্জাব পর্যন্ত একটি পথ নির্মাণ করিয়াছিল; উহাই পরবর্তী কালে শের শাহ্ কর্তৃক সংস্কৃত হইয়াছিল এবং উহাই বর্তমান গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে পরিণত হইয়াছে।

পশ্চিমমুখী স্থলপথ

বঙ্গদেশ হইতে তিনটি প্রধান পথ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ছিল। একটি পথ উত্তরবঙ্গ হইতে মিথিলা বা উত্তরবিহার ভেদ করিয়া চম্পা ও পাটলীপুত্রের মধ্য দিয়া বুদ্ধগয়া স্পর্শ করিত; এই পথ বারাণসী-অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তথা হইতে ঐ পথ সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র ও গুজরাট বন্দর পর্যন্ত সংযোজিত ছিল। বিদ্যাপতির 'পুরুষপরীক্ষা' নামক গ্রন্থে গৌড় হইতে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত রাজপথের উল্লেখ আছে। হিউয়েন সাঙের বিবরণে এবং 'কথাসরিৎসাগরে'ও এই সকল পথের আভাস পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পথটির ইঙ্গিতও হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে উল্লেখ আছে। এই পথটি তাম্রলিপ্ত হইতে উত্তরাভিমুখী হইয়া কর্ণসুবর্ণের মধ্য দিয়া রাজমহল, চম্পা স্পর্শ করিয়া পাটলীপুত্র অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। ইৎসিঙের বিবরণ এবং দুধপানি পাহাড়ের (হাজারিবাগ) শিলালিপিতে একটি তৃতীয় পথের সন্ধান

পাওয়া যায়। এই পথ তাম্রলিপ্ত হইতে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখী হইয়া বুদ্ধগয়ার মধ্য দিয়া অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল[১]। এই পথগুলিই বঙ্গদেশের সহিত উত্তর ভারতের বাণিজ্যিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ রক্ষা করিত।

দক্ষিণমুখী স্থলপথ

হিউয়েন সাঙের বিবরণে আর একটি পথের সন্ধানও পাওয়া যায়। এই পথটি বঙ্গদেশের সহিত দক্ষিণ ভারতের সংযোগ রক্ষা করিত। এই পথেই হিউয়েন সাঙ কর্ণসুবর্ণে এবং তথা হইতে দক্ষিণমুখী হইয়া ওড্র, কঙ্গোদ, কলিঙ্গ, দক্ষিণ কোশল, অন্ধ্র, দ্রাবিড়, চোল, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন[২]। পাল এবং সেন নরপতিগণ এই পথেই দক্ষিণে অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য, চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল এবং পূর্বগঙ্গ-বংশীয় নৃপতিবর্গও এই পথেই বঙ্গদেশ আক্রমণে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই পথেই শ্রীচৈতন্য নীলাচল এবং দক্ষিণ ভারতে গমন করেন।

উত্তর-পূর্বাভিমুখী স্থলপথ

বাঙ্গলার পূর্বদিকে কামরূপ রাজ্য, উত্তরে চীন ও তিব্বত। উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের মধ্য দিয়া বঙ্গদেশ উত্তরশায়ী এই দুইটি দেশের সহিত সংযোগ রক্ষা করিত। এই পথের বিবরণ পাওয়া যায় হিউয়েন সাঙ ও কিয়াতানের ভ্রমণবৃত্তান্তে, চীন রাজদূত চাঙ কিয়ানের বিবরণীতে এবং সম্ভবতঃ ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনের আসাম-তিব্বত অভিযান-সংক্রান্ত শিলালিপিতে। তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থেও এই পথের ইঙ্গিত আছে। পুণ্ড্রবর্ধন হইতে কামরূপ এবং কামরূপ হইতে সমতট পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ রাজপথের উল্লেখ হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে পাওয়া যায়। এই দুই পথে কামরূপ এবং সুবর্ণকুড্যকের (উত্তর আসাম) সমৃদ্ধ ও সুচারু বস্ত্র, অগুরু, চন্দন, হস্তী প্রভৃতি বঙ্গদেশে আমদানি হইত এবং বঙ্গের সামুদ্রিক বন্দর ও অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি হইতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং বহির্ভারতে রপ্তানি হইত[৩]। কিন্তু কামরূপই এই পূর্বাভিমুখী পথের শেষ সীমা ছিল না। হিউয়েন সাঙের সাতশত বৎসর পূর্বে আনুমানিক ১২৬ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে চাঙ কিয়ান নামক একজন চীন-রাজদূতের বিবরণীতে দক্ষিণ চীন হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ব্রহ্ম ও মণিপুরের মধ্য দিয়া কামরূপ অতিক্রম করিয়া আফঘানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ একটি পথের সন্ধান পাওয়া যায়। চাঙ কিয়ান ব্যাকট্রিয়ার বিপণিতে দক্ষিণ চীনের য়ুনান সজচোয়ান প্রদেশে জাত সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র ও বংশখণ্ড দেখিতে পাইয়াছিলেন। অনুসন্ধানের ফলে তিনি জানিয়াছিলেন যে, এই সকল দ্রব্য চীন হইতে উত্তর ভারতের মধ্য দিয়া আফঘানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত এক পথে বণিকগণ পশুপৃষ্ঠে ও পশুবাহিত শকটে বহন করিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া যাইতেন[৪]। হিউয়েন সাঙ কামরূপবাসীদের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, এই পার্বত্যপথ অতিক্রম করিতে বণিকগণের দুই মাস অতিবাহিত হইত।

---

১) Elliot, *History of India*, Vol. II, p. 345

২) Beal, *Records*, Vol. II, p. 204, F. N.

৩) *Arthasastra*, Book II, Chapter II.

৪) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. I, p. 62.

নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে কিয়াতান (৭৮৫-৮০৫ খ্রীঃ) নামক একজন পরিব্রাজকের বিবরণীতে টঙ্কিন হইতে কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত এক পথের সন্ধান পাওয়া যায়। কামরূপে আসিয়া এই পথ চাঙ কিয়ান বর্ণিত পথের সহিত মিলিত হইত এবং তথা হইতে করতোয়া নদী অতিক্রম করিয়া পুণ্ড্রবর্ধনের মধ্য দিয়া গঙ্গার অপর তীরবর্তী কজঙ্গল এবং তথা হইতে মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল[১]। কজঙ্গল হইতে পুণ্ড্রবর্ধন অতিক্রম করিয়া যে পথ কামরূপে গিয়াছে, সেই পথের সন্ধানও হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে পাওয়া যায়। এই পথেই হিউয়েন সাঙ পুণ্ড্রবর্ধন হইতে কামরূপ অতিক্রম করিয়া সমতটে আগমন করিয়াছিলেন।

বঙ্গ-তিব্বত সংযোগ-পথ

তিব্বত হইতে কামরূপের মধ্য দিয়া বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত পথের সন্ধান তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে ও গৌহাটির নিকটবর্তী এবং ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী কানাই-বরশীবোয়া নামক স্থানের পাষাণ-ফলকে ক্ষোদিত একটি লিপি হইতে জানা যায়। তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ নদীয়া বিজয়ের পরে লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ে শাসনকেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দশ সহস্র সৈন্যসহ কামরূপের পথে তিব্বত বিজয়ে অগ্রসর হন। প্রথমে তিনি সৈন্যদলসহ দেবকোট হইতে যাত্রা করিয়া করতোয়া নদীতীরস্থ বর্ধনকোটে উপস্থিত হন। তাঁহারা দশদিন নদীর গতিপথ অনুসরণ করিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং 'খিলান'যুক্ত একটি পাষাণ সেতুর উপর দিয়া নদী অতিক্রম করিলেন। পার্বত্য দুর্গম পথে পঞ্চদশ দিবস অগ্রসর হইবার পর ষোড়শ দিবসের প্রভাতে প্রাকারবেষ্টিত এক দুর্গ-নগর মুসলিমদের দৃষ্টিগোচর হইল। এই নগরের পঞ্চবিংশতি ক্রোশ দূরে করবত্তন, করপত্তন বা করমবত্তন নামক স্থানটি অশ্ব-বিক্রয়ের কেন্দ্ররূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। এই নগরের বিপণিতে প্রতিদিন প্রভাতে প্রায় দেড় সহস্র টাঙ্গন অশ্ব বা টাট্টু ঘোড়া বিক্রয় হইত। লক্ষ্মণাবতীর সকল অশ্বই ঐ বিপণিতে ক্রীত এবং কামরূপের গিরিপথে এই অশ্বগুলি লক্ষণাবতীতে আনীত হইত। ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন অবশ্য তিব্বতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। মধ্যপথেই তাঁহাকে বিপর্যস্ত ও লাঞ্ছিত হইয়া বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল। মীনহাজউদ্দীন সিরাজ প্রণীত তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে ইহার বিবরণ রহিয়াছে। কিন্তু এই বিবরণ কতখানি বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলা সুকঠিন। অবশ্য কামরূপের পথে ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন একটি ব্যর্থ অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন—ইহা নিঃসন্দেহ।

তিব্বতের অশ্ববিপণি করমবত্তন

গৌহাটীর নিকটবর্তী ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ কানাই-বরশীবোয়া নামক স্থানের পাষাণগাত্রে ক্ষোদিত একটি লিপিও ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মুহম্মদের ব্যর্থ তিব্বত অভিযানের সাক্ষ্য দেয়। লিপিটির পাঠ নিম্নানুরূপ :—

> শাকে ১১২৭ (আনুমানিক ১২০৬ খ্রীঃ, ২৭শে মার্চ,)
> শাকে তুরগ যুগ্মেশে মধুমাসে ত্রয়োদশে।
> কামরূপং সমাগত্য তুরস্কা ক্ষয়মায়যুঃ[২] ॥

---

১) R. C. Mazumdar, *Champa*, Chap. XII.

২) কামরূপ শাসনাবলির ভূমিকা, বরুয়া, ১০ পৃঃ

এই লিপিটির নিকটেই পাষাণখিলানযুক্ত একটি সেতু আছে—এই সেতুই মীনহাজ-বর্ণিত সেতু কিনা তাহা অনিশ্চিত। এই সেতু অতিক্রম করিয়া ষোড়শ দিবসে ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন যে-স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন সে-স্থান হইতে করমবত্তন পঞ্চবিংশতি ক্রোশ দূর। সুতরাং করমবত্তন দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত হওয়া সম্ভবপর নহে। মীনহাজ-বর্ণিত সেতু, প্রাকারবেষ্টিত দুর্গ-নগর এবং করমবত্তনের অশ্ববিক্রয়-কেন্দ্র—সকলই কামরূপের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। সুতরাং কামরূপ হইতে তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত একটি গিরিপথ ছিল—ইহা অনুমান করা কঠিন নহে। এই পথই চাঙ কিয়ান বর্ণিত ভারত-আফঘানিস্থান পথের সহিত মিলিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই পথেই বৌদ্ধ পণ্ডিত, পরিব্রাজক ও তিব্বতী দূতগণ মগধ ও বঙ্গদেশ হইতে তিব্বতে যাতায়াত করিতেন। এখনও গৌহাটির পঁচিশ মাইল উত্তরে ব্রহ্মপুত্রের অপর তীরে একটি মেলা বসে এবং ঐ মেলায় তিব্বতীগণ আজও অশ্ব, মেষ, কম্বল, চামর ইত্যাদি বিক্রয় করিতে আসে।

ভারত-আফঘানিস্থান সংযোগপথ

তিব্বতের সহিত যোগাযোগের আরও একটি পার্বত্য পথ সম্ভবতঃ ছিল। এই পথ উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং অঞ্চল এবং সিকিম-ভুটানের চুম্বী উপত্যকার মধ্য দিয়া হিমালয়ের গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পথই আরও প্রসারিত হইয়া চীনকে স্পর্শ করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে যে-সকল চীনাংশুক বঙ্গদেশে আনীত হইত উহা ঐ দুই পথ অতিক্রম করিয়া আসিত বলিয়াই অনুমিত হয়[১]। এখনও কালিম্পং-এর বাজারে যে সব টাঙ্গন অশ্ব, কম্বল, কাঁচা হরিদ্রা ও কাঁচা সুবর্ণের অলংকার বিক্রীত হয়—সকলই তিব্বত হইতে আসে এবং ঐ দেশীয় লোকেরাই তাহা লইয়া আসে। বঙ্গ-বিজেতা ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনও অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশেই নবদ্বীপে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

বঙ্গ, তিব্বত ও চীনের সংযোগপথ

বঙ্গদেশের নদী বা সামুদ্রিক জলপথের কথা জানা যায় কয়েকটি জাতকের কাহিনী হইতে। শঙ্খ জাতক, সমুদ্রবণিক জাতক এবং মহাজন জাতক ইত্যাদি কাহিনীতে দেখা যায় যে, মধ্যদেশীয় বণিকগণ বারাণসী এবং চম্পা হইতে নৌযানে গঙ্গা-ভাগীরথী পথে তাম্রলিপ্তে আগমন করিতেন। তথা হইতে তাঁহারা বঙ্গদেশের উপকূল বাহিয়া সিংহলে কিংবা উত্তাল সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সুবর্ণভূমি বা নিম্নব্রহ্মে গমন করিতেন। সুবর্ণভূমির পথে বহুদিন তীরভূমি দৃষ্টিগোচর হইত না—চতুর্দিকে সীমাহীন জলরাশি।

বঙ্গ-সিংহল ও সুবর্ণ-ভূমির জলপথ

নদীপথে আন্তর্দেশিক বাণিজ্য অপেক্ষা প্রাচীন বাঙ্গলার সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং বাণিজ্যপথের সাক্ষ্যপ্রমাণ অনেক বেশী পাওয়া যায়। জাতকের গল্পে তাম্রলিপ্ত হইতে সিংহল-সুবর্ণভূমিতে যাতায়াতের কথা আছে। সিংহলী ইতিগ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশে রাঢ়দেশীয় রাজপুত্র বিজয় সিংহের সমুদ্রপথে সিংহলে গমন ও দ্বীপটি অধিকারের কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু এই রাঢ়দেশ প্রাচীন বাঙ্গলার রাঢ় জনপদ

বঙ্গ-সিংহল-মালয়-সুবর্ণদ্বীপ জলপথ

---

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. 1, p. 5, F. N. 4.

কিংবা প্রাচীন গুজরাট বা লাটদেশ বা লাতদেশ—এই সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মতভেদ আছে। পেরিপ্লাস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বঙ্গদেশের সহিত দক্ষিণ ভারত ও সিংহলের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল। সমুদ্রসৈকতস্থিত গঙ্গাবন্দর হইতে বণিকগণ 'কোলণ্ডিয়া' নামক এক প্রকার জলযানে দক্ষিণ ভারত ও সিংহলের বন্দরে যাতায়াত করিত[১]। প্লিনির বিবরণ হইতেও এই জলপথের সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায়—পূর্বে প্রাচ্যদেশ হইতে সিংহলের দূরত্ব ছিল বিশ দিনের পথ; প্লিনির সময় দূরত্ব ছিল সাত দিনের পথ। ফা-হিয়ানের তাম্রলিপ্ত হইতে সিংহল গমন করিতে চৌদ্দ দিন ও চৌদ্দ রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছিল[২]। সুপ্রাচীন কাল হইতেই সিংহল ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক হইতে ভারতবর্ষের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল; বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পর হইতে সিংহল বৌদ্ধধর্মের এক বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ফা-হিয়ানের পরে বহু চৈনিক বৌদ্ধ-পরিব্রাজক সমুদ্রপথেই সিংহল-ব্রহ্মে যাতায়াত করিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে সামুদ্রিক বাণিজ্যে বাঙ্গলার প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হইলে এই পথের স্মৃতিও মানুষ প্রায় বিস্মৃত হইল। মধ্যযুগীয় সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে, ঐ যুগে সেই সমুদ্রপথ পুনরায় উন্মুক্ত হইয়াছিল। সিংহল হইতে মালয়, সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ, চম্পা এবং কাম্বোজের সহিতও জলপথে যোগাযোগ ছিল—এই সম্বন্ধে প্রচুর লিখিত প্রমাণ রহিয়াছে।

বিদেশীয় বিবরণে বঙ্গের জলপথ

তাম্রলিপ্ত হইতে চট্টগ্রাম-আরাকানের সমুদ্র উপকূল-স্পর্শী সুবর্ণভূমি (নিম্নব্রহ্ম) পর্যন্ত বিস্তৃত জলপথের বিবরণ মহাজনক জাতক হইতে জানা যায়। মধ্যযুগে এই পথেই আরাকানের সহিত চট্টগ্রামের ঘনিষ্ঠতা রক্ষিত হইয়াছিল। মধ্যযুগীয় বাঙ্গলা সাহিত্যেও বঙ্গের সহিত নিম্নব্রহ্মের যোগাযোগের ইঙ্গিত রহিয়াছে। মধ্যযুগে চৈনিক বণিক ও পরিব্রাজক এবং আরব ও পর্তুগীজ বণিকগণ এই পথেই সপ্তগ্রাম ও চেহ্‌টিগান বা চট্টগ্রাম হইতে আরাকান ও নিম্নব্রহ্মে যাতায়াত করিয়াছেন। ইৎসিঙ সপ্তম শতকেই বলিয়াছেন যে, হিউয়েন তা নামক একজন চৈনিক পরিব্রাজক মালয় উপদ্বীপের সমুদ্রতীরবর্তী 'কেডা' বন্দর হইতে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া তাম্রলিপ্তে আগমন করেন। চতুর্থ-পঞ্চম শতকের লিপিতে এই সুদীর্ঘ সরল পথটির বিবরণ পাওয়া যায়। মালয় উপদ্বীপে আবিষ্কৃত মহানাবিক বুধগুপ্তের একখানি লিপিতে দেখা যায় যে, বুধগুপ্ত রক্তমৃত্তিকা হইতে বাণিজ্য-ব্যপদেশে সমুদ্রপথে মালয়ে গমন করেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বঙ্গে একাধিক 'রক্তমৃত্তিকা' বা রাঙ্গামাটি ছিল এবং আছে। এই রক্তমৃত্তিকা কর্ণসুবর্ণের নিকটবর্তী রাঙ্গামাটি কিংবা চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গামাটিও হইতে পারে। কিন্তু এই রাঙ্গামাট চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গামাটি হওয়াই স্বাভাবিক।

বঙ্গ-ব্রহ্ম জলপথ

নবম শতকের মধ্যভাগে দেবপালের নালন্দা-লিপিতে বঙ্গোপসাগর বাহিয়া এক সমুদ্রপথের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু তাম্রলিপ্ত বন্দর তখন অবলুপ্ত; সুতরাং এই পথ কোথা হইতে কতদূর বিস্তৃত ছিল, বলা সুকঠিন। কাহারও অনুমান, উড়িষ্যার কোন

অন্যান্য জলপথ

---

১) *Periplus*, Vol. I. p. 212.

২) Mc. Crindle *Ancient India*, p. 103.

বন্দর হইতে বঙ্গের উপকূলের পার্শ্ব কিংবা বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া এই পথ বিস্তৃত ছিল। ভূগোল-বিদ্যাবিশারদ ও জ্যোতির্বিদ্ টলেমির বিবরণে আর একটি পথের সন্ধান পাওয়া যায়। তাম্রলিপ্ত হইতে যাত্রা করিয়া জলযানগুলি উড়িষ্যার পলৌরা বন্দরে আগমন করিত এবং তথা হইতে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ ও উপদ্বীপগুলিতে গমনাগমন করিত।

বঙ্গের বাণিজ্য-সমৃদ্ধিঃ অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য—বিভিন্ন স্থলপথও জলপথ বাহিয়া বঙ্গ তথা ভারতের বাণিজ্য ও পণ্যসম্ভার বিনিময় এবং সেই সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হইত। বংশীদাসের মনসামঙ্গল এবং মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙ্গালীর অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা অতিরঞ্জিত হইলেও বাঙ্গালীর সমৃদ্ধ বাণিজ্যের স্মৃতি বহন করে—এই তথ্য অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই। বঙ্গদেশ-জাত তাম্বুল-গুবাক (পান-সুপারি), নারিকেল, ইক্ষু ও ইক্ষুজাত দ্রব্য, তেজপত্র ও অন্যান্য মসলাদ্রব্য, লবণ, হীরক ও মণি-মুক্তার বিনিময়ে বঙ্গদেশীয় বণিকগণ বিপুল ধনসম্পদ লাভ করিতেন। বস্ত্র-শিল্প এবং পিপ্পল সম্বন্ধে প্লিনির উক্তি হইতে বাঙ্গলার বণিকের ধনসমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। প্লিনির বিবরণ হইতে জানা যায় যে, সেই যুগে রোমান সাম্রাজ্যে এক পাউণ্ড বা আধ সের ভারতীয় পিপ্পলের মূল্য ছিল পঞ্চদশ স্বর্ণমুদ্রা। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকেই ভারতবর্ষ হইতে যত রেশম ও কার্পাসবস্ত্র পাশ্চাত্ত্য বণিকগণ লইয়া যাইতেন, উহার বার্ষিক মূল্য ছিল প্রায় এক লক্ষ (স্বর্ণ) মুদ্রা। বিদেশ হইতে আনীত এই বিপুল অর্থের একটি বৃহৎ অংশ ছিল বঙ্গদেশের প্রাপ্য।

বঙ্গদেশে জাত পণ্যসম্ভার

গঙ্গার মোহনাস্থিত গঙ্গাবন্দর, তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণের বাণিজ্যসমৃদ্ধির উল্লেখ হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে রহিয়াছে। হিউয়েন সাঙ বলেন, তাম্রলিপ্ত বন্দরে বহু মূল্যবান দ্রব্য ও মণিরত্নের প্রচুর সমাগম হইত এবং সেইজন্য তাম্রলিপ্তের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল ঐশ্বর্যশালী ও বিত্তবান। কথাসরিৎসাগরের কাহিনী হইতে অনুমিত হয় যে, তাম্রলিপ্ত ছিল বিত্তবান বণিকদের কেন্দ্র—তাহারা সিংহল, সুবর্ণদ্বীপ ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমৃদ্ধ সামুদ্রিক বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে পরিতুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে মণিরত্ন, মূল্যবান দ্রব্যাদি সমুদ্রসলিলে উৎসর্গ করিয়া বণিকগণ সমুদ্রদেবতাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেন। মধ্যযুগের সাহিত্যেও এই রীতির উল্লেখ দেখা যায়। বঙ্গের সমৃদ্ধি ছিল বাণিজ্যপ্রসূত। বাণিজ্যের ফলে এই সকল শ্রেষ্ঠী ও বণিকদের হস্তে প্রচুর অর্থাগম হইত; সেই অর্থ দ্বারা তাঁহারা সমাজে ও রাষ্ট্রে আধিপত্য ও প্রাধান্য লাভ করিতেন। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত ভূমি দান-বিক্রয়ের লিপিগুলিতে উল্লিখিত পঞ্চপ্রধানের মধ্যে দুইজন ছিলেন রাজকর্মচারী—বিষয়পতি স্বয়ং এবং প্রথম কায়স্থ; অবশিষ্ট তিনজন ছিলেন নগরশ্রেষ্ঠী (শ্রেষ্ঠিগোষ্ঠীর প্রধান), প্রথম সার্থবাহ (বণিকগোষ্ঠীর প্রধান) এবং প্রথম কুলীন (শিল্পিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি)। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রে বণিক ও ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সেই যুগ ছিল অর্থ-কৌলিন্যের যুগ।

বঙ্গের বাণিজ্যসমৃদ্ধি

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক হইতে এই বাণিজ্যসমৃদ্ধির সূচনা হইয়াছিল এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত এই বাণিজ্যপ্রবাহ অপ্রতিহত ছিল। কিন্তু অষ্টম শতাব্দী হইতে এই বাণিজ্যস্রোত প্রতিহত হইল; পশ্চিমের দ্বার ভারতীয় পণ্যসম্ভারের সম্মুখে রুদ্ধ হইয়া গেল। নবজাগ্রত আরবজাতি হজরৎ মুহম্মদের মৃত্যুতে হতোদ্যম হয় নাই; তাহারা নব উৎসাহে প্রবলবেগে পূর্ব ও পশ্চিমে অভিযান আরম্ভ করিল। জলপথে একদিকে স্পেন অন্যদিকে ভারতের পূর্ব জলসীমান্ত পর্যন্ত তাহাদের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব এবং বাণিজ্য-আধিপত্য স্থাপিত হইল। ভূমধ্যসাগর হইতে ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চল পর্যন্ত বাণিজ্য ছিল রোম ও মিশরীয় বণিকগণের করতলগত; সেই সমৃদ্ধ বাণিজ্যের অধিকারী হইল আরব বণিকগোষ্ঠী। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই এই পরিবর্তন সংঘটিত হইল। এই সময় হইতেই বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যে উত্তর-ভারতীয়দের বাণিজ্যপ্রভাব খর্ব হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমেই পশ্চিম ভারতের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি আরব বণিকগণের হস্তগত হয় এবং পরে পূর্ব ভারতের বন্দরগুলিও আরবগণ অধিকার করিয়াছিল। দক্ষিণে চোল-পল্লব রাজ্যগুলি ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক পর্যন্ত সমুদ্রবাণিজ্যে উহাদের প্রভাব অক্ষুন্ন রাখিলেও পরবর্তী কালে উহাদের প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়া গেল এবং মুঘল যুগে ভারতীয় সমুদ্রবাণিজ্যের অধিকাংশই আরব ও পারস্যদেশীয় বণিকগণের হস্তগত হইল।

আরব জাতির আগমনে ভারতীয় বাণিজ্যের অবনতি

ভারতের এই বাণিজ্য-বিপর্যয় বঙ্গদেশকেও আঘাত করিল। ফলে সমৃদ্ধ সামুদ্রিক বাণিজ্যে বাঙ্গলার প্রতিপত্তিও খর্ব হইয়া গেল। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ ও ইৎসিঙ তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যসমৃদ্ধির কথা শতমুখে বর্ণনা করিয়াছিলেন; অষ্টম শতকের পর হইতেই প্রখ্যাত সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র, অথবা সমৃদ্ধ জনপদ বা কর্মব্যস্ত বন্দর—কোন রূপেই তাম্রলিপ্তের উল্লেখ পাওয়া যায় না। পলল সঞ্চিত হইয়া সরস্বতী নদীর মুখ রুদ্ধ হইয়া গেল—নদীটি স্রোতধারা পরিবর্তন করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাম্রলিপ্তের ভাগ্যসূর্য অস্তমিত হইল। অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গদেশে আর কোন নূতন সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠে নাই। চতুর্দশ শতকে ভাগীরথীতীরে সপ্তগ্রাম এবং বঙ্গের পূর্ব উপকূলে চট্টগ্রাম বন্দরের পত্তন হইলেও সামুদ্রিক বাণিজ্যে বঙ্গের নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার হইল না। অবশ্য অন্তর্বাণিজ্যে বঙ্গের প্রভাব অল্পবিস্তর অক্ষুন্ন ছিল।

বাঙ্গলার বাণিজ্য-সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য-হ্রাস

বাণিজ্য-ব্যপদেশে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতেই আরবগণ ভারতের উপকূলে আগমন করিয়াছিল, সামান্য পথঘাটও নির্মাণ করিয়াছিল; সিন্ধুদেশের সৈন্যদলে বেতনভুক্ সৈন্যরূপে আরবগণ স্থানলাভ করিয়াছিল। ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনের অভিযানের পূর্বেই সামান্যসংখ্যক আরব বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতের পূর্ব উপকূলে বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল। অনেক সময় বাঙ্গলার অভ্যন্তরেও অশ্ব, বস্ত্র এবং শুষ্ক ফল বিক্রয়ের জন্য আরব ও তুর্কী বণিকগণ আগমন করিত; ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনের সঙ্গে তাহাদের যোগসূত্র অনুমান করা কল্পনাবিলাস নয়।

বঙ্গদেশে আরব

ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় ও সমাজে বহু পরিবর্তন দেখা দিল। বাণিজ্যের অবনতি ও ঐশ্বর্য-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের ব্যবসায়ী-সমাজ

২।

এবং বণিককুলের প্রভাবও ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল। অষ্টম শতক হইতেই বঙ্গীয় সমাজ কৃষি-নির্ভর হইয়া পড়িল এবং ভূমিই হইল বাঙ্গালী জাতির মুখ্য সম্পদ; ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাঙ্গালী সমাজ ছিল প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ কৃষি ও শিল্পনির্ভর। এই যুগে সামন্ত প্রথাও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং এই যুগের সমাজ-ব্যবস্থার এক প্রান্তে দেখা যায়, সুবিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী মুষ্টিমেয় মহামাণ্ডলিক ও মহাসামন্ত; অন্য প্রান্তে ভূমিহীন অসংখ্য প্রজা; মধ্যভাগে ভূসম্পত্তির স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণী; সেইসঙ্গে সুগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত কৃষককুল। এক দিকে শিল্পকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতেছে—লুপ্তগৌরব বণিক, ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন শিল্পিগোষ্ঠীও রহিয়াছে; অন্য দিকে বঙ্গদেশ স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি রাজকর্মচারিশ্রেণীরও সৃষ্টি হইয়াছে। এই শ্রেণীর মধ্যেও বিভিন্ন স্তর দৃষ্ট হয়, যথা—রাজোপজীবী উপরিক, মহাসেনাপতি, মহাধর্মাধ্যক্ষ প্রভৃতি উর্ধ্বতন গোষ্ঠী এবং সাধারণ রাজকর্মচারী। রাজোপজীবী গোষ্ঠীর সহিত রাজানুগ্রহপুষ্ট একটি শ্রেণীরও উল্লেখ আছে। এই শ্রেণীতে ছিল 'ভূমি-সম্পদ নির্ভরস্তর' এবং বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানজীবী ও ধর্মজীবী। ধর্মোপজীবী শ্রেণীর এক প্রান্তে ছিল সহজ সরল বিনয়নম্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও অন্য প্রান্তে প্রভূত অর্থসমৃদ্ধ বিত্তশালী রাজপণ্ডিত বা পুরোহিত; পৌরোহিত্য ও অধ্যাপনার অন্তরালে তাঁহারা ছিলেন প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী। ভূমিবিহীন শ্রমিকগোষ্ঠীও সংখ্যায় নগণ্য ছিল না। ইহারা ছিল অধিকাংশ অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য। পালযুগের উদার সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে তাহারা অবজ্ঞাত হয় নাই; সেনযুগে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে এই অন্ত্যজ শ্রেণী হইল সমাজে অবজ্ঞাত, অবহেলিত ও নিপীড়িত। ব্রাহ্মণ-পৃষ্ঠপোষক সেনযুগে বৌদ্ধগণ বঙ্গীয় সমাজে প্রতিপত্তিহীন হইয়া গেল, তাহারাও হইল প্রায় অস্পৃশ্য। সুতরাং বঙ্গদেশের এই নিপীড়িত শ্রেণীগুলি সম্ভবতঃ মুসলিম বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল বা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বৌদ্ধ-বিদ্বেষ, সমাজে শ্রেণী-বৈষম্য ও নিম্নস্তরের হিন্দুদিগের ইসলাম গ্রহণ বঙ্গদেশে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের অন্যতম কারণ। ভূম্যধিকারী দোর্দণ্ডপ্রতাপ সামন্তশ্রেণী কিংবা প্রতাপশালী রাজোপজীবী শ্রেণীকে লুপ্তগৌরব ঐশ্বর্যশালী বণিক, শ্রেষ্ঠী ও শিল্পিগোষ্ঠী স্বচ্ছন্দমনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। সুতরাং এই বিক্ষুব্ধ বৌদ্ধজনতা, লুপ্তগৌরব বণিকগোষ্ঠী এবং অবহেলিত অন্ত্যজ শ্রেণী যে বিদেশী মুসলিম আক্রমণকারিগণকে প্রত্যক্ষ না হইলেও পরোক্ষ সমর্থন ও সহায়তা করিবে, অন্ততঃ সক্রিয় প্রতিরোধ করিবে না, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

মুসলিম আগমনের পূর্বে বঙ্গদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিবর্তন

মুসলিম সংখ্যাধিক্যের কারণ

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলিম বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাসের ধারা

সূচনা : সাধারণ দৃষ্টিতে অতীত ঘটনার শৃঙ্খলিত বিবরণই ইতিহাস। অন্য দিকে ইতিহাস মানবের বৃহত্তর সমাজ-জীবনের ক্রম-বিবর্তনের কাহিনী। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মধ্যেই মানব-সমাজ পরিপূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু এই অতীত ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে বহুদিন পর্যন্ত ইতিহাসকারের লক্ষ্য ছিল রাজবৃত্ত বর্ণনা অর্থাৎ রাজা, রাজবংশ, যুদ্ধবিগ্রহ ও রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের কাহিনী বর্ণনা। সাধারণ মানুষ ও তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ ছিল ঐতিহাসিকের দৃষ্টির বাহিরে—অবহেলিত ও অবজ্ঞাত। বঙ্গদেশের ইতিহাসও প্রধানতঃ এই রাজবৃত্ত বর্ণনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যক্তিগতভাবেই বাঙ্গলার রাজা এবং রাজবংশের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে ; বৃহত্তর সমাজের দিক হইতে নহে। রাজা বা রাজবংশের অভ্যুদয় বা বিলয় ঘটে অন্তর্নিহিত সামাজিক কারণে—অর্থাৎ সামাজিক পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা রাজবৃত্তকে প্রভাবান্বিত এবং পরিচালিত করে। ব্যক্তি যেমন তাহার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি, রাজবৃত্তও তেমনি সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি ; সুতরাং পরবর্তী মুসলিম বিজয়ের পটভূমিকা-রূপেই প্রাচীন বঙ্গের রাজবৃত্ত ও সমাজ-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

প্রাচীন ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গী

অতীত কাহিনীর যথাযথ বিবরণই ইতিহাসের মূল কথা নহে—'ভূতার্থ কথন' বা অতীন ঘটনার যথার্থ বর্ণন অর্থাৎ কার্যকারণ সম্বন্ধের বিশ্লেষণই যথার্থ ইতিহাস। মানুষের ইতিহাস কার্যকারণ সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত। কোন কার্যই বিনা কারণে সংঘটিত হয় না এবং কোন কার্যই অর্থহীন বা নিষ্ফল নহে। এই ভূতার্থ কথনই অতীত ঘটনার প্রাণহীন কঙ্কালকে জীবনের গৌরব ও সুষমা দান করে। বর্তমান ত অতীতেরই সৃষ্টি বা ফলমাত্র। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যথার্থ ই বলিয়াছেন :—

"হে অতীত ! তুমি ভুবনে ভুবনে,
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে।"

ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন কর্তৃক নবদ্বীপ বিজয় এবং একশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা আকস্মিক ঘটনা নহে, ভাগ্যের পরিহাসও নহে ; রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধঃপতনের অনিবার্য পরিণাম মাত্র।

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ক্ষীয়মাণ বঙ্গ-সমাজ

সমাজদেহে যতদিন জীবনীশক্তি থাকে ততদিন বাহির কিংবা ভিতর হইতে যত আঘাতই আসুক না কেন, সমাজ আপন শক্তিতেই সেই আঘাত প্রতিরোধ করে ও প্রত্যাঘাত করে ; জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে পরাভব স্বীকার করিলেও অন্য ক্ষেত্রে নূতনতর শক্তি সঞ্চয় ও সংহত করিয়া জাতি অধিকতর শক্তিশালী

হইয়া উঠে। ইহাই বিবর্তনের সাধারণ নিয়ম। দান ও গ্রহণ, সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণের মধ্য দিয়াই সমাজ শক্তিশালী হয়। ভারতবর্ষেও এই সাধারণ বিবর্তন নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ভারতবর্ষ বারংবার তাহার রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাকে নূতনতর সমাজ-শক্তিতে রূপান্তরিত করিয়াছে, বিরুদ্ধ প্রবাহকে এবং বিরোধী শক্তিকে সংহত করিয়া নব রূপে রূপায়িত করিয়াছে—নিজেকে সমৃদ্ধ ও শক্তিমান করিয়াছে। সমাজদেহে জড়ের জঞ্জাল স্তূপীকৃত হইতে দেয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"বিস্তারই জীবন, সংকীর্ণতাই মৃত্যু।" এই বাণীকেই ভারতীয়গণ যেন জীবনাদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। সেই জন্য শত ভাগ্যবিপর্যয় এবং আঘাত সত্ত্বেও ভারতবাসী শক্তিহীন হয় নাই। কিন্তু নানা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক-কারণে বর্ণ ও শ্রেণী-বৈষম্য এবং স্বার্থবুদ্ধির প্রেরণায় সমাজদেহ যখন অভ্যন্তর হইতে দুর্বল ও পঙ্গু হইয়া পড়ে, জীবনপ্রবাহ যখন আর স্বচ্ছ সাবলীল থাকে না, তখন ভিতর বা বাহিরের কোন কঠিন আঘাতই সহ্য করিবার মত শক্তি বা বীর্য সমাজের থাকে না—প্রত্যাঘাত তো দূরের কথা। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বঙ্গীয় সমাজ-জীবনেও এই শোচনীয় বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল। সেই বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করিবার মত ক্ষমতা তদানীন্তন বাঙ্গালী সমাজের ছিল না, কিংবা এই বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করিবার উপযুক্ত কোন শক্তিশালী নেতার আবির্ভাবও বাঙ্গলাদেশে তখন হয় নাই। কিন্তু মুসলিম বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বঙ্গীয় সমাজ-ব্যবস্থাকে বুঝিতে হইলে আদি পর্ব হইতে উহার বিবর্তনের ধারাকে জানিতে হইবে—রাজবৃত্ত ও সমাজ-ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্বন্ধের বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করিতে হইবে।

সমাজ ও রাষ্ট্র অচ্ছেদ্য

বঙ্গদেশের প্রাচীনতম ইতিহাস (আঃ খ্রীঃ পূঃ ১০০০—৩৫০ খ্রীঃ পূঃ)—প্রাচীন বঙ্গের প্রাচীনতম অধ্যায় অস্পষ্ট; পুরাণ-কাহিনীর অন্তরালে বাঙ্গলার সমাজ-ব্যবস্থার ইঙ্গিতমাত্র রহিয়াছে। ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভকালে কয়েকটিমাত্র কোমের (গোষ্ঠী) উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু যে সকল গ্রন্থে এই সকল কোমের উল্লেখ পাওয়া যায়, উহাদের একটিও প্রাচীন বঙ্গের কোন কোম বা জনপদের পক্ষ হইতে লিখিত হয় নাই। এই সকল গ্রন্থের রচয়িতা উত্তর গাঙ্গেয় প্রদেশের আর্য ঋষিবর্গ। তাঁহারা আর্যাবর্তের এই পূর্ব প্রত্যন্ত প্রদেশের প্রাক্-আর্য, অনার্য বা আর্যেতর কোমগুলিকে প্রীতি বা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই—প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার, বসন-ভূষণ, আহার-বিহার কোনটাই আর্য ঋষিগণের নিকট রুচিসম্মত ছিল না। সুতরাং তাঁহাদের লেখনীতে বঙ্গীয় কোম সম্বন্ধে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রাচীন বঙ্গসমাজ

ঋগ্বেদে প্রাচীন বঙ্গের কোন কোমের উল্লেখ নাই। ঐতরেয় আরণ্যকে পূর্ব ভারতের অনেকগুলি দস্যুকোমের উল্লেখ আছে। উহাদের মধ্যে পুণ্ড্রকোম অন্যতম। এই সকল দস্যুকোমই পূর্ব ভারতের অধিবাসী। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ ও বগধ (মগধ) দেশবাসীর ভাষাকে পক্ষিভাষার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এই উক্তির অর্থ—বঙ্গ ও মগধ জনপদের ভাষা আরণ্যক ঋষিদের নিকট পক্ষীর

ভাষার মতই দুর্বোধ্য ছিল। এই কোমের অধিবাসিগণকে আর্য ঋষিগণ 'অনাচারী' এবং 'আচার-বিবর্জিত' বলিয়াই বিবেচনা করিতেন[১]। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরের রাজাকে হত্যা করিয়া কুশী-তীরবর্তী পুণ্ড্ররাজকে পরাজিত করেন এবং তারপর বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, সুহ্ম, প্রসুহ্মরাজ ও অনেক ম্লেচ্ছকোমকে পরাজিত করেন[২]। ভাগবত পুরাণে সুহ্মদিগকে 'পাপ'কোম আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; হূণ, কিরাত, পুলিন্দ, আভীর, যবন প্রভৃতি পাপকোম বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে আরট্ট (পঞ্জাব), সৌবীর (সিন্ধু ও পঞ্জাবের দক্ষিণাংশ), কলিঙ্গ (উড়িষ্যা ও অন্ধ্র), বঙ্গ এবং পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদকে আর্য-সংস্কার ও সংস্কৃতির বহির্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল জনপদে সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকার অধিবাসিগণ প্রবাস জীবন যাপন করিলে অর্থাৎ সাময়িকভাবে বসবাস করিলেও সমাজে ব্রাত্য বা পতিত বলিয়া অভিহিত হইত এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত[৩]। আর্যশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থে গৌড়-পুণ্ড্র-বঙ্গ-সমতট ও হরিকেল জনপদের অধিবাসীদের ভাষাকে 'অসুর ভাষা' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিচিত্র উল্লেখ হইতে অনুমিত হয় যে, আর্য-সভ্যতার ধারক ও বাহক উত্তর ও মধ্য ভারতের অধিবাসিবৃন্দ পূর্ব ভারতের বঙ্গ-পুণ্ড্র-রাঢ়-সুহ্ম প্রভৃতি জনপদের সহিত পরিচিত ছিল না এবং সেই জন্যই তাহারা বিজেতৃ-জাতিসুলভ দর্প ও উন্নাসিকতায় বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন লোকদিগকে দস্যু, ম্লেচ্ছ, পাপ, অসুর প্রভৃতি আখ্যায় নিন্দিত করিয়াছে।

'আর্যসংস্কার বহির্ভূত বঙ্গদেশ'

কিন্তু উত্তর ও মধ্যভারতীয় আর্যগণ তাহাদের দর্পিত স্বাতন্ত্র্য লইয়া বহুদিন দূরে থাকিতে পারে নাই। উর্বর শস্যক্ষেত্র, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজনে নদীতীরবর্তী বাস্তুভূমির সন্ধানে এবং আদিমতম কোমগুলির উপর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় আর্যসংস্কৃতির বাহক ও ধারকগণ পূর্বদিকে অগ্রসর হইলেন। রামায়ণ ও মহাভারত এই আর্যীকরণেরই প্রচ্ছন্ন ইতিহাস।

আর্যজাতির বঙ্গাভিমুখে অগ্রগতি

---

১) "ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি ববাংসি বঙ্গবগধাশ্চের পাদাস্তন্যা অর্কমভীতো বিবিশ্র ইতি।" —ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্রের পুত্র পুণ্ড্রগণের উল্লেখ আছে এবং তাহারা দস্যুরূপে বর্ণিত। অন্তাম্ বঃ প্রজা ভক্ষীষ্টেতি ত এতেংন্ধা পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা, মুতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো ভবন্ত। বৈশ্বামিত্রা দস্যুনাং ভূয়িষ্ঠাঃ। —ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।১৮

২) ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্॥
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজো বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবং।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥ —মহাভারত, সভাপর্ব

৩) অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ —মনুসংহিতা

রামায়ণে বর্ণিত রামচন্দ্রের কাহিনী তো পূর্ব-দক্ষিণ ভারতে আর্যসভ্যতা বিস্তারেরই প্রচ্ছন্ন ইতিহাস। "মহাভারত সত্যই মহাভারতের কাহিনী"—সর্বভারতব্যাপী একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন ও আর্যসভ্যতা বিস্তারের কাহিনী। এই বিভিন্ন ভাষাভাষী ও সংস্কৃতিসম্পন্ন জনগণের পারস্পরিক পরিচয় বিরোধের মধ্য দিয়াই আরম্ভ হইয়াছিল। পৌণ্ড্রক বাসুদেব নামে একজন পুণ্ড্র-নরপতি বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাতদিগকে একরাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ করিয়া মগধরাজ জরাসন্ধের সহিত মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পৌণ্ড্রক বাসুদেব এবং জরাসন্ধের মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে কৃষ্ণ-বাসুদেবকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। অবশ্য কৃষ্ণ-বাসুদেব এই সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-বাসুদেবের জয় প্রকৃতপক্ষে আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতিরই জয়। একজন বঙ্গ-নরপতি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরব পক্ষে প্রভূত বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল কোমের অধিবাসিবৃন্দ বিনা যুদ্ধে, বিনা প্রতিরোধে আর্যভাষা ও সংস্কৃতির বাহকগণের নিকট পরাভব স্বীকার করে নাই।

বঙ্গদেশে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপ

প্রাথমিক পরাজয় ও যোগাযোগের পর পূর্বদেশীয় কোমগুলি ক্রমশঃ আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি এবং আর্য সমাজ-ব্যবস্থার একপ্রান্তে স্থান লাভ করিয়াছিল। তবে এই স্বীকৃতি একদিনে সম্ভব হয় নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিরোধ, সংঘাত, স্বীকৃতি ও স্বাঙ্গীকরণ চলিয়াছিল—কখনও শান্ত প্রবাহে, কখনও দ্রুতগতিতে। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বিজয়ের পরে আসিয়াছিল সাংস্কৃতিক বিজয়। কিন্তু আর্যজাতি কর্তৃক বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক বিজয় অদ্যাপি সম্পূর্ণ হয় নাই। কারণ, এই প্রাক্-আর্য কোমগুলি তাহাদের সংস্কার ও বিশ্বাস আজও সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নাই।

বঙ্গদেশ এবং বাঙ্গালীর আর্যীকরণ

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে দেখা যায় যে, আর্য জৈনধর্মপ্রচারক মহাবীর ও তাঁহার অনুগামী যতিবর্গকে রাঢ় দেশে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। রামায়ণ কাব্যে উল্লেখ আছে যে, বঙ্গ-নরপতিগণ অযোধ্যার রাজবংশের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন[১]। মনুসংহিতায় আর্যাবর্তের সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে—পশ্চিম সমুদ্র হইতে পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত অর্থাৎ বঙ্গদেশের কিয়দংশও আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার মনুই পুণ্ড্র কোমের অধিবাসিদিগকে ব্রাত্য বা পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং দ্রাবিড়, শক বা চীনাদের সঙ্গে তাহাদিগকে সমগোত্রীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভারতের সভাপর্বে বঙ্গ ও পুণ্ড্রদিগকে 'যথার্থ ক্ষত্রিয়' বলা হইয়াছে। জৈন প্রজ্ঞাপনা গ্রন্থেও রাঢ় এবং বঙ্গ কোমকে আর্য কোম বলা হইয়াছে। এই সকল পুরাণ-কাহিনী পরোক্ষে বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর আর্যীকরণের ইঙ্গিত করিতেছে।

প্রাচীন বঙ্গ ও সিংহলের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ

প্রাচীন সিংহলী পালিগ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশে বঙ্গ ও রাঢ়াধিপ সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ কর্তৃক তাম্রপর্ণী বা সিংহলবিজয়ের কাহিনী বর্ণিত আছে। সিংহলী বিবরণ অনুসারে বিজয়সিংহের সিংহলবিজয় এবং বুদ্ধের পরিনির্বাণ একই বৎসরে অর্থাৎ ৫৪৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে সংঘটিত হয়[২]। সমুদ্দ-বণিজ-জাতক,

১) *The Ramayana*, II, 10, 36-37
২) *Sacred Book of Ceylon*. Vol. I, p. 69 & Vol. II. p. 164.

শঙ্খ জাতক, মহাজনক জাতক ইত্যাদি কাহিনীতে তাম্রলিপ্ত-সিংহলের বাণিজ্যের কথা বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল কাহিনীতে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকের বঙ্গের বাণিজ্যিক চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে।

বঙ্গের বিচিত্র পণ্য সম্ভার

জাতকের কাহিনী, পালি গ্রন্থাবলীর ইঙ্গিত, মহাভারতে বঙ্গ ও পুণ্ড্র রাজগণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট হস্তী, মুক্তা, মহার্ঘ্য বস্ত্রাভরণ ও উপঢৌকন আনয়ন, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন বঙ্গদেশ-জাত বিচিত্র দ্রব্যসম্ভারের বর্ণনা, মিলিন্দ পঞহ গ্রন্থে বঙ্গের সমৃদ্ধ স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিবরণ এবং রোমান প্লিনি ও স্ট্র্যাবোর বিবরণীতে বঙ্গের বিচিত্র মূল্যবান পণ্যসম্ভারের বর্ণনা হইতে মনে হয় অতি প্রাচীনকালেই বঙ্গদেশ কতকগুলি কৃষি ও শিল্পজাতদ্রব্য এবং খনিজসম্পদে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বঙ্গের হস্তী উত্তর ভারতীয় নরপতিগণের নিকট পরম লোভনীয় ছিল। সম্ভবতঃ বঙ্গের এই বিপুল ধনৈশ্বর্য উত্তর ভারতের নৃপতিবর্গকে পূর্বভারতীয় এই জনপদগুলির প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং উহাদের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক প্রভুত্বকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে আর্য ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি বাঙ্গলায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

প্রাচীন বঙ্গের কৌমতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা

সুপ্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গদেশে কৌমতন্ত্র প্রচলিত ছিল এবং ক্রমে এক-একটি জনপদকে কেন্দ্র করিয়া বৃহত্তর কৌমসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিভিন্ন কৌম-সমাজের মধ্যে বিরোধ ও মৈত্রী উভয় সম্বন্ধই বিদ্যমান ছিল। এই কৌমতন্ত্রগুলিতে সুনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। কারণ, শাসনশৃঙ্খলা না থাকিলে বাণিজ্য-সমৃদ্ধি সম্ভবপর হইত না। মহাভারত ও সিংহলী বিবরণ হইতে অনুমিত হয় যে, সেই যুগ হইতেই কৌমতন্ত্র রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু রাজতন্ত্র প্রচলিত হইবার পরেও বহুদিন পর্যন্ত কৌমতন্ত্রের স্মৃতি ও ব্যবস্থা গ্রাম্য লোকালয়গুলিতে প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ মৌর্যযুগের অব্যবহিত পূর্বেই বঙ্গদেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত হইয়াছিল।

মুসলিম কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশের ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও অসংলগ্ন; খণ্ড খণ্ড ভাবে নানাপ্রকার লিখিত ও অলিখিত উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা চলিতেছে। মৌর্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলিম বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাসের ধারা ছয়টি পর্বে আলোচিত হইতে পারে। যথা—

(১) নন্দ ও মৌর্যযুগে বঙ্গদেশ (আঃ ৩৫০ খ্রীঃ পূঃ—৩২০ খ্রীষ্টাব্দ)
(২) বঙ্গদেশে গুপ্তাধিকার (আঃ ৩২০ খ্রীঃ—৫৫০ খ্রীঃ)
(৩) গৌড়-বঙ্গের স্বাতন্ত্র্য : শশাঙ্কের আবির্ভাব (৫৫০ খ্রীঃ—৬৫০ খ্রীঃ)
(৪) মাৎস্যন্যায়ের শত বৎসর (৬৫০ খ্রীঃ—৭৫০ খ্রীঃ)
(৫) পালযুগে বঙ্গদেশ : বাঙ্গলার নববিন্যাস (৭৫০ খ্রীঃ—১১৭৫ খ্রীঃ)
(৬) সেনযুগে বঙ্গদেশ : মুসলিম আগমন (১১৭৫—১২০০ খ্রীঃ)

নন্দ ও মৌর্যযুগে বঙ্গদেশ (আঃ ৩৫০ খ্রীঃ পূঃ—৩২০ খ্রীষ্টাব্দ)

আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ইহার পূর্ববর্তী ভারত ইতিহাসের অধ্যায়গুলি অত্যন্তই অস্পষ্ট এবং তমসাচ্ছন্ন। আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের পর হইতেই গ্রীক ও লাটিন ইতিহাসকারগণের বিবরণীতে ভারত তথা বঙ্গের রাজবৃত্তের কাহিনী অনেকখানি সুস্পষ্ট। গ্রীক ও লাটিন লেখকগণের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, বিপাশা নদীর পূর্ব পার্শ্বে দুইটি পরাক্রমশালী রাষ্ট্র ছিল—একটি প্রাচ্যরাষ্ট্র এবং অন্যটি গঙ্গারাষ্ট্র (Prasii and Gangaridai)। প্রাচ্যরাষ্ট্রের রাজধানী ছিল পালিবোথ্রা (Palibothra) বা পাটলীপুত্র এবং গঙ্গারাষ্ট্রের রাজধানী ছিল গঙ্গানগর (Gange)। পাটলীপুত্র ছিল গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে এবং গঙ্গানগর ছিল গঙ্গা বা ভাগীরথীর মোহনায়। প্রাচ্যরাষ্ট্র ছিল গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমে প্রায় সমগ্র গঙ্গা-অববাহিকা ব্যাপিয়া এবং গঙ্গারাষ্ট্র ছিল গঙ্গা বা ভাগীরথীর পূর্বতীরে। কার্টিয়াস এবং ডিওডোরাসের বিবরণ পাঠে অনুমিত হয় যে, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের তৃতীয় পাদে এই রাষ্ট্র একই নরপতির অধীন ছিল[১]। এই নরপতিই মহাপদ্ম নন্দ; গ্রীক ইতিহাসকার বর্ণিত Agramnes বা Xandrames. এই মহাপদ্ম 'সর্বক্ষত্রান্তক নৃপঃ' এবং 'একরাট্' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তিনি কাশী, মিথিলা, অযোধ্যা, কুরু, পাঞ্চাল, হৈহয় এবং কলিঙ্গরাষ্ট্রও পরাভূত করিয়াছিলেন। মহাপদ্মের মত পরাক্রমশালী নরপতির পক্ষে গঙ্গারাষ্ট্রবিজয় অসম্ভব কথা নহে।

গ্রীকগ্রন্থে বঙ্গদেশ

নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত সুবিস্তৃত নন্দ সাম্রাজ্য এবং ধনরত্নপূর্ণ নন্দ রাজকোষের অধিকারী হইয়াছিলেন। মহাপদ্মের গঙ্গারাষ্ট্রও সম্ভবতঃ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থের উক্তি, মহাস্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি এবং হিউয়েন সাঙের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, পুণ্ড্রবর্ধন অবশ্য মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল[২]। হিউয়েন সাঙ পুণ্ড্রবর্ধন ব্যতীত বাঙ্গলার অন্যান্য জনপদেও (কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত ও সমতট) মহারাজ অশোক নির্মিত স্তূপ ও বিহার দর্শন করিয়াছিলেন। মহাস্থানের ব্রাহ্মীলিপিতে দেখা যায় যে, রাজধানী পুন্দনগলে (পুণ্ড্রনগরে) একজন মহামাত্র নিযুক্ত ছিলেন। এই সকল বিবরণ হইতে অনুমিত হয় যে, প্রাচীন বঙ্গে মৌর্য শাসনব্যবস্থাও প্রবর্তিত হইয়াছিল। শুঙ্গবংশের রাজত্বকালেও বঙ্গ সম্ভবতঃ পাটলীপুত্র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে এই বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ কিছু নাই। কুষাণ যুগের কিছু স্বর্ণ ও ধাতবমুদ্রা বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে—এই সকল মুদ্রা সম্ভবতঃ বাণিজ্যব্যপদেশে আমদানী হইয়াছিল।[৩]

বঙ্গে মৌর্যাধিকার

এই যুগের বঙ্গের রাজা এবং রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও বিভিন্ন গ্রন্থ এবং বিবরণীতে বঙ্গের সুসমৃদ্ধ ও সুবিস্তৃত বাণিজ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাণিজ্যসূত্রে বঙ্গদেশ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বহির্ভারতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত

নন্দ ও মৌর্যাধিকারে বঙ্গের বাণিজ্য-সমৃদ্ধি

---

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. I, p. 42.
২) *ibid* Vol I, p. 44.
৩) *ibid* Vol. I, p. 45.

ছিল। পশ্চিমে মিশর ও রোম সাম্রাজ্য, দক্ষিণ-পূর্বে এশিয়ার বিভিন্ন দেশখণ্ড, দ্বীপাঞ্চল ও চীনের সহিত বঙ্গের যোগাযোগ ছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসঙ্গে এবং বাণিজ্যব্যপদেশে দক্ষিণ ভারত এবং সিংহলের সহিতও বঙ্গের যোগাযোগ ছিল। এই যুগে বঙ্গদেশ হইতে স্বুবর্ণ, মণিমুক্তা, বিচিত্র সুক্ষ্ম রেশম ও কার্পাস বস্ত্র, নানা-প্রকার মসলা ও গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে দেশবিদেশে রপ্তানি হইত। এই বিপুল ধনসমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট হইয়াই মহাপদ্ম নন্দ হইতে গুপ্তযুগ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজবংশ বঙ্গে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছে।

মধ্য ও উত্তর ভারত হইতে যে সকল রাজা ও রাজবংশ এবং বণিক ও ব্যবসায়ী যুদ্ধ, রাষ্ট্র-প্রয়োজন, ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই উত্তর-ভারতীয় আর্য ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। তাঁহারাই পথ ও ক্ষেত্র রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল পথ ও ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়াই আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচারকগণ আর্য আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেন। বঙ্গদেশে প্রথম আসিয়াছিল জৈনধর্ম ও সংস্কৃতি, তারপর বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি এবং সর্বশেষে গুপ্তযুগে আসিল পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি। নন্দ ও মৌর্য পর্বে আসিয়াছিল জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব এবং এই দুই ধর্মকে আশ্রয় করিয়া আর্য ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বঙ্গদেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

বঙ্গদেশে আর্যভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার

বঙ্গের প্রাচীন কোমগুলি এই আর্যপ্রভাব প্রতিরোধের চেষ্টা করিয়াও বিফল হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয় পরাজয়ের কারণ, এই কোমগুলি কৌম সামাজিক মন ও স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া, কৌমসীমা অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় পরিধির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে নাই। সুতরাং বহিরাগত বিজেতা রাষ্ট্রের উন্নততর রণকৌশল ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রের নিকট বঙ্গদেশবাসীকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয় পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিজেতৃবর্গের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় পরাজয়ের সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরাজয়ও অনিবার্য হইয়া উঠিল এবং বঙ্গদেশীয় প্রাচীন কোমগুলির রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিল।

কোমসমূহের রাষ্ট্রীয় পরাজয়

বঙ্গদেশে গুপ্তাধিকার (আঃ ৩২০-৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ)

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষ ভাগে কিংবা চতুর্থ শতকের প্রারম্ভেই বঙ্গদেশে কৌম-তন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—জনবসতিগুলি কৌম নামের পরিবর্তে জনপদ' নামে পরিচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে—জনপদগুলির মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনার সঞ্চার হইয়াছে—বাহিরের আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যাপারে তাহারা সংঘবদ্ধ হইতেছে। সমতট, পুষ্করণ প্রভৃতি নূতন রাজ্যের উল্লেখ দেখা যাইতেছে অর্থাৎ রাজতন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে ; অবশ্য বঙ্গ প্রভৃতি জনপদও সেই সময়ে বিদ্যমান ছিল।

রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত সমতট ব্যতীত সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া-ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রত্যন্ত রাজ্য

ছিল নেপাল, কর্তৃপুর, কামরূপ, ডবাক এবং সমতট। সমতট দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের কিয়দংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল। প্রত্যন্ত রাজ্য হইলেও সমতটের অধিপতি সমুদ্রগুপ্তের আদেশ মান্য করিয়া চলিতেন এবং গুপ্তসম্রাটকে কর প্রদান করিতেন। তৃতীয় শতকের শেষার্ধেই বরেন্দ্রভূমিতে গুপ্তাধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল; কারণ, চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীগুপ্ত নামে একজন নরপতি চীন-দেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য নালন্দার চল্লিশ যোজন পূর্বদিকে একটি ধর্মস্থান বা বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন; এই বিহারই বরেন্দ্রভূমির মৃগস্থাপনস্তূপ এবং শ্রীগুপ্ত সম্ভবতঃ মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের প্রপিতামহ মহারাজগুপ্ত। পরবর্তী কালে অবশ্য পুণ্ড্রবর্ধনই গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল এবং সম্রাট স্বয়ং পুণ্ড্রবর্ধনের উপরিক বা ঔপরিক মহারাজ নিযুক্ত করিতেন এবং মৌর্যযুগের মতন রাজকুমারদের মধ্যে কেহ কেহ এই উপরিক পদে নিযুক্ত হইতেন।[১] ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বঙ্গে গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রধানতম কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। ৫০৭/৫০৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই সমতটেও গুপ্ত-অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সময়ে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত নামে একজন নরপতি ত্রিপুরা জিলায় একজন ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ ভূমিদান করিয়াছিলেন।[২] এই বৈন্যগুপ্ত গুপ্তসম্রাটগণের সামন্তরূপে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং গুপ্ত-রাজন্যবর্গের দুর্বলতার সুযোগে দ্বাদশাদিত্য এবং মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তথাপি ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধন গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

গুপ্তাধিকারে বঙ্গদেশ

প্রাচীন বাঙ্গলার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিও গুপ্তযুগে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। গুপ্তযুগে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বত্র এমন কি, ভূমি ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারেও সাধারণ গৃহস্থ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার করিত। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্যই দেশের শ্রেষ্ঠী, শিল্পী ও বণিকগণ রাষ্ট্রাধিকারে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন। কারণ, তাঁহাদের উপার্জিত অর্থেই রাষ্ট্র পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইত। সাধারণ কৃষকশ্রেণীও দেশে বিদ্যমান ছিল—কিন্তু রাষ্ট্রাধিকারে তাহাদের বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীও সমাজে বিদ্যমান ছিল—মধ্যবিত্ত সমাজ ছিল প্রধানতঃ ভূমিলব্ধ আয়ের উপর নির্ভরশীল এবং অনেকস্থলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-নির্ভর। রাজপুরুষের সংখ্যা অধিক ছিল না। পণ্যনির্ভর ধনতন্ত্রই ছিল এই যুগের বৈশিষ্ট্য।

গুপ্তযুগের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ও উহার পরিণতি

এই যুগের সভ্যতা বা সমাজ-ব্যবস্থা ছিল নগরকেন্দ্রিক। কারণ, নগরগুলিই ছিল শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। নগর-জীবনের বিলাস-ব্যসন সাধারণ মানুষ, ধনী এবং রাজন্যবর্গের জীবনকেও আচ্ছন্ন করিয়াছিল। অবশ্য বঙ্গদেশ উত্তরভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া এখানে আর্য-পূর্ব গ্রাম্য সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব বহুদিন সক্রিয় ছিল।

গুপ্তযুগের সমাজ

---

১) *Epigraphica Indica*, Vol. XVII, p. 345.
২ Gunaigarh Copper Plate Inscription, *Indian Historical Quarterly*, I.VI, 1930, P. N. 40.

পূর্ববর্তী পর্বে বঙ্গদেশে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রসার হইয়াছিল এবং এই দুই ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি এই অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। গুপ্তাধিকারেও বঙ্গদেশে এই দুই ধর্ম রাজবংশের সমর্থন ও পোষকতা লাভ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও গুপ্ত নরপতিগণ এই দুই ধর্ম, বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নালন্দা মহাবিহারের পত্তন গুপ্তরাজগণের পোষকতাতেই হইয়াছিল বলিয়া হিউয়েন সাঙের অনুমান। সারনাথও গুপ্তরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। শ্রীগুপ্তের মৃগস্থাপনস্তূপ নির্মাণ তাঁহার বৌদ্ধধর্ম-প্রীতিরই নিদর্শন। জৈনধর্মও রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত ছিল না। কিন্তু গুপ্ত-নরপতিগণ মূলতঃ ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী। তাঁহাদের রাজত্বকালেই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান ও প্রসার হয়। মৎস্য, বায়ু, বিষ্ণু প্রভৃতি প্রধান পুরাণগুলি গুপ্তযুগেই রচিত হয় এবং পৌরাণিক দেবদেবীর পূজাও প্রচলিত হয়। গন্ধ-ধূপ-দীপ-পুষ্প-মধুপর্ক প্রভৃতি পূজোপকরণও এই সময় হইতেই প্রথম ব্যবহৃত হইতে থাকে। অগ্নিহোত্র, পঞ্চ-মহাযজ্ঞ প্রভৃতি বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য যাগ-যজ্ঞের প্রচলন হয় এবং ব্রাহ্মণদের জন্য নূতন নূতন বসতি স্থাপিত হয়। এই যুগেই দেখা যায় যে, সাধারণ গৃহস্থগণও ব্রাহ্মণবসতি করাইবার জন্য ভূমি ক্রয় করিতেছে। ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান-রীতিও এই যুগেই প্রথম প্রবর্তিত হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের প্রায় প্রতিটি লিপিতেই দেখা যায় যে, রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পোষকতা করিতেছেন—নব নব দেবায়তন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং ব্রাহ্মণগণ ভূমিদান গ্রহণ করিতেছেন। এই পোষকতার ফলেই গুপ্তাধিকারে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যসমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যতম ধারক ও পোষক শ্রেণীরূপে গড়িয়া উঠিতেছেন এবং তাঁহারাই দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। আর্য ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির স্রোত প্রবল বেগে বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ-কাহিনী প্রভৃতি এই স্রোত-প্রবাহেই বঙ্গদেশে প্রবেশ করিল এবং প্রাচীন ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, লোক-কাহিনী প্রভৃতিকে সবেগে সমাজের এক পার্শ্বে অথবা নিম্নস্তরে নামাইয়া দিল। উচ্চতর শ্রেণীগুলির ভাষা হইল আর্য ভাষা, ধর্ম হইল জৈন, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম, সংস্কৃতিও আর্য আদর্শানুযায়ী রূপায়িত হইল। প্রত্যন্ত প্রদেশ বঙ্গ এই যুগে আর্যাবর্তের বৃহত্তর রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারার সহিত যুক্ত হইয়া গেল। বাণিজ্যিক আদান-প্রদান, ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব এবং গুপ্ত-নরপতিগণের পোষকতাই এই সংযোগ সম্ভবপর করিয়াছিল।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার

বঙ্গদেশে আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের ধারা

গৌড়বঙ্গের স্বাতন্ত্র্য : শশাঙ্কের আবির্ভাব (৫৫০ খ্রীঃ-৬৫০ খ্রীঃ)

পঞ্চম শতকের শেষার্ধে দুর্ধর্ষ হূণ জাতির আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িল। গুপ্তসাম্রাজ্যের এই দুর্বলতা ও বিশৃঙ্খলার সুযোগে উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান সামন্তগণ স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিলেন—নূতন রাজ্য ও রাজবংশের উদ্ভব হইল। মান্দাশোরে যশোধর্মণ প্রতাপশালী হইলেন। কনৌজ-কোশলে মৌখরী বংশ এবং

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন : উত্তর ভারতে সামন্ততন্ত্রের অভ্যুদয়

থানেশ্বরে পুষ্যভূতি বংশের অভ্যুদয় হইল। মগধ ও মালবে গুপ্ত-রাজবংশের দুর্বল বংশধরগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে তাঁহাদের পূর্ব গৌরবস্মৃতি বহন করিয়া চলিতে প্রয়াস পাইলেন। এই দুর্বলতা ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ বঙ্গদেশও গ্রহণ করিয়াছিল।

বৈন্যগুপ্তের স্বাতন্ত্র্য

ষষ্ঠ শতকের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় পাদে পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গ মহারাজ বৈন্যগুপ্তের অধীনে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছিল। বৈন্যগুপ্তের রাজ্যসীমা পশ্চিমে বর্ধমান হইতে পূর্বে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার কিছুকাল পরেই স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিল গৌড়। গৌড়বঙ্গের স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাসই ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ হইতে সপ্তম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশের ইতিহাস। এই যুগে একদিকে ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র, সমাচারদেবের রাজবংশ এবং অন্যদিকে মহারাজ শশাঙ্ককে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গের ইতিহাস রচিত হইয়াছে।

ফরিদপুর ও বর্ধমান অঞ্চলে আবিষ্কৃত কয়েকটি লিপি-প্রমাণ হইতে তিনজন মহারাজাধিরাজের সন্ধান পাওয়া যায়—ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব। তাঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ সুনিশ্চিত জানা যায় না। অবশ্য তাঁহাদের মিলিত রাজত্বকাল প্রায় ত্রিশ বৎসর (ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ)। তাঁহাদের রাজ্য বর্ধমান হইতে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল [১]। ৫৯৭-৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময়ে চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মা একবার বঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন। গৌড়ে শশাঙ্কের অভ্যুদয়েও বঙ্গের স্বাতন্ত্র্য স্বল্পকালের জন্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

আস্রফপুর লিপি এবং বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ও সেঙ-চির বিবরণীতে

সমতটের খড়্গবংশ

সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে সমতটে বৌদ্ধরাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বংশ খড়্গবংশ নামে খ্যাত[২]। ঢাকা ও ত্রিপুরা অঞ্চল খড়্গবংশীয় রাজগণের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খড়্গবংশীয় রাজন্যবর্গ প্রথমে সম্ভবতঃ বঙ্গে রাজত্ব করিতেন এবং পরে সমতটে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। 'খড়্গ' উপাধি হইতে অনুমিত হয় যে, খড়্গবংশীয় নৃপতিবর্গ কোন পার্বত্য কোমের প্রতিনিধি ছিলেন এবং সামন্ত নরপতি ছিলেন।

সপ্তম শতকের একটি লিপি এবং হিউয়েন সাঙের বিবরণ হইতে সমতটে রাতবংশ নামে আর একটি সামন্ত রাজবংশের সন্ধান পাওয়া যায়। খড়্গবংশ ও রাতবংশ সামন্ত বংশ হইলেও বস্তুতঃ তাঁহারা স্বাধীন নরপতির অনুরূপই আচরণ করিতেন। রাতবংশীয় নরপতিগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী। নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ

সমতটের রাতবংশ

হিউয়েন সাঙের গুরু শীলভদ্র এই রাতবংশেরই সন্তান ছিলেন। শীলভদ্রের ধর্মজীবন ও জ্ঞানানুশীলন আলোচনা করিলে মনে হয়, বঙ্গদেশে তখন ধর্ম ও জ্ঞানচর্চা অত্যন্ত উন্নতিলাভ করিয়াছিল, নচেৎ আকস্মিকভাবে শীলভদ্রের মতন ধর্মপ্রাণ ও জ্ঞানবান ব্যক্তির আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। সম্ভবতঃ এই খড়্গ ও রাতবংশীয় নরপতিগণ

---

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. I, pp. 52, 53.

২) *ibid* Vol. I, p. 87, F.N. 4 & 5.

মহারাজ শশাঙ্কের সামন্ত ছিলেন ; শশাঙ্কের মৃত্যুর পর এই দুই রাজবংশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল।

সপ্তম শতকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে বঙ্গ ও সমতটে যখন খড়্গ এবং রাতবংশীয় সামন্তদের আধিপত্য চলিতেছিল, পুণ্ড্রবর্ধন তখনও একজন গুপ্ত-নরপতির অধীন ছিল (৫ সংখ্যক দামোদর লিপি)। ষষ্ঠ শতকের শেষপাদেও মহাসেনগুপ্ত নামক একজন গুপ্ত-নরপতি লোহিত্যতীরে কামরূপরাজ সুস্থিতবর্মণকে পরাজিত করিয়াছিলেন[1]। এই সকল তথ্য হইতে অনুমিত হয় যে, পুণ্ড্রবর্ধন এবং গৌড় ষষ্ঠ শতকের শেষ পাদেও স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নাই। অন্যদিকে সপ্তম শতকের সূচনাতেই শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন স্বতন্ত্র নরপতিরূপে আবির্ভূত হইলেন—তাঁহারই নায়কত্বে বঙ্গদেশ উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে এক বিশিষ্ট শক্তিরূপে পরিণত হইল। ফলে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তন হইল।

মহারাজ শশাঙ্কের স্বাতন্ত্র্য

গৌড়ের স্বাতন্ত্র্য লাভ বা শশাঙ্কের অভ্যুদয় আকস্মিক ঘটনা নহে। হূণ আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন হইলেও গুপ্তবংশীয় নরপতিগণ মগধ ও মালবে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহারা মৌখরী ও পুষ্যভূতি বংশের অভ্যুদয় প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং গুপ্ত-মৌখরী বা গুপ্ত-পুষ্যভূতি বিরোধ ছিল স্বাভাবিক। ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা উহার অব্যবহিত পূর্বেই মৌখরীরাজ ঈশানবর্মার সহিত গৌড় জনপদবাসীদের এক সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সংগ্রামে সমগ্র গৌড় জনপদ বিধ্বস্ত হইয়াছিল বলিয়াই মৌখরীরাজ তাঁহার হড়াহালিপিতে দাবি করিয়াছেন[2]। এই ঘটনা বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, ষষ্ঠ শতক হইতেই গৌড় জনপদ স্বাতন্ত্র্য অভিলাষী হইয়া উঠিয়াছিল। ঈশানবর্মার গৌড়বিজয় গুপ্ত-মৌখরী সংঘর্ষের একটি ক্ষুদ্র অঙ্ক মাত্র[3]। গৌড় ও মগধের অধিকার লইয়া গুপ্ত-মৌখরী সংগ্রাম কয়েক পুরুষ ধরিয়াই চলিয়াছিল। গুপ্ত-নরপতি মহাসেনগুপ্তের পিতা পুষ্যভূতিরাজ প্রভাকরবর্ধনের সহিত স্বীয় কন্যা মহাসেনগুপ্তার বিবাহ প্রদান করিয়া পুষ্যভূতি বংশের সৌহার্দ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং শক্তিবৃদ্ধিও করিয়াছিলেন। এই গুপ্ত-পুষ্যভূতি মৈত্রীর ভয়েই মৌখরী প্রতাপ কিয়ৎকাল শান্ত ছিল। মৌখরীরাজ গ্রহবর্মার সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে এই বিরোধ পুনরায় নূতনরূপে দেখা দিল। মগধ তখন গুপ্ত-রাজবংশের হস্তচ্যুত হইয়াছে—মালবরাজ মহাসেনগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছে—তাঁহার দুই পুত্র কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত থানেশ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। মালবের সিংহাসনে তখন দেবগুপ্ত উপবিষ্ট—তিনি থানেশ্বরের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন। গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের সহিত দেবগুপ্তের বন্ধুত্ব ছিল সর্বজনবিদিত। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের বর্ণনা অনুসারে মনে হয়, শশাঙ্ক তখন বারাণসী পর্যন্ত ভূখণ্ডের অধিকারী। মৌখরীরাজ

গুপ্ত-পুষ্যভূতি মৈত্রী

মৌখরী-পুষ্যভূতি মৈত্রী

---

১) *History of Bengal*, **Dacca University, Vol. I, p. 57, F.N. 4.**
২) *Ibid* **Vol. I, p. 56, F.N. 2.**
৩) *Ibid* **Vol. II, p. 56.**

গ্রহবর্মাও তখন পুষ্যভূতিরাজ প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়া পুষ্যভূতি-মৌখরীবংশকে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন।

বৃদ্ধ প্রভাকরবর্ধনের অসুস্থতা ও মৃত্যুর সুযোগে মালবরাজ দেবগুপ্ত মৌখরীরাজ গ্রহবর্মাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া রাজমহিষী রাজ্যশ্রীকে বন্দিনী করিলেন। দেবগুপ্ত কনৌজ হইতে থানেশ্বর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শশাঙ্কও দেবগুপ্তের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু দেবগুপ্তের সহিত শশাঙ্কের মিলনের পূর্বেই থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে আক্রমণ করিলেন। এই সংগ্রামে দেবগুপ্ত পরাজিত ও নিহত হইলেন। অতঃপর রাজ্যবর্ধন ভগিনীর উদ্ধারার্থ কনৌজের পথে অগ্রসর হইলেন[১]। কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির পূর্বেই তিনি শশাঙ্কের হস্তে নিহত হইলেন। অবশ্য রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের অধিপতি হইলেন। রাজ্যবর্ধন কর্তৃক দেবগুপ্তের পরাজয় ও নিধনের পর শশাঙ্কই মৌখরী-পুষ্যভূতি মৈত্রীর বিরুদ্ধে-সংগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই অনুমিত হয় যে, শশাঙ্ক মগধ-মালবাধিপতি গুপ্ত-নরপতিগণের মহাসামন্তরূপেই জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৬০৬-৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন নরপতিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং কর্ণসুবর্ণে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন।

গুপ্ত-মৌখরী বিরোধ

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুতে পুষ্যভূতি-মৌখরীবংশের সহিত শশাঙ্কের বিরোধের অবসান হয় নাই। এইবার শশাঙ্কের বিরোধ আরম্ভ হইল হর্ষবর্ধনের সহিত। হর্ষবর্ধনের সহিত বিরোধের সঠিক বিবরণ জানা যায় না। শশাঙ্কের সহিত হর্ষবর্ধনের সম্মুখ সংগ্রাম হইয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধে হর্ষচরিত-রচয়িতা বাণভট্ট নীরব। মঞ্জুশ্রী-মূলকল্পের গ্রন্থকারের মতানুসারে এই সময়ে প্রাচ্য দেশের অধিপতি ছিলেন সোম (চন্দ্র বা শশাঙ্ক); তাঁহার রাজধানী ছিল পুণ্ড্র। হর্ষবর্ধন এই সোমরাজকে পরাজিত করিয়া স্বীয় রাজ্যসীমায় আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে শক্তিসঞ্চয়ের জন্য কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন[২]। কিন্তু তাঁহাদের সম্মিলিত শত্রুতা সত্ত্বেও শশাঙ্ক মৃত্যু পর্যন্ত সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং গৌড়-মগধ-বুদ্ধগয়া, উৎকল ও কঙ্গোদ পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বা অধিকার বিস্তৃত ছিল। কঙ্গোদের শৈলবংশীয় নরপতি মহারাজ মহাসামন্ত শ্রীমাধবরাজ একটি লিপিতে (৬১৯ খ্রীঃ) মহারাজ শশাঙ্ককে তাঁহার অধিরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সামন্ত মহারাজ সোমদত্ত এবং মহাপ্রতীহার শুভকীর্তির মেদিনীপুর লিপিতে শশাঙ্ক 'অধিরাজ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই দুইটি লিপির সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, দণ্ডভুক্তি শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত ছিল এবং কলিঙ্গ ছিল দণ্ডভুক্তির অন্তর্ভুক্ত। ৬৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ বঙ্গে আগমন করেন; কিন্তু উহার কিছুকাল পূর্বেই মহারাজ শশাঙ্কের মৃত্যু

হর্ষ-শশাঙ্ক সংঘর্ষ

অধিরাজ শশাঙ্ক

---

১) *Harshacharit*, Translation, pp. 174-76
২) *Ibid*, ,, pp. 221-23

হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধেও বহু কাহিনী প্রচলিত আছে[১]। মহারাজ শশাঙ্ক ছিলেন শিবভক্ত—ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী। সুতরাং বৌদ্ধ হিউয়েন সাঙ এবং মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার যদি তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

মহারাজ শশাঙ্ক কীর্তিমান নরপতি ছিলেন, সন্দেহ নাই। তিনি কনৌজ-থানেশ্বর-কামরূপ-মৈত্রীর বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রাম করিয়াছিলেন। বংশানুক্রমিক কনৌজ-গৌড়-মগধ-সংগ্রামকে তিনি স্বীয় শৌর্যবলে নূতন রূপদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গলাদেশকে তিনিই সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় গৌরব দান করেন।

শশাঙ্কের বঙ্গদেশ

কিন্তু মহারাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে গৌড়ের প্রাধান্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। হিউয়েন সাঙ যখন ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গে আগমন করেন, তখন এই দেশ পাঁচটি জনপদে বিভক্ত ছিল—কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত ও সমতট। সমতট ব্যতীত অন্য চারিটি জনপদই মহারাজ শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর প্রতিটি জনপদই স্বাধীন ও স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ হইয়া উঠিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরই পুণ্ড্রবর্ধন ও কর্ণসুবর্ণ ভাস্করবর্মার এবং কঙ্গোদ, কজঙ্গল ও মগধ মহারাজ হর্ষবর্ধনের প্রভুত্ব স্বীকার করে। এই সময়ে ভাস্করবর্মা কর্তৃক কর্ণসুবর্ণ বিজয়ের পূর্বে কিংবা পরে জয়নাগ নামক জনৈক নরপতি কর্ণসুবর্ণে স্বল্পকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মহারাজ শশাঙ্কের গৌড় রাজ্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায়। তারপর একশত বৎসর গৌড় এবং সমগ্র বঙ্গদেশে ব্যাপক অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিয়াছিল। এই একশত বৎসর বঙ্গের ইতিহাসে **মাৎস্যন্যায়ের যুগ**।

রাষ্ট্রীয় আদর্শ

এই যুগে মহারাজ শশাঙ্কের অধীন গৌড় রাষ্ট্রের আদর্শ ছিল গৌড়তন্ত্র গঠন। রাষ্ট্রের গঠন-বিন্যাস এবং পরিচালনা পদ্ধতিতে গুপ্তযুগের ধারাই অনুসৃত হইয়াছিল। ভুক্তি এবং বিষয়বিভাগের সহিত বীথি নামক একটি নূতন বিভাগেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। ভুক্তির অধিকর্তা উপরিকের শাসনক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইতেছিল—উপরিক কখনও 'মহারাজ' বলিয়াও আখ্যায়িত হইয়াছেন এবং কখনও বা 'মহাপ্রতীহার' আখ্যায়ও ভূষিত হইয়াছেন। মল্লসারুল পট্টোলিতে গোপচন্দ্রের সমকালীন বহু নূতন নূতন রাজপুরুষের দীর্ঘ তালিকা পাওয়া গিয়াছে। এই সকল কর্মচারী রাজ্যশাসনের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনা করিতেন। এই যুগেই বিস্তৃত রাজকর্মচারিতন্ত্রের সূচনা হয়। এই যুগে রাষ্ট্রে শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য ছিল বটে, কিন্তু সেই প্রাধান্যের অন্যান্য অংশভাক্‌ও ছিল। বিষয় ও বীথির শাসন-সংস্থার গঠন প্রণালী হইতে জানা যায় যে, এই যুগে শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়িগণের সহিত স্থানীয় প্রধান গৃহস্থ (মহত্তর) এবং বিভিন্ন রাজপুরুষগণও (বাহনায়ক—যানবাহনের কর্তা, অগ্রহারী—গ্রামের শাসনকর্তা) সমানভাবে অংশ গ্রহণ করিতেন।

১) *Manjusri-Mulakalpa*, p. 35.

সামন্ততন্ত্র

বঙ্গদেশে এই যুগেই সামন্ততন্ত্র পরিপূর্ণভাবে গঠিত হয়। মহারাজ শশাঙ্ক স্বয়ং সামন্তরূপেই জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই যুগের লিপিতে বহু সামন্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। খড়্গবংশীয় ও রাতবংশীয় নরপতিগণ সকলেই সামন্ত বা মহাসামন্ত ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে এই সকল সামন্ত নরপতি স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন এবং কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইলে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতেন। কখনও কখনও সামন্ত বা মহাসামন্তগণ উচ্চ কর্মচারীর কার্য অথবা ভুক্তিপতি বা বিষয়পতিরূপে কার্য করিতেন। সামন্তগণের প্রধান কর্তব্য ছিল যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে সৈন্যবাহিনী দ্বারা মহারাজাধিরাজকে সহায়তা করা এবং তাঁহারা স্বয়ং মহারাজাধিরাজের পক্ষে যুদ্ধেও যোগদান করিতেন। এই সামন্ততন্ত্র পালযুগে পূর্ণতর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। এই যুগে বঙ্গ, সমতট ও গৌড়ে রাজকর্মচারিতন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

ভূমিনির্ভর সমাজ

এই যুগে বঙ্গীয় সমাজ ভূমিনির্ভর হইতে আরম্ভ করিয়াছে—ব্যবসা-বাণিজ্যের স্রোত স্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস পাইয়াছে। সমাজ ক্রমশঃ কৃষি-নির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামকেন্দ্রিক হইয়া উঠিতেছে।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির রাজপোষকতা লাভ

এই যুগে বঙ্গ এবং সমতটের প্রায় সকল নরপতিই ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী। একমাত্র খড়্গবংশীয় নৃপতিগণই ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁহারা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন এবং এই পোষকতা ঢাকা ও ত্রিপুরা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে জৈন বা বৌদ্ধধর্ম বঙ্গের কোন অঞ্চলে কোনরূপ স্বীকৃতি বা পোষকতা লাভ করিয়াছে—এমন দৃষ্টান্ত নাই। অথচ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি নিরন্তর রাজকীয় পোষকতা লাভ করিয়াছে। শশাঙ্ক এবং ভাস্করবর্মা উভয়েই শৈব ছিলেন। এই যুগে বিষ্ণুও বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন রূপে পূজিত হইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলা এবং পুরাণ-কাহিনীও দেশের সর্বত্র প্রচলিত হইতেছে। গুপ্ত-সম্রাটগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হইলেও বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের প্রতিও তাঁহারা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রথম প্রবর্তনহেতু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যাও এদেশে কম ছিল না এবং বৌদ্ধ আচার-ব্যবহারও অপ্রচলিত ছিল না।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধ

বৌদ্ধ ধর্ম, সংস্কৃতি এবং আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি এই যুগের রাজন্যবর্গের ঔদাসীন্য, ব্রাহ্মন্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি অকৃপণ পোষকতা ও সহানুভূতি—দুই ধর্মের মধ্যে বিরোধ এবং শত্রুতার সৃষ্টি করিয়াছিল কি না সুনিশ্চিত বলা কঠিন। তবে শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ এবং শত্রুতা সম্বন্ধে হিউয়েন সাঙ শুধু ইঙ্গিত নহে, সুস্পষ্ট অভিযোগই করিয়াছেন। কথিত আছে যে, শশাঙ্ক কুশীনগরের একটি বৌদ্ধবিহার হইতে ভিক্ষুগণকে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন; পাটলীপুত্রের বুদ্ধ-পদাঙ্কিত একটি প্রস্তরখণ্ড গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুমের মূলচ্ছেদ করিয়াছিলেন; সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায় যে, শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছিলেন।

মহারাজ শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষের কারণগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এই যুগে দ্রুতগতিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি বঙ্গদেশে ও কামরূপে বিস্তারলাভ করিতেছিল এবং এই দুই রাষ্ট্রের রাজন্যবর্গ প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বীই ছিলেন। সুতরাং শশাঙ্ক যে

ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হইবেন—তাহাতে আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই। দ্বিতীয়তঃ, শশাঙ্কের পরম শত্রু হর্ষবর্ধন ছিলেন পরম সৌগত; সুতরাং শশাঙ্ক যে শত্রুর আশ্রিত ধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইবেন—ইহাও স্বাভাবিক। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী নরপতির পক্ষে রুচিকর হইতে পারে না এবং বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠী ও বণিকদের ধনসমৃদ্ধিও নিশ্চয় ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী নরপতি পৃষ্ঠপোষকতার দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। সুতরাং সেই যুগের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশে শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ অসম্ভব ব্যাপার নহে—বরং ইহাই অতি স্বাভাবিক। বৌদ্ধধর্মের সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধের ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে এই বৌদ্ধবিদ্বেষ সেনবংশের রাজত্বকালে মুসলমানদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

মহারাজ শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষের কারণ

মাৎস্যন্যায়ের শতবর্ষ (৬৫০-৭৫০ খ্রীঃ)

৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়—তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ভাগ্যাকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর পূর্ব ভারতের রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার সুযোগে চীন, তিব্বত ও কামরূপের রাজন্যবর্গের লোলুপ দৃষ্টি বঙ্গদেশের উপর পতিত হইল।

তিব্বতরাজ স্রঙ সাঙ গাম্পো (৬০০-৬৫০ খ্রীঃ) এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে আসাম, নেপাল এবং ভারতের বহু স্থান অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। গাম্পোর সময় হইতে নেপাল দুই শত বৎসর তিব্বতের অধীন ছিল। কামরূপে ভাস্করবর্মার রাজবংশ এক ম্লেচ্ছ বিজেতা কর্তৃক বিনষ্ট হয়[১]। সম্ভবতঃ এই ম্লেচ্ছ বিজেতাই তিব্বতরাজ স্রঙ সাঙ গাম্পো। গাম্পোর পর তাঁহার পৌত্র কিলি-প-পু তিব্বতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন—মধ্যভারতের একাংশ, বিশেষতঃ বিহার অঞ্চলেও তাহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

এই সকল রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের প্রবাহ বাঙ্গলাদেশকেও স্পর্শ করিল। তিব্বত রাষ্ট্রের ভীতি বহুদিন পর্যন্ত কামরূপ, নেপাল, কাশ্মীর এবং বঙ্গদেশকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। সপ্তম, অষ্টম এবং নবম শতকেও বঙ্গদেশ তিব্বতী অভিযানে বিব্রত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। এমন কি, পালবংশের রাজত্বকালেও এই তিব্বতী অভিযানের স্রোত রুদ্ধ হয় নাই। বঙ্গ-তিব্বত বিরোধের ইতিহাস খুব সুস্পষ্ট নহে। মাৎস্যন্যায়ের শত বর্ষব্যাপী রাষ্ট্রীয় দুর্যোগের মেঘও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল হইতে উদ্ভূত হইয়া বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

বঙ্গের তিব্বত-ভীতি

কিন্তু বঙ্গের সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর বিপর্যয় আসিল কনৌজরাজ যশোবর্মার মগধ-গৌড় বিজয়ের ফলে। যশোবর্মার হস্তে মগধ ও গৌড়ের অধিপতি নিহত হন। বিখ্যাত বাক্‌পতিরাজ তাঁহার সভাকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত 'গৌড়বহ' কাব্যে গৌড়রাজ-বধের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই কাহিনী হইতে অনুমিত হয় যে, গৌড়রাজ এবং মগধরাজ অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তার পর যশোবর্মা তাঁহার বিজয়বাহিনীসহ সমুদ্র পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং বঙ্গ জনপদ জয় করেন—অর্থাৎ সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার পদানত

কনৌজাধিপতি যশোবর্মা কর্তৃক মগধ-গৌড় বিজয়

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. I. p. 289.

গোপাল বঙ্গ ও বরেন্দ্রীর অধীশ্বর হইয়াই দেশে যত স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ সামন্ত ছিলেন, তাঁহাদের দমন করেন এবং সমগ্র বঙ্গদেশে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সুশাসনে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। অবশ্য এই প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাতে সামন্ত নায়কেরাই তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন।

গোপালদেব ৭৫০-৭৭০ খ্রীঃ

গোপালের পর তাঁহার পুত্র ধর্মপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধর্মপালই পালবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁহার রাজত্বকালেই পালরাজ্যের সীমা বঙ্গের সীমান্ত অতিক্রম করে। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ধর্মপাল অবাধে রাজ্য বিস্তার আরম্ভ করিলেন। স্বল্পকাল মধ্যেই ভোজ (বেরার), মৎস্য (আলোয়ার, জয়পুর ও ভরত-পুরের অংশ), মদ্র (মধ্য পঞ্জাব), কুরু (পূর্ব পঞ্জাব), যদু (পঞ্জাবের সিংহপুর), যবন (পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের খণ্ড রাষ্ট্র), অবন্তী (মালব), গান্ধার (পশ্চিম পঞ্জাব) এবং কীর (পঞ্জাবের কাংড়া অঞ্চল) রাজ্য জয় করেন। এই বিজয়াভিযানেই ধর্মপাল কনৌজের অধিপতি ইন্দ্রায়ুধকেও পরাজিত করেন এবং স্ব-মনোনীত চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন [১]। কনৌজে চক্রায়ুধের অভিষেকের সময় প্রায় বিশজন সামন্ত নরপতি উপস্থিত ছিলেন এবং ধর্মপালের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ধর্মপাল নেপালও জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই সকল বিজিত রাজ্য গৌড়বঙ্গের কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে আনয়ন করেন নাই। ধর্মপালের বশ্যতা এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়া এই সকল বিজিত রাজ্যের নরপতিগণ স্বীয় রাজ্যে প্রায় স্বাধীন নরপতিরূপেই রাজ্য শাসন করিতেন।

ধর্মপাল ৭৭০-৮১০ খ্রীঃ

রাজ্যবিজয়

এই সময়ে সর্বভারতীয় গৌরবের নিদর্শন ছিল কনৌজের মহোদয়শ্রী অর্জন। এই কনৌজ রাজলক্ষ্মীকে কেন্দ্র করিয়া রাজপুতনার প্রতীহার বংশ, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ এবং বঙ্গের পালবংশীয় নরপতিগণের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই সংগ্রাম ত্রিশক্তি সংগ্রাম নামে খ্যাত। জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়া এই সংগ্রাম অগ্রসর হইল। রাষ্ট্রকূট নরপতি ধ্রুব ও তাঁহার পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ প্রতীহার নরপতি বৎসরাজ ও তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করেন। দুইবার পরাজয়ে প্রতীহার-শক্তি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। কিন্তু রাষ্ট্রকূটগণ বিজয় সত্ত্বেও উত্তর ভারতে রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হইলেন না; তাঁহারা দাক্ষিণাত্যে আরব প্রতিরোধেই অধিক ব্যাপৃত ছিলেন। গৌড়াধিপতি ধর্মপালকেও রাষ্ট্রকূটগণের নিকট নতিস্বীকার করিতে হইয়াছিল। ধর্মপালকে পরাজিত করিয়া চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল দণ্ডভুক্তি অধিকার করিয়াছিলেন; কিন্তু এই নতিস্বীকার কিংবা পরাজয় সত্ত্বেও পূর্ব ভারতে ধর্মপালের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ধর্মপাল রাষ্ট্রকূট রাজকন্যা রান্নাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার মতনই বৌদ্ধধর্মানুরাগী ছিলেন এবং বিক্রমশীলা ও সোমপুরের বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

ত্রিশক্তি-সংগ্রাম

দেবপাল সিংহাসনারোহণের পরেই পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। প্রতীহার এবং রাষ্ট্রকূটগণ তখনও পাল-নরপতিগণের

---

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. I, p. 166, F. N. 1.

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বিদ্যমান ছিল। কামরূপ এবং কলিঙ্গও স্ব স্ব রাজবংশের অধীনে পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিল। দক্ষিণে পাণ্ড্যগণ প্রবল শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। সুতরাং দেবপালের পক্ষে আক্রমণমুখী হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। মৌর্য ও গুপ্তযুগের আদর্শ ছিল সর্বভারতের 'একরাটত্ব'। হর্ষোত্তর যুগের আদর্শ ছিল 'সকল উত্তরাপথনাথত্ব'-লাভ। দেবপালের সমকালেও এই আদর্শই ছিল ভারতীয় রাজন্যবর্গের লক্ষ্য। এই আদর্শ অনুসরণে দেবপালের সহায়ক ছিলেন তাঁহার দুইজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী—দর্ভপাণি ও তাঁহার পৌত্র কেদার মিশ্র। এই মন্ত্রিদ্বয়ের সহায়তায় দেবপাল হিমালয় হইতে বিন্ধ্য এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে সমুদ্রতীর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন এবং উত্তর ভারত হইতে তিনি রাজস্ব এবং স্বীকৃতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আক্রমণে পর্যুদস্ত হইয়া কলিঙ্গরাজ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন [১]।

দেবপাল ৮১০-৮৫০ খ্রীঃ

ধর্মপালের সহিত গুর্জর-প্রতীহারদের সংগ্রাম হইলেও দেবপালের সহিত প্রতীহাররাজ নাগভট্টের কোন সংঘর্ষ হইয়াছিল কি না জানা যায় না। নাগভট্টের পৌত্র ভোজদেব প্রতীহারবংশের হৃত গৌরব বহুলাংশে পুনরুদ্ধার করেন। সম্ভবতঃ ভোজদেবের সহিত দেবপালের সংগ্রাম হইয়াছিল, কিন্তু এই সংগ্রামে ভোজদেব জয়ী হইতে পারেন নাই। কথিত আছে যে, দেবপাল রাষ্ট্রকূট নরপতি অমোঘবর্ষকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি দ্রাবিড়দিগকে পরাজিত করেন। কেহ কেহ মনে করেন, দেবপাল কর্তৃক বিজিত এই 'দ্রাবিড়নাথ' রাষ্ট্রকূট নরপতি নহেন—তিনি পাণ্ড্যরাজ শ্রীবল্লভ (৮১৫-৮৬২ খ্রীঃ) [২]। দেবপাল পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়েই পালরাষ্ট্র সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। বিজিত রাজ্যগুলিকে দেবপাল স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন নাই। দেবপালের আধিপত্য স্বীকার করিলেই বিজিত নরপতিগণ স্ব স্ব রাষ্ট্রে স্বাধীন বলিয়া স্বীকৃত হইতেন।

পাল-প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূট সংগ্রাম

দেবপালের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই পাল-সাম্রাজ্যের গৌরবরবি অস্তোন্মুখ হইয়া আসিল। দেবপালের পরবর্তী তিনজন নরপতিই (বিগ্রহপাল, শূরপাল ও নারায়ণ-পাল) ছিলেন দুর্বলপ্রকৃতি; তাঁহাদের রাজত্ব বঙ্গের পক্ষে গৌরবজনক হয় নাই। নারায়ণপাল (৮৫৪-৯০৮ খ্রীঃ) প্রায় চুয়ান্ন বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকাল বাঙ্গলার দুর্ভাগ্যের কাহিনীমাত্র। এই সময়ে রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ (৮১৪-৮৮০ খ্রীঃ) বঙ্গ ও মগধে বিজয়ী সমরাভিযান প্রেরণ করেন [৩]। উড়িষ্যারাজ মহারাজাধিরাজ রণস্তম্ভও এই সময়ে রাঢ়ের কিয়দংশ অধিকার করেন। প্রতীহার-রাজ ভোজদেবও মগধ পর্যন্ত প্রায় সমগ্র পাল-সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে ডাহল বা চেদীরাজ প্রথম কোকল্লদেব (৮৪০-৮৯৯ খ্রীঃ) বঙ্গের রাজ-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করেন [৪]। ভোজদেবের পুত্র প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপাল পুণ্ড্রবর্ধনের

পালরাষ্ট্রের অবনতি

---

১) ***History of Buddhism in India,*** **Taranath, p. 197.**
২) ***History of Bengal,*** **Dacca University, Vol. I, p. 120.**
৩) ***ibid*** **p. 127.**
৪) ***ibid*** **p. 128.**

পাহাড়পুর অঞ্চল পর্যন্ত প্রতীহার-সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তবে নারায়ণপাল মৃত্যুর পূর্বে উত্তরবঙ্গ ও বিহার পুনরধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের নিকট নারায়ণপালকেও দীর্ঘদিনের জন্য আনুগত্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল। দেবপালের সময়ে কামরূপ ও কলিঙ্গ বঙ্গের আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল ; কিন্তু নারায়ণপালের রাজত্বকালে কামরূপ ও কলিঙ্গ স্বীয় রাজবংশের অধীনে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কলচুরী ও চন্দেল্ল অভিযান

নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপাল এবং পৌত্র দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালে মগধ পর্যন্ত অঞ্চল পাল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় গোপালের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে মগধ পাল-সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। প্রতীহার-রাষ্ট্রকূট-ভীতি এই সময়ে না থাকিলেও চন্দেল্ল ও কলচুরী রাজবংশ এই সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। চন্দেল্ল নরপতি যশোবর্মা বঙ্গ, অঙ্গ, গৌড় এবং রাঢ় দেশ পর্যন্ত সমরাভিযান করিয়াছিলেন। কলচুরীরাজ কেয়ূরবর্ষ (দশম শতকের প্রথম পাদ) গৌড়, কর্ণাট, লাট, কাশ্মীর এবং কলিঙ্গদেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণরাজ ওড্রদেশ ও বঙ্গদেশ জয় করেন [১]। এই সকল পরাজয় ও সামরিক বিপর্যয় পাল-সাম্রাজ্যকে দুর্বল করিয়া তুলিয়াছিল এবং এই সকল পরাজয় পাল-সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ও সামরিক শক্তিহীনতারই পরিচয় প্রদান করে। চন্দেল্ল এবং কলচুরী লিপিতে রাঢ়, বঙ্গ ও গৌড়ের পৃথক উল্লেখ হইতে অনুমান করা যায় যে, বাঙ্গলাদেশেও পাল-সাম্রাজ্য বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত হইয়াছিল। রাঢ় এবং বঙ্গাল প্রায় স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই হইয়া উঠিয়াছিল—বাণগড় লিপিতে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে।

কাম্বোজ অভিযান

এই সময়েই উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে কাম্বোজ নামে এক রাজবংশ প্রবল হইয়া উঠে। কথিত আছে যে, কাম্বোজবংশীয় রাজ্যপাল পাল-সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে রাঢ়-গৌড়ে স্বীয় বংশের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন [২]। এই কাম্বোজদের আদি বাসভূমি সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও মতে কাম্বোজ জাতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কাম্বোজদেশাগত, কাহারও মতে কাম্বোজদেশ তিব্বতে এবং কাহারও মতে দক্ষিণ-পূর্বভারতীয় দ্বীপাঞ্চলের কাম্বোডিয়াই কম্বুজ বা কাম্বোজদেশ। তিব্বতী গ্রন্থে লুসাই অঞ্চলে এক কাম্বোজদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। দক্ষিণবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ এই সময়েই পালবংশের হস্তচ্যুত হইয়া যায়।

চন্দ্রদ্বীপের চন্দ্রবংশ

ঢাকা ও ফরিদপুর জিলায় প্রাপ্ত চারিটি লিপি হইতে চন্দ্রবংশীয় চারিজন নৃপতির উল্লেখ পাওয়া যায়—পূর্ণচন্দ্র, সুবর্ণচন্দ্র, মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্র এবং শ্রীচন্দ্র। সুবর্ণচন্দ্র হইতে সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। এই চন্দ্রবংশ হরিকেলের অধিপতি ছিলেন। ইহাদের শক্তিকেন্দ্র ছিল চন্দ্রদ্বীপে (বাখরগঞ্জ জিলা)। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ঢাকা ও ফরিদপুর এই চন্দ্রবংশের অধিকারভুক্ত ছিল।

---

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol I, p. 134. F. N. 1.
২) *ibid* p. 135.

চোল নরপতি রাজেন্দ্রচোলের বিখ্যাত তিরুমলয় লিপির মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র নামে একজন রাজার উল্লেখ আছে। তিনি বঙ্গাল দেশের অধিপতি ছিলেন। লহয়চন্দ্র এবং গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে পূর্বোক্ত চন্দ্রবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, তাহা সুনিশ্চিত জানা যায় না। এই সকল বিবরণ হইতে অনুমিত হয় যে, পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের কিয়দংশ খ্রীষ্টীয় দশম শতকের প্রথমার্ধ হইতে একাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পাল-রাজ্যসীমার বহির্ভূত ছিল। চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণকে এবং গোবিন্দচন্দ্রকে কলচুরি এবং চোলরাজ্যের পরাক্রান্ত সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। রাজেন্দ্রচোল ও গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গালদেশ জয় করিয়াছিলেন এবং চোলরাজগণ রণশূরকে পরাজিত করিয়া 'তক্কণ লাড়ম' বা দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। বিভিন্ন লিপি-প্রমাণ হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল তখন বিভিন্ন নরপতির অধীন ছিল।

রাজেন্দ্রচোলের বঙ্গাভিযান

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপাল (৯৮৮-১০৩৮ খ্রীঃ) পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার প্রধান কীর্তি হৃত পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার। সেই সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশই পালরাজবংশের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। পালরাজ্য তখন মগধ অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত ছিল। মহীপাল উত্তর ও পূর্ববঙ্গ পুনরুদ্ধার করেন। উত্তর বিহার বা অঙ্গদেশও তিনি পুনরধিকার করিয়াছিলেন।

প্রথম মহীপাল ও পালবংশের পুনরুত্থান

মহীপাল কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন নিঃসন্দেহ। তিনি কেবল পিতৃরাজ্যই পুনরুদ্ধার করেন নাই, পূর্বপুরুষের বিলুপ্ত সাম্রাজ্যের কিয়দংশও পুনরধিকার করিয়াছিলেন।

পালবংশের লুপ্ত গৌরবও তিনি অনেকাংশে পুনরুদ্ধার করেন। মহীপাল সারনাথের অনেক জীর্ণ বৌদ্ধ বিহারের ও বুদ্ধগয়া বিহারের সংস্কার করেন এবং কয়েকটি নূতন বিহার ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধজগতেও বাঙ্গলাদেশ পুনরায় তাহার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিল। পুনরুত্থানের প্রচেষ্টায় ও সফলতায় বাঙ্গালীর আত্মবিশ্বাস ও আত্মগৌরব-বোধ উদ্বুদ্ধ হইল। ফলে মহীপাল বাঙ্গালীমানসে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিলেন। জনস্মৃতিতে আজিও "ধান ভানতে মহীপালের গীত" জাগরূক। বঙ্গদেশের বহু দীর্ঘিকা এবং নগরী এই কীর্তিমান নরপতির স্মৃতি বহন করিতেছে।

মহীপালের কৃতিত্ব

মহীপাল সম্ভবতঃ পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার, পূর্বপুরুষদের সাম্রাজ্যের নষ্ট গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলাবিধানেই ব্যাপৃত ছিলেন। সম্ভবতঃ, এই সকল কারণেই মহীপাল পঞ্জাবের শাহী রাজগণ কর্তৃক ব্যবস্থিত সুলতান মামুদ গজনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত হিন্দু শক্তিসংঘে যোগদান করিতে পারেন নাই। উত্তর ভারতের শক্তিপুঞ্জ যখন বিদেশী এবং বিধর্মী শত্রুর আক্রমণে বিব্রত ও বিপর্যস্ত, সেই সুযোগেই মহীপাল পিতৃরাজ্য আংশিক উদ্ধার করেন। সম্ভবতঃ তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, সুশৃঙ্খল শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে দুর্ধর্ষ বৈদেশিক আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করা যতটা সহজ এবং সম্ভবপর, ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যের সম্মিলিত শক্তি দ্বারা ততটা সহজ নহে। সম্ভবতঃ সেই কারণেই তিনি বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে কঠিনতর প্রতিরোধ-প্রাচীর গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই সময়ে একাধিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণেই উত্তর ভারতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। জাতীয় চেতনা ব্যতীত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও সাধনায় এই আসন্ন পতন ও বিনাশ প্রতিরোধ সম্ভবপর ছিল না। ভারতের বিভিন্ন শক্তি বিদেশাগত মুসলিম আক্রমণকারী কর্তৃক পরাজিত ও পর্যুদস্ত হইতেছিল। রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে যে সর্বভারতীয় আদর্শ মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাটগণের লক্ষ্য ছিল—সেই আদর্শ সক্রিয় থাকিলে একটি বৃহত্তর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা ও বিপন্মুক্তির জন্য সমবেত প্রচেষ্টা ভারতীয় রাজন্যবর্গের পক্ষে সম্ভবপর হইত। একমাত্র পঞ্জাবের শাহী রাজবংশই এই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সর্বভারতীয় আদর্শের পরিবর্তে একটি প্রাদেশিক আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মকর্তৃত্ববোধ ভারতীয় রাষ্ট্র-গুলিকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছিল।

মহীপালের সমসাময়িক ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা

অষ্টম শতকের প্রারম্ভ হইতেই দেখা যায় যে, ভারতের সমৃদ্ধ বৈদেশিক বাণিজ্য আরব বণিকগণের করতলগত হইতেছিল। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণ ভারতে স্থায়িভাবে স্থানান্তরিত হইতেছিল। আর্যব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আদর্শবাদও ক্রমশঃ সংকীর্ণতর হইয়া আসিতেছিল; সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের প্রধান সহায়ক উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীগুলির স্বচ্ছ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। বাণিজ্য বিদেশী বণিকগণের হস্তগত হওয়ায় ভারতের আর্থিক মেরুদণ্ডও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

ভারতের সমৃদ্ধ বৈদেশিক বাণিজ্য হস্তচ্যুত

মহীপাল গৌড়তন্ত্র বা পাল-সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারে আংশিক সাফল্য লাভ করিলেও এই পুনরুদ্ধার স্থায়ী হয় নাই। নারায়ণপালের সময় হইতে পাল-সাম্রাজ্যের যে ভাঙ্গন ও পতন আরম্ভ হইয়াছিল উহা মহীপাল সাময়িকভাবে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন মাত্র, সম্পূর্ণ নিরোধ করিতে পারেন নাই—কারণ, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পাল-সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইল। বঙ্গের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং আদর্শ-বাদও এই পতনের অন্যতম কারণ। মহীপালের পূর্বেই বাঙ্গলার বিভিন্ন জনপদ আত্মকর্তৃত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও একটি প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত হইয়াছিল। এই স্থানীয় অর্থাৎ প্রাদেশিক আত্ম-কর্তৃত্বের আদর্শ বাহির ও ভিতর হইতে পালরাষ্ট্রকে ক্রমাগত আঘাত করিতেছিল। এই আঘাতে পালরাষ্ট্র দুর্বল হইয়া পড়িল। এই সময়ে রাষ্ট্রীয় দুর্বলতার সহিত সামাজিক কারণ যুক্ত হইয়া পালরাষ্ট্রের পতন অনিবার্য করিয়া তুলিল। এই যুগে বঙ্গের সুসমৃদ্ধ বাণিজ্যের স্রোত রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় সমাজ ও রাষ্ট্রে শ্রেষ্ঠী, বণিক ও শিল্পীদের প্রাধান্য ক্ষীয়মাণ হইয়া আসিল। সমাজ ভূমিনির্ভর হইয়া উঠিল এবং ভূমিনির্ভর সমাজে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই স্বাভাবিক পরিণতি। বাঙ্গলাদেশেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলি এই যুগে সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। সুতরাং পালরাষ্ট্রের পতন রোধ করিবার কোন উপায়ই রহিল না।

বঙ্গের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দুর্বলতা

মহীপালের পর তাঁহার পুত্র নয়পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন (১০৩৮-১০৫৫ খ্রীঃ)। তাঁহার রাজত্বকালে বঙ্গ ও গৌড়ের রাজা কলচুরিরাজ কর্ণ বা লক্ষ্মীকর্ণের হস্তে পরাজিত হন। তিব্বতী প্রমাণ হইতে অনুমিত হয় যে, এই জয়-পরাজয় ছিল অমীমাংসিত[১]। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মধ্যস্থতায় দুই রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে লক্ষ্মীকর্ণ দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। কর্ণ পরাজিত হইলেন—তৃতীয় বিগ্রহপালের সহিত কলচুরি-রাজকন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ দ্বারা এই অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটিল। বঙ্গে এই সময়ে চন্দ্র বা বর্মন্ বংশ রাজত্ব করিতেছিল[২]। লক্ষ্মীকর্ণ প্রথমবারের আক্রমণে একজন চন্দ্র বা বর্মন্ নরপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

কলচুরি-রাজ লক্ষ্মীকর্ণ

লক্ষ্মীকর্ণের হস্ত হইতে উদ্ধার হইলেও পশ্চিমবঙ্গ বহুদিন পাল-সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ নামক একজন সামন্ত নরপতি এই সময়ে বর্ধমান অঞ্চলে স্বাধীন নরপতিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন[৩]। পূর্ববঙ্গে ত্রিপুরা অঞ্চলে সমসাময়িক পট্টিকেরা রাজ্য গড়িয়া উঠে। এই রাজ্যের সহিত পগানের (ব্রহ্মদেশ) রাজবংশের রাষ্ট্রীয় ও বৈবাহিক সম্বন্ধ দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ছিল[৪]।

তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে আবার নূতন বহিঃশত্রুর আগমন হইল। বিক্রমাঙ্কদেবচরিত গ্রন্থে বিহ্লনের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, কর্ণাটের চালুক্যরাজ প্রথম সোমেশ্বরের পুত্র ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য এক বিরাট সেনাবাহিনীসহ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। বঙ্গদেশের বিরুদ্ধে একাধিক চালুক্য নরপতি সমরাভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় বিগ্রহপাল (১০৫৫-১০৭০ খ্রীঃ)

একাদশ শতকের মধ্যভাগেই উড়িষ্যার অধিপতি মহাশিব গুপ্ত যযাতি গৌড়, রাঢ় এবং বঙ্গদেশে সমরাভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে[৫]। উড়িষ্যার অন্য একজন নরপতি উদ্যোতকেশরীও গৌড় বিজয় করিয়াছিলেন বলিয়া ভুবনেশ্বর শিলালিপিতে উল্লেখ আছে[৬]। এই সকল প্রাদেশিক আক্রমণে পাল-সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন হইয়া উঠিল। পরিতোষ এবং তাঁহার পুত্র শূদ্রকের নেতৃত্বে গয়া অঞ্চলও পাল-সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। শূদ্রকের পুত্র বিশ্বরূপ এবং পৌত্র যক্ষপালের সময়ে এই বংশ অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠে। কামরূপরাজ রত্নপালও গৌড়ের পাল-নরপতির আনুগত্য উদ্ধতভাবেই অস্বীকার করিলেন।

উড়িষ্যা ও কামরূপের সহিত বঙ্গের সম্বন্ধ

তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপালের সিংহাসন আরোহণের সমকালে পালরাষ্ট্র গভীর বিপদেব সম্মুখীন হয়। রাজপরিবারেই তখন বহু ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত দেখা দিয়াছে—সামন্তগণ বিদ্রোহোদ্যত হইয়া উঠিয়াছেন; রাজভ্রাতা রামপালকে পারিবারিক চক্রান্তের মূল মনে করিয়া মহীপাল ভ্রাতা রামপাল এবং শূরপালকে

দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০-১০৭৫ খ্রীঃ)

১) S. C. Das, *Indian Pandits in The Land of Snow* p. 51.
২) Bargaon Grants, *JASB*, LXVIII, p. 115.
৩) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. I, p. 146 F. N.
৪) *ibid*, p. 147.
৫) Sonpur Grant, *JBOAS*, II, pp. 45-49.
৬) Bhubaneswara Inscription, *JASB*, VII, p. 557 F. N.

কারারুদ্ধ করিলেন এবং বিদ্রোহী সামন্তদের দমনে তিনি কৃতসংকল্প হইলেন। অথচ তখন বোধ হয় তাঁহার যথেষ্ট সৈন্যবল এবং যুদ্ধোপকরণ ছিল না। মন্ত্রিবর্গের পরামর্শেও তিনি কর্ণপাত করিলেন না। ফলে বরেন্দ্রীর কৈবর্ত সামন্তদের দমন করিতে চেষ্টা করিয়া তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। কৈবর্ত-নায়ক দিব্য বরেন্দ্রী অধিকার করেন[১]। সন্ধ্যাকরনন্দী-বিরচিত রামচরিত কাব্যে এই বিদ্রোহ, মহীপাল হত্যার বিবরণ এবং রামপাল কর্তৃক বরেন্দ্রী অধিকারের কাব্যময় কাহিনীর বিবরণ উল্লিখিত আছে।

কৈবর্ত-বিদ্রোহ

বরেন্দ্রাধিপতি দিব্যকে যুদ্ধব্যপদেশে বর্মনবংশীয় নরপতি জাতবর্মার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহীপালের পর তাঁহার ভ্রাতা শূরপাল গৌড়ের অধীশ্বর হন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকাল মাত্র দুই বৎসর (১০৭৫-১০৭৭ খ্রীঃ)। শূরপালের পর রাজ্য লাভ করিলেন রামপাল (১০৭৭-১১২০ খ্রীঃ)। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই রামপাল বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থই হইয়াছিল। কৈবর্তগণ একাধিকবার রামপালের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। দিব্যের পর রুদোক বরেন্দ্রীর নায়ক হইলেন। রামপাল রুদোকের সময়েও বরেন্দ্রী উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিলেন। রুদোকের পর ভীম বরেন্দ্রীর অধিকর্তা হইলেন—তাঁহার সুযোগ্য পরিচালনায় কৈবর্তশক্তি প্রবলতর হইয়া উঠিল। রামপাল আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রামপাল যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি পালরাষ্ট্রের অতীত ও বর্তমান স্বাধীন স্বতন্ত্র সামন্ত এবং প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অজস্র অর্থ ও ভূমিদান করিয়া রামপাল প্রতিবেশী রাজন্য এবং সামন্তবর্গের সাহায্য লাভ করিলেন[২]। মাতুল রাষ্ট্রকূটরাজ মথনদেবই ছিলেন রামপালের প্রধান সহায়। রামচরিতে এই সকল সাহায্যকারী নৃপতি ও সামন্তবর্গের নামতালিকা উল্লিখিত আছে[৩]। এই তালিকা বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যায় যে, তদানীন্তন বঙ্গ ও বিহার রাষ্ট্রতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

রামপাল কর্তৃক বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা

---

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. I, p. 150.

২) *Ramacharita*, Chap. V, VI, VII.

৩) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. I, pp. 156-57 F. N

নৃপতি ও সামন্তবর্গের নামতালিকা :—

(১) রাষ্ট্রকূটরাজ মহানদেব বা মথনদেব (২) পীঠি (বিহার) ও মগধাধিপতি ভীমযশ (৩) কোটাটবির রাজা বীরগুণ (বিষ্ণুপুরের পূর্বে—বর্তমান কোটেশ্বর—*Ain-i-Akbari*, Vol. II, p. 144) (৪) দণ্ডভুক্তির রাজা জয়সিংহ (৫) বাল বলভীর (মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জিলা) অধিপতি বিক্রমরাজ (৬) অপার-মন্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশূর (মন্দারণ—বর্তমান হুগলী জেলায়) (৭) কুজবটির রাজা শূরপাল (সাঁওতাল পরগণা) (৮) তৈলকম্প বা তেলকুপির অধিপতি রুদ্রশিখর (মানভূম জেলা) (৯) উচ্ছালাধিপতি ভাস্কর বা জয়গলসিংহ (বর্তমান বীরভূমের বৈন উজিয়াল পরগণা) (১০) কজঙ্গল মণ্ডলাধিপতি নরসিংহার্জুন (১১) সঙ্কট (বল্লালচরিত গ্রন্থের 'সংককোট', আইন-ই-আকবরীর 'সকোট'—হুগলী জেলা) গ্রামের চণ্ডার্জুন (১২) ঢেক্করী বা ঢেকুরীর (কাটোয়া মহকুমা) রাজা প্রতাপসিংহ (১৩) নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ (১৪) কোশাম্বি অধিপতি দ্বোরপবর্ধন (রাজশাহীর কুসুম্বর পরগণা কিংবা বগুড়া জেলার কুসুম্বি পরগণা) (১৫) পদুবম্বার (পাবনার) রাজা সোম।

এই সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জকে প্রতিরোধ করা বরেন্দ্রী অধিপতি ভীমের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। গঙ্গার উত্তর তীরে উভয় সৈন্যদলের ভীষণ সংগ্রাম হইল—ভীম বন্দী হইলেন। ভীমের ধনরত্নপূর্ণ রাজভাণ্ডার রামপালের সৈন্যদল কর্তৃক লুণ্ঠিত হইল। কিন্তু ভীমের পরাজয়েও কৈবর্তশক্তি হতোদ্যম হইল না। ভীমের বন্দী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভীমের বন্ধু ও সহায়ক হরি কৈবর্তসৈন্যদলকে সংহত করিয়া রামপালের সম্মুখীন হইলেন। প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া হরি ও কৈবর্তসৈন্যদলকে বশীভূত করা হইল [১]। ভীম সপরিবারে নিহত হইলেন। বরেন্দ্রী রামপালের অধীন হইল। রামাবতী নগরে বরেন্দ্রীর রাষ্ট্রকেন্দ্র স্থাপিত হইল।

বরেন্দ্রী-নায়ক ভীম

বরেন্দ্রীর উদ্ধারসাধনের পর রামপাল হৃতরাজ্যের অন্যান্য অংশের উদ্ধার-সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। বঙ্গের বর্মন্‌রাজ স্বীয় স্বার্থরক্ষার্থ বিনাযুদ্ধেই রামপালের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। রামপালের একজন সামন্ত কামরূপ জয় করিলেন। রাঢ়দেশীয় সামন্তদের সহায়তায় রামপাল উড়িষ্যার কিয়দংশও অধিকার করেন এবং এই কারণে তাঁহাকে কলিঙ্গের চোড়গঙ্গবংশীয় রাজগণের বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গ (১০৭০-১১১৮ খ্রীঃ) পালরাজ্য আক্রমণ করেন। কুলোত্তুঙ্গকে বঙ্গ, বঙ্গাল এবং মগধরাজ কর প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। সম্ভবতঃ কুলোত্তুঙ্গ গঙ্গা হইতে কাবেরী পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন।

চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গের বঙ্গাভিযান

এই সময়ে কর্ণাটের লুব্ধদৃষ্টিও বরেন্দ্রী অঞ্চলের উপর পতিত হইল। তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালেই কর্ণাটরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বঙ্গদেশে সমরাভিযান করিয়াছিলেন এবং সেই আক্রমণের অবসরে কতিপয় কর্ণাটী ক্ষত্রিয় সামন্ত-পরিবার বঙ্গে আগমন করে; সমরাভিযান অন্তে সেনাবাহিনী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেও সেনাবাহিনীর প্রত্যেকেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে নাই। বাঙ্গলার সেনবংশ এবং বর্মন্ রাজবংশ এই দক্ষিণ কর্ণাটী-পরিবার-সম্ভূত বলিয়াই ইতিহাসকারগণের অনুমান। কর্ণাট হইতে আগত সেনবংশীয় একজন সামন্ত মিথিলায় একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কর্ণাট-বঙ্গ সংগ্রাম

মিথিলার সেনবংশীয় নরপতি নান্যদেবের সহিতও রামপালের সংঘর্ষ হয় এবং নান্যদেব বঙ্গ ও গৌড়ের গৌরব ক্ষুণ্ণ করেন বলিয়াই দাবি করেন। মিথিলা ও পশ্চিমবঙ্গ রামপালের হস্তচ্যুত হইল।

এই সময়ে কনৌজে মৌখরীবংশের স্থান অধিকার করিয়াছিল পরাক্রমশালী গাহড়বাল বংশ। রামপালদেবকে এই গাহড়বাল-বংশীয় নরপতিগণের সহিতও সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। গাহড়বাল-বংশীয় নরপতি মদনপালের পুত্র গোবিন্দপালের সহিত গৌড়ের সংগ্রামের সাক্ষ্য গাহড়বাল-লিপিতে পাওয়া যায়। তবে এই সংগ্রামের ফলাফল অনিশ্চিত। রামচরিতের সাক্ষ্য অনুসারে মনে হয়, রামপাল 'মধ্যদেশের' বিক্রম সংযত বা প্রতিহত করিয়াছিলেন (ধৃতমধ্যদেশতনিমা) [২]।

মৌখরীবংশের অভ্যুদয়

---

১) *Ramacharita*, Chap. XXX, XXXI.

২) *ibid*. Chap. III, p. 24.

রামপালদেব বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি কৃতি-পুরুষ এবং শক্তিমান নরপতি ছিলেন। কথিত আছে যে, মাতুল মৃথনদেবের মৃত্যুতে মর্মাহত হইয়া তিনি মুঙ্গেরের নিকট গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেন। রামপাল নির্বাসনে জীবন আরম্ভ করিয়া কৈবর্ত বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে পিতৃভূমি বরেন্দ্রী উদ্ধার করেন—কামরূপ ও উড়িষ্যায় আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত পাল-সাম্রাজ্যের সীমা অক্ষুণ্ণ রাখেন। এই সকলই তাঁহার রাষ্ট্রবুদ্ধি এবং শৌর্য-বীর্যের নিদর্শন।

রামপালের কৃতিত্ব

কিন্তু এত শৌর্য-বীর্য ও দূরদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও রামপাল পাল-সাম্রাজ্যের আসন্ন পতন প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। তাঁহার শৌর্য-বীর্যে পালরাষ্ট্রের দ্রুত পতনের গতি সাময়িকভাবে একটু স্তিমিত হইয়াছিল মাত্র। কারণ, রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং সামাজিক ব্যবস্থার সময়োপযোগী পরিবর্তন না হইলে কোন রাজা বা নেতার পক্ষে একমাত্র ব্যক্তিগত চরিত্র-বলে সেই রাষ্ট্রের পতন প্রতিরোধ করা সম্ভবপর নহে। যে সংকীর্ণ আত্মসচেতনতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি ভারতীয় রাষ্ট্রবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশকেও স্পর্শ করিয়াছিল। বঙ্গদেশেও এই আদর্শের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। সেই যুগের রাজবংশগুলি প্রতিবেশী বা অন্য রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে স্বীয় রাজ্যসীমা বিস্তারেই ব্যস্ত ছিল। এমন কি, বিদেশী আধিপত্য যখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমেই পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তখন সেই বিপর্যয়ের দিনেও ভারতীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ এই আত্মসচেতনতার উর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। রামপালদেবের চেষ্টাও সেই কারণেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। এই রাজনৈতিক কারণের সহিত সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক কারণও যুক্ত হইয়াছিল।

পাল-সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

সংকীর্ণ প্রাদেশিক আত্মসচেতনতা

রামপালের মৃত্যুর পর যথাক্রমে কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল এবং মদনপাল রাজত্ব করেন (১১২০-১১৫৫ খ্রীঃ)। রাজ্য পরিচালনা করিবার মতন উপযুক্ত যোগ্যতা তাঁহাদের ছিল না। এই তিনজন নরপতির রাজত্বকালেই বাঙ্গালীর গৌরব সুদীর্ঘ চারিশত বৎসরকাল-স্থায়ী পাল-সাম্রাজ্য ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িল। গোপাল যে পাল-সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন, ধর্মপাল-দেবপাল সুবিস্তৃত রাজ্য জয় দ্বারা যে সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, মহীপাল যে সাম্রাজ্যকে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, রামপাল যে সাম্রাজ্যের আত্মপ্রত্যয় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই পাল-সাম্রাজ্যকে কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল এবং মদনপাল—কেহই রক্ষা করিতে পারিলেন না।

দুর্বল উত্তরাধিকারী

কুমারপালের প্রিয় সেনাপতি বৈদ্যদেব এই দুর্বলতার সুযোগেই কামরূপে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। একাদশ শতকের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পাদেই জাতবর্মা পূর্ববঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্য ও রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জাতবর্মা কলচুরিরাজ কর্ণের দ্বিতীয়া কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া শক্তিশালী হইলেন; তিনি অঙ্গ, কামরূপ এবং বরেন্দ্রীর নায়ক দিব্যকেও পরাজিত করেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জাতবর্মার পুত্র হরিবর্মার রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। তাঁহার সন্ধি-

সেনাপতি বৈদ্যদেবের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা ও পূর্ব-বঙ্গে বর্মনবংশের অভ্যুদয়

বিগ্রহিক মন্ত্রী ছিলেন ভট্ট ভবদেব। জাতবর্মার ভ্রাতা শ্যামলবর্মার সময়েই বঙ্গদেশে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আগমন হইয়াছিল। তিনি সম্ভবতঃ রাজশাহী, বগুড়া অঞ্চলেও স্বীয় বংশের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে কিংবা অব্যবহিত পরেই পূর্ববঙ্গ সেনবংশের পদানত হয়।

পাল-গঙ্গ সংগ্রাম ও চালুক্য অভিযান

এই সময় দক্ষিণ হইতে কলিঙ্গের গঙ্গবংশীয় রাজন্যগণও আরম্য বা বর্তমান আরামবাগ দুর্গ জয় করিয়া গঙ্গাতীর পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কুমারপালের প্রিয় সেনাপতি বৈদ্যদেব এই আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। মদনপাল সম্ভবতঃ কলিঙ্গ পর্যন্ত অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পাল-গঙ্গ সংগ্রাম এবং কল্যাণের চালুক্যবংশীয় নরপতিদের আক্রমণের সুযোগে পশ্চিমবঙ্গে সেনবংশ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল। এই সেনবংশ ইতিপূর্বেই পূর্ববঙ্গে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। এইবার সেন-নরপতি বিজয়সেন পালরাজ্যের কেন্দ্র গৌড় আক্রমণ করিলেন। মদনপাল সেন-অভিযান প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হইলেন—কালিন্দী নদীতীরে উভয় সেনাদলের তুমুল সংগ্রাম হইল। তবে এই যুদ্ধের জয়-পরাজয় সম্বন্ধে সংবাদ অনিশ্চিত।

পালবংশের অবসান

এই বিপর্যয়ের সুযোগেই গাহড়বাল রাজন্যবর্গ পুনরায় বঙ্গদেশে সমরাভিযান প্রেরণ করেন। ১১২৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই পাটনা বা প্রাচীন পাটলীপুত্র তাঁহাদের হস্তগত হয় এবং ১১৪৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই তাঁহারা মুঙ্গের অঞ্চলও অধিকার করেন। বরেন্দ্রীর কিয়দংশ এবং বিহারের পূর্বাঞ্চল মাত্র মদনপালের অধিকারে রহিল। মদনপালের মৃত্যুর দশ বৎসরের মধ্যেই পালবংশের শেষ চিহ্নও বিলুপ্ত হইয়া গেল। মদনপালের পর পরমভট্টারক গোবিন্দপাল নামে একজন গৌড়েশ্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ বর্তমান গয়া অঞ্চলে তাঁহার রাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহার পর পাল-বংশের আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খালজী কর্তৃক ঔদন্তপুর বিহার আক্রমণকালে গোবিন্দপাল পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন।

বঙ্গের ইতিহাসে পালবংশের অবদান

বাঙলার ইতিহাসে পালবংশের সুদীর্ঘ চারিশত বৎসর রাজত্বকাল এক গৌরবময় অধ্যায়। বর্তমান বাঙলা দেশ ও বাঙালী জাতির ভিত্তিস্থাপন এই যুগেই হইয়াছিল। এই যুগ বৃহত্তর সামাজিক সমন্বয়ের যুগ। বাঙালীর স্বদেশ ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ এই যুগেরই অবদান।

খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতক হইতেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ছিল সর্বভারতের একচ্ছত্রাধিপত্য। মৌর্য এবং গুপ্তরাজবংশের আদর্শ ছিল সর্বভারতব্যাপী আধিপত্য ও একরাটত্ব। সপ্তম শতকে হর্ষবর্ধনের সময়ও এই আদর্শ সক্রিয় ছিল—কিন্তু আদর্শের সীমা ক্রমশঃ সংকীর্ণতর হইয়া আসিতেছিল। সর্বভারতের পরিবর্তে 'সকলোত্তরপথনাথ' হওয়াই এই যুগের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। অষ্টম শতকে এই আদর্শকে কেন্দ্র করিয়াই উত্তরাপথের আধিপত্য লাভের জন্য পাল-প্রতীহার-রাষ্ট্রকূট রাজবংশের মধ্যে সুদীর্ঘ ত্রিশক্তি সংগ্রাম চলিয়াছিল। কিন্তু অন্য একটি নূতন আদর্শও ধীরে ধীরে জাগ্রত হইয়াছিল। এই আদর্শ সর্বভারতীয় আদর্শ নহে, এই আদর্শ স্থানীয় এবং প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের আদর্শ। এই সময় হইতেই বিভিন্ন দেশখণ্ডের ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করিয়া এক-একটি রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে, এবং এই খণ্ডরাষ্ট্রগুলি প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারেই সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের আদর্শ রাষ্ট্রগুলির নিকট শ্রেয় হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই উহারা ভারতবর্ষের গভীরতম বিপদের দিনেও অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা বিসর্জন দিয়া বৃহত্তর আদর্শ ও স্বার্থের জন্য সংঘবদ্ধ হইতে পারে নাই। যখনই এই বৃহত্তর আদর্শ হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তখনই ভারতবর্ষকে বিদেশীর নিকট লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হইয়াছে। মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতীয় রাষ্ট্রগুলি এই প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের আদর্শেই আচ্ছন্ন ছিল। বঙ্গদেশেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় আদর্শ

প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের আদর্শ

অষ্টম-নবম শতক হইতে এক-একটি বৃহত্তর জনপদ-রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া এক-একটি বিশিষ্ট লিপি, ভাষা ও শিল্পাদর্শ গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে এবং দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে এইটি তাহাদের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি প্রাদেশিক ভাষা ও লিপির জন্ম এই যুগেই। বাঙলা ভাষা এবং লিপির ভিত্তি-স্থাপন এই যুগেই হইয়াছিল। বঙ্গদেশের স্বতন্ত্র ভৌগোলিক সত্তাও এই যুগেই বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে।

বাঙালীর জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ

এই লিপি, ভাষা, ভৌগোলিক সত্তা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তাও এই যুগেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য গৌড়-বঙ্গে এই রাষ্ট্রীয় চেতনার সূচনা সপ্তম শতকেই স্ফুরিত হইয়াছিল। বঙ্গের এই রাষ্ট্রীয় সত্তার প্রথম প্রতীক ছিলেন মহারাজ শশাঙ্ক। কিন্তু মাৎস্যন্যায়ের একশত বৎসরে এই রাষ্ট্রীয় সত্তা প্রায় বিনষ্ট হইয়াছিল—পাল-রাজন্যবর্গ পুনরায় এই রাষ্ট্রীয় সত্তাকে জাগ্রত করিলেন।

বাঙ্গালীর স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হইল। ধর্মপাল এবং দেবপালের রাজ্যবিজয়ের ফলে বঙ্গদেশ ভারতীয় ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চেও স্থান লাভ করিয়াছিল। তদ্ব্যতীত পালরাষ্ট্র ও রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্যে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ঔদন্তপুর ও সারনাথের বৌদ্ধসংঘ এবং মহাবিহারের মাধ্যমে বঙ্গদেশ আন্তর্জাতিক বৌদ্ধজগতেও একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালীর এই জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠালাভই পালযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।

আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ জগতে বঙ্গের বিশিষ্ট স্থান লাভ

পালযুগে বঙ্গদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ঃ পাল-রাজন্যবর্গ ছিলেন বাঙ্গালী, বরেন্দ্রী ছিল তাঁহাদের পিতৃভূমি। তাঁহারা বংশে ছিলেন পরিপূর্ণভাবেই বাঙ্গালী। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-সমাজের বংশাভিজাত্যের দাবি তাঁহারা করেন নাই। পাল-রাজন্যবর্গ ছিলেন ধর্মে পরমসৌগত (বৌদ্ধ); তাঁহারা ছিলেন মহাযানী বৌদ্ধ সংঘ ও সম্প্রদায়ের পরম অনুরাগী পোষক; অথচ বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি তাঁহাদের সহৃদয় আনুকূল্য ও পোষকতা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। একাধিক পাল-নরপতি ব্রাহ্মণ্য পূজা, আচার-অনুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন; ব্রাহ্মণের মন্ত্রপূত শান্তিবারি মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রের বিভিন্ন উচ্চপদে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইতেন; এমন কি, মন্ত্রী ও সেনাপতির পদেও ব্রাহ্মণদের নিয়োজিত দেখা যায়। আবার কৈবর্তগণও রাষ্ট্রাধিকারে স্থান লাভ করিয়াছেন। এইভাবে ভগবান তথাগত বুদ্ধের 'সাম্য ও মৈত্রী' মন্ত্রে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত পাল-রাজবংশের আনুকূল্যেই বঙ্গদেশে প্রথম সামাজিক সমন্বয়ের সূচনা হইয়াছিল এবং চারিশত বৎসর ব্যাপিয়া এই সমন্বয়-প্রবাহ চলিয়াছিল। আর্য ও আর্যেতর সংস্কার ও সংস্কৃতি, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, পূজা, দেবদেবী, শিক্ষা ও আদর্শ পাল-রাজবংশকে কেন্দ্র করিয়াই পরস্পর আদান-প্রদানের সুযোগ লাভ করে এবং এই মিলন ও সংযোগের মধ্য দিয়াই এক বৃহৎ সামাজিক সমন্বয় রূপ পরিগ্রহ করে। গুপ্তযুগ হইতে বঙ্গদেশে প্রচলিত জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের সহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবাহ সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। ফলে সপ্তম শতকে এই দুই স্বতন্ত্র প্রবাহের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। মহারাজ শশাঙ্ক তো এই সংঘর্ষেরই প্রতীক। এই সংঘর্ষ প্রশমিত হইল পালযুগের সমন্বয়ী আদর্শ ও ছত্রচ্ছায়ার অন্তরালে। আর্য সংস্কার ও সংস্কৃতির বাহিরে যে বৃহৎ আর্যেতর সংস্কার ও সংস্কৃতি দেশে বিদ্যমান ছিল, তাহাও পাল-রাজন্যবর্গের উদার পোষকতা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্মেই আর্যেতর দেবদেবী, আচার ও সংস্কার লোকচক্ষুর অগোচরে স্বীকৃতি লাভ করিল।

পাল-রাজবংশের সমন্বয়ী ধারা

সামাজিক

এই সমন্বয় সংগঠিত হইয়াছিল ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও সংস্কৃতির আদর্শ অনুযায়ী। ভূমি-ব্যবস্থা, উত্তরাধিকার, চতুর্বর্ণের স্বীকৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্বীকৃতি এবং সংস্কৃত ভাষায় কাব্যময় সাহিত্য রচনা—সকলই ব্রাহ্মণ্য আদর্শের পরিচয় দেয়। এই আর্য, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে আশ্রয় করিয়াই উত্তর-ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সহিত বঙ্গদেশের সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। এই সংযোগ-

সাংস্কৃতিক

সাধন গুপ্তযুগেই আরম্ভ হইয়াছিল। পালযুগে উহা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিল। বঙ্গদেশে আর্য ব্রাহ্মণ্য, আর্যেতর এবং মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির এক অপূর্ব সমন্বয় হইল। এই সমন্বয়ও পালযুগেরই অবদান। ভারতের অন্যত্র এই সমন্বয় সম্ভব হয় নাই। এই সমন্বয়ী ভাবধারা বাঙ্গালীর রক্তে ছিল বলিয়াই বৈদেশিক বিধর্মী মুসলমানকেও গ্রহণ করা বাঙ্গলার পক্ষে অসম্ভব হয় নাই।

সামন্ততন্ত্র ঃ জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ও সমীকরণের আদর্শ পালযুগের রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। আত্মকর্তৃত্বের আদর্শ কেবল বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেই সক্রিয় ছিল, তাহা নহে—প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও এই আদর্শ সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইহা হইতেই সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব। বঙ্গদেশেও ষষ্ঠ শতক হইতেই বৃহত্তর রাষ্ট্রখণ্ডের মধ্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত নায়কের উল্লেখ দেখা যায়। তাঁহারা স্বীয় শাসিত অঞ্চলে স্বাধীন নরপতির মতই আচরণ করিতেন। পালযুগের শেষভাগে সামন্তপ্রথা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিল। এই সামন্ততন্ত্র একদিকে রাষ্ট্রের শক্তি, অন্যদিকে দুর্বলতার মূল; কারণ, কেন্দ্রীয় রাজশক্তি দুর্বল হইলেই এই সামন্ততন্ত্র প্রবল হইয়া উঠিত।

সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্তি ও দুর্বলতার নিদর্শন

দেবপালের মৃত্যুর পর বিজিত রাষ্ট্রসমূহ স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিল। মহীপাল পাল-সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব আংশিকভাবে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেই গৌরব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। বহিঃশত্রু কর্তৃক বিজিত রাষ্ট্র এবং আভ্যন্তরীণ সামন্তচক্রের বিদ্রোহ মহীপালের গৌরবকে স্থায়ী হইতে দেয় নাই। রামপাল কৈবর্ত-বিদ্রোহ দমন করিয়া বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। এই কার্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন সামন্তবর্গই। আবার রামপালের মৃত্যুর পর সামন্ত, মহাসামন্ত, মাণ্ডলিক, মহামাণ্ডলিক, রাজন্, রাজক, রাজন্যক প্রভৃতি সামন্তগোষ্ঠীই পালরাজগণের দুর্বলতার সুযোগে বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছিলেন।

সামন্তবর্গের দুইটি রূপ

রাজকর্মচারিতন্ত্র ঃ সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সঙ্গে রাজকর্মচারিতন্ত্রও প্রসার লাভ করিয়াছিল। পালযুগের লিপিতে এই কর্মচারিবৃন্দের সুদীর্ঘ তালিকার উল্লেখ আছে। রাজকার্যের বিভিন্ন ও বিচিত্র বিভাগের কার্য এই কর্মচারিতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হইত। মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি উচ্চতর রাজকর্মচারীর হস্তে প্রভূত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। এই সকল কর্মচারীও সুযোগ অনুযায়ী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বোধ হয়, দিব্য একজন রাজকর্মচারী ছিলেন; বৈদ্যদেব ছিলেন কুমারপালের সেনাপতি। তাঁহারা পরিশেষে রাজবিদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই সামন্ততন্ত্র কিংবা কর্মচারিতন্ত্র বিনা কারণে গড়িয়া উঠে নাই। এই যুগে বঙ্গের সামুদ্রিক বাণিজ্যপ্রবাহ প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। বহির্ভারতের সহিত বঙ্গের যোগাযোগ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচ্ছদপটেই রচিত হইয়াছিল; যদিও বাঙ্গলাদেশে আন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের প্রবাহ ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত ছিল। রাষ্ট্রে বা সমাজে শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ীর পূর্বের মতন প্রাধান্য ছিল না। ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম সমাজ-ব্যবস্থায় তাঁহাদের স্থানও অতি উচ্চে ছিল না। অন্যদিকে সমাজে কৃষি ও

সামন্ত ও কর্মচারিতন্ত্রের উদ্ভব

ভূমি-নির্ভরতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং ভূমিনির্ভর ব্রাহ্মণ, রাজোপজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিপত্তি সমাজে বৃদ্ধি পাইতেছিল। কৃষককুল অবশ্য অবহেলিত ছিল না। ভূমিনির্ভর সমাজে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই স্বাভাবিক। পালযুগের অন্তে ভূমিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল।

সেনযুগে বঙ্গদেশঃ মুসলিম আগমন

বাঙ্গলার সেন-রাজবংশ ব্রহ্মক্ষত্রিয় অথবা কর্ণাটক্ষত্রিয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ বীরসেন চন্দ্রবংশীয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন[১]। বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেন কর্ণাট আক্রমণকারী ও লুণ্ঠনকারীদের হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া একটি সেন-লিপিতে উল্লেখ আছে। এই তাম্রশাসন হইতেই অনুমিত হয় যে, সেন-রাজবংশের পিতৃভূমি ছিল কর্ণাটদেশ। কর্ণাট হইতে আগত চন্দ্রবংশীয় কোন সেন-পরিবার রাঢ় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল—সেই পরিবারেরই সন্তান ছিলেন সামন্তসেন। রাঢ়দেশ তখন কর্ণাটরাজের অধিকারভুক্ত ছিল। সামন্তসেনের বাল্য ও যৌবন সম্ভবতঃ রাঢ়দেশে কর্ণাটরাজের শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহেই অতিবাহিত হইয়াছিল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি গঙ্গাতীরে বানপ্রস্থ জীবনযাপন করিয়াছিলেন।

সেনবংশের পরিচয়

অনেকের মতে ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেন-পরিবারের পূর্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন; পরে ব্রাহ্মণ্য আচার, সংস্কার ও বৃত্তি ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় বৃত্তি গ্রহণ করেন। সেন-লিপি হইতেই জানা যায় যে, সেন-নৃপতিগণ এক সময়ে বৈদিক যাগযজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের বৈদিক ধর্মপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত[২]। অন্যদিকে বল্লালসেন বাঙ্গলার শূর-বংশের দৌহিত্র ছিলেন। শূরবংশ যদি কায়স্থ হয়, তবে সেনবংশও কায়স্থ; নচেৎ শূর ও সেন উভয় বংশই ক্ষত্রিয়।

কর্ণাটকের সেনবংশ কোন্ সময়ে কি ভাবে বঙ্গদেশে আগমন করেন, সেই সম্বন্ধে মতভেদ আছে। পাল-রাজগণের সৈন্যদলে বিভিন্ন প্রদেশের লোক ছিল; সম্ভবতঃ কর্ণাটবাসীও পাল-রাজসৈন্যদলে ছিল। সেনবংশীয় কোন কর্মচারী হয় তো শক্তি সঞ্চয় করিয়া সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং পালবংশের দুর্বলতার সুযোগে বঙ্গদেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিংবা দক্ষিণ হইতে প্রেরিত কর্ণাটের চালুক্যবংশীয় নরপতিগণের সমরাভিযানের সঙ্গে বঙ্গদেশে সেনবংশের আগমন হইতে পারে। বঙ্গদেশে যখন সামন্তসেন এবং তাঁহার পুত্র হেমন্তসেন শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন, সেই সময়েই কর্ণাট হইতে আগত একটি সেনবংশ মিথিলা ও নেপালে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এই বংশের সন্তান

সেনবংশের বঙ্গে আগমন

১) মাধাইনগর তাম্রশাসন—*Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. V, New Series, p. 471.

২) দেওপাড়া লিপি—হুগলী-হাওড়ার ইতিহাস, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, ১২৬ পৃঃ।

ছিলেন নান্যদেব। এই সময়েই কান্যকুব্জ ও বারাণসীতে গাহড়বাল বংশ স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, তিনটি রাজবংশই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগী ছিল।

হেমন্তসেন

সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে সামন্তচক্রের বিদ্রোহ এবং পালবংশের ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগে রাঢ়দেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে: "শূরবংশীয় নৃপতি স্বীয় বংশ সংহার করিয়া স্বর্গলাভ করিলে তাঁহার অরাজক রাজ্যে সেনবংশধর হেমন্ত গৌড়রাজশ্রীসম্পন্ন হইয়া শ্রীধর নামে খ্যাত হইয়াছিলেন[১]।" হেমন্তসেনের আশ্রিত শূর-রাজবংশীয়গণ তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতে সাহসী হন নাই।

বিজয়সেন ১০৯৫-১১৫৮

হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম নাম ধীসেন—পরে তিনি শত্রুসৈন্য পরাজিত করিয়া বিজয়সেন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন[২]। তিনি তাঁহার একত্রিংশ রাজ্যাঙ্ক শূরবংশীয় রাজকন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করেন[৩]। রাজেন্দ্রচোলদেবের পূর্ব ভারতে অভিযানকালে শূরনরপতি রণশূর ছিলেন অপারমন্দারের সামন্ত নৃপতি। তিনি কৈবর্ত-বিদ্রোহ দমনে রামপালের সহায়তা করেন[৪]। অপর একজন শূর-নরপতি আদিশূরের নাম বাঙ্গলার কৌলিন্যপ্রথার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শূর-পরিবারের সহিত এই বৈবাহিক সম্বন্ধ রাঢ়দেশে বিজয় সেনের প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করিয়াছিল[৫]।

বিজয়সেন কি ভাবে রাঢ়দেশের অন্যান্য সামন্তদের জয় করিয়াছিলেন, কি ভাবে বর্মন্‌রাজগণকে পরাজিত করিয়া পূর্ববঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না।

বিজয়সেন কর্তৃক বিক্রমপুর অধিকার

বিজয়সেন তাঁহার একত্রিংশ রাজ্যাঙ্কের পূর্বেই বিক্রমপুরে তাঁহার রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে বঙ্গে বর্মন্‌রাজগণের প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বিজয়সেনই বর্মন্‌বংশীয় নরপতি ভোজবর্মন্ বা তাঁহার উত্তরাধিকারীর হস্ত হইতে বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। দানসাগর গ্রন্থে উল্লিখিত আছে:

তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রে
দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বম্।
শিখরবিনিহিতাজ্ঞা বৈজয়ন্তীং বহন্তঃ
প্রণতিপরিগৃহীতারঃ প্রাংশবো রাজবংশাঃ ॥

---

১) গৌড়রাজমালা, ৪৬-৪৭ পৃঃ।
২) দেওপাড়া লিপি; হুগলী-হাওড়ার ইতিহাস, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, ১৯৬ পৃঃ।
৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৩০০ পৃঃ।
৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৩য় অংশ, ১৯-২০ পৃঃ।
৫) " " " " ৩০১ পৃঃ।

গৌড়রাজমালার রচয়িতা লিখিয়াছেন—"বর্মন্ বংশের অভ্যুদয় এবং মদন পালের দুর্বলতা নিবন্ধন গৌড়রাষ্ট্র যখন বিশৃংখল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সামন্তসেনের পৌত্র (রাজা হেমন্তসেন ও রাজ্ঞী যশোমতীর পুত্র) বিজয়সেন বরেন্দ্রভূমিতে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হেমন্তসেন একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি বাহুবলে গৌড়রাজ্যের কোন অংশ করতলগত করিতে পারিয়াছিলেন কি না, বলা যায় না। হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন রাঢ়ে এবং বঙ্গে বর্মন্‌রাজ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়াই সম্ভবতঃ স্বীয় অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য বরেন্দ্র অভিমুখে অভিযান করিয়াছিলেন, অথবা হেমন্তসেনই হয়ত' বরেন্দ্রে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে সুযোগ লাভ করিয়া বিজয়সেন তথায় স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন [১]।"

বিজয়সেন কর্তৃক বরেন্দ্রী অধিকার

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন—"বৈদিক কুলগ্রন্থানুসারে ৯৫১ শকে বা ১০২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়সেনের জন্ম। সুতরাং জয়পাল এবং বিগ্রহপালের রাজত্বকালেই তাঁহার বাল্য ও যৌবন অতিবাহিত হইয়াছিল। তৎপর দ্বিতীয় মহীপালের সময় কৈবর্ত-বিদ্রোহে যখন সমস্ত উত্তরবঙ্গ আলোড়িত হইতেছিল, সেই সময় বিজয়সেন পিতার সহিত নানা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সেনবংশের প্রভাব ও গৌরব বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্য ও যৌবনের প্রথম লীলাস্থল রাঢ় বটে, কিন্তু যখন দ্বিতীয় মহীপালের হস্ত হইতে বরেন্দ্রভূমি কৈবর্তনায়ক দিব্যের অধিকারে আসিল এবং শূরপাল ও রামপাল পৈত্রিক রাজ্য উদ্ধারের জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে বিজয়সেন নৌযান সাহায্যে গঙ্গার অপর তীরে নিদ্রাবলী নামক স্থানে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন। স্বীয় অধিকার রক্ষার জন্য কৈবর্তনায়ক দিব্যের সহিত তাঁহাকে একাধিকবার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি গৌড়াধিপ রামপালের আহ্বানে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া ভীমের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামপালের জয়লক্ষ্মী অর্জন ও কৈবর্তনাথ ভীমের সম্পূর্ণ পরাজয়ের ফলে বিজয়সেনের ভাবী সৌভাগ্যের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল।"

বিজয়সেনের শৈশব ও যৌবন

যাহা হউক, বাল্যকাল হইতেই ক্রমাগত রণক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজয়সেন নিজ প্রভুত্ব বিস্তারে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে পার্শ্ববর্তী সকল নৃপতির সহিতই তাঁহার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। সুতরাং যে পালবংশের পক্ষে একদা তিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, সেই পালবংশই তাঁহার উদীয়মান প্রভাব খর্ব করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য বিজয়সেনের প্রশস্তিতে পালবংশ 'প্রতিক্ষিতিভৃৎ' অর্থাৎ প্রতিপক্ষ নৃপতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

পাল বংশের সহিত বিজয়সেনের বিরোধ

উক্ত প্রশস্তিকার উমাপতিধর উল্লেখ করিয়াছেন,—"বিজয়সেন বীরবিক্রমে গৌড়েশ্বরকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কামরূপ-পতিকে দূরীভূত করিয়াছিলেন এবং

---

১) গৌড়রাজমালা, ৬৯ পৃঃ।

ক্ষিপ্রগতিতে কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন।" বিজয়সেনের গৌড় অভিযানে তাঁহার তরুণ-বয়স্ক পৌত্র লক্ষ্মণসেন বীরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌড়াধিপতি পরাজিত হইলেও এই পরাজয় বিজয়সেন কর্তৃক সমগ্র বরেন্দ্রী অধিকার সূচনা করে না। বিজয়সেন কর্তৃক পরাজিত গৌড়াধিপতি সম্ভবতঃ মদনপাল [১]; কারণ মদনপালের সময়েই পালবংশের আধিপত্য গৌড়-বরেন্দ্রীতে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল।

বিজয়সেনের শৌর্য

বিজয়সেন পাল-রাজগণের নিকট হইতে দক্ষিণ বরেন্দ্রী অধিকারের পর মহাপরাক্রমশালী নরপতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সেইজন্যই ইতিহাস-কারগণের অভিমত এই যে, বরেন্দ্রখণ্ডেই বিজয়সেনের প্রথম অভ্যুদয়। অতঃপর তিনি রাঢ়ের কতকাংশও অধিকার করেন। এই সময়ে শ্যামলবর্মা রাঢ় পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিজয়সেন দক্ষিণ বরেন্দ্রী অধিকার করিয়া প্রথমে দেবপাড়ার নিকটবর্তী বিক্রমপুরেই অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি বরেন্দ্রী বিজয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ এই স্থানে সুবিখ্যাত প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রাজকবি উমাপতিধর উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠার স্মৃতিরক্ষার জন্য এক প্রশস্তি রচনা করেন। ইহাই দেবপাড়া বা দেওপাড়া প্রশস্তি নামে পরিচিত।

বিজয়সেনের ধর্মানুরাগ ও ব্রাহ্মণভক্তি

রাজকবি উমাপতিধর দেবপাড়া প্রশস্তিতে বিজয়সেন কর্তৃক অনুষ্ঠিত অসংখ্য যাগযজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন; এই সকল যাগযজ্ঞানুষ্ঠান হইতে অনুমিত হয় যে, বিজয়সেন বৈদিক ধর্মে বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহার এতই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন যে, তাঁহার অনুগ্রহে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ বিত্তশালী ও ধনবান হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিবিধ কুলপঞ্জী গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিজয়সেন বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া গৌড়রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-প্রভাবে বরেন্দ্রবাসী যে সকল ব্রাহ্মণ বৈদিকসংস্কারভ্রষ্ট হইয়াছিল, বিজয়সেন আনীত ব্রাহ্মণগণের প্রচেষ্টায় তাহারা পুনরায় বৈদিক সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিল। বিজয়সেন শিবকে ব্যাঘ্রচর্মের পরিবর্তে কৌষেয় বস্ত্র, সর্পমালার পরিবর্তে মনোহর কণ্ঠহার, ভস্মের পরিবর্তে চন্দনানুলেপন এবং নরকপালের পরিবর্তে মুক্তামালা দ্বারা শোভিত করেন [২]। বিজয়সেন এত শিবভক্ত ছিলেন যে, শিবপূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না; সম্ভবতঃ সেইজন্যই তিনি 'বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

রামপালদেবের পরবর্তী পাল-নরপতিগণের দুর্বলতার সুযোগে পরমেশ্বর পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ বিজয়সেন বঙ্গদেশে সেনবংশের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি প্রায় সুদীর্ঘ ৬৩।৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বল্লালসেন ১১৫৮-৭৯ খ্রীঃ

বিজয়সেনের পর তাঁহার পুত্র বল্লালসেন রাঢ়-বঙ্গের অধিপতি হইলেন। তিনি ছিলেন শূর-রাজকন্যা বিলাসদেবীর পুত্র। আবুল ফজল তাঁহার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বল্লালসেন পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন। দানসাগর ও অদ্ভুত-

---

১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৩০৭ পৃঃ।
২) দেওপাড়া প্রশস্তি, ৩১ শ্লোক।

সাগর গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে যে, গৌড়েশ্বর বল্লালসেন ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহলীলা সংবরণ করেন। সুতরাং আইন-ই-আকবরী এবং দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরের উক্তি বিচার করিলে অনুমিত হয় যে, বল্লালসেন সম্ভবতঃ ১১৭৯ – ৫০ = ১১২৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন। রাজ্যাভিষেকের পরেই তিনি মিথিলা জয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলালিপি এবং বল্লালসেনের সীতাহাটি তাম্রশাসনে তাঁহারা উভয়েই 'মহারাজাধিরাজ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, 'গৌড়েন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত হন নাই। অদ্ভুতসাগর গ্রন্থে ও দানসাগর গ্রন্থে বল্লালসেন 'নিঃশঙ্ক শঙ্কর গৌড়েশ্বর' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। অদ্ভুতসাগর গ্রন্থের সূচনায় উল্লেখ আছে যে, বল্লালসেন গৌড়ের শেষ নরপতি গোবিন্দপালকে পরাস্ত করিয়াই 'গৌড়েশ্বর' উপাধি লাভ করেন। ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়াধিপতি গোবিন্দপালের রাজ্যাবসান হয়। সুতরাং ধারণা করা যায় যে, বল্লালসেন গৌড় অধিকার করিয়া সম্ভবতঃ ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। সম্ভবতঃ বল্লালসেনের বীর কীর্তি এবং গৌড়াধিকারকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্যই অদ্ভুতসাগর গ্রন্থে ১০৮২ শকে বল্লালের রাজ্যারম্ভ লিখিত হইয়াছে [১]। ১১২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়-মগধ জয় করিয়া গৌড়েশ্বররূপে রাজ্য-শাসন আরম্ভ করেন।

বল্লালসেনের গৌড়াধিকার

বল্লালসেন তাঁহার পিতা বিজয়সেনের ন্যায় মহাবীর ছিলেন। বিজয়সেনের রাজ্য রাঢ় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমসাময়িক যুগে বঙ্গে বর্মনবংশীয়, গৌড়-মগধে পালবংশীয় এবং মিথিলায় কর্ণাটকবংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব করিতেন। সীতাহাটি তাম্রলেখে উল্লেখ আছে যে, বীরবর বল্লালসেন পৈত্রিক রাজ্যে সন্তুষ্ট না থাকিয়া এই সকল রাজ্য বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বীরদর্পে ভারতের প্রাচ্যভূখণ্ড প্রকম্পিত হইয়াছিল।

বল্লালসেনের বিজয়াভিযান

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, রাজা 'বৌজা'র (বৌজ = বল্লাল) জীবনান্ত হইলে তাঁহার রাজ্য রায় লখমনিয়ার হস্তগত হয় [২]। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ল্যাসেন (Lassen) সাহেব 'বৌজা'র পরিবর্তে 'ভোজ' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গাধিপতি শ্যামলবর্মার পুত্র ভোজবর্মার পর বল্লাল বঙ্গ অধিকার করেন এবং বিক্রমপুরে একটি রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপর তিনি মিথিলা জয় করিয়া উহাকে স্বীয় রাজ্যান্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়া গৌড় অধিকার করেন এবং পৌণ্ড্রবর্ধন বা মহাস্থান-গড় হইতে গৌড়-মগধের মধ্যবর্তী স্থানে (মালদহের নিকটে) সুপ্রসিদ্ধ নূতন **গৌড়** নগরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণসেনের নামানুসারে উহার নামকরণ করেন **লক্ষ্মণাবতী**। সেই সময়ে লক্ষ্মণাবতীর ন্যায় সুবিস্তৃত, সুদৃশ্য এবং সমৃদ্ধিশালী নগরী উত্তর ভারতে ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বল্লালসেনের সুবিস্তৃত রাজ্যসীমা পশ্চিমে মগধ ও মিথিলা হইতে পূর্বে

নূতন গৌড়নগরী—লক্ষ্মণাবতী

১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, দুর্গাচরণ সান্যাল, ৩২৩ পৃঃ।

২) *Ain-i-Akbari*, Jarret's Tr. Vol. II. p. 148.

বঙ্গের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এবং উত্তরে দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সুবিস্তৃত রাজ্যের নানা স্থানে এখনও বল্লালসেনের বহু কীর্তিচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত পাথরঘর নামক স্থানে বল্লালদীঘি নামক একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা রহিয়াছে। বিক্রমপুরে বল্লালবাড়ী এবং দক্ষিণ-রাঢ়ে নবদ্বীপেও বল্লালদীঘি বিদ্যমান আছে।[১]

বল্লালসেনের রাজ্যসীমা

বল্লালসেন এই সুবিস্তৃত রাজ্য রাঢ়, বরেন্দ্রী, বঙ্গ, বাগ্‌ড়ী ও মিথিলা এই পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার সময়ে বাগ্‌ড়ী উপবঙ্গ নামে আখ্যাত হইত। যশোহর হইতে বিক্রমপুর পর্যন্ত ভূখণ্ড উপবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২]

বল্লালসেনের সময়ে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। বল্লালের পূর্বপুরুষগণ বৈদিক ধর্ম এবং আচার-অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী হইলেও রাজনীতিতে বল্লালসেন দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া স্বয়ং তান্ত্রিকাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ এবং তাঁহার বেদাচারপ্রিয় পুত্র লক্ষ্মণসেনও তাঁহার উপর বিরূপ হইয়াছিলেন। কিন্তু বল্লালসেন পুত্রমিত্রদের বিরূপতায় ভীত না হইয়া বেদাচারী ব্রাহ্মণদিগকে ও পুত্র লক্ষ্মণসেনকে স্বমতে আনয়নের চেষ্টা করেন। মহারাজ বল্লালসেন বেদাচারত্যাগী কুলাচারবর্তী ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান ও সম্পত্তি প্রদান করিয়া সমাজের শীর্ষস্থানে স্থাপন করিলেন।

বল্লালসেনের ধর্মমত

আদিশূর কর্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরগণ অনেকেই তন্ত্রমতের উদারতা ও উপকারিতা দর্শনে বৈদিক আচার পরিত্যাগ করিয়া তান্ত্রিক আচার অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং বহুবিধ তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া জনসমাজে প্রতিপন্ন করিলেন—কলিকালে বেদমন্ত্র বিষহীন সর্পবৎ নিবীর্য—"নিবীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।" তান্ত্রিকগণের অসাধারণ শক্তি ও তন্ত্রমতে আচার-বিচারের গৌণস্থান দর্শনে প্রাচ্য ভারতের জনগণের অধিকাংশই তন্ত্রমত গ্রহণ করিতে লাগিল। মহারাজ বল্লালসেনও মহাশৈব এবং তন্ত্রাচারী ছিলেন। তাঁহার সীতাহাটি তাম্রশাসন সদাশিব মুদ্রায় মুদ্রিত এবং উহাতে তিনি পরম মাহেশ্বর বলিয়া আখ্যায়িত হইয়াছেন[৩]।

তন্ত্রাচারী মহাশৈব বল্লালসেন

বল্লালচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বল্লালসেন সিদ্ধিলাভের আশায় নিম্নবর্ণীয়া জনৈকা রমণীর সহিত তন্ত্রোক্ত সাধনায় নিরত হইয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "রাজত্বকালের প্রথমাংশে বল্লাল বৌদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে তিনি এক চণ্ডাল-তনয়াকে হরণ করিয়া আনেন এবং ঐ চণ্ডাল-কন্যার বক্ষের উপর আসন গ্রহণ করিয়া জপ করিতেন; 'তারা'-শক্তির উপাসকগণ এই কাহিনী বিশ্বাস করেন।" রাজত্বের প্রারম্ভে বল্লাল তান্ত্রিকধর্মে আসক্ত

বল্লালসেনের তন্ত্রসাধনা

---

১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৩২৫ পৃঃ।
২) " " ৩২৫ পৃঃ।
৩) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৭ সাল, ২৩৩, ২৩৬-৩৭ পৃঃ।

ও শক্তি সাধনায় রত ছিলেন। পরে গাড়োয়ালের অন্তর্গত যোশীমঠ হইতে আগত সিংহগিরি নামক একজন শৈব তান্ত্রিকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।[১] ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বল্লালসেন একজন কুলাচারী মহাশাক্ত ছিলেন। বল্লালসেন চালুক্য-রাজকন্যা রামদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।[২]

বল্লালসেনের কৌলিন্য-প্রথা ও সমাজ-সংস্কার

বৌদ্ধমতপ্লাবিত গৌড়বঙ্গে বৈদিক ধর্ম পুনঃপ্রবর্তনের জন্য আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই গৌড়বঙ্গ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল-নরপতিগণের অধীন হওয়ায় এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের কয়েকজন আদিশূরের পুত্র ভূশূরের সঙ্গে রাঢ়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহারা রাঢ়ী বলিয়া আখ্যায়িত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বরেন্দ্র-ভূমিতেই স্থায়িভাবে বসবাস. আরম্ভ করেন, তাঁহারা বারেন্দ্রী নামে পরিচিত হইলেন।

বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ রাঢ়-ভূমির এক বিশিষ্ট অংশে বসতি স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম রক্ষার সংকল্প করিলেন। কিন্তু তখন প্রায় সমগ্র দেশেই তান্ত্রিকাচারের স্রোত প্রবাহিত ছিল। তন্ত্রমতে আচার-বিচারের মধ্যে কঠোরতা ছিল না এবং সকলেরই ভগবৎসাধনায় অধিকার ছিল; এই কারণে বহুলোক সাগ্রহে তান্ত্রিক পথ ও মত গ্রহণ করে। অবশেষে পালবংশের অবসানে বেদাচার-প্রিয় সেনবংশীয় নরপতি বিজয়সেনের এবং বর্মন্‌বংশীয় নৃপতিবর্গের রাজত্বকালে পুনরায় এদেশে কতিপয় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আনীত হইলেন। তাঁহারা এখনও বৈদিক ব্রাহ্মণ নামেই পরিচিত। তাঁহারা বৈদিক আচার পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু জনসাধারণ তান্ত্রিক মতেরই পক্ষপাতী রহিয়া গেল। এমন কি, বৌদ্ধগণও তান্ত্রিক ধর্মের নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইল। দেশের এইরূপ পরিস্থিতিতে বল্লালসেনের অভ্যুদয়। বল্লালসেন ছিলেন বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও রাজনীতিকুশল ব্যক্তি। তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, যে নরপতির উপর প্রজাগণ সন্তুষ্ট বা যিনি প্রজার সহানুভূতি লাভ করিতে পারেন, সেই নরপতিই ক্ষমতাশালী। সেই জন্যই সম্ভবতঃ বৈদিক ধর্মানুরাগী সেনবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও বল্লালসেন প্রথমে বৌদ্ধ তান্ত্রিকাচার গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণসেন বৈদিকাচার এবং হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া তিনিও বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা পরিত্যাগ করিয়া শৈব তান্ত্রিকতা গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন।

তন্ত্রমতের প্রসার

বৈদিক ব্রাহ্মণ-বংশধরগণের অনেকেই তন্ত্রমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বল্লালসেনের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। বল্লালসেন সম্ভবতঃ এই কুলাচার-নিরত ব্রাহ্মণগণকেই 'কুলীন' (সৎ কুলে জাত, কু অর্থাৎ পৃথিবীতে লীন অথবা জাত) আখ্যায় ভূষিত করিয়া সমাজে সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করেন।

---

১) *Introduction to Modern Buddhism, mm.* **H. P, Sastri, p. 21**

২) **লক্ষ্মণসেনের মাধাই নগর তাম্রলেখ, ৯ সংখ্যক শ্লোক**

বল্লালসেন বৈদ্য এবং কায়স্থগণের মধ্যেও কৌলিন্য-প্রথার প্রবর্তন করেন।[১] অবশ্য বল্লালসেন কর্তৃক কৌলিন্য-প্রথা প্রবর্তন সম্বন্ধেও মতবিরোধ রহিয়াছে।

যাহা হউক, বল্লালসেন প্রবর্তিত কৌলিন্য-প্রথা প্রথমে রাঢ়দেশে এবং পরে বঙ্গে প্রবর্তিত হইয়াছিল।

বল্লালসেন কর্তৃক ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত দোঁহাকোষ ও তাঁহার সহযাত্রা নামক টীকা হইতে জানা যায় যে, তৎকালেও গৌড়বঙ্গে বহু বৌদ্ধ বাস করিত এবং তাহারা অত্যন্ত ব্রাহ্মণবিদ্বেষী ছিল। বল্লালসেন বৌদ্ধ-প্রাধান্য বিনষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এবং ব্রাহ্মণবিদ্বেষীর উপযুক্ত শাস্তিবিধানের জন্য গৌড়ে একশত জন, মগধে পঞ্চাশ জন, ভোজে ষাট জন, রসাঙ্গে (আরাকানে) ষাট জন, উৎকলে বাইশ জন এবং মৌড়ঙ্গে (আসাম তরাইয়ে) বাইশ জন ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়াছিলেন।[২] এই সময়ে অনেকেই বৌদ্ধ সমাজ ত্যাগ করিয়া হিন্দু সমাজে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছিল। যে নয়টি শাখা বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্বীকার করিল, তাহারাই 'নবশাখ' বলিয়া পরিচিত হয়। এই নয়টি শাখা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অবস্থায় উপবীতাদি পরিত্যাগহেতু শূদ্ররূপেই পরিগণিত হইল।[৩] যাহারা ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্বীকার করিল না, তাহারাই সমাজে পঙ্‌ক্তি-বহির্ভূত হইয়া রহিল। তাহাদের মধ্যে সুবর্ণবণিক্, স্বর্ণকার, মাহিষ্য ও গোপ গোষ্ঠী ছিল প্রধান।

নবশাখ

গৌড়বঙ্গের নানাস্থানে সুবর্ণবণিক্‌গণ অতিশয় ধনশালী এবং মাহিষ্যগণ অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিল। দক্ষিণ রাঢ়ের সীমান্তদেশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাহিষ্যকুলপতি রাজত্ব করিতেন। গৌড়ের সুবর্ণবণিক্‌গণ গৌড়েশ্বর অপেক্ষাও অধিকতর ঐশ্বর্যবান ছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা বৌদ্ধধর্মবিধ্বস্তকারী ব্রাহ্মণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের পৃষ্ঠপোষক গৌড়েশ্বরকেও গ্রাহ্য করিতেন না এবং সেই কারণেই মুসলিম বিজয়ের পূর্বমুহূর্তে তাঁহারা বঙ্গের ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী সেন-নরপতিকে কোনরূপ সহায়তা করেন নাই।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, বল্লালসেনের পর চালুক্য-রাজকন্যা রামদেবীর গর্ভজাত প্রিয়-পুত্র লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। লক্ষ্মণসেন সিংহাসনারোহণকালে ছিলেন পরিণতবয়স্ক। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজের বিবরণ অনুসারে ইখতিয়ার কর্তৃক নদীয়া বিজয়ের আশী বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের জন্ম।[৪]

লক্ষ্মণসেন (১১৭৯-১২০০ খ্রীঃ)

লক্ষ্মণসেন বীরশ্রেষ্ঠ, ধর্মানুরাগী, বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিদ্বান এবং বিদ্যানুরাগী ছিলেন। কেশবসেনের তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে যে, "লক্ষ্মণসেনের বাহুদ্বয় ছিল করিকর-সদৃশ, বক্ষঃস্থল শিলার ন্যায় সংহত ছিল। মহাপরাক্রমশালী লক্ষ্মণের হস্তবিনির্গত অমোঘ শরে শত্রুর নিস্তার ছিল না। মদজলক্ষরী বহু বৃংহস্তিসহ

---

১) হুগলী-হাওড়ার ইতিহাস, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, ২৪৭ পৃঃ।

২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, নগেন্দ্রনাথ বসু, ৩৩১-৩৩৩ পৃঃ।

৩) যদুনন্দনের মুলটাকুর।

৪) Tabaqat-i-Nasiri Tr. by Raverty, p. [illegible]

বীরকেশরী লক্ষ্মণসেন রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতেন। এই ধরাধামে তাঁহার প্রতিযোগী শত্রু ছিল না।"

বাহূ বারণহস্তকাণ্ডসদৃশৌ বক্ষঃ শিলাসংহতং
বাণঃ প্রাণহরদ্বিষাং মদজলপ্রস্যন্দিনো দন্তিনঃ।
যস্যৈতাং সমরাঙ্গনপ্রণয়িনীং কৃত্বা স্থিতিং বেধসা
কো জানাতি কুতঃ কুতো ন বসুধা চক্রেঽনুরূপো রিপুঃ॥[১]

লক্ষ্মণসেনের রাজ্যবিজয়—কাশী, কলিঙ্গ ও কামরূপ

মাধাইনগর তাম্রলেখ হইতে জানা যায় যে, "লক্ষ্মণসেন প্রথম যৌবনে কলিঙ্গ-দেশের রমণীগণের সহিত কেলি" করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন হইতে লক্ষ্মণসেন কর্তৃক কলিঙ্গ আক্রমণের আভাসও পাওয়া যায়। মাধাইনগর তাম্রশাসন হইতে আরও জানা যায় যে, লক্ষ্মণসেন স্বীয় বাহুবলে কাশীরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং কামরূপের রাজাও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

যস্য কৌমারকেলিঃ কলিঙ্গে চাঙ্গনাভিঃ।
যেনাসৌ কাশিরাজঃ সমরভুবি জিতঃ।
বিক্রমবশীকৃতকামরূপঃ।[২]

লক্ষ্মণসেনের সহিত কাশিনরেশ জয়চন্দ্রের সংগ্রাম ও জয়চন্দ্রের পরাজয়

লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন এবং বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনদ্বয়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি বারাণসী এবং প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন।[৩] সম্ভবতঃ মগধে কান্যকুব্জরাজের সহিত যুদ্ধের সময়েই বঙ্গাধিপ লক্ষ্মণসেন বারাণসী ও প্রয়াগ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। পালবংশীয় শেষ নরপতি গোবিন্দ পালের পর মগধ-অঞ্চল গাহড়বাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধগয়া এবং বারাণসীও গাহড়বাল রাজ্যের অধীন হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেন যে কাশিরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ গাহড়বাল-রাজ জয়চন্দ্র। লক্ষ্মণসেন কর্তৃক প্রয়াগ পর্যন্ত বিজয়ের কাহিনী সম্বন্ধে সুনিশ্চিত প্রমাণ নাই—অবশ্য মুসলিম বিজয় পর্যন্ত গয়া অঞ্চল লক্ষ্মণসেনের অধিকারভুক্ত ছিল।[৪] কিন্তু লক্ষ্মণসেনের মগধ অধিকার এবং প্রয়াগ পর্যন্ত সমরাভিযান প্রেরণ গাহড়বাল শক্তিকে দুর্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এখানে সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবই পরিলক্ষিত হয়; কারণ এই গাহড়বাল রাজ্য ছিল ক্রমাগ্রসরমান মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে শেষ প্রতিরোধ প্রাচীর।

গাহড়বাল প্রতিরোধ-প্রাচীর ভঙ্গের পরিণাম

লক্ষ্মণসেন ধারণা করিতে পারেন নাই যে, প্রতিরোধ প্রাচীর চূর্ণ হইলেই মুসলিম আক্রমণের সর্বাত্মক আঘাত তাঁহার রাজ্যের উপর আসিয়া পড়িবে। সুতরাং গাহড়বাল শক্তিকে দুর্বল করিয়া তিনি নিজের অজ্ঞাতে বিদেশী বিধর্মী মুসলিম শক্তিকে পরাক্রান্ত হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে দাক্ষিণাত্য

---

১) *J A S B.* New Series, Vol. X, p. 100, Verse 13.

২) *Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal,* New Series, Vol. V. p. 473

৩) *J A S B.* 1828, pt. I. II.

৪) বাঙ্গলার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, ৩১৫-১৬ পৃঃ।

সম্বন্ধে এই প্রকার প্রমাদই করিয়াছিল ভারতের মুঘল রাজবংশ। দাক্ষিণাত্যের শেষ মুসলিম রাজ্য গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর ধ্বংস করিয়া তাঁহারাও মুঘলশক্র মারাঠাদের শক্তিশালী হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিল। সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের এই অদূরদর্শিতার জন্যই ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খালজীর পক্ষে প্রায় বিনা বাধায় সমগ্র বিহার ও বঙ্গ বিজয় সম্ভবপর হইয়াছিল। কথিত আছে যে, ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ মাত্র সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বঙ্গের রাজধানী নদীয়া নগরী বা নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন।

বিনা বাধায় বখতিয়ারের নদীয়া বিজয়

ইখতিয়ারউদ্দীনের বঙ্গবিজয় কাহিনী আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নহে। আমাদের বক্তব্য বিষয়—ইখতিয়ারউদ্দীন স্বল্পায়াসে নামমাত্র সৈন্য সাহায্যে কিরূপে নদীয়া বিজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তদানীন্তন বাঙ্গলার রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এই বিষয়ে তাঁহাকে কতদূর সহায়তা করিয়াছিল।

লক্ষ্মণসেনের ধর্মানুরাগ

এ পর্যন্ত মহারাজ লক্ষ্মণসেনের চারিখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল তাম্রশাসনের তিনখানিতে লক্ষ্মণসেনকে পরমবৈষ্ণব নরসিংহ উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে। এই সকল উপাধি আলোচনা করিলে মনে হয়, তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু তাম্রশাসনগুলিতে প্রথমেই মহাদেবের বন্দনা দেখিতে পাওয়া যায়।[১] বেদের চর্চা পুনঃপ্রবর্তিত করিবার জন্য তিনি পুরুষোত্তম নামক বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে পাণিনির একটি 'বৃত্তি' (ব্যাখ্যান গ্রন্থ) রচনা করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে তিনি 'ভাষাবৃত্তি' রচনা করেন। লক্ষ্মণসেনের প্রধানমন্ত্রী পশুপতি ব্রাহ্মণগণের জন্য 'সংস্কার-পদ্ধতি' এবং হলায়ুধ বৈদিক আচার রক্ষা করিবার জন্য 'ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব' রচনা করেন। হলায়ুধের ভ্রাতা পণ্ডিতপ্রবর ঈশান 'আহ্নিক-পদ্ধতি' রচনা করিয়া বৌদ্ধভাবাপন্ন বরেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণগণকে হিন্দু আচার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন।

হিন্দু তান্ত্রিকগণের প্রভাবে হীনবল হইয়া বৌদ্ধগণ বহু পূর্ব হইতেই তান্ত্রিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণগণের পৃষ্ঠপোষক হিন্দু ধর্মানুরাগী সেনবংশীয় নরপতি বিজয়সেন ও বল্লালসেনের সময়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বহু ব্যক্তি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। মহারাজ লক্ষ্মণসেন হিন্দু তান্ত্রিকতার সহিত বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার সমন্বয় করিবার অভিপ্রায়ে রাজপণ্ডিত হলায়ুধকে 'মৎস্যসূক্ত' প্রচার করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। হলায়ুধ মৎস্যসূক্ততন্ত্রে কৌশলে মদ্য-মাংসাদির নিন্দা করিয়া হিন্দু সমাজ হইতে মদ্য-মাংসের প্রচলন নিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।[২] অন্যদিকে বৌদ্ধ তান্ত্রিকাচার সমাজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া রাজপণ্ডিত শ্রেষ্ঠ ধর্মাধিকারী হলায়ুধ তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ঈশান ও পশুপতির সাহায্যে বৌদ্ধতান্ত্রিকতা প্রতিরোধের জন্য যত্নবান হইলেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের 'তারা' লোকেশ্বর বুদ্ধ-সুতা। এই পণ্ডিত ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে 'প্রজ্ঞাপারমিতা' নামে অভিহিত করিলেন। মৎস্যসূক্তে লোকেশসুতা তারা বা প্রজ্ঞাপারমিতার স্তবের

লক্ষ্মণসেন কর্তৃক বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রগুলের সমন্বয় সাধন-প্রচেষ্টা

---

১) *J A S B*, 1909, p. 471

২) মৎস্যসূক্ত, ৬৬-৬৭ পটল।

সন্ধান পাওয়া যায়। হলায়ুধ মৎস্যসূক্তে স্মার্ত মতানুসারে খাদ্যাখাদ্য নির্বাচন, শৌচাশৌচ ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের অবশ্য-কর্তব্যের বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছেন। মৎস্যসূক্ত প্রচার করিয়া হলায়ুধ বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন।

বঙ্গের বিক্রমাদিত্য লক্ষ্মণসেন

আংশিক বিচারে মহারাজ লক্ষ্মণসেন ছিলেন 'বঙ্গের বিক্রমাদিত্য'। রাজপণ্ডিত হলায়ুধ এবং তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ঈশান ও পশুপতি ব্যতীত অন্যান্য অনেক পণ্ডিত ও মনীষী তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। রূপসনাতন নিম্নোক্ত শ্লোকটি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাগৃহের দ্বারদেশে উৎকীর্ণ দেখিয়াছিলেন—

গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ॥

গীতগোবিন্দের টীকাকার নারায়ণ ভট্ট বলেন, উক্ত শ্লোকটি লক্ষ্মণসেন স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত পৃথ্বীধর, ভবানন্দ, দিনকর মিশ্র, অরবিন্দ ভট্ট, বলভদ্র, বেতাল, ব্যাস, কবিরাজ, পুরুষোত্তম দেব, সঞ্চাধর, উদয়ন প্রভৃতি বিদ্বন্মণ্ডলী দ্বারা লক্ষ্মণসেন সর্বদা পরিবেষ্টিত থাকিতেন।[১]

সেনযুগের বিবুধমণ্ডলী

হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব এবং মৎস্যসূক্ত ভিন্ন মীমাংসাসর্ব্বস্ব, বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব, শৈবসর্ব্বস্ব, পুরাণসর্ব্বস্ব ও পণ্ডিতসর্ব্বস্ব রচনা করেন। পুরুষোত্তম ভাষাবৃত্তি, ত্রিকাণ্ডকোষ, দ্বিরূপকোষ, একাক্ষরকোষ, দ্ব্যর্থকোষ, কারককোষ, প্রকাশকোষ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং পশুপতি ও ঈশান পাশুপতপদ্ধতি ও আহ্নিকতত্ত্বপদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। গোবর্ধন আর্য্যাসপ্তশতী, জয়দেব গীতগোবিন্দ, কবীন্দ্র ধোয়ী পবনদূত কাব্য রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্র ব্যতীত শিল্পক্ষেত্রেও এই সময় গৌড়রাজ্য উন্নতির উচ্চ শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল।[২]

সেনযুগে বঙ্গের বিলাস-জীবন ও উহার পরিণতি

কিন্তু লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বাঙ্গালীর মেধার উন্নতি সত্ত্বেও দেশের নরনারী বিলাসিতার স্রোতে নিমগ্ন হইয়াছিল। কবিরাজ ধোয়ীর পবনদূত এবং গোবর্দ্ধন আচার্য্যের আর্য্যাসপ্তশতী পাঠে তৎকালীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের রুচির বিষয় সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কবিরাজ ধোয়ী-বিরচিত কয়েকটি শ্লোক হইতে বঙ্গদেশীয় ভদ্র নরনারীর মানসিক অবস্থা বেশ অনুধাবন করা যায়—

বৃদ্ধোষ্মাণস্তনপরিসরাঃ কুঙ্কুমস্যাঙ্গরাগা
দোলাঃ কেলিব্যসনরসিকাঃ সুন্দরীণাং সমূহাঃ।
ক্রীড়াবাপ্যঃ প্রতনু-সলিলা মালতীদাম রাত্রিঃ
স্যানজ্যোৎস্নামুদমবিরতং কুর্ব্বতে যত্র যূনাং॥
ভ্রাম্যন্তীনাং ভ্রমসি নিবিড়ে বল্লভাকাঙ্ক্ষিণীনাং
লাক্ষারাগাশ্চরণগলিতাঃ পৌরসীমন্তিনীনাম্।

---

১) ঢাকার ইতিহাস, যতীন্দ্র মোহন রায়, ২য় খণ্ড, ৪০৬ পৃঃ।
২) বাঙ্গলার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, ২৯৯ পৃঃ।

রক্তাশোকস্তবকললিতৈর্বালভানোর্ময়ূখৈ-
র্নালক্ষ্যন্তে রজনিবিগমে পৌরমার্গেষু যত্র।

"এই সময়ে দেশ মধ্যে ব্যভিচারস্রোত এত প্রবলভাবে প্রবাহিত হইতেছিল যে, সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণীগণও জ্যোৎস্নালোকে প্রকাশ্য রাজপথে দোলায় আরোহিত নগর-বাসিগণের সহিত প্রেমালাপে সম্পূর্ণ রজনী অতিবাহিত করিত। রাজপথ বার-বিলাসিনীগণের মঞ্জীর-নিক্কণে চমকিত ও মুখরিত থাকিত। বল্লভাকাঙ্ক্ষিণী স্বেচ্ছা-বিহারিণী অভিসারিকাগণ গভীর রজনীর অন্ধকারে রাজপথে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিত।

সেনযুগে নারী-সমাজের অধঃপতন

"যে গৌড়বাসিগণের বীরদর্পের নিকট ভারতের সুদূর পশ্চিম সীমান্তস্থিত পুরুষপুর হইতে দক্ষিণে কোঙ্গদ মণ্ডল পর্যন্ত একদিন মস্তক অবনত করিয়াছিল—সেই অরাতিভীতিস্থল শৌর্যবীর্যাধার, মহাকৌশলী, কার্যকুশল গৌড়বাসিজনগণ ব্যভিচার ও বিলাসিতার স্রোতে ভাসমান হইয়া ক্রমশঃ অলস, ভীরু ও অদৃষ্টবাদী হইয়া উঠিয়াছিল।[১]

সেনযুগের রাষ্ট্রীয় আদর্শ

বর্তমান ইতিহাসের সিদ্ধান্ত এই যে, সেন রাজবংশ বাঙ্গালী ছিল না—কর্ণাট হইতে আসিয়া পালযুগ-সৃষ্ট বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। এই যুগে পূর্ববঙ্গে অধিষ্ঠিত বর্মন্ রাজবংশও ছিল দক্ষিণাগত। সেন ও বর্মন্ রাজবংশ ছিল অ-বাঙ্গালী। পাল নরপতিগণ ছিলেন পরম সৌগত অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং সেনবংশ ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মানুরাগী ও ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী। অথচ পূর্ববঙ্গের চন্দ্ররাজবংশ ছিল পালবংশের মত পরম সৌগত, কিন্তু উহাদের স্থলাভিষিক্ত বর্মন্ এবং দেববংশ উভয়ই ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস-সম্পন্ন। সুতরাং ধর্ম ও সংস্কৃতিগত এই বিভিন্নতা সমসাময়িক জীবনদর্শন, রাষ্ট্রাদর্শ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছিল।

রাষ্ট্রাদর্শ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য

পালযুগের সামাজিক আদর্শ আনুষ্ঠানিকভাবে এই যুগে অপরিবর্তিত ছিল। নূতন কোন রাষ্ট্রীয় আদর্শের সৃষ্টি অথবা রাষ্ট্রযন্ত্রের কোন বিশেষ পরিবর্তন এই যুগে হয় নাই। স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য ও আত্মকর্তৃত্বের আদর্শই বলবৎ ছিল। এমন কি, বিদেশী বিধর্মী মুসলিম শক্তির দুর্ধর্ষ আক্রমণ এবং কঠিন আঘাত সত্ত্বেও সামগ্রিক ধর্মীয় ঐক্যবোধ অথবা বৃহত্তর ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আদর্শ গড়িয়া উঠে নাই। সামন্ততন্ত্র তখনও যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। ত্রিপুরা অঞ্চলে পট্টিকেরা রাজ্য এবং মেঘনার পূর্বতীর মিহিরকূলে দেববংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ্য এই সামন্ততন্ত্রের সক্রিয়তারই নিদর্শন।

প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব ও সামন্ততন্ত্র

সেন যুগে কর্মচারিতন্ত্রও ছিল ক্রমবর্ধমান। এই যুগেই নূতন নূতন শাসনবিভাগ এবং তৎসংক্রান্ত রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্র ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গেই 'মহা' পদের সংখ্যাও বর্ধিত হইয়াছিল—যেমন মহামন্ত্রী, মহাপুরোহিত, মহাসন্ধিবিগ্রহিক, মহাধর্মাধ্যক্ষ প্রভৃতি। এই যুগে রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শও সংকীর্ণ

---

১) হুগলী-হাওড়ার ইতিহাস, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, ১ম খণ্ড, ২৭৭ পৃঃ।

হইয়া আসিয়াছিল। সমাজ ভূমিনির্ভর এবং কৃষিনির্ভর হইয়া উঠিলেও কৃষককুল ছিল রাজদৃষ্টিতে অবজ্ঞাত—তাহাদের কোন উল্লেখ রাজকীয় তাম্রশাসন, নীতিশাস্ত্র বা লিপিমালায় নাই। সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তরের জনগণের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। অথচ বৌদ্ধধর্মের আদর্শানুযায়ী পালযুগে সমাজের বণিক-শিল্পী-কৃষক-চণ্ডাল—কেহই অবহেলিত কিংবা অবজ্ঞাত হয় নাই। সুতরাং সেনযুগে দেখা যায় যে, একদিকে রাষ্ট্রের সমাজদৃষ্টি যত সংকীর্ণ হইতেছে, রাষ্ট্রের পরিধি যত ক্ষুদ্র হইতেছে, কর্মচারিতন্ত্র তত বিস্তৃত হইতেছে, রাজকর্মচারীর সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে—বেতনভোগী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও সমভাবে বিস্তৃত হইতেছে। কর্মচারি-শ্রেণী সংখ্যা ও অধিকার বৃদ্ধিতে দর্পিত ও আত্মসচেতন হইয়া উঠিয়াছে। রাজার সর্বময় কর্তৃত্ব এবং তৎসঙ্গে আড়ম্বরও বৃদ্ধি পাইয়াছে—রাজপরিবারের আভিজাত্য-বোধও জাগ্রত হইয়াছে। পুরোহিত, মহাপুরোহিত, শান্তিবারিক, মহাতন্ত্রাধিকৃৎ প্রভৃতি এবং ধর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত নবনিযুক্ত কর্মচারী রাজসভায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। রাজপণ্ডিতও রাজসভা অলংকৃত করিতেছেন। কর্মচারিতন্ত্রের এই সর্বময় কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের প্রতি জনসাধারণের মনোভাব কি প্রকার ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই—তবে অনুমান করা কষ্টকর নহে।

কর্মচারিতন্ত্র

সেনযুগে সামাজিক আদর্শ

সেন ও বর্মন্‌বংশ ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী ছিল বলিয়া উহাদের প্রতিটি লিপিতেই দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি, সংস্কার ও পূজার্চনার প্রাধান্য এবং বিবিধ তিথি উপলক্ষে তীর্থস্নান, উপবাস, নানাবিধ যাগ-যজ্ঞ-হোম ইত্যাদির বিবরণ। এই সকল অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান করা হইত। এই যুগের কোন লিপিতেই প্রত্যক্ষ-ভাবে কোন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী কিংবা বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সংঘ বা বিহার কোন প্রকার রাজানুগ্রহ লাভ করিতেছে, এমন কোন প্রমাণ নাই। বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত প্রায় সকল বুদ্ধমূর্তিই অষ্টম হইতে একাদশ শতকের অবদান। পট্টিকেরা রাজ্যের রণবঙ্কমল্ল শ্রীহরিকালদেব ব্যতীত অন্য কোন বৌদ্ধ নরপতির সন্ধানও সমসাময়িক যুগে পাওয়া যায় না।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পোষকতা

অন্যদিকে সেন ও বর্মন্ নরপতিগণের কেহ ছিলেন শৈব, কেহ বৈষ্ণব, কেহ সৌর। কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকেই ছিলেন ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও সংস্কারের অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক এবং ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও সংস্কার প্রচারে উৎসাহী। রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিদেরও এই বিষয়ে উৎসাহের অন্ত ছিল না। বৌদ্ধধর্ম এই সময়ে স্তিমিতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। সংঘ, বিহার ইত্যাদিও বিদ্যমান ছিল; কিন্তু ঐগুলি ছিল রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি কেবল রাজানুগ্রহ হইতেই বঞ্চিত হয় নাই—এই সময়ে সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির সহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রকাশ্য বিরোধিতাই আরম্ভ হইয়াছিল। এই বিরোধিতার পশ্চাতে রাষ্ট্রের সমর্থনও ছিল।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরোধ

বর্মন্‌রাজ জাতবর্মার রাজত্বকালেই একদল 'বাঙ্গাল' সৈন্য সোমপুর মহাবিহারের একাংশ অগ্নিসংযোগে বিনষ্ট করিয়াছিল। কৈবর্তনায়ক দিব্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরোক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধেই অভিযান—এইরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে।

ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য

ভট্ট ভবদেব ছিলেন বর্মন্‌রাজ হরিবর্মার সন্ধি-বিগ্রহিক; তাঁহার পিতামহ আদিত্যদেবও ছিলেন বঙ্গরাজের সন্ধি-বিগ্রহিক। সুতরাং রাজবংশের উপর এই পরিবারের প্রভাব ছিল সহজ ভাবেই অপরিমেয়। ভট্ট ভবদেব ছিলেন সমসাময়িক কালের একজন বহুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, টীকাকার এবং চিন্তানায়ক। তিনি মীমাংসা, সিদ্ধান্ত, তন্ত্র, গণিত, দশকর্ম্মপদ্ধতি, প্রায়শ্চিত্তকরণ প্রভৃতি স্মৃতিবিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি বহু বৌদ্ধ নৈয়ায়িককে যুক্তিতর্কে পরাজিত করিয়াছিলেন। বর্মন্ রাজ্যে যেমন ভবদেব ভট্ট ছিলেন সামাজিক আদর্শের প্রতীক ও প্রতিনিধি, সেনরাষ্ট্রেও তেমনই ছিলেন হলায়ুধ। ভবদেবের অনুরূপ হলায়ুধও ছিলেন ব্রাহ্মণ-কুলতিলক—প্রথমে রাজপণ্ডিত, তারপর মহামাত্য এবং সর্বশেষে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ। তাঁহার পিতা ধনঞ্জয়ও ছিলেন রাষ্ট্রাধিকারে ধর্মাধ্যক্ষ। সুতরাং এই পরিবারের রাষ্ট্রীয় প্রভাবও সহজেই অনুমান করা যায়। হলায়ুধের দুই ভ্রাতা ঈশান ও পশুপতি আহ্নিকপদ্ধতি এবং শ্রাদ্ধপদ্ধতি নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। হলায়ুধ স্বয়ং যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

বঙ্গসমাজ সেনবংশের কীর্তি

এই যুগের সামাজিক আদর্শ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করিয়াই গঠিত হইয়াছিল। বর্তমান যুগে বঙ্গদেশে যে-সমস্ত স্মৃতির অনুশাসন ও বর্ণবিন্যাস চলিতেছে—উভয়ই সেন ও বর্মন্ যুগের সৃষ্টি। এই ধর্ম ও সংস্কৃতির আদর্শের পশ্চাতে রাষ্ট্রের সক্রিয় পোষকতা ও সমর্থন না থাকিলে মাত্র সার্ধশত বৎসরের মধ্যে ইহা এমন সমৃদ্ধ ও সুদৃঢ় রূপ পরিগ্রহ করিতে পারিত না। ইহার পশ্চাতে রাজকীয় সমর্থন ছিল; সেই সমর্থনের প্রমাণ বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন স্বয়ং। বল্লালসেন স্বয়ং আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগর এবং অদ্ভুতসাগর গ্রন্থের অংশবিশেষ রচনা করিয়াছিলেন। পিতৃনির্দেশে লক্ষ্মণসেন অদ্ভুতসাগর গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল; রাজা ও রাজবংশ ঐ সংস্কৃতি বিস্তারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল; বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রচনা ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

সেন ও বর্মন্ বংশের রক্ষণশীলতা

সেন ও বর্মন্ উভয় বংশই দক্ষিণ-ভারতীয়। অন্ধ্র-সাতবাহনগণের যুগ হইতেই দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। চোল-পল্লব-চালুক্য প্রভৃতি সকল রাজ-বংশই এই ধর্ম ও সংস্কৃতির সমর্থক, পোষক, ধারক ও বাহক। প্রাচীনকাল হইতেই দক্ষিণ ভারত ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে একান্ত রক্ষণশীল ও পরিবর্তনবিমুখ। কলিঙ্গ-কর্ণাট হইতে আগত সেন-বর্মন্ বংশও সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত ছিল এবং রাষ্ট্র ও রাজবংশের মর্যাদার প্রসাদে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি অনুযায়ী স্মৃতি ও আচার-ব্যবহার বঙ্গদেশে প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিল এবং সাফল্যও লাভ করিয়াছিল। অবশ্য এই আদর্শ প্রবর্তনে সেন ও বর্মন্‌বংশীয় নৃপতিবর্গকে বিরোধিতার সম্মুখীনও হইতে

হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি আজ পর্যন্ত বাঙ্গলার হিন্দু সমাজে—উচ্চতর বর্ণ ও সমাজে সেন ও বর্মন্ যুগের অনুশাসনই অনুসৃত হইতেছে—নিম্নতর বর্ণের আদর্শও সেন ও বর্মন্ যুগেরই অনুরূপ।

পাল যুগের সামাজিক আদর্শ ছিল বৃহত্তর সামাজিক সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণ। বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের যে স্রোত বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইতেছিল, সেই স্রোতকে ব্রাহ্মণেতর স্রোতের সঙ্গে মিশাইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের আদর্শানুযায়ী একটি বৃহত্তর সামাজিক সমন্বয় গঠন ছিল পাল ও চন্দ্রবংশীয় রাজন্যবর্গের সাধনা। সমসাময়িক সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজবংশের এই সাধনাই ছিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ। গুপ্তযুগ হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি বঙ্গদেশে প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ, খড়্গ, পাল ও চন্দ্রবংশীয় রাজন্যবর্গ উহা অস্বীকার করেন নাই বরং সেই আদর্শই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছেন, পুরোহিত প্রদত্ত শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছেন, দেবদেবীর মন্দির স্থাপন করিয়াছেন এবং চতুর্বর্ণ সমাজ সংরক্ষণ ও পালন করিয়াছেন।

পালযুগের সমন্বয়ী আদর্শ

পালযুগে ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ দেবদেবীর মধ্যেও বিরাট সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়া চলিতেছিল। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ দেবদেবীসমূহকে বৌদ্ধ এবং শৈব তন্ত্রধর্ম ও চিন্তা এক গভীর সমন্বয়সূত্রে আবদ্ধ করিতেছিল। বৌদ্ধগণ বহু ব্রাহ্মণেতর এবং আর্যেতর দেবদেবীকে পংক্তিভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সমন্বয় ও সাঙ্গীকরণ-ক্রিয়া সমভাবেই চলিয়াছিল। পালযুগে চণ্ডাল পর্যন্ত কেহই রাষ্ট্রের দৃষ্টিবহির্ভূত ছিল না; কিন্তু সেনযুগে ব্রাহ্মণ এবং উচ্চতর বর্ণের ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। পাল-রাজন্যবর্গ বর্ণাশ্রম সমাজের রক্ষক ও ধারক ছিলেন; কিন্তু সেন ও বর্মন্ রাজগণ পালযুগে গঠিত বাঙ্গলার সমাজ ও বাঙ্গালী জাতিকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া নূতনরূপে গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিবর্তনের মূলে কোন সমন্বয় বা স্বাঙ্গীকরণের প্রয়াস ছিল না।

পাল যুগের ধর্মাদর্শ—বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সমন্বয়

বর্ণবিন্যাসের দিক হইতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, সমাজ বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি স্তরের সীমারেখা ছিল সুনির্দিষ্ট এবং এক স্তরের সহিত অন্য স্তরের মিলন ও আদান-প্রদান প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। বিভিন্ন স্তরের কিংবা একই স্তরের বিভিন্ন শাখার মধ্যেও বিবাহ প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। সেন-বর্মন্ যুগের এই স্তরভেদের বিধি-নিষেধ পরবর্তী কালের মত সুকঠোর না হইলেও ব্রাহ্মণ এবং উচ্চতর বর্ণের আদর্শ ছিল স্তরভেদ। বাঙ্গালী সমাজের এই স্তরভেদ বাঙ্গালী সমাজকে যথেষ্ট দুর্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

সেন যুগের আদর্শ—সমাজে স্তরভেদ সৃষ্টি

বর্ণবিন্যাসের মত শ্রেণীবিন্যাসও ভেদবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য প্রবলতর হইতেছিল। ব্রাহ্মণগণ রাষ্ট্রাধিকারে, সামরিক বিভাগে ও অন্যান্য উচ্চপদে নিযুক্ত হইতেছিলেন। ভবদেবের মত অনুসারে ব্রাহ্মণগণের পক্ষে প্রায় সকল বৃত্তিই নিষিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল—যেমন, অব্রাহ্মণকে শিক্ষাদান, অব্রাহ্মণের যাগযজ্ঞ এবং পূজানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য গ্রহণ পর্যন্ত

নিষিদ্ধ হইয়াছিল—শ্রেণীগত ভেদবুদ্ধির ইহাই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ব্রাহ্মণদের পক্ষে চিকিৎসাবিদ্যা এবং চিত্রবিদ্যার চর্চাও নিষিদ্ধ হইয়াছিল—এমন কি, জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চাও নিষিদ্ধ ছিল। অথচ ভবদেব ভট্ট, বল্লালসেন প্রভৃতি সমাজের নায়কবর্গ জ্যোতিষ, কুলসংহিতা ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও সমাজে পতিত হন নাই। শ্রেণীভেদ-বুদ্ধি এত কঠোর ছিল যে, যাঁহারা ব্রাহ্মণেতর বর্ণের পৌরোহিত্য করিতেন, তাঁহারাও ঐ সকল নিম্ন বর্ণভুক্ত বলিয়া নিন্দিত হইতেন। বল্লালসেন মালাকার, কর্মকার, কুম্ভকার এবং কৈবর্তদের উন্নীত করিয়াছিলেন; কিন্তু সুবর্ণ বণিকগণ সম্ভবতঃ কোন ব্যক্তিগত কারণে সমাজে পতিত রহিয়া গিয়াছিলেন। শেখ শুভোদয়ের একটি কাহিনীতে দেখা যায় যে, রাজ-শ্যালক (রাজমহিষী বল্লভার ভ্রাতা) কুমার দত্ত মাধবী নাম্নী এক বণিক-বধূর উপর অত্যাচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মাধবী আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করিয়াও এই অপমানের প্রতিবিধানকল্পে লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় অভিযোগ করেন। রাজমহিষী স্বয়ং রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেন মাধবীর অভিযোগে নিরুত্তর রহিলেন; রাজমহিষী স্বয়ং মাধবীকে প্রহার করিতে উদ্যতা হইলেন। অবশেষে তেজস্বী ব্রাহ্মণ সভাপণ্ডিত গোবর্ধন আচার্যের মধ্যস্থতায় মাধবী সুবিচার লাভ করেন। এই কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গের সেন রাজসভা, রাজমহিষী, মন্ত্রিবর্গ এবং স্বয়ং নৃপতির যে আচরণের ইঙ্গিত লক্ষিত হয়, তাহা সেনযুগের পক্ষে গৌরবজনক নহে। রাজসভার এই অবস্থা হইতে দেশের সাধারণের অবস্থা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নহে।

ভেদবুদ্ধি-সঞ্জাত ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য

সেনযুগে নৈতিক অধঃপতন

বর্ণভেদ-বুদ্ধিও সম্ভবতঃ এই নবগঠিত বাঙ্গালী সমাজ এবং সেনরাষ্ট্রকে অন্তঃস্থল হইতে দুর্বল করিয়া তুলিয়াছিল। বৌদ্ধগণ সেনরাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না—অবশ্য সেন-বর্মন্ রাষ্ট্রে তাঁহারা বিরোধিতা ব্যতীত কোন শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি রাজার নিকট হইতে লাভ করেন নাই। সেনযুগে সামন্ততন্ত্র ও কর্মচারিতন্ত্র অস্বাভাবিকভাবে স্ফীত ও ক্ষমতাদৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজন্যবর্গ, মন্ত্রী ও রাষ্ট্রনায়কগণও ছিলেন মেরুদণ্ডবিহীন এবং দুর্বলচরিত্র। সুতরাং এই সকল দুর্বলতা যে বৈদেশিক আক্রমণকে সহজ ও সুগম করিয়া তোলে নাই—তাহা বলা কঠিন। আরবজাতি কর্তৃক সিন্ধুবিজয় কাহিনীতে দেখা যায় যে, সহজাত বিরোধিতার জন্যই সিন্ধুর বৌদ্ধগণ চাচ্‌বংশীয় ব্রাহ্মণ নরপতি দাহিরের বিরুদ্ধে বিদেশী বিধর্মী মুসলমানদিগকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বঙ্গদেশে—যেখানে ব্রাহ্মণ্য রাজন্যবর্গের ইঙ্গিতে বৌদ্ধগণ অবজ্ঞাত ও নিপীড়িত, তথায় তাঁহারা যে সেই বৌদ্ধ-বিরোধী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদেশী বিধর্মী মুসলমান অভিযাত্রীদের সহায়তা করিবেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। বিহার বা ওদন্তপুর ধ্বংসের সংবাদে নবদ্বীপের প্রায় সমস্ত অধিবাসী, এমন কি, বণিক ব্যবসায়িগণও ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কামরূপ ও পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজবিধানে পতিত ধনশালী বণিকগণের পক্ষে এই আচরণ স্বাভাবিক। রাজার প্রধান উপদেষ্টা ও মন্ত্রিবর্গের চরিত্রের দৃঢ়তা, সাহস ও আত্মবিশ্বাস বিন্দুমাত্রও ছিল বলিয়া মনে হয় না।

সেনযুগে বর্ণভেদ ও শ্রেণীভেদ সৃষ্টির বিষময় ফল

সুতরাং তাঁহারাও লক্ষ্মণসেনকে পলায়নের পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। রাজ-জ্যোতিষিগণও লক্ষ্মণসেনকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন। সেন-রাজন্যবর্গের স্বয়ংসৃষ্ট ভেদবুদ্ধির বিষময় ফল দেখা দিয়াছিল এবং সেই ভেদবুদ্ধি সকল স্তরের মানুষের মনকে এত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল যে, লক্ষ্মণসেন কিংবা তাঁহার পুত্রগণের শৌর্যবীর্য এবং সৈন্যগণের প্রতিরোধ-ক্ষমতাও বিদেশী অভিযানকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকরী হয় নাই।

সেনযুগে বঙ্গের সমাজ-জীবন

বিপদের শেষ এইখানেই হইল না। আর্যেতর ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান এবং তান্ত্রিক ধর্মের বিকৃতি এই সময়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। সম্ভবতঃ তাহারই ফলে সমাজের সকল স্তরে, বিশেষতঃ উচ্চ বর্ণ ও শ্রেণীগুলিতে নানা প্রকার ভোগবিলাসের আবেদন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল—কোন বিধিনিষেধ এবং শালীনতাবোধও যেন তখন ছিল না। ব্যক্তিগত উপভোগের জন্য রক্ষিতা বা দাসী প্রতিপালন নাগরিক জীবনের প্রায় অঙ্গরূপে সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল। বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে গৌড়বঙ্গের রাজান্তঃপুরের কাম-লীলার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, উহা হইতেও সমসাময়িক বঙ্গের সমাজ-জীবনের ইঙ্গিত অনুধাবন করা যায়। ধোয়ীর পবনদূতেও এই চিত্র সুস্পষ্ট। পালযুগে বণিক ও ধনিক-তন্ত্রে এবং সুগঠিত কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্রের যুগে সমাজে এত ব্যভিচার ছিল না—ভেদবুদ্ধিও এত কঠোর ছিল না। পালযুগে এই সকল দুর্নীতি উচ্চবর্ণ, অভিজাত শ্রেণী এবং রাজান্তঃপুর অতিক্রম করিয়া সমাজদেহের সকল অঙ্গে বিস্তৃত হয় নাই। কিন্তু পালযুগের শেষভাগ হইতে সেনবংশের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দুর্নীতি সমস্ত সমাজ-দেহকে কলুষিত করিয়া তুলিল। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইল—ব্রাহ্মণ শূদ্রা নারীকে বিবাহ করিতে পারিত না, কিন্তু শূদ্রা নারীর সহিত বিবাহাতিরিক্ত দেহ-সম্বন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। নামমাত্র শাস্তিতে সেই অপরাধ স্খালন হইত। ইহাই ছিল সে-যুগের স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান। সেনযুগে দেবদাসীপ্রথাও বঙ্গদেশে ন্যূনাধিক প্রবর্তিত হয়—কিন্তু ইহার ফলও বঙ্গদেশের পক্ষে শুভ হয় নাই। ব্রাহ্মণ পুরোহিত, অভিজাত শ্রেণী এবং রাজন্যবর্গ এই দেবদাসীদের কেন্দ্র করিয়া ব্যক্তিগত ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতেন। বিলাস ও আড়ম্বর বঙ্গের নগরজীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। নৈতিক বল মানুষের চরিত্রের ভিত্তি—সমাজ-জীবনের মেরুদণ্ড। তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজে নৈতিক বল ও চরিত্র-বলের অভাব সুস্পষ্ট। লক্ষ্মণসেনের আবাল্য বন্ধু রাজসভার ভূষণস্বরূপ রাজপণ্ডিত মহামন্ত্রী এবং মহাধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ মিশ্র মুসলমান বিজেতার গুণকীর্তন করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। সেনযুগের শেষভাগে বাঙ্গালী সমাজের চারিত্রিক দৃঢ়তা বা নৈতিক জীবনের আদর্শ অত্যন্ত শ্লথ ছিল। সেই যুগে বাঙ্গালী মাত্রই যেন বিলাসপরায়ণ এবং মেরুদণ্ডবিহীন হইয়া উঠিয়াছিল।

সেনযুগে নৈতিক অধঃপতন

সমসাময়িক উত্তর-ভারতের অবস্থা

সুলতান মামুদ গজনীর ভারত অভিযানের পর হইতে উত্তর ভারতের অনেক স্থানেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম বসতিকেন্দ্র গঠিত হইয়াছিল। গাহড়বাল-রাজ্যেও এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'তুরস্ককেন্দ্র' ছিল। কারণ, গাহড়বাল-রাজ জয়চন্দ্রের

পিতামহ গোবিন্দচন্দ্রের লিপিতে তুরস্কদণ্ড নামক এক প্রকার করের উল্লেখ আছে। এই কর গাহড়বাল-রাজ্যের তুরস্কজাতীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে সংগৃহীত হইত। মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনের আক্রমণের পূর্বেই বিহার পর্যন্ত তুরস্ক-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিহারের সর্বত্র অরাজকতা; কোন শক্তিশালী রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তারানাথের বিবরণী হইতে অনুমিত হয় যে, একদল বৌদ্ধভিক্ষু বৌদ্ধবিদ্বেষী ব্রাহ্মণ্য রাজন্যবর্গের প্রতি সহজাত ঈর্ষাবশতঃই মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনের গুপ্তচরের কার্য করিয়াছিলেন এবং বঙ্গের ও উহার পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুরস্ককেন্দ্রের সহিত ইখতিয়ারউদ্দীনের যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। মিনহাজ লক্ষ্মণসেনের রাজ-জ্যোতিষীদের মুখে যে ভবিষ্যদ্বাণীর ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা হইতেও জানা যায় যে, তুরস্কজাতীয় শত্রুর দ্বারাই বঙ্গ বিজিত হইবে। কিন্তু এই বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার উপদেষ্টা মন্ত্রিমণ্ডলী নিশ্চেষ্ট রহিলেন; এমন কি মন্ত্রিমণ্ডলী লক্ষ্মণসেনকে পলায়নের পরামর্শ দিলেন। একটি নিশ্চেষ্ট পরাজয়ী মনোবৃত্তি ও স্বার্থবুদ্ধি তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল—তাঁহারা যেন অনিবার্য ভবিষ্যৎকে নত মস্তকে ভবিতব্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তুরস্কদণ্ড

বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ বিরোধিতা

ব্রাহ্মণ-জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী

উত্তর ভারতের অধিকাংশ যখন মুসলমানদের করতলগত, মধ্য গাঙ্গেয় প্রদেশ (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) ও বিহারে তখন সম্পূর্ণ নৈরাজ্য এবং বাঙ্গলার রাষ্ট্র ও সমাজ ভেদবুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন। বাঙ্গলার রাজা ও রাজ-সভাসদ্‌গণের চরিত্রে আত্ম-বিশ্বাসের অভাব, ধর্ম ও সমাজ উদ্দাম বিলাস-লীলায় মগ্ন, জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত ও পলায়নপর, উপদেষ্টা ও মন্ত্রিমণ্ডলী পরাজয়ী মনোবৃত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন, জ্যোতিষ রাষ্ট্রবুদ্ধির নিয়ামক—এই অবস্থায় সৈন্যদলের প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা কখনই শক্তিশালী ও কার্যকরী হইতে পারে না। মিনহাজের বিবরণ পাঠে অনুমিত হয়, ইখতিয়ারউদ্দীন যে বিনা বাধায় বিহার ও বঙ্গের একাংশ জয় করিয়াছিলেন তাহাও এই কারণেই। লক্ষ্মণসেনের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রযন্ত্র নানা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণে অভ্যন্তর হইতেই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। যতদিন গাহড়বাল প্রতিরোধ-প্রাচীর অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন কলিঙ্গ, কামরূপ ও কাশী বিজয় লক্ষ্মণসেনের সেনাবাহিনীর পক্ষে কঠিন হয় নাই। কিন্তু সেই প্রতিরোধ-প্রাচীর শিথিল হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্র ও সৈন্যদলের মনোবল এবং প্রতিরোধস্পৃহাও অন্তর্হিত হইল।

বঙ্গসমাজের পরাজয়ী মনোভাব

মুসলমান আক্রমণকারিদল এই প্রকার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিশৃংখলার সুযোগ গ্রহণ করিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন হেতু নাই। মুসলিম আক্রমণকারিগণের রাষ্ট্রীয় ও সামরিক শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া উচ্চাভিলাষী সৈনিক বা সেনাপতিগণ আত্মতুষ্টির সুযোগ সন্ধান করিবে—ইহাও বিচিত্র নহে। মুসলমান বিজয়ের প্রারম্ভ-যুগের উচ্চাভিলাষী, ভাগ্যান্বেষী, যুদ্ধব্যবসায়ী সেনানায়কদের মধ্যে মুহম্মদ ইখতিয়ার-উদ্দীন অন্যতম। ইখতিয়ারউদ্দীন দিল্লী হইতে বিহার ও বঙ্গে অভিযানের নির্দেশ লাভ করেন নাই—স্বেচ্ছায় ভাগ্যান্বেষণে বহির্গত হইয়া স্বীয় বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে তিনি বঙ্গ-বিহার একাংশ জয় করিয়াছিলেন।

ইখতিয়ারউদ্দীনের সহজ-লব্ধ বিজয়

তৃতীয় অধ্যায়

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খালজীর বঙ্গবিজয়

(১২০০-১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ)

সূচনা: দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জাতি স্থানচ্যুত উল্কার মত দুর্জয় বেগে দুর্গম পর্বত, অরণ্য, উপত্যকা অতিক্রম করিয়া দেশ-দেশান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। দেহে তাহাদের অসীম শক্তি, হৃদয়ে তাহাদের অদমনীয় সাহস, আননে আশার দীপ্তি, হস্তে উন্মুক্ত তরবারি। এই সকল দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি সেলজুক সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে খোরাসান, সিস্তান ও আফঘানিস্থান অধিকার করিল। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল তাহাদেরই সমগোত্রীয় তুর্কী-জাতীয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতক হইতেই তাঁহারা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর হইতেই এই অঞ্চলে তুর্ক শক্তি ম্রিয়মাণ এবং স্তিমিত-প্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। নবাগত এই সকল যাযাবর জাতির আগমনে এবং তাহাদের প্রাণশক্তির উচ্ছলতায় পুনরায় এই স্তিমিতপ্রায় জাতির দেহে প্রাণ সঞ্চার হইল; তাহারা পুনরায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; সুদীর্ঘ সার্ধ শতাব্দী পরে আবার এই জাতি বিজয়াভিযানে বহির্গত হইল। এই ভাগ্যান্বেষী জাতির বিজয়াকাঙ্ক্ষা সার্থক রূপ পরিগ্রহ করিল সিন্ধুর পূর্বতীরে, এবং অতি স্বল্পকাল মধ্যেই সমগ্র উত্তর ভারতে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইল। ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ খালজী ছিলেন এই যাযাবর গোষ্ঠীর সন্তান।

তুর্ক-যাযাবর গোষ্ঠীর পরিচয়

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ ছিলেন জাতিতে তুর্কী, বংশে খালজী এবং বৃত্তিতে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। তাঁহার পিতৃভূমি ছিল সিস্তানের পূর্ব সীমান্তবর্তী ঘুর এবং গরমশীর অঞ্চল (বর্তমান দস্ত-ই-মার্গ = পথনির্দেশক); সুতরাং বসতিতে তিনি ছিলেন আফঘান। গর্ব করিবার মত পিতৃপরিচয় বা বংশগৌরব তাঁহার ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী এবং দুর্জয় সাহসী। স্বীয় কর্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া ইখতিয়ারউদ্দীন ভাগ্যান্বেষণে বহির্গত হইলেন। তিনি গজনীতে উপস্থিত হইয়া শিহাবউদ্দীন ঘুরীর অধীনে সৈন্যবিভাগে কর্মপ্রার্থী হইলেন। ইখতিয়ারউদ্দীন ছিলেন খর্বাকৃতি, দীর্ঘবাহু। এই দুইটি লক্ষণের সমাবেশ তুর্কী সমাজে অকল্যাণের ইঙ্গিত বহন করিত; সুতরাং মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হইল। ইহা বোধহয় নিয়তিরই বিধান; তাহা না হইলে ভবিষ্যৎ বঙ্গবিজেতা হয় তো গজনী অঞ্চলেই জীবন অতিবাহিত করিতেন।

ইখতিয়ারউদ্দীনের বংশ পরিচয়

গজনীর দরবারে প্রত্যাখ্যাত হইয়া মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন ভারতের পথে অগ্রসর হইলেন। কুতুবউদ্দীন তখন দিল্লীতে শিহাবউদ্দীন ঘুরীর প্রতিনিধি। ইখতিয়ারউদ্দীন কর্মপ্রার্থী-রূপে দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কুতুবউদ্দীনও তাঁহাকে স্বচ্ছন্দমনে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এই ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক হইল মুহম্মদ ইখতিয়াউদ্দীনের খর্ব দেহ এবং দীর্ঘ বাহু।

দিল্লীর দরবারে ইখতিয়ারউদ্দীন

প্রত্যাখ্যাত ইখতিয়ারউদ্দীন হতোদ্যম হইলেন না। তিনি পূর্বাঞ্চলের পথে অগ্রসর হইলেন। যথার্থ সৈনিক একবার অগ্রসর হইলে কখনও পশ্চাতে পদক্ষেপ করে না। ইখতিয়ারউদ্দীন বদায়ুনে উপস্থিত হইলেন। বদায়ুন অঞ্চল ছিল মহারাজ পৃথ্বীরাজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পৃথ্বীরাজের পরাজয় ও মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যখণ্ড বিভিন্ন মুসলিম আমীরের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মালিক হিজবরউদ্দীন ছিলেন বদায়ুনের সিপাহ-সালার বা শাসনকর্তা। বদায়ুন ব্যতীত গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব এবং গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলও তাঁহার অধীনে ছিল। হিজবরউদ্দীনের অধীনে মাত্র বেতনভোগী সৈনিকরূপে ইখতিয়ারউদ্দীন জীবন আরম্ভ করিলেন। শীঘ্রই তিনি পার্শ্ববর্তী হিন্দু সামন্তবর্গের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন এবং প্রভূত শৌর্য ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি জায়গীরদার পদের উপযুক্ত বিবেচিত হইলেন না।

বদায়ুনে ইখতিয়ার-উদ্দীন : ভারতে কর্ম-জীবন আরম্ভ

ইখতিয়ারউদ্দীনের ন্যায় উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি সামান্য বেতনভোগী সৈনিকের পদে তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই। সুতরাং অল্পকাল পরেই তিনি বদায়ুন পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যার শাসনকর্তা হুসামউদ্দীনের অধীনে পর্যবেক্ষণের কার্যে নিযুক্ত হইলেন (১১৯৭ খ্রীঃ)। ইখতিয়ারউদ্দীনের সাহস ও বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হইয়া হুসাম-উদ্দীন তাঁহাকে বর্তমান মির্জাপুর জিলার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ভাগবত ও ভুইলী নামক দুইটি পরগণার জায়গীর প্রদান করিলেন।[১] এই অঞ্চলে ইতিপূর্বে আর কোন মুসলিম সৈনিকের পদার্পণ হয় নাই। এই দূরবর্তী অঞ্চলে জায়গীর প্রদানের পশ্চাতে আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। অযোধ্যার শাসনকর্তা হুসামউদ্দীন ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি সম্ভবতঃ ইখতিয়ারউদ্দীনের বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের পরিচয় পাইয়া এই উচ্চাভিলাষী সৈনিককে স্বীয় শক্তিকেন্দ্র হইতে দূরে রাখাই সমীচীন বিবেচনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন এইবার তাহার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রের সন্ধান পাইলেন।

অযোধ্যায় ইখতিয়ারউদ্দীন

ভাগবত ও ভুইলীতে জায়গীর লাভ

বর্তমান চুণারের এগার মাইল পূর্বে এবং মির্জাপুর হইতে ত্রিশ মাইল দূরে বিন্ধ্যপর্বতমালার উত্তর-সানুদেশে ভুইলী গ্রাম। চুণার গড়ের নিকটে গঙ্গা ও কর্মনাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে দুইটি পরগণা এখনও ভাগবত ও ভুইলী নামে পরিচিত। অবশ্য বিভিন্ন ইতিহাসে এই দুইটি স্থান বিভিন্ন নামে উল্লিখিত হইয়াছে। বকশী নিজামউদ্দীন আহম্মদের তবকাৎ-ই-আকবরীতে কম্পিলা ও পতিয়ালী নামের উল্লেখ আছে।[২] বদায়ুনীর মুন্তাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ গ্রন্থেও কম্পিলা ও পতিয়ালী নাম দেখা যায়।[৩] গোলাম হুসেন সলিমের রিয়াজ-উস-সালাতীনে কম্বালা ও বেতালী নামের উল্লেখ রহিয়াছে। কম্পিলা

---

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. by Raverty, p. 550. F. N. 5

২) *ibid.* Text. p. 147

৩) *Muntakhab-ut-Tuwarikh*, Text, p. 57

(সম্ভবতঃ কুন্তিলা) এবং পতিয়ালী (সম্ভবতঃ পতিলা বা বেতালীর শুদ্ধ নাম) ভাগবত ও ভুইলীর সন্নিকটে অবস্থিত।[১] ক্রমে এই ভাগবত এবং ভুইলী মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনের শক্তিকেন্দ্র হইয়া উঠিল। প্রথমেই তিনি গাহড়বালের সামন্ত নরপতিদিগকে পরাজিত করিলেন এবং তারপর মুনের (বর্তমান পাটনা জিলার অন্তর্গত) এবং বিহার (বর্তমান বিহার শরিফ) অঞ্চলের বহুস্থান লুণ্ঠন করিলেন। এই সময়ে নববিজিত হিন্দুস্থানে বহু তুর্কী ও খালজীজাতীয় লুণ্ঠনলোভী ভাগ্যান্বেষী অভিযাত্রী পরিভ্রমণ করিত। মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনের সাফল্যে ও বীর্যবত্তায় আকৃষ্ট হইয়া ইহাদের মধ্যে অনেক ভ্রাম্যমাণ লুণ্ঠনলোভী মুসলিম তাঁহার সহিত যোগদান করিল এবং তাঁহার বশ্যতাও স্বীকার করিল।

ইখতিয়ারউদ্দীনের বিহার অভিযান

ইখতিয়াউদ্দীনের শক্তি ও সাহসের কাহিনী দিল্লীতে কুতুবউদ্দীনের নিকট অশ্রুত রহিল না। ইখতিয়ারউদ্দীন প্রত্যক্ষভাবে কুতুবউদ্দীনের অধীন ছিলেন না। কিন্তু ভারতবিজেতা শিহাবউদ্দীনের প্রতিনিধিরূপে কুতুবউদ্দীন আইবকই ভারতের মুসলিম নেতারূপে বিবেচিত হইতেন। কুতুবউদ্দীন উদীয়মান ইখতিয়ারউদ্দীনের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন এবং তাঁহাকে ইসলামের প্রচারক বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন এবং অভিনন্দনের চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে খিলাত প্রেরণ করিলেন। ইখতিয়ারউদ্দীন এই অভিনন্দন, উপাধি ও খিলাত গ্রহণ করিলেন; অর্থাৎ পরোক্ষভাবে ইখতিয়ারউদ্দীন কুতুবউদ্দীনের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন। এইবার বিনা দ্বিধায় মুসলমানগণ ইখতিয়ারউদ্দীনের সহিত যোগদান করিল; কারণ ইখতিয়ারউদ্দীনের কার্যাবলী ভারতে ইসলামের কর্ণধার কুতুবউদ্দীনের স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভ করিয়াছে; ইখতিয়ারউদ্দীনের বিজয় ইসলামের বিজয় বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে; ইখতিয়ারউদ্দীন ইসলামের সৈনিক বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত বিজয়াভিযানে যোগদান করিলে বিজয়ী মুসলিম সৈন্যগণ ইহকালে লুণ্ঠনের অংশ এবং সময়ে মৃত্যুবরণ করিলে পরকালে স্বর্গলাভ করিবে। সুতরাং ইহকাল এবং পরকালের লাভের আকাঙ্ক্ষায় দলে দলে ভ্রাম্যমাণ তুর্ক-খালজী সৈন্য ইখতিয়ার উদ্দীনের সহিত যোগদান করিল। কুতুবউদ্দীন কর্তৃক খিলাত প্রেরণের পূর্বে মুসলিম সৈনিকগণের মনে যে দ্বিধা ছিল, তাহাও নিঃশেষে দূর হইয়া গেল। ইখতিয়ারউদ্দীন নবোদ্যমে সমরাভিযানে প্রবৃত্ত হইলেন।

কুতুবউদ্দীন কর্তৃক খিলাত প্রেরণ

ইখতিয়ারউদ্দীন উচ্চাভিলাষী এবং দুর্জয় সাহসী ছিলেন। তাঁহার দূরদৃষ্টি এবং বিচক্ষণতারও অভাব ছিল না এবং স্বীয় সৈন্যবল সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সুতরাং কোন শক্তিশালী নরপতির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া স্বীয় সার্থকে ক্ষুণ্ণ করা বা দেশব্যাপী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল লুণ্ঠন ও ধনসম্পদ লাভ। সেই সময়ে উত্তর বিহারের মিথিলায় (গণ্ডক ও কুশী

ইখতিয়ারউদ্দীনের উদ্দেশ্য—লুণ্ঠন

১। *Riyas-us-salatin*, Text, p. 61
(for details, see Gazetteer of the Mirzapur District, 1911)

নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) কর্ণাটক হইতে আগত একটি হিন্দু রাজবংশ রাজত্ব করিতেছিল। কনৌজের সিংহাসনে তখন জয়চন্দ্রের পুত্র হরিশ্চন্দ্র সমাসীন। রোহতাস অঞ্চলের হিন্দু মহানায়কগণ তখনও তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের সামন্ত মহামাণ্ডলিক উদয়রাজ শোন নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে নবনেরাপত্তনে আধিপত্য করিতেন। সুতরাং এই সকল হিন্দু নরপতিদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিয়া বিপদ ও বিপ্লব সৃষ্টি করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। অতএব যে স্থানে রাজশক্তি দুর্বল, শিথিল অথবা রাজা অনুপস্থিত ছিলেন, সেই সকল স্থান লুণ্ঠন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল। তাঁহার কর্মক্ষেত্র হইল প্রধানতঃ দক্ষিণ বিহার—এই সময়ে তিনি বর্তমান পাটনার নিকটবর্তী স্থান এবং বিহার নগর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।

ইখতিয়ারউদ্দীনের ওদন্তপুর অভিযান

বৎসরাধিক কাল এই ভাবে হিন্দুরাজ্য, গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিয়া ইখতিয়ার-উদ্দীন প্রচুর অর্থ ও ধনসম্পদ সংগ্রহ করিলেন এবং নূতন সেনাদল গঠন করিলেন। ইখতিয়ারউদ্দীন নবগঠিত সেনাবাহিনী লইয়া গোবিন্দপালদেবের রাজ-ধানী আক্রমণ করিলেন। গোবিন্দপালদেব চিরশত্রু গৌড়েশ্বর সেনরাজের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য না পাইয়া স্বীয় স্বল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া ওদন্তপুরের দুর্গম, সুরক্ষিত, শৈলশিখরস্থিত সংঘারামে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইখতিয়ারউদ্দীন সসৈন্যে 'বিহার' দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন (১১৯৯ খ্রীঃ)। এই মহাবিপদের সময়ে সংঘারামের বৌদ্ধভিক্ষুগণ জাতি, ধর্ম ও প্রাণ রক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিলেন; কিন্তু সুশিক্ষিত রণনিপুণ মুসলিম সৈন্যের সহিত[১] যুদ্ধে তাঁহারা পরাজিত হইলেন—গোবিন্দপালদেব নিহত হইলেন।[২] মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন বিহার দুর্গ অধিকার করিলেন। দুর্গের অধিবাসিগণ অধিকাংশই নিহত হইল, যুগযুগ-সঞ্চিত ধনরাশি লুণ্ঠিত হইল এবং বহু গ্রন্থ ভস্মীভূত করা হইল। ইখতিয়ারউদ্দীন কর্তৃক নিহত দুর্গ বা বিহারবাসীরা অধিকাংশই ছিলেন মুণ্ডিতকেশ পীতবসন বৌদ্ধভিক্ষু। ওদন্তপুরের মঠ সাধারণের নিকট 'বিহার' নামেই পরিচিত ছিল। সুতরাং এই 'বিহার' নামানুসারেই সমগ্র প্রদেশটিকে মুসলিমগণ বিহার নামে আখ্যায়িত করিল। অবশ্য একসময়ে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ-বিহারও ছিল অগণিত।

গোবিন্দপাল নিহত

ইখতিয়ারউদ্দীনের বিহারে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা

ওদন্তপুর ধ্বংসের প্রায় একবৎসর পরে মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন পুনরায় বিহার অঞ্চলে সমরাভিযান করিয়া ঐ অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিলেন[৩] (১২০০ খ্রীঃ)। এইবার মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন এই অঞ্চলে লুণ্ঠন অপেক্ষা আধিপত্য স্থাপনেই সচেষ্ট হইলেন। তিনি স্থানে স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করিলেন এবং বিজিত অঞ্চলের জন্য শাসনব্যবস্থাও রচনা করিলেন। প্রসিদ্ধ কাশ্মীরী বৌদ্ধভিক্ষু শাক্য

১) *Epigraphica Indica*. XXII, p. 22

২) *Talqat-i-Nasiri*, Tr. by Raverty, p. 550

৩) This year, i.e. 1200 A.D. he was busy in consolidating his hold over the province, as the author of *Riyas-us-Salatin* says, "by establishing *thanas* and military outposts and by introducing administrative arrangements."

শ্রীভদ্র এই সময়ে শ্রমণব্যপদেশে এবং তীর্থদর্শন-মানসে মগধে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ওদন্তপুর এবং বিক্রমশীলা বিহারে ধ্বংসস্তূপই দর্শন করিয়াছিলেন। এই ধ্বংসলীলা দর্শনে ক্ষুব্ধ এবং মগধে তুর্কীজাতির সংখ্যাধিক্য দর্শনে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া তিনি বিহার পরিত্যাগ করেন এবং উত্তরবঙ্গের জগদ্দল বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১] মুসলমানের অত্যাচারে মগধের বহু নরনারী এবং বৌদ্ধ শ্রমণ দেবমূর্তি ও ধর্মগ্রন্থ সহ নেপাল ও নেপালের নিকটবর্তী পর্বতময় দুর্গম হিন্দুরাজ্যে পলায়ন করিয়াছিল। মুসলিম ইতিহাসকার আমীর আলীর বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে, তৎকালে মুসলিমগণ হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধগণের প্রতি অধিকতর বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। কারণ, দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এশিয়ার বৌদ্ধধর্মাবলম্বী তুর্কীজাতি আরব সাম্রাজ্য ধ্বংসোদ্দেশ্যে অভিযান করিয়াছিল এবং মুসলিমদিগকে পরাজিত করিয়া বৌদ্ধ হুলাগু খান বাগদাদ নগর অধিকার করিয়াছিলেন।

বিহারে মুসলিম অভিযান

নবদ্বীপ অভিযান

অতঃপর ইখতিয়ারউদ্দীন তাঁহার বিজয়বাহিনীসহ আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হইলেন এবং ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে অকস্মাৎ বঙ্গের রাজনিবাস নদীয়া নগরীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কারণ, বঙ্গাধিপতির ধনৈশ্বর্যের কাহিনী তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণসেন তখন পুণ্যার্থিরূপে গঙ্গাতীরবর্তী নদীয়া বা নবদ্বীপ নগরীতে বাস করিতেছিলেন। নবদ্বীপ কোনকালেই বঙ্গের স্থায়ী রাজধানী ছিল কি না, বলা সুকঠিন। কিন্তু সেন-নরপতিগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের গভীর অনুরাগী। সুতরাং গঙ্গাতীরে বাস করাকে তাঁহারা অত্যন্ত পুণ্যকর্ম মনে করিতেন। পুণ্যার্থী সেন-নরপতিগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বহু ধনৈশ্বর্যশালী ব্যক্তিও পুণ্যলোভে গঙ্গার তীরে নবদ্বীপে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। ফলে, গঙ্গার উভয় তীরে প্রায় তিন ক্রোশব্যাপী অঞ্চলে বহু সমৃদ্ধ ব্যক্তির আবাস নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল আবাস ইষ্টকনির্মিত প্রাসাদ বা অট্টালিকা নহে—বঙ্গের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাঁশ ও খড়-নির্মিত গৃহ মাত্র। নগরের চতুর্দিকে প্রাচীর অথবা শত্রুর গতি-প্রতিরোধের উপযোগী কোন দুর্গ বা সেনানিবাস ছিল বলিয়া কোথাও উল্লেখ নাই। নদীয়া ছিল শান্তিকামী পুণ্যার্থী ব্যক্তিদের শান্তির নীড়।

প্রাচীন নবদ্বীপ বা নদীয়া পরিচিতি

নবদ্বীপে বাঁশ-খড় নির্মিত গৃহ

পশ্চিমদিক হইতে বঙ্গে অভিযানের সহজ এবং স্বাভাবিক পথ ছিল গণ্ডক ও কুশী নদী অতিক্রম করিয়া গঙ্গার উত্তর তীর অনুসরণ করিয়া অযোধ্যা-ত্রিহুতের মধ্য দিয়া কিংবা রাজমহলের নিকটবর্তী তেলিয়াগড়ের সংকীর্ণ গিরিপথে বঙ্গে প্রবেশ। প্রথম অধ্যায়ে বঙ্গের ভূপ্রকৃতি ও সীমারেখা আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে, উত্তরবঙ্গ, পূর্ণিয়া ও ত্রিহুত অঞ্চলের মধ্যে কোন দুর্ভেদ্য প্রাকৃতিক প্রাচীর নাই—এই বিরাট অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি এবং জলবায়ুও একই প্রকার। সেইজন্যই এক সময়ে পূর্ণিয়া বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং মিথিলার

---

১) *History of Bengal*, **Dacca University, Vol. II, p. 8**

সংস্কৃতি উত্তরবঙ্গকেও স্পর্শ করিয়াছিল—বাঙ্গালীও মিথিলার জ্ঞান-গরিমাকে কেন্দ্র করিয়া গৌরব অনুভব করিত। এই কারণেই পরবর্তী কালে ত্রিহুতের নামকরণ হইয়াছিল দ্বারবঙ্গ (দ্বারভাঙ্গা) অর্থাৎ বাঙ্গলার প্রবেশ-দ্বার। তেলিয়াগড়ের অব্যবহিত দক্ষিণ হইতেই সাঁওতাল পরগণা ও মানভূম-সিংভূমের পার্বত্য অরণ্যময় গৈরিক মালভূমির আরম্ভ। এই অঞ্চলেই ছিল হিউয়েন সাঙ বর্ণিত উষর বনময় কজঙ্গল এবং উত্তর-রাঢ় প্রদেশ। এই অঞ্চলের সাধারণ নাম ছিল ঝাড়খণ্ড বা অরণ্যময় প্রদেশ। এই অঞ্চল এত গভীর অরণ্যময় ছিল যে, এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া কোন সুগঠিত সুবিশাল সেনাবাহিনী পরিচালনা সম্ভবপর ছিল না। এই ভূখণ্ডে সৈন্যচালনার মত কোন রাজপথ, বা খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবার মত কোন লোক-বসতিপূর্ণ গ্রাম বা জনপদ ছিল না। সুতরাং বঙ্গের ইতিহাসে তেলিয়াগড় গিরিবর্ত্মের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই একটিমাত্র সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম রক্ষা করিতে পারিলেই বঙ্গের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত। সুতরাং বঙ্গাধিপতিদের লক্ষ্যই ছিল এই তেলিয়াগড় গিরিবর্ত্মের সুরক্ষণ ও সংরক্ষণ। মহারাজ লক্ষ্মণসেনও সম্ভবতঃ এই বিষয়ে ক্রটি করেন নাই। সেন-নরপতি লক্ষ্মণসেন সম্ভবতঃ কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, মুসলিম অভিযাত্রিদলের পক্ষে তেলিয়াগড়ের সুরক্ষিত গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করা সম্ভবপর হইবে কিংবা তাহারা বঙ্গে প্রবেশের এই সহজ স্বাভাবিক পথ তেলিয়াগড়ের গিরিবর্ত্ম পরিত্যাগ করিয়া ঝাড়খণ্ডের দুর্ভেদ্য অরণ্যময় ও দুর্গম পার্বত্যপথে বঙ্গে প্রবেশ করিবে। সুতরাং নদীয়া বা নবদ্বীপ সুরক্ষিত করিবার কোন প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নাই।[১]

বঙ্গের সহজ ও স্বাভাবিক প্রবেশপথ তেলিয়াগড় গিরিবর্ত্ম

মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন ছিলেন দুর্জয় সাহসী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি সম্ভবতঃ বঙ্গ-অভিযানের পূর্বেই বঙ্গের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও রক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি তেলিয়াগড়ের সুরক্ষিত গিরিপথে বঙ্গে অভিযান করেন নাই কিংবা বঙ্গের প্রকৃত রাজধানী সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত গৌড় নগরীও আক্রমণ করেন নাই। রাজার পরাজয় তখন দেশের বা রাষ্ট্রের পরাজয় বলিয়াই বিবেচিত হইত। সুতরাং তিনি অতর্কিতে অরক্ষিত অবস্থায় পুণ্যকামী বঙ্গাধিপতিকে আক্রমণ করাই সমীচীন বিবেচনা করিলেন। দুর্গম পথের ভীতি তাঁহাকে বিচলিত কিংবা আতঙ্কিত করিতে পারে নাই। তিনি স্বাভাবিক পথে গঙ্গার উত্তর তীর অনুসরণ করিয়া বঙ্গে প্রবেশ করেন নাই। তিনি গঙ্গার দক্ষিণস্থ 'মুনে'র হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া শোণ অতিক্রম করিলেন এবং বিহার শরিফে উপস্থিত হইলেন। গয়া ও ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রসর হইয়া তিনি নবদ্বীপে প্রবেশ করিলেন।[২]

ইখতিয়ারউদ্দীনের নবদ্বীপ প্রবেশ

নবদ্বীপ প্রবেশের পূর্বরাত্রি ইখতিয়ারউদ্দীন নবদ্বীপের বিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত অরণ্যে অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি এত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন যে, মাত্র সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সৈনিক

ইখতিয়ারউদ্দীন ও সপ্তদশ অশ্বারোহী

---

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 6

২) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. by Raverty, pp. 541-43

তাঁহার অনুসরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিংবা তিনি স্বেচ্ছায় এই সপ্তদশ-অশ্বারোহী-সমন্বিত ক্ষুদ্র দলটি সহ নদীয়া নগরী অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন; পশ্চাতে আসিতেছিল মূল সেনাবাহিনী। ইখতিয়ারউদ্দীন ও তাঁহার অনুচরদের পরিধানে ছিল বণিকের পরিচ্ছদ, সঙ্গে অতি তেজস্বী ও বলশালী অশ্ব। ইখতিয়ার-উদ্দীনের পূর্বেও বণিকদল এই দেশে অশ্ব ও নানাপ্রকার পণ্যসম্ভার লইয়া আগমন করিত এবং রাজ-দর্শনের জন্য নগরীর বহির্দেশে প্রতীক্ষা করিত। এই ক্ষুদ্র অগ্রগামী দল শান্তগতিতে শান্তভাবেই নগরে প্রবেশ করিল; প্রাসাদ-রক্ষিগণের মনেও কোন প্রকার সন্দেহ জাগ্রত হয় নাই; সুতরাং তুর্কী অগ্রগামী দল বিনা বাধায় প্রাসাদ-তোরণ অতিক্রম করিল। ক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দলও আসিয়া অগ্রগামী দলের সহিত যোগদান করিল।[১]

বণিকবেশে ইখতিয়ার উদ্দীনের নবদ্বীপ-প্রবেশ

তখন বেলা দ্বিপ্রহর। মহারাজ লক্ষ্মণসেন মধ্যাহ্নভোজনে নিরত—রক্ষিদল সম্পূর্ণ অসতর্ক বা অর্ধসতর্ক; নাগরিকগণও স্নানাহারে ব্যাপৃত—সর্বত্রই একটা শিথিল ভাব। মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন এই শিথিলতার এবং অসতর্কতার সুযোগ গ্রহণ করিলেন। বণিকের ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া তিনি অকস্মাৎ তরবারি উন্মুক্ত করিলেন। তোরণ-রক্ষিদল অভিভূত হইয়া পড়িল। ইখতিয়ারউদ্দীন নিঃসংকোচে রক্ষিদলকে হত্যা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশের উদ্যোগ করিলেন। ইতোমধ্যে ইখতিয়ারউদ্দীনের অবশিষ্ট পশ্চাদ্বর্তী সেনাবাহিনীর একটি বৃহৎ অংশও নগরে প্রবেশ করিয়াছে—নগরে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে, নগর প্রায় অবরুদ্ধ; নাগরিকগণ ভীত, সন্ত্রস্ত ও পলায়নপর। প্রাসাদ-তোরণ এবং নগরের মধ্যস্থল হইতে তুমুল আর্তনাদ ও কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইল। মহারাজ লক্ষ্মণসেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। বিধর্মী আক্রমণকারিগণকে প্রতিরোধের কোন উপায়ও তাঁহার ছিল না—কারণ, তখন তিনি প্রায় নিরস্ত্র—ভোজনালয়ে কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। সুতরাং তিনি বাধ্য হইয়া সপরিবারে গোপনে নগ্নপদে নৌকাযোগে পূর্ববঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।[২] অচিরকাল মধ্যেই ইখতিয়ারউদ্দীনের পশ্চাদ্‌গামী অবশিষ্ট সৈন্যদলও আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বিনা বাধায় নবদ্বীপ এবং উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অধিকার করিল; মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনের নবদ্বীপ বিজয় সমাপ্ত হইল।

ইখতিয়ারউদ্দীনের নবদ্বীপ বিজয়

সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ইখতিয়ারউদ্দীনের নবদ্বীপ-বিজয় এবং মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পলায়ন বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করিয়া বহু কলঙ্ককাহিনী রচিত হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের আচরণ সম্পর্কে অত্যন্ত বিরুদ্ধ সমালোচনাও করা হইয়া থাকে—যথা, লক্ষ্মণসেন ভীরু কাপুরুষ, সেইজন্যই তিনি পশ্চাৎ দ্বারপথে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে, জ্যোতিষিগণ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, 'লক্ষ্মণসেনের রাজ্য যবন কর্তৃক বিধ্বস্ত এবং বিজিত হইবে'। তাঁহারা যবন বিজেতার রূপ বর্ণনাও করিয়াছিলেন এবং ইখতিয়ারউদ্দীনের দেহাকৃতির সহিত সেই বর্ণনার সামঞ্জস্যও ছিল।

জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী

---

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. by Raverty, p. 557

২) *ibid*, p. 558

সুতরাং তুর্কী সৈন্যসহ ইখতিয়ারউদ্দীনের আগমনে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়াই লক্ষ্মণসেন রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সমসাময়িক দুইটি ফারসী ইতিহাসে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঘটনার প্রথম সাক্ষ্য পাওয়া যায় ঘটনার ষাট বৎসর পরে রচিত দিল্লীর ভূতপূর্ব কাজী মীনহাজ-উস্-সিরাজের তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে। মীনহাজ লক্ষ্মৌতি বা লক্ষ্মণাবতীতে দুই বৎসর অতিবাহিত করেন এবং দুইজন অতিবৃদ্ধ সুপ্রাচীন সৈনিকের নিকট ইখতিয়ারউদ্দীনের বিহার-বিজয় এবং অন্যান্য বিশ্বস্ত লোকের মুখে নবদ্বীপ-বিজয় তথা বঙ্গ-বিজয়ের কাহিনী শ্রবণ করেন। মীনহাজের রচনার একশত বৎসর পরে ইতিহাসকার ইসামী তাঁহার ফুতুহ্-উস্-সালাতীন নামক গ্রন্থে ইখতিয়ারউদ্দীন কর্তৃক নবদ্বীপ-বিজয়ের একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। দুইটি বিবরণ তুলনামূলকভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিলে সমসাময়িক বাঙ্গালী সমাজের মনোবৃত্তি ও মহারাজ লক্ষ্মণসেনের আচরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সমসাময়িক ফারসী ইতিহাস তবকাৎ-ই-নাসিরী এবং ফুতুহ্-উস্-সালাতীন

ইসামী তাঁহার ফুতুহ্-উস্-সালাতীনে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—ইখতিয়ারউদ্দীন সিস্তান হইতে আগত বণিকবেশে নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি রায় লখ্‌মনিয়াকে তাতারদেশীয় সুগঠিত তেজস্বী অশ্ব, চীনদেশীয় মহার্ঘ বস্ত্র এবং বিভিন্ন-দেশীয় দুষ্প্রাপ্য পণ্যসম্ভার পর্যবেক্ষণ ও ক্রয়ের জন্য অনুরোধ করিলেন। রায় লখমনিয়া পণ্যসম্ভার পরিদর্শনের জন্য 'কারবান'-এ (বণিকদের বিশ্রামাগার বা অশ্বাদির বিশ্রামস্থল) উপস্থিত হইলেন। মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন তাঁহাকে মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করিলেন। রাজা অত্যন্ত পরিতৃপ্ত এবং অসন্দিগ্ধ। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ইখতিয়ারউদ্দীনের ইঙ্গিতে বণিকবেশী মুসলিম সৈন্যগণ হিন্দু রাজসৈন্যদের আক্রমণ করিল। রাজার দেহরক্ষিদলও তৎক্ষণাৎ রাজাকে বেষ্টন করিয়া ব্যূহ রচনা করিল। তুর্কী সৈন্য ভীত হইয়া পড়িল……অবশেষে খালজী সৈন্যগণ ঝঞ্ঝার বেগে হিন্দু রক্ষিদলকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিল। রাজা ইখতিয়ারউদ্দীনের হস্তে বন্দী হইলেন।

ফুতুহ্-উস্-সালাতীনের বিবরণ

মীনহাজ-উস্-সিরাজ তাঁহার তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে লিখিয়াছেন—মগধ অধিকারের পর দ্বিতীয় বৎসরে (১২০১ খ্রীষ্টাব্দে) ইখতিয়ারউদ্দীন তাঁহার সৈন্য-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া বিহার (বিহার শরিফ) হইতে সমরাভিযান আরম্ভ করিলেন এবং অকস্মাৎ নদীয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। তিনি এত দ্রুত অশ্ব পরিচালনা করিলেন যে, মাত্র সপ্তদশ জন অশ্বারোহী ভিন্ন সকলেই পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। নগরদ্বারে উপস্থিত হইয়া ইখতিয়ারউদ্দীন কাহাকেও আক্রমণ করিলেন না, বরং অতি শান্ত পদক্ষেপে নগরাভ্যন্তরে অগ্রসর হইলেন। কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই যে, এই অশ্বারোহী দলে স্বয়ং ইখতিয়ারউদ্দীন উপস্থিত আছেন। সকলেই ধারণা করিয়াছিল যে, এই নবাগত বণিকদল মহার্ঘ অশ্ব বিক্রয়ের উদ্দেশ্যেই নগরে আগমন করিয়াছে। রায় লখমনিয়ার প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হইয়াই ইখতিয়ারউদ্দীন তরবারি কোষমুক্ত করিয়া শত্রুনিধনে তৎপর হইলেন। রায় লখমনিয়া তখন মধ্যাহ্ন-ভোজনে নিরত

তবকাৎ-ই-নাসিরীর বিবরণ

ছিলেন। প্রাসাদ-তোরণ এবং নগরের মধ্যস্থল হইতে আর্তনাদ ও চীৎকার-ধ্বনি উত্থিত হইল, অর্থাৎ ততক্ষণে অবশিষ্ট তুর্কী সেনাবাহিনী নগরে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিয়াছে। রায় লখমনিয়া যথার্থ সংবাদ পাইবার পূর্বেই ইখতিয়ারউদ্দীন প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিলেন। রায় লখমনিয়া নগ্নপদে প্রাসাদের পশ্চাৎ দ্বারপথে পলায়ন করিলেন। অর্থাৎ ঘটনাটি এত অতর্কিতে সংঘটিত হইয়াছিল যে, ব্যস্ততাবশতঃ পাদুকা গ্রহণেরও সময় বা অবসর তাঁহার হয় নাই। ১

বিবরণদ্বয়ের সামঞ্জস্য বিশ্লেষণ

মীনহাজ এবং ইসামীর বিবরণে কয়েকটি বিষয়ে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়; যেমন—সপ্তদশ অশ্বারোহিসহ বণিকবেশে ইখতিয়ারউদ্দীনের আগমন, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের অসতর্ক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ ইত্যাদি। কিন্তু সমস্ত ঘটনাটি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় যে, নগরে বিদেশী অশ্ব-বিক্রেতার যাতায়াত ছিল বলিয়াই অশ্ব-বিক্রেতার ছদ্মবেশে অষ্টাদশ জন (সপ্তদশ জন অশ্বারোহী ও ইখতিয়ারউদ্দীন স্বয়ং) বণিকবেশী অশ্বারোহীর আগমন কাহারও মনে সন্দেহের উদ্রেক করে নাই। পশ্চাদ্বর্তী বৃহৎ খালজী এবং তুর্কী অশ্বারোহী দল যথাসময়ে উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই অগ্রবর্তী অষ্টাদশ জন অশ্বারোহীর পক্ষে প্রাসাদ ও নগর অধিকার সম্ভবপর হইয়াছিল। অবশ্য মুঘলযুগের প্রাসাদ কিম্বা দুর্গ-নগর বলিতে যাহা বুঝায় নবদ্বীপে সেই সময়ে তেমন সুরক্ষিত প্রাসাদ-দুর্গ ছিল না। কিন্তু ইসামী বলেন, লক্ষ্মণসেন বন্দী হইয়াছিলেন; মীনহাজ বলেন, তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক রাখালদাস বলেন, মীন্‌হাজ বর্ণিত রায় লখ্‌মনিয়া ও লক্ষ্মণসেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি।

ঐতিহাসিক রাখাল-দাসের অভিমত

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার 'হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে ইখতিয়ারউদ্দীন কর্তৃক নবদ্বীপ ও গৌড়বিজয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"বিহার দেশ অধিকার করিয়া বখতিয়ার সুজলা-সুফলা সমৃদ্ধিশালিনী গৌড়ভূমির প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পরাক্রান্ত গৌড়বাহিনীর সহিত সম্মুখ সমরে বিজয়লাভ অসম্ভব মনে করিয়া বখতিয়ার বোধ হয় কোন সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন এবং বিহারের সন্নিকটবর্তী রাঢ়ের শাসনকর্তা বিশ্বরূপ কিংবা কেশবের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া প্রথমে বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনকে ধৃত করিবার জন্য নদীয়ায় গমন করেন। এই সময়ে সম্ভবতঃ বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন জ্যেষ্ঠপুত্র মাধবের হস্তে রাজধানী লক্ষ্মণাবতী ও উত্তর-গৌড় এবং অপর দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও কেশবের হস্তে রাজ্যের পশ্চিম ও পূর্বাংশ অর্পণ করিয়া শেষ বয়সে ইষ্টদেব মুরারির সান্নিধ্যে গঙ্গাতীরস্থ নদীয়া নগরে ধর্মচর্চায় কালাতিপাত করিতেছিলেন।" ২

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য রচিত 'হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস'-বর্ণিত কাহিনী

বিশ্বরূপ ও কেশব সম্ভবতঃ গৌড় সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাধবসেনকে রাজ্যাধিকার হইতে বিচ্যুত করিবার জন্যই ইখতিয়ারউদ্দীনের

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. by Raverty. p. 557

২) হুগলী-হাওড়ার ইতিহাস, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, ১ম খণ্ড, ২৮৪-২৮৬ পৃঃ।

সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন এবং বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেনের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনায় ইখতিয়ারউদ্দীনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কারণ, লক্ষ্মণসেনের জীবিতাবস্থায় মাধবসেন শক্তিশালী হইলে তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করা কঠিন হইবে। রাজ্যলোলুপ ইখতিয়ারউদ্দীনও এই সুযোগের অপব্যবহার না করিয়া অচিরে সসৈন্যে নবদ্বীপ লুণ্ঠনে অগ্রসর হইলেন। অধিকাংশ সৈন্য পশ্চাতে রাখিয়া মাত্র সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ইখতিয়ারউদ্দীন নবদ্বীপে লক্ষ্মণসেনের রাজ-প্রাসাদ আক্রমণ করেন।

ইখতিয়ারউদ্দীনের সহিত বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের ষড়যন্ত্র

ষড়যন্ত্রকারিগণ নিশ্চিত হইয়াছিলেন যে, লক্ষ্মণসেনকে হস্তগত বা নিহত করিতে না পারিলে গৌড়বিজয় অসম্ভব হইবে এবং সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কারণ, ইখতিয়ারউদ্দীন গৌড়ের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিলেই মাধবসেন গৌড়ীয় সেনাবাহিনী লইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবেন এবং লক্ষ্মণসেনও রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া কেশব এবং বিশ্বরূপকে দেশের শত্রু বিধর্মী ইখতিয়ার-উদ্দীনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে নির্দেশ দিবেন। সেইজন্যই ইখতিয়ারউদ্দীন বিহারের অধিকতর নিকটবর্তী এবং সুগম সেনরাজধানী লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ না করিয়া লক্ষ্মণসেনকে পরাভূত করিবার উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশে নদীয়ায় গমন করেন এবং অতর্কিতে প্রাসাদ-রক্ষীদের আক্রমণ করেন। প্রাসাদ-রক্ষীদের সহিত ইখতিয়ার-উদ্দীনের যুদ্ধের অবকাশে লক্ষ্মণসেন প্রাসাদের পশ্চাৎ দ্বারপথে পূর্ব বাঙ্গলা অভিমুখে প্রস্থান করেন। লক্ষ্মণসেন যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার রাজ্যের অন্য কোন অংশ আক্রমণ করিতে ইখতিয়ারউদ্দীন সাহস করেন নাই। লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের সহায়তায় মাধবসেনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইখতিয়ারউদ্দীন লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন। সুতরাং লক্ষ্মণসেনের ভীরুতায় নবদ্বীপ বা লক্ষ্মণাবতী মুসলিম পদানত হয় নাই। গুপ্ত ষড়যন্ত্র না থাকিলে মুসলিম সৈন্য বিনা বাধায় মগধ হইতে নবদ্বীপে আসিতে পারিত না, কিংবা ইখতিয়ারউদ্দীনও এমন অসমসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতেন না। লক্ষ্মণসেনের পুত্র-ত্রয়ের মধ্যে বিরোধবশতঃ কিংবা রাজ্যলোভী সামন্ত বা প্রধান ব্যক্তিগণের সাহায্যেই ইখতিয়ারউদ্দীন নির্বিরোধে নদীয়ায় আগমন ও তথা হইতে নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ষড়যন্ত্র-সমীক্ষা

মীনহাজ ও ইসামীর বর্ণনার সত্যতা অস্বীকার করা চলে না, এবং তাঁহাদের বর্ণিত অবস্থার পটভূমিকায় ইখতিয়ারউদ্দীনের নবদ্বীপ-বিজয় কিছু বিস্ময়কর ঘটনাও মনে হয় না কিংবা মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ভীরুতাও কিছু প্রমাণিত হয় না। কিন্তু তবুও মনে প্রশ্নের উদয় হয় যে, ইখতিয়ারউদ্দীন কর্তৃক বিহার ধ্বংস এবং মগধ জয়ের কাহিনী তো লক্ষ্মণসেনের অজ্ঞাত ছিল না, বৎসরাধিককাল সময়ও তিনি পাইয়াছিলেন; তবে কেন তিনি মাতৃভূমি বা রাজ-আবাস রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন না, কিংবা করিলেও কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? তিনি বৃদ্ধ হইতে পারেন; কিন্তু তিনি তো দেশের রাজা—বীরধর্ম এবং রাজধর্ম কি তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন! তিনি তো শত্রু-

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের বিসদৃশ ও অস্বাভাবিক আচরণ

প্রতিরোধে মৃত্যুবরণ করিয়া বীরধর্ম পালন করিতে পারিতেন। অথচ তিনিই এককালে শৌর্যে-বীর্যে, শস্ত্র ও সৈন্যবলে কাশী, কলিঙ্গ ও কামরূপ বিজয় করিয়াছিলেন। এমন কি, নবদ্বীপ ত্যাগের পরেও তিনি পূর্ববঙ্গে কয়েক বৎসর রাজত্ব পরিচালনা এবং প্রজার কল্যাণার্থে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার বংশধরগণ আরও পঞ্চাশ বৎসর পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মীনহাজের গ্রন্থে আর একটি কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়; এই কাহিনীর মধ্যে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের মানসিক অবস্থা এবং সমসাময়িক বাঙ্গালী সমাজের মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মীনহাজ-বর্ণিত কাহিনী বিশ্লেষণ করিলেও মহারাজ লক্ষ্মণসেনের আচরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণসেন

মীনহাজ-বর্ণিত কাহিনীতে আছে—"ইখতিয়ারউদ্দীন যখন বিহার ও মগধ বিজয় ও লুণ্ঠন করিতেছিলেন তখন বঙ্গের অধিপতি ছিলেন রায় লখমনিয়া। তাঁহার রাজধানী ছিল নবদ্বীপ বা নদীয়া নগরীতে। ইখতিয়ারউদ্দীনের বিজয়কাহিনী এবং যশোবার্তা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল হইতেই তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। এই অবস্থায় তাঁহার রাজ্যের কতিপয় গুণী, পণ্ডিত, জ্যোতিষী এবং পরামর্শদাতা রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন—প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, এই দেশ বিদেশী তুর্কী জাতি কর্তৃক বিজিত হইবে এবং সেই সময়ও প্রায় সমাগত। তুর্কী সৈন্যগণ বিহার জয় করিয়াছে এবং পর বৎসরই তাহারা বঙ্গে আসিবে। তাঁহারা রাজাকে আরও অনুরোধ করিলেন—তিনি যেন প্রজাবর্গসহ দেশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গ ও কামরূপে আশ্রয় গ্রহণ করেন; তাহা হইলেই তিনি বিধর্মী তুর্কীর অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। রায় লখমনিয়া সেই বিধর্মী বিজেতার দেহাকৃতি সম্বন্ধে কোন বর্ণনা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা উত্তর দিলেন যে, প্রাচীন গ্রন্থে সেই বিজেতার রূপবর্ণনাও রহিয়াছে—তিনি হইবেন আজানুলম্বিতভুজ। রায়ের নির্দেশে উক্তপ্রকার দেহাকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির অনুসন্ধানে বিশ্বস্ত অনুচর প্রেরিত হইল। তাঁহারা রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজসমীপে নিবেদন করিল যে, মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনই শাস্ত্র-বর্ণিত বিধর্মী বিজেতা; অর্থাৎ ইখতিয়ারউদ্দীনের দেহাকৃতিতেই শাস্ত্র-বর্ণিত বিধর্মী বিজেতার রূপের সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য জানিবার পরেই রাজ্যের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ অধিবাসী পূর্ববঙ্গ ও কামরূপে পলায়ন করিলেন। রায় লখমনিয়া কিন্তু স্বদেশ ও স্বরাজ্য ত্যাগের পরামর্শকে স্বচ্ছন্দমনে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি নবদ্বীপেই রহিয়া গেলেন।"[১] শত্রু অগ্রসরমান জানিয়া এবং মন্ত্রী ও উপদেষ্টৃবর্গের পরামর্শে বিচলিত হইলেও লক্ষ্মণসেন রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন না। কিন্তু ছদ্মবেশী শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে পলায়ন ব্যতীত যখন আর কোন উপায় ছিল না, তখনই তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি ভীরু কাপুরুষ ছিলেন না—ছিলেন ভাগ্যবিড়ম্বিত। বঙ্গদেশ ও সমাজ ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে যে অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের আচরণ বিশ্লেষণ

রায় লখমনিয়া সম্বন্ধে মীনহাজের অভিমত

---

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. by Raverty, p. 556

হইতেছিল, লক্ষ্মণসেনের শৌর্যবীর্য এবং গুণাবলী বঙ্গদেশকে সেই আসন্ন পরিণতি হইতে রক্ষা করিতে পারিত না এবং পারেও নাই। লক্ষ্মণসেনের ব্যক্তিগত পরাক্রম এবং শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিতে গিয়া মীনহাজ স্বয়ং লিখিয়াছেন—"রায় লখ্‌মনিয়া মহান্ নরপতি ছিলেন (Great Rai)—হিন্দুস্থানে তাঁহার মত সম্মানিত রাজা আর ছিলেন না। তিনি কাহারও প্রতি অত্যাচার-অবিচার করেন নাই এবং কখনও লক্ষ কড়ির কমে কাহাকেও দান করেন নাই।" [১]

ইখতিয়ারউদ্দীন কর্তৃক নবদ্বীপ বিজয়ের কারণ

বিদেশী ইখতিয়ারউদ্দীন কর্তৃক নবদ্বীপ বিজয়ের কারণ আরও গভীর, আরও ব্যাপক —তাহা উত্তর ভারতের সমসাময়িক ইতিহাসের সহিত যুক্ত। ভারতীয় পদাতিক, গজারোহী এবং স্বল্পমাত্র অশ্বারোহী সৈন্য অপেক্ষা তুর্কীদের দ্রুতগামী সুকৌশলী অশ্বারোহী সৈন্য বহুগুণে নিপুণ ছিল। সুতরাং মুসলিম রণপাণ্ডিত্য, রণকৌশল এবং রণনৈপুণ্যের নিকট ভারতীয় সৈন্যকে পুনঃপুনঃ পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। বঙ্গদেশও এই সাধারণ নিয়মেই যেন বিদেশী তুর্কী বাহিনীর নিকট পরাজিত হইয়াছিল। নবদ্বীপে মুসলিম সৈন্যের অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার মত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, চিত্তবল কিংবা প্রতিরোধক্ষমতা লক্ষ্মণসেনের সৈন্যদের ছিল না। লক্ষ্মণসেন রাষ্ট্র এবং রাজধানী রক্ষার জন্য কতখানি সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না; তবে এই প্রতিরোধ-ব্যবস্থা যে খুব সুষ্ঠু ছিল, তাহাও মনে হয় না।

তরাইনের যুদ্ধের পরই উত্তর-ভারত ক্রমে ক্রমে মুসলমানের পদানত হইয়া পড়িয়াছিল এবং ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে গাহড়বাল-রাজ জয়চন্দ্রের মৃত্যুর পর পূর্বদিকের একমাত্র পরাক্রান্ত স্বাধীনরাজ্য ছিল লক্ষ্মণসেনের সেনরাষ্ট্র। গাহড়বাল প্রতিরোধ-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশী আক্রমণের সকল আঘাত আসিয়া পড়িল সেনরাষ্ট্রের উপর। সেই সেনরাষ্ট্রের কিয়দংশ যখন অধিকৃত হইল, বিহার বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত হইল, তখন জনসাধারণের মন সাধারণ নিয়মেই আতঙ্ক ও ভীতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই আতঙ্কেই বহু লোক পূর্ব-বঙ্গ ও কামরূপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও বণিকগণ; এমন কি, নবদ্বীপও প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল মীনহাজই একথা বলেন নাই—বৌদ্ধ ভিক্ষু তারানাথও বলিয়াছেন যে, বহু ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধভিক্ষু সমসাময়িক কালে নানাদিকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরিত্যক্ত নবদ্বীপ

সেনযুগ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানের যুগ। সেন-নরপতিগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির গভীর অনুরাগী সমর্থক—অন্ধ বিশ্বাসী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৌদ্ধ পালযুগের সমন্বয়ী সমাজ-ব্যবস্থাকে বিচূর্ণ করিয়া নূতন ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি অনুযায়ী সমাজ-ব্যবস্থা রচনা করাই ছিল তাঁহাদের প্রচেষ্টা। ব্রাহ্মণ্য ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বীদের কোন যোগ্য স্থানই রাষ্ট্রে বা রাষ্ট্রব্যবস্থায় ছিল না। বৌদ্ধগণ সেনযুগে তো অবজ্ঞাত অবহেলিতই ছিলেন। সুতরাং রাষ্ট্রের কিংবা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী সেন-নরপতির প্রতি তাঁহাদের বিশেষ কোন সহানুভূতি ছিল না—ছিল সহজাত বিদ্বেষ। অতএব বৌদ্ধবিরোধী সেনরাষ্ট্রের বিপদে বৌদ্ধগণ কোন

ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুরাগী সেনরাষ্ট্রের প্রতি বৌদ্ধগণের বিদ্বেষ

[১] *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. by Raverty, p. 558 F. N. 7

প্রতিরোধের চেষ্টা না করিয়া দূরে সরিয়া যাইবে—ইহাই তো স্বাভাবিক মনোবৃত্তি; যদিও বৌদ্ধগণের স্বদেশের বিরুদ্ধে বিভীষণ-বৃত্তি বা বিদেশী মুসলমানকে সহায়তা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে। অবশ্য, সাধারণ মানুষের পক্ষে সাধারণ মনোবৃত্তির উর্ধ্বে উঠা যথেষ্ট কঠিন। ব্যক্তিগত কারণে কিংবা কয়েকটি বণিকগোষ্ঠীর ধনৈশ্বর্যের জন্য সেন-নরপতিগণ তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। শ্রেষ্ঠী এবং বিত্তশালী বণিকগণও সেন-নরপতিদের প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারাও সেনরাষ্ট্রের বিপদের মুহূর্তে নির্লিপ্ত রহিলেন। ব্রাহ্মণগণ সেনযুগের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পারিপার্শ্বিকতায় অতিমাত্রায় আচারনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবশ্য এই আচারনিষ্ঠা প্রায় কুসংস্কারেই পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণগণও বিদেশী বিধর্মীর অত্যাচার হইতে স্বীয় নিয়মব্যবস্থা ও আচারনিষ্ঠার অন্তরালে আত্মরক্ষার জন্য মুসলমান আক্রমণের পূর্বাহ্নে দেশ ত্যাগ করিলেন।

সমসাময়িক জনসমাজের জ্যোতিষে বিশ্বাস

ব্রাহ্মণ জ্যোতিষিগণের জ্যোতিষগণনা ও শাস্ত্রের যে যুক্তির ইঙ্গিত মীনহাজের বিবরণে পাওয়া যায়, তাহাও অস্বীকার করা চলে না। লক্ষ্মণসেনের জন্মকাহিনী অলৌকিক এবং অবিশ্বাস্য হইলেও উহা সমসাময়িক জনসমাজের জ্যোতিষে বিশ্বাসই প্রমাণ করে। মীনহাজের বিবরণে উল্লিখিত আছে যে, বল্লালমহিষীর (লক্ষ্মণসেনের মাতা) সন্তানসম্ভাবনা হইয়াছে; প্রসবসময় প্রায় সমুপস্থিত। রাষ্ট্রের জ্যোতিষিবর্গকে শুভক্ষণ নির্ধারণের জন্য আহ্বান করা হইল। জ্যোতিষিবর্গ ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তে সন্তান প্রসূত হইলে সেই সন্তান রাজ্যেশ্বর হইবে। রাজমহিষী এই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণে তাঁহার পরিচারিকাবৃন্দকে আদেশ করিলেন, যেন তাঁহার শির নিম্নমুখী এবং পদদ্বয় উর্ধ্বমুখী করিয়া রাখা হয়। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল। নির্দিষ্ট সময় অন্তে পরিচারিকাবৃন্দ রাজমহিষীকে যথারীতি প্রসূতি-শয্যায় শায়িত করিল এবং তাঁহার গর্ভোপরি রাজমুকুট স্থাপিত হইল। এই অবস্থায় রাজা লক্ষ্মণসেনের জন্ম হইল। কিন্তু রাজমহিষী বা রাজমাতা এই অস্বাভাবিক প্রসব-ব্যবস্থার অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ইহলীলা সংবরণ করিলেন। এই যুগের খ্যাতনামা পণ্ডিত, সমাজের পরিচালক ভবদেব ভট্ট, হলায়ুধ প্রভৃতি সকলেই ছিলেন জ্যোতিষ-বিশ্বাসী এবং জ্যোতিষ-নির্ভর। এমন কি, সেন-নরপতিগণও জ্যোতিষে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন। বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেন জ্যোতিষ গ্রন্থ পর্যন্ত রচনা করিয়াছেন। রাজা, রাজপরিবার, মন্ত্রিবর্গ এবং জনসাধারণ, সকলেই যেন জ্যোতিষে বিশ্বাসী ও জ্যোতিষে নির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং সেই সংকটময় মুহূর্তে মীনহাজ জ্যোতিষীদের উক্ত আচরণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা চলে না। জনসাধারণ যেখানে আতঙ্কগ্রস্ত—পলায়নপর, রাষ্ট্রের মন্ত্রী ও উপদেষ্টামণ্ডলী যেখানে পরাজয়ী মনোবৃত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন, জ্যোতিষ যেখানে রাষ্ট্রবুদ্ধির নিয়ামক, সেই ক্ষেত্রে সৈন্যদল এবং জনসাধারণের চিত্তবল এবং প্রতিরোধ-বাসনা সুদৃঢ় ও সফল হইতে পারে না। সুতরাং

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের জন্মকাহিনী

লক্ষ্মণসেনও ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্য-প্রভাবে এই আসন্ন পতন প্রতিরোধ করিতে পারিতেন না। লক্ষ্মণসেনের আচরণকে মুসলিম শক্তি কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কারণ বলা চলে না। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিম্নগামী প্রবাহকে রোধ করিবার মত সাহস, শক্তি, বুদ্ধি, চরিত্রের দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব ও চিত্তবৃত্তি যেন কাহারও ছিল না—সকলেই যেন অনিবার্য ভবিষ্যৎকে ভবিতব্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইখতিয়ারউদ্দীনের গৌড়বিজয়ঃ ইখতিয়ারউদ্দীনের নবদ্বীপ-বিজয়ের পশ্চাতে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন। রাজ্যবিজয় প্রধান লক্ষ্য হইলে তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্মণসেনের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কিংবা তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের বিরুদ্ধে সৈন্যপ্রেরণ তিনি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন নাই কিংবা সৈন্য প্রেরণ করিলেও অনিশ্চিত পরিস্থিতি এবং জয়লাভ অনিশ্চিত বুঝিয়াই পূর্ববঙ্গে অভিযান প্রেরণ করেন নাই। লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইখতিয়ারউদ্দীন স্বল্পকাল মাত্র নবদ্বীপে অবস্থান করিলেন এবং প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া বঙ্গের রাজধানী গৌড় অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। গৌড়-নগরী নবদ্বীপের মত অরক্ষিত ছিল না; কিন্তু দুর্গপ্রাকার-সমন্বিত গৌড় নগরীও মুসলমান সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না; গৌড় বিজিত হইল। কিন্তু এই গৌড়বিজয় সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। হিন্দুগণ এই অপমানের গ্লানি লিপিবদ্ধ করেন নাই। মুসলিমগণও এই বিজয়ের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। এই নীরবতা স্বাভাবিক। কারণ নদীয়াতে রাজ-নিবাস পরিবর্তিত হইবার পর হইতেই গৌড়ের ঐশ্বর্য এবং প্রাধান্য হ্রাস পাইতেছিল। বণিক, ধনিক এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রাজার সঙ্গে সঙ্গে নদীয়াতে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। গৌড়ের সমৃদ্ধি হইল ক্ষয়িষ্ণু। তারপর ইখতিয়ারউদ্দীন কর্তৃক নদীয়া বিজয়ের পরেই গৌড়বাসী বুঝিল ইখতিয়ারউদ্দীনের পরবর্তী লক্ষ্য হইবে গৌড়। সুতরাং গৌড়বাসিগণ ধর্ম, সম্মান ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য কেহ মিথিলায়, কেহ বা নেপালে চলিয়া গেল। গৌড় তখন মৃত নগরী। গৌড়বিজয় সামরিক গৌরবের বস্তু ছিল না; লুণ্ঠনের দিক হইতেও গৌড়বিজয় সুফলপ্রসূ হয় নাই। সুতরাং মুসলিম ইতিহাসকারগণ গৌড়বিজয়ের উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই।

গৌড় নগরী পরিত্যক্ত

মৃত নগরী গৌড়

১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন বরেন্দ্রী বা উত্তরবঙ্গবিজয় সমাপ্ত করিলেন। ইখতিয়ারউদ্দীন কর্তৃক গৌড়বিজয়ের সমকালে মালিক কুতুবউদ্দীন আইবক কালিঞ্জর, মাহোবা ও কলপী বিজয় সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইখতিয়ারউদ্দীন স্বীয় বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে নবদ্বীপ ও গৌড় বিজয় করিয়াছিলেন। কুতুবউদ্দীন তাঁহাকে সৈন্য বা অর্থ দ্বারা বিন্দুমাত্রও সাহায্য করেন নাই। কিন্তু পরে ইখতিয়ারউদ্দীনের এই নবদ্বীপ ও গৌড় বিজয় কুতুবউদ্দীনের মনে কোন ঈর্ষার উদ্রেক করে বা কুতুবউদ্দীন ইখতিয়ারউদ্দীনকে বঙ্গ-বিহারের শাসকরূপে স্বীকার না করেন—এই আশংকায় ইখতিয়ারউদ্দীন কুতুবউদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় অধিকার অক্ষুণ্ণ

বরেন্দ্রীবিজয়

রাখিলেন। ইখতিয়ারউদ্দীন কুতুবউদ্দীনকে বিংশতি-সংখ্যক হস্তী এবং প্রচুর ধনরত্ন উপহার দিলেন। কুতুবউদ্দীনও ইখতিয়ারউদ্দীনকে অশ্ব, তরবারি, নিশান এবং খিলাত প্রদান করিলেন। ইখতিয়ারউদ্দীনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কুতুবউদ্দীন আত্মতৃপ্তি লাভ করিলেন যে, ইখতিয়ারউদ্দীন তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন এবং ইখতিয়ারউদ্দীন আত্মগৌরব অনুভব করিলেন যে, তিনিই হইলেন বঙ্গের স্বাধীন শাসক ও অধিকর্তা।

কুতুবউদ্দীন ও ইখতিয়ার-উদ্দীনের সাক্ষাৎকার

ইখতিয়ারউদ্দীনের শাসন-ব্যবস্থাঃ পরবর্তী দুই বৎসর কাল (১২০৩ খ্রীঃ-১২০৫ খ্রীঃ) ইখতিয়ারউদ্দীন তাঁহার নববিজিত রাজ্যখণ্ডে শান্তি ও শৃংখলা বিধানে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনে ইসলামের চিরাচরিত শাসন-রীতিই অনুসরণ করিলেন। বিজিত ভূখণ্ড তিনি তাঁহার সহকর্মী তুর্কী খালজী আমীরগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। তুর্কীরীতি অনুসারে কোন আমীরই অন্য আমীর অপেক্ষা নিম্নস্তরের নহেন। এই সামন্তরীতিই তুর্ক-আফঘান শাসনব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী মালিক বা আমীরগণ তাঁহাদের সীমার মধ্যে স্বাধীনভাবেই শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন। অবশ্য লুণ্ঠন, পৌত্তলিকবিগ্রহ ও মন্দির ধ্বংস, মসজিদ নির্মাণ, কাফের বা বিধর্মীকে ধর্মান্তরিত-করণ এবং মুসলিম ধর্ম প্রচারের জন্য মাদ্রাসা স্থাপন প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষেই পুণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। রাজ্যরক্ষার জন্য মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন অধিকৃত অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করিলেন।

ইখতিয়ারউদ্দীনের হিন্দুনীতি

ইখতিয়ারউদ্দীনের রাজ্যসীমাঃ ইখতিয়ারউদ্দীনের রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছিল লাখনোর (বর্তমান বীরভূম জিলার অন্তর্গত নগর বা রাজনগর) এবং উত্তর-পূর্ব কোণে ছিল দেবকোট (বর্তমান দিনাজপুরের অন্তর্গত গঙ্গারামপুর)। বর্তমান বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও দিনাজপুর জেলা তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল অর্থাৎ প্রাচীন রাঢ় ও বরেন্দ্রী ব্যাপিয়া মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনের রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

তিব্বত অভিযান

তিব্বত অভিযানই ছিল মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনের জীবনের শেষ কর্মপ্রচেষ্টা বা শেষ সমরাভিযান। মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন ছিলেন জাত সৈনিক, যুদ্ধই ছিল তাঁহার জীবনের প্রেরণা, শক্তির মূল উৎস। সুতরাং নীরস গতানুগতিক শাসনকার্য লইয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। শাসন-ব্যবস্থা রচনা তাঁহাকে অধিক দিন আনন্দ দিতে পারিল না। তাঁহার অনুচর তুর্কী ও আফঘান সৈনিকগণও যুদ্ধের অভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তাহাদিগকেও কর্মের সন্ধান দিতে হইবে, লুণ্ঠনের উপযুক্ত ক্ষেত্রের সন্ধান দিতে হইবে। হিমালয়ের অপরাংশের দেশখণ্ড তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পূর্বেই এই অঞ্চলের ধনৈশ্বর্যের কাহিনী তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। দুঃসাহসিক কর্মের উন্মাদনা, নূতন দেশ জয়ের মোহ, তিব্বতের মধ্য দিয়া

তিব্বত অভিযানের কারণ

হিন্দুস্থান ও তুর্কীস্থানের মধ্যে যোগসূত্র-স্থাপন, তিব্বতীয় অশ্বক্রয়ের একাধিকার লাভ এবং ইসলাম প্রচারের আবেগও তাঁহাকে এই তিব্বতাভিযানে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তিব্বতের মন্দিরে দুই-তিন হাজার মণ ওজনের স্বর্ণমূর্তির কাহিনীও তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল।

বঙ্গের সহিত তিব্বতের যোগাযোগ

তিব্বত বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত ছিল না। সুপ্রাচীন কাল হইতেই তিব্বতের সহিত বঙ্গের যোগসূত্র ছিল এবং বঙ্গ ও তিব্বতের এই বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কখনও ছিন্ন হয় নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৌদ্ধধর্ম প্রচারসূত্রে তিব্বতের সহিত বঙ্গের একটা আত্মীয়তা এবং ঘনিষ্ঠতাও গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গলার কীর্তিমান সন্তান মতিধ্বজ তিব্বতের প্রধান লামার পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বঙ্গের গৌরবরবি, ভারতের জ্ঞানসূর্য দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞান তিব্বতে ভগবান তথাগত বুদ্ধের বাণী প্রচার করিয়া তিব্বতেই দেহত্যাগ করেন। দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালীসন্তান তিব্বতের পথে চীনের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছিল। ভুটান ও তিব্বতের বণিকগণ উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের বিপণিতে পণ্যসম্ভার বিক্রয় করিতে আসিত এবং তাহারা অদ্যাপি আসে। ইখতিয়ারউদ্দীন তিব্বতীয় বণিকদের নিকট হইতে তিব্বতের ধনৈশ্বর্যের কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য তথ্যও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মীনহাজ-উস-সিরাজও তিব্বত এবং তুর্কীস্থান সম্বন্ধে বহু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তিব্বত অভিযানের অন্য কারণ

মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনের তিব্বত অভিযানের পশ্চাতে আরও উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার নববিজিত রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে তিস্তা ও করতোয়া নদীর অপর তীরেই ছিল শক্তিশালী কামরূপ রাজ্য। পশ্চিমে গণ্ডক ও কুশীনদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল পরাক্রমশালী মিথিলা রাজ্য। দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল পরাক্রান্ত গঙ্গবংশীয় রাজগণের উড়িষ্যা রাজ্য এবং পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর অঞ্চলে মহারাজ লক্ষ্মণসেন তখনও রাজত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং ইখতিয়ারউদ্দীনের পক্ষে এই সকল হিন্দুরাজ্য বিজয়ই ছিল সমীচীন। কিন্তু অনিশ্চিত জয়ের আশায় তিনি এই সকল পরাক্রান্ত রাজ্য আক্রমণ করিয়া স্বীয় ভাগ্যকে ক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, অথচ তাঁহার এবং তাঁহার সৈন্যদলের সমরলিপ্সা পরিতৃপ্ত করারও প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তিনি বরেন্দ্রী ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী অজ্ঞাত অঞ্চল বিজয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। এই অঞ্চলের অপর পার্শ্বে ছিল তিব্বত, চীন ও তুর্কীস্থানের বিস্তৃত ভূখণ্ড। সুতরাং তিনি সমতল অংশের সুসভ্য হিন্দুরাজ্যে অভিযান না করিয়া অজ্ঞাত অঞ্চল বিজয়েই অগ্রসর হইলেন।

তিব্বত অভিযানের প্রস্তুতি

মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনের তিব্বত অভিযান অনিশ্চিতের পথে অভিযান নহে। তিব্বত অভিযানে অগ্রসর হইবার পূর্বেই তিনি যথেষ্ট বিচক্ষণতার সহিত সমস্ত সামরিক আয়োজন এবং যোগাযোগের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে লক্ষ্মণাবতী এবং হিমালয়ের মধ্যবর্তী পার্বত্য অরণ্যময় অঞ্চলে কোচ, মেচ, থারু প্রভৃতি কয়েকটি মোঙ্গলীয় জাতি বাস করিত। তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থ হইতে জানা

যায় যে, তিব্বত অভিযানের পূর্বেই তিনি এই পার্বত্য অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযাত্রী বা অগ্রগামী দল প্রেরণ করিয়াছিলেন। অভিযাত্রী দল কর্তৃক একজন মেচ-নায়ক ধৃত হইয়াছিলেন। মেচ-নায়ক ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। তাঁহার নূতন নামকরণ হইল আলী মেচ। তাঁহার বহু মেচ-অনুচরও ইখতিয়ারউদ্দীনের সহিত যোগদান করিল; অবশ্য তাহারা সকলেই যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নহে।

কামরূপের পথে তিব্বত অভিযানের সিদ্ধান্ত

কামরূপরাজও লক্ষ্মণসেনের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ, লক্ষ্মণসেন একবার কামরূপ আক্রমণ ও বিজয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং ইখতিয়ারউদ্দীনের ধারণা হইয়াছিল যে, লক্ষ্মণসেনের প্রতি বিরূপতাবশতঃ হয় তো কামরূপরাজ তাঁহার সহায়তা করিবেন। ইখতিয়ারউদ্দীনের সহিত কামরূপরাজ যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনের দুর্ধর্ষ বিজয়ী সেনাদলকে বাধা দিবার সাহসও তাঁহার ছিল না। সুতরাং ইখতিয়ারউদ্দীন কামরূপের পথেই তিব্বত অভিযানের পরিকল্পনা করিলেন।

তিব্বত অভিযানের পূর্বে রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা

সুদূর তিব্বত অভিযানে যাত্রা করিবার পূর্বেই মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন তাঁহার রাজ্যরক্ষার সুব্যবস্থাও করিলেন। তিনি মুহম্মদ শিরাণ ও আহম্মদ শিরাণ নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে লাখনোরে (বর্তমান বীরভূমের অন্তর্গত নগর বা রাজনগর) এবং জাজ-নগরে (উত্তর উড়িষ্যা) প্রেরণ করিলেন। গঙ্গার তীরবর্তী হিন্দুগণকে ব্যস্ত ও বিব্রত রাখা এবং রাঢ় অঞ্চল স্থায়িভাবে বিজয়ই ছিল শিরাণ ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর ন্যস্ত কর্তব্যভার। রাজ্যের পূর্বসীমান্ত রক্ষার জন্য আলী মরদান খালজী সরকার ঘোড়াঘাটে নিযুক্ত হইলেন—তাঁহার কর্মকেন্দ্র হইল করতোয়াতীরস্থ বরসাউল বা বড়সালা। রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ভারপ্রাপ্ত হইলেন হুসামউদ্দীন খালজী। তাঁহার কর্মকেন্দ্র ছিল সরকার তানডা বা রাজমহলের অন্তর্গত গাঙ্গুরী। তিনি রাজমহল হইতে কুশী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের শাসনভার লাভ করিয়াছিলেন। এই কুশী নদী মিথিলারাজ্য এবং লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়রাজ্যের সীমা নির্দেশ করিত।

মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনের যাত্রারম্ভ

১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে শীতের শেষে মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন তিব্বত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইখতিয়ারউদ্দীনের সৈন্য সমাবেশ হইয়াছিল দেবকোটে—বর্তমান দিনাজ-পুর শহরের দশ মাইল দক্ষিণে। প্রায় দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সংগৃহীত হইল —ইহাই তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থের রচয়িতা মীনহাজ-উস-সিরাজের অভিমত।[১] অবশ্য গোলাম হুসেন[২], মীনহাজ-উদ্দীন[৩], নিজামউদ্দীন[৪], বদায়ুনী[৫] প্রভৃতি ইতিহাসকারগণের মতে এই সৈন্যসংখ্যা ছিল দ্বাদশ সহস্র। দেবকোট হইতে

---

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. p. 560

২) *Riyas-us-Salatin*, Tr. p. 64

৩) *Tabqat-i-Akbari*, Tr. p. 52

৪) *Tarikh-i-Hindustan*, Tr. p. 294

৫) *Muntakhab-ut-Tawarikh*, Tr. p. 83

ইখতিয়ারউদ্দীনের বিপুল বাহিনী উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হইল, পথ-প্রদর্শক ছিলেন আলী মেচ; আপাততঃ গন্তব্যস্থান ছিল বর্ধনকোট।[১] পথ দুর্গম, খাদ্য-ব্যবস্থা বিঘ্নবহুল, শত্রুর শক্তি অজ্ঞাত, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। বিজয়ের পর বিজয় ইখতিয়ার-উদ্দীনকে দুঃসাহসী করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, এই অভিযানই তাঁহার জীবনের শেষ সমরাভিযান।

বর্ধনকোটে উপস্থিতি

দেবকোট হইতে উত্তর-পূর্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া আলী মেচের নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনী অবশেষে বর্ধনকোট নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বর্ধনকোটের সম্মুখে গঙ্গার তিন-চারিগুণ প্রশস্ত একটি নদী প্রবাহিত। তবকাৎ-ই-নাসিরী এবং তবকাৎ-ই-আকবরী গ্রন্থে এই নদী বাগমতী নামে উল্লিখিত। রিয়াজ-উস-সালাতীন অনুসারে এই নদীর নাম নমকদি। বদায়ুনী এই নদীকে ব্রহ্মণপুত্র বা ব্রহ্মপুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফেরিস্তা অনুসারে এই নদীর নাম তিমকরি। এই নদীর অবস্থিতি সম্পর্কে মীনহাজ [২], নিজামউদ্দীন [৩], গোলাম হুসেন [৪], বদায়ুনী [৫], ফেরিস্তার[৬] মধ্যে মতভেদ আছে। কাহারো মতে ইহা ব্রহ্মপুত্র, মতান্তরে ইহা তিস্তা বা ত্রিস্রোতা। তবে বর্ধনকোট এখন বগুড়া জেলায় (প্রাচীন মহাস্থানগড়ের সংলগ্ন ভূমিখণ্ড) বিদ্যমান রহিয়াছে এবং বর্ধনকোটের সম্মুখে করতোয়া ব্যতীত অপর কোন বৃহৎ নদী নাই। ব্লকম্যান-এর মত অনুসারে প্রাচীন তিস্তা নদীরই নাম বাগমতী।[৭]

বর্ধনকোট পরিচিতি

দেবকোট (বর্তমান দিনাজপুরের দশ মাইল দক্ষিণে) হইতে মুসলিম বাহিনী উত্তর-পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। বর্ধনকোট যদি প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন বা মহাস্থানগড়ের সন্নিকটে হয়, তাহা হইলে মুসলিম সেনাবাহিনীকে বিপরীত মুখে অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্বে আসিতে হইয়াছিল এবং করতোয়া ভিন্ন কোন বৃহৎ নদীও এই অঞ্চলে নাই। মুসলিম বাহিনী দেবকোট হইতে উত্তর-পূর্ব মুখে অগ্রসর হইয়া বাগমতী তীরে বর্ধনকোটে পৌছিয়াছিল। মুসলিম সেনাবাহিনী উত্তর-পূর্ব মুখে অগ্রসর হইয়াছিল, সুতরাং বর্ধনকোট দেবকোটের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ছিল। ব্লকম্যান মীনহাজোক্ত বাগমতীকে তিস্তা নদীর সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন এবং মনে হয় তাঁহার অনুমানই সত্য; কারণ, বর্ধনকোট করতোয়া তীরে অবস্থিত হইলে কামরূপের পথে অগ্রসর হইতে অপর একটি নদী অতিক্রম করিতে হয় এবং এই নদীই তিস্তা। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কখনও কখনও কামরূপ রাজ্যের সীমা

---

১) **Bardhankot identified with Pundrabardhan by Minhaj in his *Tabqat-i-Nasiri*, says Ramaprasad Chanda (*Sahitya Parishad Patrika,* 1820 B.S., p. 312)**

২) ***Tabqat-i-Nasiri,* Tr. p. 561**

৩) ***Tabqat-i-Akbari,* Tr. p. 52**

৪) ***Riyas-us-Salatin,* Tr. p. 65**

৫) ***Muntakhab-ut-Tawarikh,* Tr. p. 84**

৬) ***Tarikh-i-Ferishta,* Tr. p. 294**

৭) ***Sahitya Parishad Patrika.* 1320 B.S., p. 311-312**

ব্রহ্মপুত্র ও করতোয়া নদী অতিক্রম করিয়া রংপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলার সীমানা—এমন কি, কুশী নদীও স্পর্শ করিয়াছিল। মীনহাজের বিবরণ পাঠে অনুমিত হয় যে, বর্ধনকোট ছিল দেবকোট হইতে উত্তর-পূর্বে অবস্থিত তিস্তা নদীর তীরে একটি সমৃদ্ধ নগরী।

বর্ধনকোট হইতে নদীর তীর অনুসরণ করিয়া নদীর উৎসমুখে দশদিন অবিশ্রান্ত চলিবার পর একাদশ দিবসে ইখতিয়ারউদ্দীনের সেনাবাহিনী পর্বতের সানুদেশে সমুপস্থিত হইল। ইখতিয়ারউদ্দীন এইস্থানে বিংশতি-খিলানযুক্ত একটি প্রাচীন পাষাণনির্মিত সেতু দেখিতে পাইলেন। সেই সেতুপথে মুসলিম সৈন্যবাহিনী সহজেই সুপ্রশস্ত খরস্রোতা নদী অতিক্রম করিল। গৌহাটির নিকটে ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ কানাই-বরশী বোয়া নামক স্থানের শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন কামরূপের মধ্য দিয়া একটি ব্যর্থ অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই শিলা-লিপিটির নিকটেই একটি সেতুও বিদ্যমান। সম্ভবতঃ এইটিই মীনহাজ-বর্ণিত বিংশতি-খিলানযুক্ত পাষাণসেতু। এই শিলালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ :

পাষাণ-সেতু ও নদী অতিক্রম

শাকে ১১২৭ (১২০৬, ২৭ মার্চ আনুমানিক)
শাকে তুরগ যুগ্মেশে মধুমাসে ত্রয়োদশে
কামরূপং সমাগত্য তুরস্কাঃ ক্ষয়মায়য়ুঃ ॥
(কামরূপ-শাসনাবলী-ভূমিকা)

আলী মেচ এই স্থান হইতেই বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইখতিয়ারউদ্দীন তাঁহার দুইজন আমীরকে সেতুরক্ষায় নিযুক্ত করিয়া পার্বত্য পথে আরোহণ আরম্ভ করিলেন। এইবার তাঁহারা বঙ্গের সীমানা অতিক্রম করিলেন এবং কামরূপের উত্তরতম অঞ্চল অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। কামরূপরাজ ইখতিয়ারউদ্দীনকে তাঁহার রাজ্য মধ্য দিয়া সৈন্য পরিচালনায় বাধাপ্রদান করেন নাই। তিনি বর্ষার শেষে তিব্বতে অভিযান করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সসৈন্যে ইখতিয়ারউদ্দীনের সহিত যোগদান করিবেন—এইরূপ আশ্বাসও প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইখতিয়ারউদ্দীন কামরূপরাজের পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি তখন জয়ের নেশায় উন্মত্ত—কিংবা ভবিতব্য তাঁহাকে অনিবার্য পরিণতির দিকে আকর্ষণ করিতেছিল।

কামরূপে মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন

পঞ্চদশ দিবস ক্রমাগত চলিবার পর বিপদসংকুল দুর্গম পার্বত্য পথ শেষ হইল। ষোড়শ দিবসে মুসলিম সৈন্যগণ দেখিল সম্মুখে বিশাল উপত্যকা, সুকর্ষিত জনবহুল ভূখণ্ড। অপরিচিত বিদেশীর দর্শনমাত্রই তিব্বতীয়গণ আক্রমণকারিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চলিল। মুসলিম বাহিনীকে বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিতে হইল। এই যুদ্ধের স্থান সম্বন্ধে সুনিশ্চিত জানা যায় না। তবে এই স্থানটি তিব্বতের কেন্দ্রস্থলে না হইলেও তিব্বত রাজ্যের অন্তর্গত সীমান্তবর্তী কোন স্থানে, তাহা নিঃসন্দেহ। কারণ, এই স্থান হইতে পঁচিশ ক্রোশ বা পঞ্চাশ মাইল দূরেই তিব্বতের বিখ্যাত শহর করমবর্তন (করবর্তন বা করপত্তন)। এই স্থানে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র তিব্বতী সৈন্য ছিল। এই করমবর্তনের বিপণিতে প্রতিদিন

তিব্বতীয়দের সহিত সংগ্রাম

দেড় সহস্র টাঙ্গন অশ্ব (টাট্টু ঘোড়া) বিক্রীত হইত। লক্ষ্মণাবতীতে আনীত সকল অশ্বই ঐ করমবর্তনের বিপণিতে ক্রীত এবং তিব্বত-কামরূপের গিরিপথেই এই অশ্বগুলি লক্ষ্মণাবতীতে আনীত হইত। তিব্বত-কামরূপের মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় পঁয়ত্রিশটি গিরিবর্ত্ম রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি করমবর্তনের অবস্থান নির্দেশ করা সুকঠিন। আবার কাহারও মতে করমবর্তনের অশ্ববিক্রয়-কেন্দ্র দিনাজপুর জেলার অন্তর্বর্তী নেকতুমার বাজার। এখনও ঐ বাজারে বহু অশ্ব বিক্রীত হয়। এই সকল অশ্বের অধিকাংশই তিব্বত ও ভুটানের টাঙ্গন অশ্ব। কিন্তু করমবর্তন দিনাজপুরের অন্তর্বর্তী না হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ, মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন দেবকোট হইতে ষড়বিংশতি দিবসের পথ অতিক্রম করিয়াই তিব্বতের প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইখতিয়ারউদ্দীন প্রথম সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন বর্তমান দিনাজপুরের দশ মাইল দক্ষিণস্থ দেবকোটে। দেবকোট হইতে মুসলিম সৈন্যবাহিনী প্রথম দশদিনে বর্ধনকোটে এবং তথা হইতে ষোড়শ দিবস পরে তিব্বতে উপস্থিত হয়। সুতরাং দিনাজপুরের কোন অঞ্চলই গৌড়, দেবকোট কিংবা বর্ধনকোট হইতে ছাব্বিশ দিনের পথ হইতে পারে না—দশ সহস্র সৈন্য সহ পদব্রজে চলিলেও নহে।

তিব্বত অভিযান করমবর্তন

মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন যুদ্ধে জয়ী হইলেও সুদূর অপরিচিত পার্বত্য-অঞ্চলে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁহার পক্ষে খুব প্রীতিপ্রদ হয় নাই। সুতরাং সেই রাত্রিতেই তিনি শিবির উত্তোলন করিলেন এবং সৈন্যগণকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ প্রদান করিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন জীবনের তিক্ততম অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। সৈন্যদের খাদ্য নাই, অশ্বের তৃণ নাই; কারণ, তাহাদের প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই পার্বত্য সৈন্যগণ সমস্ত খাদ্য ও শস্য বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল। সৈন্যগণ অবিশ্রান্ত পথশ্রমে শ্রান্ত-ক্লান্ত, পশ্চাদ্‌ভাগ শত্রুসৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত, জীবন বিপন্ন। খাদ্যাভাবে অশ্বারোহী সৈনিকগণ তাঁহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু অশ্বগুলিকে হত্যা করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হইল; অনেকে খাদ্যাভাবে প্রাণত্যাগ করিল; কেহ বা অতিরিক্ত পথশ্রম এবং পরিশ্রম সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুবরণ করিল। পরিশেষে পঞ্চদশ দিবসের পথ অতিক্রম করিয়া তাহারা বাগমতীর তীরে উপস্থিত হইল।

মুহম্মদ ইখতিয়ার উদ্দীনের প্রত্যাবর্তন

কিন্তু ভাগ্যদেবী বিমুখ হইয়াছেন। মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন সেতুর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সেতু ভগ্ন—অনতিক্রমণীয়; পশ্চাতে নিষ্করুণ শত্রু, সম্মুখে খরস্রোতা বাগমতী। যে দুইজন আমীরকে তিনি সেতুরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা পরস্পর বিবাদের ফলে সেতু পরিত্যাগ করিয়াছে। নদী অতিক্রমের কোন উপায় নাই দেখিয়া মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন নৌকা সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু একটিও নৌকা সংগৃহীত হইল না। ইখতিয়ারউদ্দীন সসৈন্যে নিকটবর্তী একটি উচ্চ দেবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নৌকা ও ভেলা নির্মাণের চেষ্টা করিলেন।

ইখতিয়ারউদ্দীনের বিপর্যয়

কামরূপরাজ মুসলিম সৈন্যের ভাগ্যবিপর্যয় ও দুর্দশার কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে অবরোধ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কামরূপ-সৈন্যগণ সেই দেবমন্দিরের চতর্দিকে অসংখ্য বংশখণ্ড দ্বারা অবরোধ প্রাচীর রচনা করিল।

মুসলিম সৈন্যগণ যখন দেখিল যে, তাহাদের প্রত্যাবর্তনের পথ ক্রমেই রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তখন অনন্যোপায় হইয়া তাহারা অবরোধ-প্রাচীরের একাংশ ভেদ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠেই নদী অতিক্রম করিতে প্রয়াস পাইল। ইখতিয়ারউদ্দীনের দশ সহস্র সৈন্যের মধ্যে মাত্র একশত জন অশ্বারোহী ব্যতীত সমস্ত সৈন্য নদীজলে নিমজ্জিত হইল। নদীর অপর তীরে আলী মেচের আত্মীয়স্বজন অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের সহায়তায় ইখতিয়ারউদ্দীন তাঁহার একশত অশ্বারোহী সহ বহুকষ্টে দেবকোটে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহাই মীনহাজ-বর্ণিত ইখতিয়ারউদ্দীনের তিব্বত-অভিযানের কাহিনী।

কামরূপ-সৈন্য কর্তৃক মুসলিম সৈন্য আক্রমণ

মীনহাজ-বর্ণিত এই তিব্বত-অভিযান কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে ইতিহাসকার রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গলার ইতিহাস' গ্রন্থে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত—"তবকাৎ-ই-নাসিরীর অন্যান্য অংশের তুলনায় তিব্বত-অভিযানের কাহিনী অনেকটা অস্পষ্ট, কল্পনা-প্রসূত; ইহাতে অনেক অলীক কাহিনীর সমাবেশ আছে। মীনহাজের গ্রন্থে বর্ণিত আছে, শাহ গর্ষতাস্প চীন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে কামরূপে আসিয়াছিলেন। নদীতীরে দেবমন্দিরে দুই-তিন সহস্র মণ ওজনের সুবর্ণপ্রতিমার কথাও আছে। এই সকল কারণে অনুমিত হয় যে, মগধ ও গৌড় বিজয় করিয়া গর্বান্ধ ইখতিয়ারউদ্দীন হিমালয়ের পাদদেশস্থিত কোন পার্বত্য জাতি কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। সেই পরাজয়ের সংবাদ গোপন করিবার জন্য যে-সমস্ত অলীক কাহিনীর অবতারণা করিতে হইয়াছিল, মৌলানা মীনহাজ-উস-সিরাজ তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।"[১] কিন্তু মীনহাজ যদি তাঁহার এত বৃহৎ গ্রন্থের কোথাও সত্যের অপলাপ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এক্ষেত্রেই বা করিবেন কেন? পরাজয়ের অপমান গোপন করিতে হইলে তিব্বত-অভিযানে মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনের চরম বিপর্যয় এবং ব্যর্থতার কাহিনীও গোপন করিতে পারিতেন। ইখতিয়ারউদ্দীনের ব্যর্থতা এবং বিপর্যয়ের কাহিনী বর্ণনা করিতে তো মীনহাজ কুণ্ঠিত হন নাই। তবে কোন কোন বিষয়ে অতিরঞ্জন থাকিতে পারে। কিন্তু অতিরঞ্জনের পশ্চাতেও সত্য ন্যূনাধিক পরিমাণে নিহিত থাকে।

তিব্বত অভিযান সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রাখালদাসের অভিমত

মীনহাজের বিবরণ

আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আসামের শিলহাকো নামক স্থানে যে সেতু আছে, মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন সেই সেতু অতিক্রম করিয়া তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা অসম্ভব; কারণ, শিলহাকো প্রাচীন কামরূপদেশের উত্তর-পশ্চিম ভাগে অবস্থিত এবং কামরূপ বিজিত না হইলে শিলহাকো অতিক্রম করা অসম্ভব।[২] পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইখতিয়ারউদ্দীনের বিজয়কাহিনী ও বীর্যবত্তায় ভীত হইয়াই স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কামরূপরাজ, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, মুসলিম সৈন্যকে তাঁহার রাজ্য মধ্য দিয়া অভিযানের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। এমন কি, পর বৎসর অভিযান করিলে তিনি সসৈন্যে যোগদান

---

১) বাঙ্গলার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ৩২ পৃঃ।

২) *Ibid* p. 32

করিবেন—এমন উক্তিও করিয়াছিলেন।[১] সুতরাং কামরূপ রাজ্যমধ্যস্থ সেতু অতিক্রম করিতে কামরূপ বিজয়ের কোন প্রশ্ন উঠে না। অবশ্য কামরূপরাজের পরামর্শ গ্রহণ না করায় তাঁহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিয়াছিল এবং সেইজন্য সেই আহত আত্মাভিমানের ক্ষুব্ধ রোষেই তিনি প্রত্যাবর্তনের পথে মুসলিম সৈন্যের বিপর্যয় ও দুর্দশার কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহাদের অবরোধ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইখতিয়ারউদ্দীনের শ্রান্ত-ক্লান্ত হতোদ্যম ভগ্নপ্রায় সেনাবাহিনী হইতে তখন তাঁহার ভীত ও আতঙ্কিত হইবার কোন কারণ ছিল না। তদ্ব্যতীত কামরূপের হিন্দু নরপতির পক্ষে বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত বিদেশী বিধর্মী অভিযাত্রী দলের বিরুদ্ধে সংগ্রামও বিচিত্র নহে।

কামরূপরাজের বিরুদ্ধ আচরণ

তিব্বত-অভিযানই ইখতিয়ারউদ্দীনের জীবনের শেষ সমরাভিযান। দেবকোট হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। পরাজয়ের ক্ষোভ ও অপমানে ইখতিয়ারউদ্দীন সমাজ ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ পরিহার করিয়া চলিতে লাগিলেন। কারণ, তিব্বত-অভিযানে নিহত সেনানীবর্গের আত্মীয়-পরিজন তাঁহাকে দেখিলেই অভিসম্পাত বর্ষণ করিত, শ্লেষ করিত। ইখতিয়ারউদ্দীন শ্লেষ সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি গৃহপ্রাচীরের অন্তরালেই থাকিতে চেষ্টা করিতেন। ফলে অভিযানের বিফলতায় এবং নেতার অদর্শনে তুর্কী ও খালজী সেনাবাহিনী বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যুদ্ধ ও লুণ্ঠন যাহাদের জীবিকা, পরাজয় ও ব্যর্থতাকে তাহারা স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করিতে পারে না এবং সেনাপতির উপর বিশ্বাস বিনষ্ট হইলে অক্লেশেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করে—কোন দ্বিধাই তাহাদের মনে জাগে না। অত্যল্পকালের মধ্যেই ইখতিয়ারউদ্দীনের সৈন্যদলের মধ্যেও বিরোধ এবং বিশ্বাসঘাতকতা দেখা দিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনও এই সময়ে আসামের কালাজ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। রোগশয্যায় তাঁহার সুদিনের বন্ধু আলী মরদান খালজী বন্ধুদর্শনের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যে আগমন করিলেন এবং রুগ্ন ও পীড়িত বন্ধুর বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া বন্ধুকে অপমানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন (অগস্ট, ১২০৬ খ্রীঃ)।

তিব্বত-অভিযানের ফলাফল

ইখতিয়ারউদ্দীনের মৃত্যু

তিব্বত-অভিযানের আপাত ফল হইল এই যে, বঙ্গদেশে মুসলিম অগ্রগতির প্রবাহ প্রতিহত হইল; শক্তিশালী মুসলিম সেনাবাহিনী নূতন করিয়া গঠিত হইতে পারিল না; খালজী সৈনিকগণ উপযুক্ত নেতা-বিহনে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ইখতিয়ারউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাহার বিজিত ভূখণ্ড সৈন্যাধ্যক্ষগণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন। এই সৈন্যাধ্যক্ষ বা আমীরগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আলী মরদান, হুসামউদ্দীন আইয়াজ এবং মুহম্মদ শিরাণ খালজী। তাঁহাদের পরস্পর বিরোধে পরবর্তী কয়েক বৎসর বাঙ্গলার জন-জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছিল।

মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনের কৃতিত্ব: মধ্যযুগের তুর্ক-আফঘান ও মোঙ্গলজাতির সকল দোষগুণ লইয়াই মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখনও এই পার্বত্য অর্ধসভ্য জাতিগুলি স্থায়িভাবে কোন উপনিবেশ গঠন করে নাই কিংবা

১) *JASB*. Old Series, Vol XX, p. 291

স্থায়িভাবে বসবাসও আরম্ভ করে নাই। তাহারা ছিল ভ্রাম্যমাণ যাযাবর; আহার এবং আশ্রয়ের সন্ধানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া তাহারা দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিত। বর্ধিষ্ণু নগর-জনপদ তাহারা দ্বিধাহীন চিত্তে লুণ্ঠন করিত। অনেক সময় যুদ্ধ ও ধ্বংসের উন্মাদনায় তাহারা দূর-দূরান্তে গমন করিত এবং উপযুক্ত নেতার সন্ধান পাইলে তাঁহার অধীনে কর্মগ্রহণ করিত। মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনও শিহাবউদ্দীন ঘুরীর অধীনে কর্মপ্রার্থী হইয়া তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নিয়তির বিধানে তিনি বিফলমনোরথ হইলেন। তৎপরে ইখতিয়ারউদ্দীন দিল্লীতে কুতুবউদ্দীন আইবকের দরবারে কর্মপ্রার্থী হইয়াছিলেন—কিন্তু তথায়ও তিনি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। সুতরাং সামান্য বেতনভোগী সৈনিকরূপেই তিনি বদায়ুনের শাসনকর্তা হিজবরউদ্দীনের অধীনে কর্মগ্রহণ করিলেন। পরবর্তী অঙ্কে দেখা যায় যে, স্বীয় যোগ্যতায় ইখতিয়ারউদ্দীন অযোধ্যার শাসনকর্তার নিকট হইতে সামান্যমাত্র জায়গীর লাভ করিয়াছেন। এই সামান্যমাত্র স্থানের অধিকারী মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন স্বীয় ক্ষমতা ও রণ-নৈপুণ্যের বলে বঙ্গদেশে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই বিজয়কাহিনী ইসলামের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়।

ভাগ্যান্বেষী ইখতিয়ার-উদ্দীন

ইখতিয়ারউদ্দীন রাজ্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন কি না, বলা সুকঠিন; তবে, তাঁহার আক্রমণের ফলে বঙ্গদেশের বহুলাংশ বিজিত হইয়াছিল নিঃসন্দেহ। সেই বিজয়ের ফলে বঙ্গদেশে মুসলিম অধিকার সার্ধ-পঞ্চশতাধিক বৎসরকাল স্থায়ী হইয়াছিল (১২০০-১৭৫৭ খ্রীঃ)। বঙ্গে তাঁহার রাজ্যসীমা ছিল উত্তরে পূর্ণিয়া, দেবকোট ও রঙ্গপুর, পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, পশ্চিমে কুশী নদীর নিম্নাংশ হইতে রাজমহল; অর্থাৎ টোডরমল রাজস্ব-ব্যবস্থার জন্য সুবা বাঙ্গলাকে যে-সকল সরকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে সমগ্র লক্ষ্ণৌতি সরকার, তান্ডা, পূর্ণিয়া, পিন্জরা, তাজপুর, ঘোড়াঘাট এবং বরবকাবাদ সরকারের অধিকাংশই মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনের অধিকৃত বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণ বিহারে (প্রাচীন মগধ) তাঁহার রাজ্যসীমা ছিল বিন্ধ্যগিরির উত্তর সানুদেশে অবস্থিত মির্জাপুর হইতে রাজমহল পর্যন্ত গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী সমগ্র অঞ্চল। পরবর্তী যুগেও বঙ্গের সহিত বিহারের এই সংযোগসূত্র অক্ষুণ্ণ ছিল। সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপিয়াই বঙ্গের মুসলিম সুলতানগণ গঙ্গার উত্তর তীরে গণ্ডক নদী পর্যন্ত বঙ্গের রাজ্যসীমা বলিয়া দাবী করিয়াছেন। বাবর পর্যন্ত দিল্লীর বাদশাহগণও বঙ্গ-সুলতানদের এই দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। চতুর্দশ শতক পর্যন্ত উত্তর বিহারের ভাগলপুর ও মুঙ্গের জিলার মধ্য দিয়াই ছিল অযোধ্যার সহিত বঙ্গের যোগাযোগের সহজ পথ।[১] কিন্তু এই সমগ্র অঞ্চলই ইখতিয়ারউদ্দীন স্বীয় বুদ্ধিবলে ও বাহুবলে জয় করিয়াছিলেন।

ভাগ্যবান ইখতিয়ার-উদ্দীন

ইখতিয়ারউদ্দীনের রাজ্যসীমা

বঙ্গবিজয়ের সমস্ত কৃতিত্ব ইখতিয়ারউদ্দীনের সম্পূর্ণ নিজস্ব। কুতুবউদ্দীন আইবকের সেনাপতিরূপে তিনি বঙ্গবিজয় করেন নাই। তিনি বিহার ও বঙ্গবিজয়ের

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 11

পর দুইবার মালিক কুতুবউদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ ও উপঢৌকন আদান-প্রদান করেন। ইহা তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং বিচক্ষণতারই পরিচায়ক। তিনি কুতুব-উদ্দীনের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন—প্রভুত্ব স্বীকার করেন নাই। এই স্বীকৃতি দ্বারা তিনি নববিজিত রাজ্যেরই কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন। নচেৎ রাজ্যারম্ভেই দিল্লীর মালিক কুতুবউদ্দীনের সহিত বিরোধ আরম্ভ হইলে গৃহযুদ্ধে ইসলামের প্রভূত ক্ষতি হইত; ইসলামের স্বার্থ ব্যাহত হইত; হয়ত বঙ্গদেশ এই বিরোধের ফলে মুসলিমের হস্তচ্যুত হইয়া যাইত। কারণ, বঙ্গের চতুর্দিকে শক্তিশালী হিন্দুরাজ্যের অভাব ছিল না। ইখতিয়ারউদ্দীনের বাস্তববুদ্ধিও যথেষ্ট ছিল। কুতুবউদ্দীনের স্বীকৃতি তাঁহার অগ্রগতিকে সহজ, সুগম ও দ্রুততর করিয়া দিয়াছিল।

ইখতিয়ারউদ্দীনের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা

আবদুল কাদের বদায়ুনী বলেন, সুলতান কুতুবউদ্দীন (অবশ্য তখনও তিনি সুলতান হন নাই) তাঁহাকে লক্ষ্মৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।[১] রিয়াজ-উস-সালাতীন গ্রন্থের রচয়িতা গোলাম হুসেন সলীম বলেন যে, বঙ্গরাজ্য দিল্লী সাম্রাজ্যের অংশস্বরূপ কুতুবউদ্দীনের হস্তে ন্যস্ত হইলে, তিনি মালিক ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ারকে বিহার ও লক্ষ্মৌতির শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।[২] তবকাৎ-ই-আকবরী-প্রণেতা বক্সী নিজামউদ্দীন আহম্মদের মতে ইখতিয়ারউদ্দীন সুলতান কুতুবউদ্দীনের অধীনে কার্যগ্রহণ করিয়াছিলেন।[৩] কিন্তু ইখতিয়ারউদ্দীনের বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে প্রাচীনতম মূলগ্রন্থ তবকাৎ-ই-নাসিরীতে কোথাও উল্লিখিত হয় নাই যে, তিনি কখনও সুলতান কুতুবউদ্দীনের কর্মচারী ছিলেন কিংবা তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, অথবা অর্থ ও সৈন্য সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন যখন বঙ্গবিজয় করেন (১২০১ খ্রীঃ) তখনও মালিক কুতুবউদ্দীন দিল্লীর সুলতান বলিয়া স্বীকৃত হন নাই। তিনি প্রকৃতপক্ষে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন মুহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর (১২০৬ খ্রীঃ)। সুতরাং ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব পর্যন্ত কুতুবউদ্দীন ছিলেন ভারতে মুহম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি—অধীন কর্মচারী। মুহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর প্রায় সমকালেই মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনেরও মৃত্যু হইয়াছিল।[৪] সুতরাং মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন যদি দিল্লীর অধীনতা বা প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াও থাকেন, সেই স্বীকৃতি কি মুহম্মদ ঘুরীর প্রাপ্য—না কুতুবউদ্দীনের?

ইখতিয়ারউদ্দীনের বঙ্গবিজয়ের স্বরূপ—দিল্লীর সহিত সম্বন্ধ

ইখতিয়ারউদ্দীনের পদমর্যাদা

মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, কিংবা স্বীয় নামে মুদ্রাপ্রচার ও খুত্‌বা পাঠের নির্দেশ দিয়াছিলেন কি না সঠিক জানা যায় না। তবে সমসাময়িক সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে মনে হয়, তিনি সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার নামাঙ্কিত কোন মুদ্রাও অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। যদিও

১) *Muntakhab-ut-Tawarikh.* Tr. p. 82

২) *Riyaz-us-Salatin*, Tr. p. 59

৩) *Tabqat-i-Akbari*, Tr. p. 50

৪) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr., p. 559

তবকাৎ-ই-নাসিরী, মুন্তাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ, রিয়াজ-উস্-সালাতীন প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে যে, মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন। তবকাৎ-ই-নাসিরীর অনুবাদক মেজর রেভার্টিও বলিয়াছেন যে, মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনের নামে মুদ্রাঙ্কন হইয়াছিল।[১] ইখতিয়ারউদ্দীনের মৃত্যুর পূর্বে মগধে বা গৌড়ে দিল্লীর কোন বাদশাহের নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা কিংবা তাঁহার সময়ের খোদিত কোন লিপিও অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। নমাজের শেষে মুসলমানগণ তাঁহার নামে খুত্বা পাঠ করিত কি না তাহার নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে তবকাৎ-ই-আকবরীতে নিজামউদ্দীন বক্সী বলিয়াছেন—মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন মস্তকে রাজচ্ছত্র ধারণ করিতেন; তাঁহার নামে মুদ্রাঙ্কন হইয়াছিল এবং খুত্বা পাঠও হইত।[২] সম্ভবতঃ ইখতিয়ারউদ্দীন সুলতান পদবী গ্রহণ করেন নাই। সুলতান উপাধি গ্রহণ না করিলেও সুলতানোচিত সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা উপভোগ করিয়াছেন—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইখতিয়ারউদ্দীনের মুদ্রা প্রচার ও স্বীয় নামে খুতবা পাঠ

রাজ্যজয় এবং পরবর্তী যুগের মোঙ্গল আক্রমণকারীদের ন্যায় ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিয়াই ইখতিয়ারউদ্দীন নিশ্চিন্ত হন নাই। বিজিত রাজ্যে যুগোপযোগী সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। বিজিত ভূখণ্ড তিনি তাঁহার সহকর্মী মালিকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন এবং সীমান্তের অধিকতর বিস্তৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সর্বক্ষমতাসম্পন্ন সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই শাসন-ব্যবস্থারই অন্য নাম মালিকানা শাসন। এইটিই মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার বিশেষত্ব। এই ব্যবস্থানুসারে 'মালিক' উপাধিধারী সৈন্যাধ্যক্ষদের উপরে নির্দিষ্ট অঞ্চলের শাসনভার ন্যস্ত হইত এবং তাঁহারা স্বীয় শাসিত অঞ্চলে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে পারিতেন। ইখতিয়ারউদ্দীন মালিকদিগকে বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করিয়া গৃহ-বিবাদ নিরসনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতেও কোন বিদ্রোহ হয় নাই—ইহা তাঁহার শাসনের দৃঢ়ভিত্তিরই পরিচায়ক। মুঘলযুগের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশে ইখতিয়ারউদ্দীন প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থাই বলবৎ ছিল। এই ব্যবস্থারই রূপান্তরে বার ভূঁইঞার অভ্যুদয় হয়। সুতরাং ইখতিয়ারউদ্দীন কেবল সুনিপুণ যোদ্ধা এবং সুকৌশলী সেনানায়কই ছিলেন না, শাসন-প্রতিভাও তাঁহার ছিল।

ইখতিয়ারউদ্দীনের শাসন-ব্যবস্থা

প্রত্যক্ষ ভাবে ইসলাম প্রচারকে উদ্দেশ্য বা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ না করিলেও মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য বিধর্মীকে ধর্মান্তরিতকরণে তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। মেচরাজা আলী মেচ নাম গ্রহণ করিয়া ধর্মান্তরের প্রমাণ দিয়াছেন। হিন্দু-মন্দির এবং বৌদ্ধমঠ বিধ্বস্ত করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। স্বীয় ধর্ম এবং সংস্কৃতি বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি মসজিদ ও মাদ্রাসা-স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইখতিয়ারউদ্দীনের ধর্মপ্রচার

---

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. p. 559, N. 3
Riyaz-us-Salatin, Tr. p. 63

২) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. 559 N. 3

মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন গৌড় নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। দেবকোট নগরীর পত্তন না করিলেও তিনি পুরাতন নগরীর বহু সংস্কার ও উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্মকেন্দ্র ছিল দেবকোট। দেবকোট হইতেই তিনি তিব্বত-অভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন। মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন হিন্দুনগরী দেবকোটের নিকট দমদমাতে একটি দুর্গ বা সেনানিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনের প্রতিষ্ঠিত অন্য একটি নগরকে কেন্দ্র করিয়াই পরবর্তীকালের রঙ্গপুর নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল।

বিভিন্ন নগর ও সেনা-নিবাস স্থাপন

ইখতিয়ারউদ্দীন ছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, অফুরন্ত আশাবাদী এবং অদম্য উৎসাহী। জীবনে বিফলতার নিকট তিনি পরাজয় স্বীকার করেন নাই। ভাগ্যান্বেষণে সিস্তান হইতে তিব্বত পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড তিনি অশ্বপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। বিন্ধ্যগিরির সানুদেশ হইতে বঙ্গের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাঁহার কর্মক্ষেত্র। ১১৯৫-১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একাদশ বৎসরে তিনি বিন্ধ্যাঞ্চলের ঘন বনানী, তরঙ্গসংকুল গঙ্গা, খরস্রোতা বাগমতী এবং হিমালয়ের তুষারাবৃত গিরিপথ দুর্বারবেগে অতিক্রম করিয়াছেন। কোন বিপদ-বাধাই তাঁহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ইখতিয়ারউদ্দীনের জীবনের ঘটনাপঞ্জী আলোচনা করিলে তাঁহাকে হঠকারী বলিয়াই মনে হয়। তিব্বত-অভিযানে এই উদ্ধত হঠকারিতাই তাঁহার সর্বনাশের কারণ হইয়াছিল। কারণ, তিনি কামরূপরাজের পরামর্শ গ্রহণযোগ্য বলিয়াই মনে করেন নাই। কিন্তু বঙ্গবিজেতারূপে মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন ইসলামের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্মরণীয় হইয়া আছেন এবং চিরকাল অবিস্মরণীয়ই থাকিবেন।

ইখতিয়ারউদ্দীনের কৃতিত্ব

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্গে খালজী প্রাধান্য ও অন্তর্বিদ্রোহ

(৬০২/১২০৫-৬২৪/১২২৬ খ্রীঃ)

সূচনাঃ ইখতিয়ারউদ্দীনের হত্যার (অগস্ট, ১২০৬ খ্রীঃ) সঙ্গে সঙ্গেই তুর্ক-খালজী গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। সেই বৎসরই (১৫ই মার্চ, ১২০৬ খ্রীঃ) ঘুর রাজ্যের অধিপতি মুইজউদ্দীন মুহম্মদ ঘুরী ঝিলাম নদীর তীরে অজ্ঞাত আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন। মুসলিম বিজয়ের প্রথম অঙ্কেই ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে দুইজন কর্ণধারের হত্যা অত্যন্ত অশুভ ইঙ্গিত করিল। এই নির্মম ধারাই ভারতের মুসলিম ইতিহাসে সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব ও রাজত্বের গতির পূর্বাভাস সূচনা করিল; কারণ, এই হত্যা ছিল মুসলিমের হস্তে মুসলিমের হত্যা। লাহোরে কুতুবউদ্দীন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিলেন (২৫শে জুন, ১২০৬ খ্রীঃ); সিন্ধুর অপর তীরে ত্রিশক্তি-সংগ্রাম আরম্ভ হইল—তাজউদ্দীন ইলদুজ কিরমানে, সুলতানজাদা ফিরুজ কোহ্ ঘুরে এবং সুলতান মুহম্মদ খাওয়ারিজম শাহ্ খোরাসানে প্রাধান্য স্থাপনের আয়োজন করিলেন।[১]

ভবিষ্যতের অশুভ ইঙ্গিত

এই অধ্যায়ের বর্ণিত কাল—১২০৬-১২২৬ খ্রীষ্টাব্দ; বক্তব্য বিষয়—খালজী গোষ্ঠী কর্তৃক বঙ্গদেশ শাসনের ইতিহাস। এই স্বল্প-পরিসর কালের মধ্যে তিনজন খালজী আমীর বাঙ্গলাদেশ শাসন করেন। এই সময়ে দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস বারংবার বাঙ্গলায় পূর্ণ অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ের ইতিহাস রক্তাক্ত—ইখতিয়ারউদ্দীন তাঁহার অনুচর আলী মরদান কর্তৃক নিহত, মুহম্মদ শীরাণ যুদ্ধে নিহত। হুসামউদ্দীন আলী মরদানকে হত্যা করিয়াছেন এবং স্বয়ং ইলতুৎমিস কর্তৃক নিহত হইয়াছেন।

রক্তাক্ত ইতিহাস

মালিক মুহম্মদ শীরাণ খালজী

(৬০২/১২০৫-৬০৫/১২০৮ খ্রীঃ)

তিব্বত-অভিযানের প্রাক্কালে ইখতিয়ারউদ্দীন মালিক মুহম্মদ শীরাণকে তাঁহার নব-বিজিত রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা বিধান ও গঙ্গার দক্ষিণস্থ রাঢ় অঞ্চল বিজয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শীরাণ-ভ্রাতৃদ্বয়ের শক্তিকেন্দ্র ছিল বর্তমান বীরভূম জিলার অন্তর্গত লখনোর বা নগর (বর্তমান রাজনগর)। প্রভু ইখতিয়ারউদ্দীনের নৃশংস হত্যার সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রই মালিক মুহম্মদ শীরাণ সসৈন্যে দেবকোট অভিমুখে যাত্রা করিলেন (অক্টোবর-নভেম্বর, ১২০৬ খ্রীঃ)—উদ্দেশ্য প্রভুহত্যার

---

১) *Cambridge History of India.* Vol. III, p. 48

প্রতিশোধ গ্রহণ। তাঁহার আগমন সংবাদে আলী মরদান দেবকোট হইতে তাঁহার স্বীয় জায়গীর বরসালাতে (সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত—বর্তমান রঙ্গপুর জিলা) প্রস্থান করিলেন। মুহম্মদ শীরাণ দেবকোটে উপস্থিত হইয়া ইখতিয়ারউদ্দীনের পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিলেন। আলী মরদান পরাজিত ও বন্দী হইলেন। বঙ্গের খালজী আমীরগণ মুহম্মদ শীরাণকে লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তা নির্বাচিত করিলেন। নায়ক নির্বাচনে আমীর-গোষ্ঠীর ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত।

আলী মরদনের পরাজয়

মালিক মুহম্মদ শীরাণ লক্ষ্ণৌতির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াও নিরাপদ হইলেন না। ইখতিয়ারউদ্দীনের অধীনস্থ আমীরগণের সকলেরই ধারণা ছিল যে, বাঙ্গলার সিংহাসনে তাঁহাদের সকলেরই সমান অধিকার রহিয়াছে। কারণ, তাঁহারা সকলেই সমানভাবে ইখতিয়ারউদ্দীনের বঙ্গবিজয়ে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। মালিক মুহম্মদ শীরাণ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন; সুতরাং তিনি সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হইয়াও তুর্ক-আফঘান আমীরগণের সহজাত 'সমান অধিকারের দাবী' অস্বীকার করিলেন না। তিনি সকল আমীরগণকেই তাঁহাদের স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত রাখিলেন। মুহম্মদ শীরাণ কখনও ক্ষমতার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেন নাই। তিনি আলী মরদানের সহকর্মী বিদ্রোহী আমীরগণকে শাস্তি প্রদান করিলেন না, কিংবা বিহারের দিকেও হস্ত প্রসারিত করিলেন না। কারণ, বিহার বিজয়ের প্রচেষ্টায় দিল্লীর সুলতান কুতুব-উদ্দীনের সহিত সংঘর্ষের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। তিনি দিল্লীর সহিত সংঘর্ষ পরিহারের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন নাই—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন সুলতানের ন্যায় বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছেন।[১]

দিল্লীর সহিত মুহম্মদ শীরাণের সম্বন্ধ

মালিক মুহম্মদ শীরাণ দিল্লীর সহিত সংঘর্ষের সম্ভাবনায় বিহারে স্বীয় আধিপত্য স্থাপনের কোন চেষ্টাই করেন নাই। এই সময়ে বিহারে ইখতিয়ারউদ্দীনের আমীরবর্গের মধ্যে কেহ শক্তিশালী হইয়াছিলেন বলিয়াও জানা যায় না। সম্ভবতঃ বঙ্গের খালজী আমীরগণের অন্তর্বিরোধের সুযোগে বিহারের হিন্দু নরপতিগণ এই অঞ্চলে পুনরায় শক্তিসঞ্চয়ে সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং মুসলিম শক্তিকেন্দ্রগুলি বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে মুসলিম আক্রমণে স্থানচ্যুত হইয়া বহু গাহড়বাল ও পরমার রাজপুত বিহার অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারাও খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারেন নাই। ফলে বিহার ক্রমশঃ দিল্লীশ্বর কুতুবউদ্দীনের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িল।

সমসাময়িক বিহারের রাজনৈতিক অবস্থা

মুহম্মদ শীরাণ দীর্ঘকাল শান্তিসম্ভোগ করিতে পারিলেন না। তিনি শত্রু আলী মরদানকে তুর্ক রীতি অনুসারে হত্যা না করিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, তাহার ফল এইবার তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল। আলী মরদান কারারক্ষী হাজী বাবা ইস্পাহানীকে উৎকোচ-প্রদানে বশীভূত করিয়া পলায়ন করিলেন এবং দিল্লীতে কুতুবউদ্দীনের আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। কুতুবউদ্দীন আলী মরদানের পক্ষ অবলম্বন

আলী মরদানের কারাগার হইতে পলায়ন ও দিল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ

১) *Cambridge History of India.* Vol. III, p. 48

করিলেন—আধিপত্য বিস্তারের এই সুযোগ উপেক্ষা করা তিনি সমীচীন বিবেচনা করিলেন না।

অযোধ্যার শাসনকর্তা কায়েমুজ রুমীর লক্ষ্ণৌতি অভিযান

কুতুবউদ্দীনের আদেশে অযোধ্যার শাসনকর্তা কায়েমুজ রুমী লক্ষ্ণৌতি অভিমুখে সৈন্যচালনা করিয়া (১২০৭ খ্রীঃ) কুশী নদী অতিক্রম করিলে মালিক হুসামউদ্দীন তানডা হইতে কায়েমুজ রুমীর সহিত যোগদান করিলেন। লক্ষ্ণৌতির প্রাচীনতম আমীরের এই বিশ্বাসঘাতকতায় বাঙ্গলার ভাগ্যাকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। এই সংবাদে মালিক মুহম্মদ শীরাণ দেবকোট পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে পুনর্ভবা নদীর অপর তীরে প্রস্থান করিলেন; কায়েমুজ রুমী লক্ষ্ণৌতি অধিকার করিলেন—পূর্বাঞ্চলে খালজী প্রাধান্য অন্তর্হিত হইল। দিল্লী-সুলতানের প্রতিনিধিরূপে হুসামউদ্দীন দেবকোটের আমীর পদ বা মালিকানা লাভ করিলেন; কারণ, ইখতিয়ারউদ্দীনের আক্রমণের পরই লক্ষ্ণৌতির গৌরবরবি অস্তমিত হইয়াছিল। দেবকোট সেই গৌরবাধিকার লাভ করিয়াছিল।

সুলতান কুতুবউদ্দীনের অনুমতিক্রমে হুসামউদ্দীনকে দেবকোটের মালিক পদে অধিষ্ঠিত করিয়া কায়েমুজ অযোধ্যা অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রত্যাবর্তনের অর্ধপথে কায়েমুজ সংবাদ পাইলেন যে, মালিক মুহম্মদ শীরাণ সসৈন্যে দেবকোট আক্রমণের উদ্যোগ করিয়াছেন। কায়েমুজ তৎক্ষণাৎ গতি পরিবর্তন করিয়া মুহম্মদ শীরাণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। শীরাণ পরাজিত হইয়া সন্তোষ (দিনাজপুর) ও মসেদা (মাহিগঞ্জ—বগুড়া জেলা) অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মালিক মুহম্মদ শীরাণ আত্রেয়ী নদীর তীরবর্তী তাঁহার নিজস্ব মালিকানাতে প্রস্থান করিলেন। তিনি দেবকোট পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না; তবে হুসামউদ্দীনও তাঁহাকে তাঁহার মালিকানা হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন নাই। মীনহাজ বলেন, খালজী আমীরদের সহিত বিরোধের ফলে শীরাণ নিহত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কাহিনী অনুসারে জানা যায় যে, তিনি স্থানীয় হিন্দু রাজা বা সামন্তের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন।

কায়েমুজ রুমীর প্রত্যাবর্তন মুহম্মদ শীরাণের পরাজয় ও মৃত্যু

মালিক মুহম্মদ শীরাণের কৃতিত্ব : মালিক মুহম্মদ শীরাণ অত্যন্ত আত্মসম্মান-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রভুভক্তিও ছিল অতুলনীয়। রোগশয্যায় ইখতিয়ারউদ্দীন আলী মরদান কর্তৃক নিহত হইলে তিনি অবিলম্বে প্রভুর হত্যাকারীকে শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বন্দীও করিয়াছিলেন। খালজী-রীতি অনুসারে বন্দীকে হত্যা না করিয়া তিনি সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন—কিন্তু ইহার ফল মুহম্মদ শীরাণের পক্ষে শুভ হয় নাই। আলী মরদান কৌশলে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া কুতুবউদ্দীনের সহায়তায় মালিক মুহম্মদ শীরাণের ধ্বংসের কারণ হইয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌতি অধিকারের পর তিনি অন্যান্য আমীরগণের সহিতও সুব্যবহার করিয়াছিলেন—তাঁহাদের কাহাকেও তিনি পদচ্যুত করেন নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মুহম্মদ শীরাণের শত্রুপক্ষে যোগদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি বারংবার যুদ্ধ করিয়াছেন—পরাজয়েও তিনি

আলী মরদান ও মুহম্মদ শীরাণ

বিচলিত, ধৈর্যচ্যুত বা হতোদ্যম হন নাই। তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বুদ্ধি ছিল প্রখর। তিনি দিল্লীর সুলতানকে সযত্নে পরিহার করিয়া চলিয়াছিলেন; দিল্লীর সহিত অযথা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি অবতীর্ণ হন নাই। সেই কারণে তিনি বিহারে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন নাই। বাঙ্গলার ভাগ্যাকাশে ধূমকেতু বা দুষ্ট-গ্রহের মতনই আলী মরদানের আবির্ভাব হইয়াছিল—আলী মরদানের প্ররোচনাতেই কুতুবউদ্দীন বাঙ্গলার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করেন। সুলতান কুতুবউদ্দীন আলী মরদানের সহিত যোগদান না করিলে বাঙ্গলার আধিপত্য ব্যাপারে এত গোলযোগ উপস্থিত হইত না। মালিক মুহম্মদ শীরাণের স্বল্পস্থায়ী শাসনকালের কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যায় না। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মালিক মুহম্মদ শীরাণ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং স্বাধীন নরপতিরূপেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কুতুবউদ্দীন ও আলী মরদান

হুসামউদ্দীন আইয়াজ

(৬০৫/১২০৮—৬০৭/১২১০ খ্রীঃ)

মালিক মুহম্মদ শীরাণের অপসারণের পর হুসামউদ্দীন লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তার পদ অধিকার করিয়াছিলেন। দুই বৎসরকাল বিশেষ কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু এই সময়ে অকস্মাৎ আলী মরদান ধূমকেতুর মতনই বঙ্গদেশে উপস্থিত হইলেন; চতুর আলী মরদান বহুবার ভাগ্যবিপর্যয়ের পর সুলতান কুতুবউদ্দীনের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ১২১০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে কুতুবউদ্দীন আলী মরদানকে বাঙ্গলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া বহু অর্থসম্পদ সহ পূর্বাঞ্চলে প্রেরণ করিলেন। অসীম দুঃসাহসী আলী মরদান জানিতেন যে, বাঙ্গলার খালজী আমীরগণ তাঁহার অতীত কার্যকলাপের স্মৃতি বিস্মৃত হন নাই এবং তাঁহার প্রতি কোন শ্রদ্ধা বা প্রীতিও তাঁহাদের নাই। তথাপি ভাগ্য ও বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া তিনি পূর্বাঞ্চলের পথে যাত্রা করিলেন এবং যাত্রার পূর্বেই বহুসংখ্যক সহযাত্রী অনুচরও সংগ্রহ করিলেন। তাঁহাকে অনুসরণ করিল লাহোরের বহু ভাগ্যান্বেষী তুর্কী যাযাবর। ১২১০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে আলী মরদান সসৈন্যে কুশী নদী অতিক্রম করিলেন।

আলী মরদানের বঙ্গ-অভিযান

হুসামউদ্দীন সুবিধাবাদী ও সুচতুর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কায়েমুজ রুমীকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আলী মরদানের সহিত শক্তিদ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হওয়া অসমীচীন বিবেচনা করিয়া তিনি আলী মরদানকে বাধা প্রদানের কোন চেষ্টা করিলেন না; অধিকন্তু সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া কুশী নদীর তীরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার পুরাতন জায়গীর গাঙ্গুরীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আলী মরদান বিনা বাধায় বাঙ্গলার কর্তৃত্ব লাভ করিলেন।[১]

আলী মরদানের বিনা বাধায় বঙ্গের কর্তৃত্ব লাভ

---

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 16

মালিক আলী মরদান

(৬০৭/১২১০-৬১০/১২১৩ খ্রীঃ)

মালিক আলী মরদানের প্রকৃত নাম মুহম্মদ আলী মরদান। তিনি ছিলেন জাতিতে তুর্কমান, বংশে খালজী এবং বৃত্তিতে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দীনের অনুচর ও বঙ্গবিজয়ের সৈনিকরূপে তাঁহার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। তিব্বত অভিযানের প্রাক্কালে ইখতিয়ারউদ্দীন আলী মরদানকে তাঁহার নব-বিজিত রাজ্যখণ্ডের পূর্ব সীমান্ত রক্ষার জন্য বরসালার (সরকার ঘোড়াঘাটের) মালিক নিযুক্ত করেন। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে আমরা আবার আলী মরদানের দর্শন পাই প্রভুর হত্যাকারিরূপে। দেবকোটে প্রভু ইখতিয়ারউদ্দীনকে রোগশয্যায় নিরস্ত্র ও অসহায় অবস্থায় হত্যা করিতেও আলী মরদান কুণ্ঠিত হন নাই। স্বল্পকাল মধ্যেই ইখতিয়ারউদ্দীনের অন্যতম আমীর মালিক মুহম্মদ শীরাণ প্রভুহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে আলী মরদানকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করিলেন। ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে কারারক্ষী হাজী বাবা ইস্পাহানীকে উৎকোচ-প্রদানে বশীভূত করিয়া আলী মরদান কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া দিল্লীতে সুলতান কুতুবউদ্দীনের আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১]

আলী মরদানের পরিচয়

অনিশ্চিত-পরিস্থিতি বাঙ্গলা সম্বন্ধে সুলতান কুতুবউদ্দীন সর্বদাই শান্তিহীন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি মালিক আলী মরদানকে সাহায্যদানের অন্তরালে বাঙ্গলায় দিল্লীর প্রভুত্বস্থাপনের এই সুযোগ নষ্ট হইতে দিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ অযোধ্যার মালিক কায়েমুজ রুমীকে বাঙ্গলার আমীরদের বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু এই সময়েই সুলতান কুতুবউদ্দীনকে গজনীর মালিক তাজউদ্দীন ইলদুজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হয়। ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে ইলদুজ পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন। কুতুবউদ্দীনও পঞ্জাব অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আলী মরদান পঞ্জাব অভিযানে তাঁহার অনুগমন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার ফলে তিনি কুতুবউদ্দীনের প্রীতিও লাভ করিলেন।[২] কুতুবউদ্দীনের সহিত তিনি লাহোরে উপস্থিত হইলেন। চল্লিশ দিবসব্যাপী লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চলিল ; কুতুব-উদ্দীন লাহোর ত্যাগ কবিতে বাধ্য হইলেন। এই পশ্চাৎ অপসরণকালে আলী মরদান তুর্কী হস্তে বন্দী হইলেন (১২০৯ খ্রীঃ) ; পুনরায় আলী মরদানের প্রভু পরিবর্তন হইল। উর্ধ্বতন প্রভুর বিশ্বাস উৎপাদনের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল আলী মরদানের। শীঘ্রই তিনি মালিক তাজউদ্দীন ইলদুজের সভাসদ পদ লাভ করিলেন। সালার জাফর নামক একজন উচ্চপদস্থ খালজী আমীরের সহিত তাঁহার অত্যন্ত বন্ধুত্ব বা ঘনিষ্ঠতা হইল।[৩] একদিন মৃগয়াকালে তিনি তাঁহার বন্ধুর নিকট সুলতান ইলদুজকে হত্যার পরোক্ষ ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার বন্ধু সালার জাফর তাঁহাকে দুইটি অশ্বসহ

বঙ্গ সম্বন্ধে কুতুবউদ্দীনের মনোভাব

আলী মরদানের প্রভু পরিবর্তন

পশ্চাদপসরণকালে গজনীতে আলী মরদান

---

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. p. 578

২) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 16

৩) বাঙ্গলার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ৩৬ পৃঃ

সীমান্ত অতিক্রম করিতে বাধ্য করিয়া গজনীতে প্রেরণ করিলেন। প্রায় এক বৎসর বন্দী-জীবন যাপন করিয়া আলী মরদান গজনী হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলে কুতুবউদ্দীন তাঁহাকে লক্ষ্মৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গলায় প্রেরণ করিলেন। হুসামউদ্দীন বিনা বাধায় আলী মরদানের প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন। এইবার সত্যই বঙ্গদেশ তুর্কী শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিল।

আলী মরদানের দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন

দৈব ছিল আলী মরদানের সহায়—ভাগ্যলক্ষ্মী ছিলেন তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না। আলী মরদানের বঙ্গদেশে আগমনের অল্পকাল মধ্যেই কুতুবউদ্দীন ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন (১২১০ খ্রীষ্টাব্দ)—দিল্লীর সিংহাসনের জন্য গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল। মুহম্মদ ঘুরী ও কুতুবউদ্দীনের অনুগত আমীরগণ দুইটি বিবদমান দলে বিভক্ত হইয়া দিল্লী অধিকারের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। কুতুবউদ্দীনের অনুগত আমীরগণ লাহোরে কুতুবউদ্দীনের পুত্র আরাম শাহকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দিল্লীর আমীরগণ বদায়ুনের শাসনকর্তা মালিক ইলতুৎমিসকে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। নাসিরউদ্দীন কুবাচা সিন্ধু ও মুলতানে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। এই সুযোগে আলী মরদানও লক্ষ্মৌতিতে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন—হিন্দুস্থানে মুসলমানগোষ্ঠী চারিটি সুস্পষ্ট দলে বিভক্ত হইয়া গেল। আলী মরদান স্বীয় নামে খুত্‌বাপাঠ ও মুদ্রাপ্রচার আরম্ভ করিলেন এবং সুলতান আলাউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করিলেন।[১]

আলী মরদানের স্বাধীনতা ঘোষণা

অকস্মাৎ এই সৌভাগ্যলাভে সুলতান আলাউদ্দীনের মস্তিষ্কে নানা উদ্ভট কল্পনার উদয় হইল। প্রকাশ্য দরবারে ও মসজিদে তিনি নিজেকে পৃথিবীর সকল মুসলমানের সুলতান বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি, গৌড়ের ক্ষুদ্র অংশ লক্ষ্মৌতির অধিকার লাভ করিয়াই তিনি তাঁহার রাজ্য বহির্ভূত অঞ্চল এবং রাজ্য হইতে বহুদূরে অবস্থিত গজনী, ঘুর, ইস্পাহান ও খোরাসানে তাঁহার প্রিয় অনুচরদিগকে জায়গীর বণ্টন করিয়া দিলেন এবং প্রচুর ধনরত্নসহ তাঁহাদিগকে ঐ সকল দেশে প্রেরণ করিলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, তাঁহার সৈন্যগণ শীঘ্রই ঐ সকল রাজ্য জয় করিবে—সুতরাং পূর্বাহ্নেই তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার প্রদত্ত জায়গীর অভিমুখে যাত্রা করুক।

সুলতান আলাউদ্দীনের অদ্ভুত কার্যকলাপ

সুলতান আলাউদ্দীনের এই অদ্ভুত কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটি কাহিনী স্টুয়ার্ট সাহেব তাঁহার 'বাঙ্গলার ইতিহাস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কথিত আছে যে, একদা জনৈক বণিক নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গ-সুলতানের নিকট আবেদন করিলেন যে, সমুদ্রে তাঁহার বাণিজ্যতরণী জলমগ্ন হওয়ায় দৈবদুর্বিপাকে তিনি সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। সুলতান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোন্ দেশীয় বণিক। বণিক পারস্যদেশীয় জানিয়া সুলতান উক্ত বণিককে ইস্পাহানের শাসনকর্তৃপদে নিয়োগের জন্য মন্ত্রীকে এক আদেশপত্র প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দিলেন। ইস্পাহান যে তাঁহার রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত নহে, একথা সুলতানকে স্মরণ করাইয়া দিবার মতন সাহস মন্ত্রীর ছিল না—

ইস্পাহানী বণিকের কাহিনী

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Text. p. 159

সুতরাং আদেশপত্র লিখনের ছলে তিনি কক্ষান্তরে গমন করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে দরবারে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন যে, বণিক তাঁহার অনুগ্রহের জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, কিন্তু তাঁহার পদের উপযোগী সৈন্যসামন্ত লইয়া উচ্চ রাজকর্মচারীর যথাযোগ্য আড়ম্বরের সহিত তাঁহার ঐ প্রদেশে প্রবেশ করা উচিত। সুতরাং উক্ত বণিকের প্রার্থনা যে, তাঁহাকে যেন অশ্ব ক্রয়ের জন্য উপযুক্ত অর্থ প্রদান করা হয়। সুলতান আলাউদ্দীন স্বীয় ত্রুটি বুঝিতে পারিলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে প্রচুর অর্থদান করিয়া বিদায় করিলেন—কিন্তু সুলতানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে দিলেন না।

মন্ত্রীর বুদ্ধিমত্তায় সুলতানের মর্যাদা রক্ষা

সুলতান আলাউদ্দীন (আলী মরদান) তাঁহার উদ্ভট কার্যকলাপ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে ক্ষোভের বিশেষ কারণ ছিল না; কিন্তু তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর-প্রকৃতি ও কূট-চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। বাঙ্গলাদেশে যে সকল খালজী আমীর মুহম্মদ শীরাণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা ইখতিয়ারউদ্দীনের অনুগত ছিলেন, তাঁহাদের উপর নির্মম অত্যাচার আরম্ভ হইল। সাধারণ প্রজাবর্গও এই অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই। তুর্কী সৈন্যদিগকে খালজীগোষ্ঠী হত্যার আদেশসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হইল। এই ব্যাপারে পঞ্জাব ও দিল্লী হইতে নবাগত তুর্কী সৈন্যগণ তাঁহার সহায়তা করিল—কারণ, তাহারা প্রাচীন খালজীদিগকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখিত। এই অত্যাচার অবাধে দুই বৎসর ব্যাপিয়া চলিল। পরিশেষে অত্যাচার সহের সীমা অতিক্রম করিলে খালজী আমীরগণ একযোগে সুলতান আলাউদ্দীনকে হত্যা করিয়া অবিলম্বে মালিক হুসামউদ্দীনকে সুলতান মনোনীত করিল (১২১৩ খ্রীঃ)।

খালজীগোষ্ঠী হত্যা

সুলতান আলাউদ্দীনের (আলী মরদানের) রাজ্যসীমাঃ সুলতান আলাউদ্দীনের রাজ্যসীমা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বিহারের শোণ নদীর পূর্বদিকস্থ অঞ্চল যে তাঁহার রাজত্বকালে পুনর্বিজিত হইয়াছিল, তাঁহার পরবর্তী সুলতান হুসামউদ্দীন আইয়াজের রাজত্বকালের ঘটনাপঞ্জী হইতে এই সংবাদ জানা যায়। ইলতুৎমিস কর্তৃক প্রথম বার বঙ্গদেশ আক্রমণকাল (১২২৬-২৭ খ্রীঃ) পর্যন্ত বিহারের ঐ অঞ্চল হুসামউদ্দীন আইয়াজের অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাস-লেখক মীনহাজ তাঁহার গ্রন্থের কোথাও উল্লেখ করেন নাই যে, আইয়াজ ঐ অঞ্চল বিজয় করিয়াছিলেন।[১] বঙ্গদেশের সমগ্র লক্ষ্মৌতি অঞ্চল সুলতান আলাউদ্দীনের অধিকারভুক্ত ছিল। রাঢ় এবং বরেন্দ্রীও লক্ষ্মৌতির অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২] রাঢ় অঞ্চলে তাঁহার অধিকার দক্ষিণে অজয় নদ এবং পূর্বে ভাগীরথী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বরেন্দ্রীর উত্তর সীমা ছিল দেবকোট, পূর্ব সীমা ছিল করতোয়া নদী এবং পশ্চিম সীমা ছিল কুশী নদী। এই সংবাদ নির্ভুল।

বঙ্গদেশে মুসলিম বিজয় তিনটি ধারায় সম্পন্ন হইয়াছিল—সামরিক অভিযান, বহুবিবাহ এবং ধর্মবিস্তার। মুহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনের সময়েই নগরে (রাঢ়

১) *History of Bengal*, **Dacca University, Vol. II, p. 20**

২) ***Tabqat-i-Nasiri*. Tr. p. 578**

অঞ্চলে) অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহার সেনাপতি মালিক মুহম্মদ শীরাণ ঐ অঞ্চলে রাজ্যখণ্ড বিজয় করেন (আঃ ১২০৬ খ্রীঃ)। আলী মরদান ঐ অঞ্চল লক্ষ্ণৌতির অন্তর্ভুক্ত করেন। এই সময়ে করতোয়া নদীর দক্ষিণ দেশে এবং পূর্বাঞ্চলে বঙ্গ ও কামরূপে অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ অঞ্চলের হিন্দু নরপতি সুলতান আলাউদ্দীন আলী মরদানকে কর প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রথম যুগে হিন্দুরাজ্য ত্রিহুত পশ্চিমে অযোধ্যার এবং পূর্বে লক্ষ্ণৌতির মুসলিম অভিযানকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল।

মুসলিম বিজয়ের তিনটি ধারা

আলী মরদানের চরিত্র ঃ আলী মরদান ছিলেন অত্যন্ত ক্রুর, নিষ্ঠুর, স্বার্থান্বেষী ও ভবিষ্যৎচিন্তা-বিহীন। অতি নিকটের জিনিস ভিন্ন দূরের জিনিস অনুধাবন করার মতন ধৈর্য বা বুদ্ধি তাঁহার ছিল না। কিন্তু ঊর্ধ্বতন প্রভুর বিশ্বাস অর্জন করিবার মত বাক্‌চাতুর্য এবং ব্যবহার-কুশলতা তাঁহার ছিল। তিনি সহকর্মীদের উপর প্রভুত্বব্যঞ্জক ব্যবহার করিতেন এবং অধীন লোকদের উপর তাঁহার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত কঠোর ও কটু। অথচ তাঁহার কথাবার্তা এবং আচার-ব্যবহারে এমন একটি ভাব ছিল যে, সম্মুখে কেহই তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিত না। তাঁহার বাগাড়ম্বরের অন্ত ছিল না। সকল সময়ে তিনি সুস্থমস্তিষ্ক ছিলেন বলিয়া মনে হয় না ; তিনি যেভাবে গজনী, ঘুর, খোরাসান ও ইস্পাহানে জায়গীর বণ্টন করিয়াছিলেন, তাহা সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচায়ক নহে।

নিষ্ঠুর ও স্বার্থান্বেষী আলী মরদান

আলী মরদান শত্রুর উপর—সে শত্রু কল্পিতই হউক, আর বাস্তবই হউক—অত্যন্ত নির্দয় ব্যবহার করিতেন ; রোগশয্যায় প্রভু ইখতিয়ারউদ্দীনের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। বাঙ্গলার সুলতানরূপে পুরাতন খালজী সহকর্মীদের নিঃসংকোচে হত্যা করিয়াছেন—এমন কি, তাঁহার রাজত্বের দুই বৎসরের মধ্যে একমাত্র হুসামউদ্দীন ব্যতীত কোন প্রবীণ খালজী আমীর সম্ভবতঃ অবশিষ্ট ছিলেন না। সধর্মী কিংবা বিধর্মী কেহই তাঁহার অত্যাচার হইতে সহজে অব্যাহতি লাভ করে নাই। নীতি অপেক্ষা প্রয়োজনের মূল্য ছিল তাঁহার নিকট অত্যধিক। অবশ্য তাঁহার পরিণামও কর্মানুযায়ীই হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া খালজীগণ আমীর হুসামউদ্দীনের অধীনে সংঘবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ ও হত্যা করিয়া প্রতিশোধ চরিতার্থ করিয়াছিল। কিন্তু এই আলী মরদানই বাঙ্গলার প্রথম মালিক—যিনি প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া 'সুলতান আলাউদ্দীন' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আলী মরদানের পরিণাম

মালিক হুসামউদ্দীন-আইয়াজ খালজী বা সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন

(আঃ ৬১০/১২১৩-৬৩৪/১২৩৭ খ্রীঃ)

মালিক আলী মরদান খালজী বা সুলতান আলাউদ্দীনের হত্যার পর মালিক হুসামউদ্দীন আইয়াজ খালজী বাঙ্গলার সুলতান পদ লাভ করিলেন। তাঁহার উপাধি হইল সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন।

সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের প্রথম জীবন: সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন ছিলেন ইখতিয়ারউদ্দীনের দেশবাসী। তাঁহার জন্মস্থান গরমশীর, পিতার নাম হুসেন। গরমশীর ছিল সুলতান শিহাবউদ্দীন ঘুরীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। শিহাবউদ্দীন কর্তৃক দিল্লীবিজয়ের পরে তিনি ইখতিয়ারউদ্দীনের সহিত ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং বহু দেশে ইখতিয়ারউদ্দীনের অনুগমন করেন। তাঁহার প্রথম জীবন অতি সাধারণ-ভাবে অতিবাহিত হয়—গর্দভপৃষ্ঠে ভারবাহীর বৃত্তি অনুসরণ করিয়া তিনি জীবিকা অর্জন করিতেন। কথিত আছে—একদা তিনি দুইজন দরবেশের সাক্ষাৎ লাভ করেন। দরবেশদ্বয় ছিলেন জীর্ণবস্ত্র-পরিহিত এবং ক্ষুৎপিপাসা-কাতর। তাঁহারা ঘিয়াসউদ্দীনের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করিলেন। ঘিয়াসউদ্দীন তাঁহার নিকট যে যৎসামান্য খাদ্য ছিল উহাই দরবেশদ্বয়কে প্রদান করিলেন এবং নম্রভাবে তাঁহাদের ভোজন-সমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। ভোজনান্তে ঐ দরবেশদ্বয় ঘিয়াসউদ্দীনকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি হিন্দুস্থানে গমন কর —তথায় তুমি মুসলিম রাজ্যের অধিপতি হইবে।" তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া সস্ত্রীক ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথে ইখতিয়ারউদ্দীনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই গর্দভ-চালক ঘিয়াসউদ্দীন স্বীয় যোগ্যতা ও ভাগ্যবলে বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। গৌড়ের জনপ্রিয় সুলতানগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।[১]

সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের প্রারম্ভ জীবন

ইখতিয়ারউদ্দীনের বঙ্গবিজয়ের পর তিব্বত অভিযানের প্রাক্কালে মুহম্মদ আলী মরদান খালজী, মুহম্মদ শীরাণ খালজী ও হুসামউদ্দীনের উপর রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল। হুসামউদ্দীনের উপর অযোধ্যা ও ত্রিহুতের পথে পশ্চাদ্দিক হইতে পরিচালিত আক্রমণ বা অভিযান প্রতিরোধের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহার কর্মকেন্দ্র ছিল সরকার তানডার অন্তর্গত (রাজমহল, সাঁওতাল পরগণা এবং মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ) গাঙ্গুরীতে। সুলতান কুতুবউদ্দীনের আদেশে অযোধ্যার শাসনকর্তা কায়েমুজ রুমী বঙ্গে অভিযান করিলেন। হুসামউদ্দীন মুহম্মদ শীরাণের বিরুদ্ধে তাঁহার সহিত যোগদান করেন। এই কার্যের ফল মুহম্মদ শীরাণের পক্ষে মারাত্মক হইয়াছিল। হুসামউদ্দীন স্বীয় স্বার্থ সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। তিনি স্বার্থের দিক হইতে সুলতান কুতুবউদ্দীনের প্রেরিত প্রতিনিধির বিরুদ্ধাচরণ বিপজ্জনক বিবেচনা করিলেন। তিনি কায়েমুজ রুমীর সহিত যোগদান করিয়াছিলেন এবং আলী মরদানকে প্রতিহত করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। অবশ্য পরে যখন তিনি অবগত হইলেন যে, আলী মরদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে সকল খালজী মালিককে নিশ্চিহ্ন করা, তখন তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আলী মরদানের মৃত্যুর পর হুসামউদ্দীন 'সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন' উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গের শাসনকার্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন (১২১৩ খ্রী:) এবং প্রায় চৌদ্দ বৎসরকাল তিনি রাজত্ব করেন।

গাঙ্গুরীর শাসনকর্তা হুসামউদ্দীন

হুসামউদ্দীনের 'সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন' উপাধি গ্রহণ

১) *Tabqat-i-Nasiri.* Tr. p. 569

খালজী আমীরগণের মধ্যে কেহই এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন নাই। ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

ঘিয়াসউদ্দীনের স্বাধীনভাবে বঙ্গরাজ্য পরিচালনা

১২১৩ খ্রীঃ হইতে ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সুলতানগণ বঙ্গদেশের প্রতি দৃষ্টি প্রদানের অবসর পান নাই। কারণ, দিল্লীতে তখন কুতুবউদ্দীনের পুত্র আরাম শাহের স্থানে তাঁহার জামাতা ইলতুৎমিস দিল্লীর সুলতানী-পদ লাভ করিলেও কুতুবউদ্দীনের মৃত্যুর পর অরাজকতার সুযোগে রাজ্যের চতুর্দিকে যে সকল বিদ্রোহ এবং সীমান্তে যে সকল মোঙ্গল অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল—সেই সকল বিদ্রোহ ও সীমান্ত আক্রমণ দমনেই ইলতুৎমিসকে ব্যস্ত ও বিব্রত থাকিতে হইয়াছিল। সুতরাং ঘিয়াসউদ্দীন স্বাধীনভাবেই বঙ্গরাজ্য পরিচালনা করিতে পারিয়াছিলেন।

ঘিয়াসউদ্দীনের রাজত্বের প্রথম দুই বৎসর

অত্যাচারী আলী মরদানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী খালজী আমীরগণের নায়করূপেই তিনি বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার রাজত্বের প্রথম দুইটি বৎসর লক্ষ্ণৌতিতে স্বীয় শক্তি সংহত করিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। আলী মরদানের সহিত আগত নূতন তুর্কী সেনাদলকেও তাঁহার স্বপক্ষে আনয়ন করিতে হইয়াছিল।

গঙ্গবংশীয় নরপতি অনঙ্গভীমের মন্ত্রী বিষ্ণু কর্তৃক দক্ষিণ রাঢ় অধিকার

এই সময়ে বঙ্গের চতুষ্পার্শ্বস্থ হিন্দুশক্তিও বঙ্গের মুসলমানগণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিল। উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় নরপতি তৃতীয় অনঙ্গভীমের (১২১১-১২৩৮ খ্রীঃ) বীর্যবান মন্ত্রী বিষ্ণু রাঢ় অঞ্চল আক্রমণ করেন। যদিও লক্ষ্ণৌতির মুসলিম শাসনকর্তা লখ্‌নোর (নগর) পর্যন্ত তাঁহাদের সীমান্ত বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন, তথাপি রাঢ় অঞ্চলে তখন অরাজকতাই বিরাজ করিতেছিল। বিষ্ণু বাহুবলে দক্ষিণ রাঢ়ের কিয়দংশ অধিকার করেন এবং বৈতরণী নদীর তীরবর্তী জাজপুর বা জাজনগরে তাঁহার কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই ভাগ্যবিপর্যয়ে মুসলিমগণ হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদিগকে ধর্মের উন্মাদনা এবং বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ও ইসলামের মর্যাদা রক্ষায় প্ররোচিত করিতে সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। অবশেষে ফিরুজ কোহের একজন 'ইমামজাদা' জালালউদ্দীন গজনভীর পুত্র জালালউদ্দীন সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের সম্মুখে মুসলিম সৈন্যগণের উদ্দেশ্যে একটি 'তজকীর' বা ভাষণ দিলেন। এই তজকীর শ্রবণে মুসলিম সৈন্যগণের মনে উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। পুরস্কারস্বরূপ ঘিয়াসউদ্দীন ঐ ইমামজাদাকে বহু ধনরত্ন প্রদান করিলেন। নবোৎসাহিত সেনাবাহিনী লইয়া ঘিয়াসউদ্দীন লখ্‌নোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন (আঃ ১২১৪ খ্রীঃ)। এই সংগ্রাম দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। ছাত্তেশ্বর বা ছত্রেশ্বর অনুলেখ হইতে জানা যায় যে, উড়িষ্যার সেনাপতি বিষ্ণু এই সংগ্রামে অসীম সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং এই যুদ্ধে বিজয়গৌরবের অধিকারীও হইয়াছিলেন।[১] অবশ্য পরিশেষে উড়িষ্যা-বাহিনীকে লখ্‌নোর পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের স্বীয় রাজ্যসীমান্ত মধ্যে প্রত্যাবর্তন

---

১) *JASB*. LXVIII, p. 317-27. R. D. Banerjee, *Orissa* Vol. I p. 16

করিতে হইয়াছিল। মীনহাজউদ্দীনের তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে ও ছাত্তেশ্বর অনুলেখের মধ্যে অনুরূপ উক্তি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ঐ গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে যে, ঘিয়াসউদ্দীন কর্তৃক লাখ্‌নোর বিজয়ের পূর্বে ঐ স্থানটি মুসলিম হস্তচ্যুত হইয়াছিল। ঘিয়াসউদ্দীন ঐ স্থান জয় করিয়া তথায় স্বীয় কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।[১]

জাজনগরাধিপতি কর্তৃক কর প্রদান

সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন কেবল মুসলিম গৌরবই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন নাই—গঙ্গবংশের অগ্রগতিও প্রতিহত করিয়াছিলেন। ফলে বঙ্গের মুসলিম রাজ্যসীমা অজয় নদ হইতে দামোদর নদ এবং বিষ্ণুপুরের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, জাজনগরের অধিপতিও তাঁহাকে কর প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু অনুমিত হয় যে, এই জাজনগরাধিপতি বোধ হয় গঙ্গ নরপতি তৃতীয় অনঙ্গভীম নহেন—ইনি সম্ভবতঃ জাজনগরের সামন্ত নরপতি বিষ্ণু। মহাসামন্ত বিষ্ণু উপঢৌকন প্রদান করিয়া মুসলিম সৈন্যের অগ্রগতি রোধ করিয়াছিলেন। মীনহাজ বলেন, মুসলিম সেনাবাহিনী দামোদরের দক্ষিণে কাটাসিন (বর্তমান বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী) পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল।[২]

মিথিলা ও ঘিয়াসউদ্দীন

বঙ্গ, কামরূপ এবং ত্রিহুত সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনকে কর প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মুসলিম সেনা কর্তৃক এই সকল দেশ বিজয়ের কোন প্রত্যক্ষ ইতিহাস বা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই। তথাপি এই সকল অঞ্চল যে ঘিয়াসউদ্দীনের সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মিথিলাধিপতি অরিমল্লদেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মিথিলারাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল—এই সকল রাষ্ট্র পশ্চিমে মুসলিম রাজ্য অযোধ্যা ও পূর্বে লক্ষ্মৌতি দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। সুতরাং মিথিলার হিন্দুরাজন্যবর্গ অযোধ্যা-বঙ্গের মুসলিম শক্তি দ্বারা পূর্ব-পশ্চিমে প্রতিহত হইয়া স্বভাবতঃই উত্তরে নেপাল উপত্যকায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ে পূর্ব-ত্রিহুত লক্ষ্মৌতির বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।[৩]

কামরূপ ও ঘিয়াসউদ্দীন

করতোয়া নদীর পূর্বতীরবর্তী অঞ্চলই কামরূপ নামে অভিহিত হইত। ঘিয়াস-উদ্দীনের সমকালে এই অঞ্চল বারভুঁইঞা নামক সামন্তবর্গের অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত ছিল। এই সামন্তবর্গের কেহই একক মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার মতন শক্তিশালী ছিলেন না; কিন্তু জাতীয় বিপদের সম্মুখে সত্বর সংঘবদ্ধ হইবার মতন ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল। সুতরাং মুসলিম শক্তির পক্ষে কামরূপের অভ্যন্তরে আধিপত্য বিস্তার খুব সহজ হয় নাই। ঘিয়াসউদ্দীন সামন্ত নরপতিদের কয়েক জনকে কর প্রদান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। বড়ুয়া তাঁহার 'আসামের প্রাচীন ইতিহাস' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন ব্রহ্মপুত্র নদের তীর অনুসরণ করিয়া গৌহাটি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তথায় মুসলিম শক্তি প্রতিহত হইয়াছিল। ফলে মুসলিম সেনাবাহিনীকে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে

মুসলিম শক্তির অপচয়

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Text, Pp. 141-43

২) *History of Bengal*, Dacca University, Vol II, p. 23

৩) *Tabqat-i Nasiri*, Tr. Pp. 586-87

হইয়াছিল (১২২৬-২৭ খ্রীঃ)। অবশ্য এই ঘটনার একমাত্র প্রমাণ গৌহাটিতে প্রাপ্ত সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের মুদ্রা।[১]

এই সময়ে পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই বিশেষ শক্তিশালী ছিলেন না—সুতরাং তাঁহাদিগকে সর্বক্ষণই মুসলিম আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম এবং গঙ্গানদীর উত্তরতীরস্থ ভূখণ্ড সেনরাজবংশের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং এই অঞ্চলে এই সময়ে সেনরাজগণের কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই।[২] সমসাময়িক সংস্কৃত গ্রন্থ 'হরিমিশ্র কারিকা'র বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশব সেন 'যবনভয়ে ভীত হইয়া' গৌড় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণও আর তথায় বাস করিতে সাহস করেন নাই;[৩] কিন্তু কেশব সেনের ভ্রাতা বিশ্বরূপ সেন সুলতান ঘিয়াস-উদ্দীনের সিংহাসনারোহণকালে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। বিশ্বরূপ নিজেকে গৌড়েশ্বর বলিয়া অভিহিত করিতেন এবং তিনি বর্তমান বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম, চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল) এবং দক্ষিণ রাঢ় বা নদীয়া অঞ্চলের অপ্রতিহত অধীশ্বর ছিলেন। সম্ভবতঃ ঘিয়াসউদ্দীন উত্তর রাঢ়ের কিয়দংশও অধিকার করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ সেন লক্ষ্মৌতিতে কর প্রদান করিতেন বলিয়া মীনহাজ তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।[৪]

পূর্ববঙ্গ ও ঘিয়াসউদ্দীন

সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন শাসনকার্যের সুবিধার জন্য দেবকোট হইতে গৌড় বা লক্ষ্মৌতিতে বঙ্গের রাজধানী পরিবর্তন করিলেন। কারণ, দেবকোট শত্রুর আক্রমণের দিক হইতে আপাততঃ নিরাপদ হইলেও ভৌগোলিক সংস্থানহেতু সমগ্র বঙ্গদেশ শাসনের পক্ষে লক্ষ্মৌতিই অধিকতর সুবিধাজনক ছিল। পাল-রাজাদের সময় হইতেই গৌড় বা লক্ষ্মৌতি অথবা লক্ষ্মণাবতী ছিল বঙ্গের রাজধানী। কিন্তু মুসলিম বিজয়ের পর হইতে দেবকোট মুসলিম শক্তির কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। দেবকোট ছিল বঙ্গে মুসলিম বিজিত রাজ্যের সর্বোত্তর প্রান্তে অবস্থিত—সুতরাং স্থলপথে উত্তর ভারতের সেনাবাহিনীর কিংবা বর্ষাকালে জলপথে শত্রুসৈন্যের আকস্মিক আক্রমণের ভীতি হইতে মুক্ত। তদ্ব্যতীত এই অঞ্চলের শুষ্ক জলবায়ু ছিল আফঘানিস্থানের পার্বত্য উষ্ণ অঞ্চল হইতে আগত মুসলিমগণের পক্ষে অনুকূল এবং স্বাস্থ্যপ্রদ; কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ঘিয়াসউদ্দীন পরবর্তী কালের মুসলিম শাসকবর্গের ন্যায় অনুভব করিলেন যে, নদীবিভক্ত বঙ্গের দূরতম অঞ্চল শাসনের জন্য অশ্বারোহী সৈন্যই যথেষ্ট নহে। অশ্বারোহী সৈন্য মাত্র ছয় মাসকাল রাজশক্তির সহায়তা করিতে পারে। বৎসরের অবশিষ্ট ছয় মাসকাল বর্ষার আধিক্যহেতু স্থলপথে যাতায়াত অসম্ভব হইয়া পড়ে, সুতরাং দেশশাসন এবং রাজ্যরক্ষার জন্য নৌবহর প্রয়োজন।

দেবকোট হইতে লক্ষ্মৌতিতে রাজধানী পরিবর্তন

রাজধানী পরিবর্তনের কারণ

১) Barua. *Early History of Assam*, p. 224

২) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 23

৩) *ASB. Chronology of the Sena Kings of Bengal*, N. N. Basu, 1891 p, 22

৪) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. Pp. 586-87

ভৌগোলিক সংস্থানহেতু লক্ষ্মৌতি হইতে বঙ্গ এবং বিহারের বিভিন্ন অংশের সহিত জলপথে সংযোগ রক্ষা করা সহজ এবং সম্ভবপর ছিল। অথচ নৌ-চলাচলের অসুবিধাই ছিল দেবকোটের প্রধান অসুবিধা। সুতরাং ঘিয়াসউদ্দীন দেবকোট হইতে লক্ষ্মৌতিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন (১২১৯-১২২০ খ্রীঃ) এবং তিনিই সর্বপ্রথম লক্ষ্মৌতি হইতে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য একটি নৌবহর গঠন করিলেন।

লক্ষ্মৌতির সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের সহজ যোগাযোগ

হিন্দু ও মুসলিম যুগের গৌরবময় গৌড় নগর বা লক্ষ্মৌতির কোন চিহ্ন আজ বিদ্যমান নাই। কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাসকারগণ লক্ষ্মৌতির অবস্থান নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লক্ষ্মণসেনের গৌড় এবং ঘিয়াসউদ্দীনের লক্ষ্মৌতি একই নগর ছিল বলিয়া ধারণা করা হয়। পরবর্তী যুগে যেমন বিভিন্ন রাজবংশের সময়ে পৃথ্বীরাজের দিল্লী নগরীর অবস্থিতি বহুবার পরিবর্তিত হইয়াছিল, তেমনই রাজনৈতিক, ভৌগোলিক এবং ব্যক্তিগত কারণে লক্ষ্মণসেনের গৌড়ের অবস্থিতিও বহুবার পরিবর্তিত হইয়াছিল। নদী-স্রোতের পরিবর্তনের ফলে গৌড়ের কোন ধ্বংসাবশেষ আজ আর অবশিষ্ট নাই—কালিন্দী নদীর পূর্বতীরে কয়েক মাইল ব্যাপিয়া ধ্বংসস্তূপমাত্র প্রাচীন গৌড়ের গৌরবস্মৃতি বহন করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। সেন-রাজধানী গৌড়ের একমাত্র নিদর্শনস্বরূপ বর্তমান আছে—'বল্লাল বাড়ী'। পুরাতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন যে, লক্ষ্মৌতি নগরীর সীমা ছিল উত্তরে বল্লাল বাড়ী (ফুলবাড়ী তোরণ) হইতে দক্ষিণে কোতোয়ালী ও পশ্চিমে গঙ্গা (কালিন্দী) এবং পূর্বে মহানন্দা পর্যন্ত। সমস্ত নগরটি পশ্চিম দিক ব্যতীত অপর তিন দিকে সুদৃঢ় মৃন্ময় প্রাচীর ও একশত হস্ত প্রশস্ত একটি পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

গৌড়নগর বা লক্ষ্মৌতির অস্তিত্ব বিলোপ

মীনহাজের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ঘিয়াসউদ্দীন লক্ষ্মৌতিতে রাজধানী পরিবর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তাঁহার নূতন রাজধানীকে সুসজ্জিত, সুশোভিত এবং সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্মৌতির তিন পার্শ্বে সুগভীর ও সুপ্রশস্ত পরিখা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক খাল খনন ও সেতু নির্মাণ করিয়া লক্ষ্মৌতি ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে বার্ষিক বন্যার প্রকোপ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। নৌকা ব্যতীত বর্ষাকালে এই অঞ্চলে যাতায়াতের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তিনি পথ-নির্মাণ করিয়া সৈন্যচালনা ও পণ্য-চলাচলের সুবিধা করেন। ঘিয়াসউদ্দীন তাঁহার রাজধানী লক্ষ্মৌতির ৩৭½ ক্রোশ (৭৫ মাইল) উত্তর-পূর্বস্থিত দেবকোট এবং ৪২½ ক্রোশ (৮৫ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ লাখ্‌নোর একটি প্রশস্ত রাজপথ দ্বারা সংযুক্ত করেন। তিনি গঙ্গা, মহানন্দা এবং পুনর্ভবা নদীতে ফেরীর ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। এই রাজপথের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৭৫ ক্রোশ (১৫০ মাইল) এবং পদব্রজে প্রায় দশ দিনের পথ। কালের প্রভাব এবং বন্যার প্রকোপ অতিক্রম করিয়া এই সুপ্রশস্ত রাজপথ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এই রাজপথ কেবল রাজ্যশাসন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধাই করে নাই—দেশের লোকের নিকট

লক্ষ্মৌতির উন্নয়ন

আশীর্বাদস্বরূপও ছিল; কারণ, এই রাজপথ বার্ষিক বন্যার করালগ্রাস হইতে তাহাদের গৃহ ও শস্যক্ষেত্রাদি রক্ষা করিত। [১]

প্রাসাদনগরী লক্ষ্ণৌতি

লক্ষ্ণৌতিতে রাজধানী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহু আমীর লক্ষ্ণৌতিতে বসবাস আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের নিমিত্ত বহু মনোরম অট্টালিকা নির্মিত হইল। ঘিয়াসউদ্দীন লক্ষ্ণৌতিতে একাধিক জুম্মা মসজিদ এবং অন্যান্য বহু মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করিলেন। নূতন রাজধানী প্রাসাদ-মসজিদ দ্বারা সুসজ্জিত ও সুশোভিত হইল। ফুলবাড়ী ও কোতোয়ালী তোরণের মধ্যবর্তী স্থানে ঘিয়াসউদ্দীন তাঁহার আবাস-গৃহ নির্মাণ করিলেন। সুলতানের আবাস-গৃহ প্রাচীর-পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত করা হইল।

সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের স্বাধীনতা ঘোষণা: সুলতান কুতুবউদ্দীনের মৃত্যুর পর (১২১১ খ্রীঃ) দিল্লীর সিংহাসনকে কেন্দ্র করিয়া কুতুবউদ্দীনের পুত্র আরামশাহ, জামাতা ইলতুৎমিস, গজনীর সুলতান তাজউদ্দীন ইলদুজ এবং সিন্ধুর শাসনকর্তা নাসীরউদ্দীন কুবাচা—এই প্রতিদ্বন্দ্বী চতুষ্টয়ের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হয়। এক বৎসর পরে আরামশাহের মৃত্যু হয়। তাজউদ্দীন পঞ্জাবের কারনল পর্যন্ত অধিকার করিলেন; কিন্তু অবশেষে তিনি মুলতানে সুলতান ইলতুৎমিস কর্তৃক পরাজিত হইলেন (১২১৫-১৬)। তাঁহার মৃত্যুতে নাসীরউদ্দীন কুবাচা শক্তিশালী হইলেন, কিন্তু তাহাও সাময়িকভাবে মাত্র। কারণ, শীঘ্রই ইলতুৎমিস তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। নাসীরউদ্দীন কুবাচা ইলতুৎমিসের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন—সিন্ধু এবং মুলতান তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করা হইল (১২১৭-১৮ খ্রীঃ)। দিল্লীর সিংহাসনের জন্য এই বিরোধের সুযোগে আলী মরদান বঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন (১২১১ খ্রীঃ)। তাঁহার মৃত্যুর পর ঘিয়াসউদ্দীন লক্ষ্ণৌতির সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই সুযোগ গ্রহণ করিলেন—বঙ্গ ও বিহারে তিনি স্বীয় আধিপত্য ও শক্তি সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং দিল্লীর অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিলেন। মীনহাজ বলেন যে, তাঁহার নামে খুত্‌বা পঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল—তিনি সুলতান উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। [২]

কুতুবউদ্দীনের মৃত্যুর পর অন্তর্দ্বন্দ্ব

ঘিয়াসউদ্দীনের 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ

বাগদাদের খলিফার নিকট হইতে ঘিয়াসউদ্দীনের স্বীকৃতিপত্র লাভ: ঘিয়াসউদ্দীনের সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ রাজনৈতিক সাফল্য হইল বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার নিকট হইতে স্বীকৃতিপত্র লাভ। ইসলামের নীতি অনুসারে আল্লাহ্ এক, কোরাণ এক, খলিফা এক, রসুল এক। ইসলামের ঐক্যসূত্র হইল খলিফা; খলিফা ব্যতীত অন্য কোন লোকের প্রভুত্ব ইসলাম অনুসারে অবৈধ। অবশ্য যদি কোন মুসলিম শাসক খলিফার স্বীকৃতিপত্র বা ফরমান লাভ করেন, তবে তাঁহাকে ইসলামের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করা বৈধ এবং ধর্মসঙ্গত। ওম্মাইয়া বংশের

---

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. p. 586

২) *ibid*, p. 589

সময় হইতে দামাস্কাস ও বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাগণ শক্তিশালী মুসলিম নায়ক-দিগকে এই স্বীকৃতিপত্র প্রদান করিতেন। খলিফা তাঁহাদিগকে আমীর-উল-মুমিনীন (বিশ্বাসীদের আমীর), আমীর-উল মুসলিমীন (মুসলিমগণের আমীর), নায়েব-উল-খলিফা (খলিফার প্রতিনিধি) এবং সাইক-উল-ইসলাম (ইসলামের তরবারি) প্রভৃতি শ্রুতিমধুর ও গুরুগম্ভীর উপাধি প্রদান করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খিলাত (পরিচ্ছদ), তরবারি ইত্যাদি উপহারও প্রেরণ করিতেন। খলিফা কর্তৃক স্বীকৃত নায়কগণ উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বীয় নামের সহিত খলিফার নাম যুক্ত করিয়া খুত্‌বা[১] পাঠ করিতেন, খলিফার নামের সঙ্গে যুক্ত বা বিযুক্ত মুদ্রা প্রচলন করিতেন। ইহাতে মুসলিম নরপতিগণের রাজত্ব ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিবেচিত হইত এবং মুসলিম জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ করিত।

বাগদাদের খলিফা কর্তৃক স্বীকৃতি ও উহার মূল্য

সামান্য গর্দভচালকরূপে জীবন আরম্ভ করিলেও ঘিয়াসউদ্দীন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি অনুভব করিলেন যে, হিন্দুস্থানের মুসলিম শাসন সম্পূর্ণ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সুতরাং ঘিয়াসউদ্দীন দিল্লীকে বাদ দিয়া স্বয়ং হিন্দুস্থানের খলিফা-স্বীকৃত মুসলিম শাসকের পদলাভের চেষ্টা করিলেন। ইহার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—প্রথমতঃ, রাজ্যের মুসলিম জনতা তাঁহাকে খলিফার প্রতিনিধিরূপে স্বীকার করিবে—দ্বিতীয়তঃ, দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিসের কোন ক্ষমতা তাঁহার উপর থাকিবে না। এই উদ্দেশ্যে তিনি বাগদাদের খলিফার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া বহু মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। প্রত্যুত্তরে তদানীন্তন খলিফা আল্‌-নাসীরউদ্দীন ইলাহী তাঁহাকে আল্‌-নাসীর (সহায়ক) উপাধি প্রদান করিয়া খিলাত ও ফরমান প্রেরণ করিলেন। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ৬১৬-৬১৭ হিজরী সনে ঘটিয়া থাকিবে। কারণ ঐ বৎসরে তিনি আল-নাসীরউদ্দীন ইলাহীর নাম উল্লেখ করিয়া স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ঐ বৎসরের মুদ্রাতেই তাঁহার সুলতান উপাধি ও খলিফা আল্‌-নাসীরউদ্দীন নাম উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।[২] অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বাঙ্গলার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত আছে যে, তিনি আরও তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ৬২০ হিজরী সনে খলিফার ফরমান লাভ করিয়াছিলেন, যদিও এই ঘটনাকে স্মরণীয় করিবার জন্য ৬১৬ হিজরী সনেই তিনি বিশেষ মুদ্রা উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন।[৩]

ঘিয়াসউদ্দীনের প্রারম্ভ জীবন

আল্‌ নাসীর উপাধি লাভ

বাগদাদের খলিফা কর্তৃক ঘিয়াসউদ্দীনের এই স্বীকৃতিলাভ বাঙ্গলা তথা ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের ভিত্তিতে স্বীকৃত হিন্দুস্থানের সর্বপ্রথম সুলতান ছিলেন ঘিয়াসউদ্দীন-আল্‌-নাসীর (এই উপাধিই তাঁহার মুদ্রাতে

---

১) খুত্‌বা—অর্থ ঘোষণা। সিংহাসনারোহণের পরে সুলতানের মুসলিম প্রজাবর্গ শুক্রবারে জুম্মা নমাজের পর সমবেতভাবে সুলতানের নাম ঘোষণা করিয়া নমাজ পড়ে। এই ঘোষণার দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে সুলতানের আধিপত্য স্বীকার করা হয়—M. L. Ray Chowdhury. *State and Religion in Mughal India.* Chap. I, p. 62, F. N. 2. (বঙ্গানুবাদ)।

২) *Tabqat-i-Nasiri.* Tr., pp. 576-80

৩) *History of Bengal.* Dacca University, Vol. II. p. 26

দেখা যায়)। ইলতুৎমিসের সহিত যুদ্ধে যদি তাঁহার পরাজয় না হইত, তবে হয়তো হিন্দুস্থানের মুসলিম রাজ্যকেন্দ্র পূর্ব ভারতে বঙ্গদেশেই প্রতিষ্ঠিত হইত এবং লক্ষ্ণৌতিই দিল্লীর স্থান ও গৌরব লাভ করিত। পরবর্তী যুগে বাঙ্গলার প্রাধান্যকে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম আমীরদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা হইয়াছে, তাহার কারণও সম্ভবতঃ বাঙ্গলার সুলতান কর্তৃক বাগদাদের খলিফার প্রথম স্বীকৃতিলাভ। বাঙ্গলার সুলতানই মালিক-উশ্-শার্ক (শার্ক = পূর্বদিক) বা পূর্বদিকের মালিক বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। সুলতান ইলতুৎমিস এই ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করিলেন এবং তিনি স্বয়ং খলিফার নিকট হইতে স্বীকৃতি লাভের জন্য বাগদাদে প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা তাঁহাকে ইসলামের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিলেন[১]; তাঁহার উপাধি হইল সুলতান-উল-আজম (মহা-সুলতান)। খলিফা তাঁহাকে 'খিলাত' (রাজভূষণ) এবং একখানি 'সাইফ'ও (তরবারি) প্রদান করেন। কিন্তু এই ঘটনা ঘিয়াসউদ্দীনের স্বীকৃতিলাভের প্রায় দশ বৎসর পরে ঘটিয়াছিল; সুতরাং ঘিয়াসউদ্দীনই ভারতবর্ষে খলিফা কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম মুসলিম সুলতান।

ঘিয়াসউদ্দীন কর্তৃক উপাধি লাভের গুরুত্ব

ইলতুৎমিসের অস্বস্তি

ইলতুৎমিসের সহিত বাঙ্গলার সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের সংঘর্ষঃ বাগদাদের খলিফা কর্তৃক স্বীকৃতিলাভ ঘিয়াসউদ্দীনকে সুলতান ইলতুৎমিসের রোষ বা আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। অবশ্য খলিফা কর্তৃক ঘিয়াসউদ্দীনের স্বীকৃতি-লাভে অস্বস্তি বোধ করিলেও সুলতান ইলতুৎমিস পরবর্তী তিন-চারি বৎসরকাল বাঙ্গলার প্রতি মনোনিবেশ করিবার মত সময় ও সুযোগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সময়ে দুর্ধর্ষ চিঙ্গিস খানের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে খাওয়ারিজম শাহ জালালউদ্দীন মাঙ্গাবরণী পঞ্জাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন (৬১৮ হিঃ/১২২১ খ্রীঃ) এবং দিল্লী ও মুলতান অধিকার করিতে চেষ্টা করেন। চিঙ্গিস খানও মাঙ্গাবরণীর অনুসরণ করিয়া পঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন। সুতরাং ইলতুৎমিসকে কিছুদিন তাঁহার রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষাতেই ব্যাপৃত থাকিতে হইল। অবশেষে ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দে (৬২১ হিঃ) মাঙ্গাবরণী সিন্ধুর অপর তীরে প্রস্থান করিলে ইলতুৎমিস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। এইবার তিনি হিন্দু সামন্তগণের হস্ত হইতে বদায়ুন, বারাণসী, কনৌজ ও অযোধ্যা পুনরুদ্ধার করিলেন এবং ঘিয়াসউদ্দীনের হস্ত হইতে বিহার পুনরুদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। উত্তর বিহারের ভাগলপুর অঞ্চলের উপর অথবা পূর্ব ত্রিহুতের উপর তাঁহার অধিকার পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[২] কারণ এই পথেই তিনি লক্ষ্ণৌতির বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। এইবার গঙ্গানদীর দক্ষিণস্থ বিহার বা বিহার শরিফ (বা প্রাচীন ওদন্তপুর) তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। তথায় দিল্লী সুলতানের প্রতিনিধি শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন।[৩]

ইলতুৎমিসের নীরবতার কারণ

---

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Text, p. 74

২) *ibid.* Text. p. 159

৩) *ibid*, Text, p. 113

ঘিয়াসউদ্দীনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ছিল ; কারণ পূর্বাঞ্চলের এই যুদ্ধ দুই বৎসর ব্যাপিয়া চলিয়াছিল এবং স্বয়ং স্থলতান ইলতুৎমিসকে স্থদূর বঙ্গদেশে সৈন্য পরিচালনার জন্য আসিতে হইয়াছিল। ৬২২ হিঃ/১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থলতান ইলতুৎমিস গঙ্গার তীর অনুসরণ করিয়া বঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্থলতান ঘিয়াস-উদ্দীনও তাঁহার রাজধানী লক্ষ্ণৌতি হইতে দিল্লীশ্বরকে বাধা প্রদানের জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার রণতরীসমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে নদীপথে তাঁহার অনুসরণ করিল। মুঙ্গের কিংবা সক্রীগলি গিরিবর্ত্মের নিকট উভয় সেনাদলের সাক্ষাৎ হইল।[১] সংগ্রাম সম্বন্ধে সমসাময়িক ইতিহাস কিন্তু নীরব। রিয়াজ-উস-সালাতীন অনুসারে ঘিয়াসউদ্দীন নিজেকে ইলতুৎমিস অপেক্ষা দুর্বল দেখিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।[২] স্থলতান ঘিয়াসউদ্দীন সময়োপযোগী সন্ধি করিতে অভ্যস্ত ছিলেন—তিনি জানিতেন যে, ইলতুৎমিসকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে এবং তিনি সেই স্থযোগে দিল্লীর অধিকৃত অঞ্চল পুনরধিকার করিবেন। যাহা হউক, উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে ঘিয়াসউদ্দীন ইলতুৎমিসকে আটত্রিশটি হস্তী এবং আশি লক্ষ (মতান্তরে আশি সহস্র) মুদ্রা প্রদান করেন।[৩] বাঙ্গলার স্থলতান দিল্লীর স্থলতান ইলতুৎমিসের নামে মুদ্রাঙ্কন ও খুত্‌বা পাঠের অঙ্গীকার করিলেন।

স্থলতান ইলতুৎমিস কর্তৃক বিহার অভিযান (১২২৫ খ্রীঃ)

মালিক আলাউদ্দীন জানী নামক একজন তুর্কী আমীরকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীশ্বর ইলতুৎমিস দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন ; বাঙ্গলার শাসক পদে ঘিয়াসউদ্দীনই অধিষ্ঠিত রহিলেন। ঘিয়াসউদ্দীন স্থলতান ইলতুৎমিসের দিল্লী প্রত্যাবর্তনের স্থযোগ গ্রহণ করিলেন এবং স্বল্পকালমধ্যেই বিহার অধিকার করিলেন। আলাউদ্দীন জানী বিহারের সীমানার বহির্দেশে বিতাড়িত হইলেন। আলাউদ্দীন জানী অযোধ্যায় ইলতুৎমিসের পুত্র শাহজাদা নাসীরউদ্দীন মামুদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। স্থলতান ইলতুৎমিস দুই বৎসরকাল এই অপমান নীরবে সহ্য করিলেন এবং তাঁহার পুত্র নাসিরউদ্দীন মামুদকে এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের স্থযোগের প্রতীক্ষায় থাকিতে নির্দেশ দিলেন।

ঘিয়াসউদ্দীন কর্তৃক বিহার পুনরুদ্ধার

স্থলতান ঘিয়াসউদ্দীন এক বৎসরকাল রাজধানীতে স্থলতান ইলতুৎমিসের আক্রমণের আশংকায় স্থসজ্জিত সেনাবাহিনীসহ প্রতীক্ষা করিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন যে, ইলতুৎমিস এই অপমান নীরবে সহ্য করিবেন না। ইলতুৎমিসও যে সময় এবং স্থযোগের প্রতীক্ষা করিতে পারেন, ঘিয়াসউদ্দীন তাহা সহজেই ধারণা করিয়াছিলেন। অন্যদিকে, অযোধ্যার হিন্দুগণও এই সময়ে পৃথু নামক একজন নায়কের অধীনে বিদ্রোহ করিয়া বহু সহস্র মুসলিমকে হত্যা করিয়াছিল। স্থলতান ইলতুৎমিস তাঁহার পুত্র নাসিরউদ্দীনকে বহু সৈন্যসহ এই বিদ্রোহিদিগকে দমন করিবার জন্য

স্থলতান ঘিয়াসউদ্দীনের পূর্ববঙ্গ অভিযান

১) *ibid.* Text, 593

২) *Riyaz-us-Salatin*, Tr, 72

৩) *ibid.*

প্রেরণ করেন। আলাউদ্দীন জানী হইলেন নাসীরউদ্দীন মামুদের পরামর্শদাতা। সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন দিল্লীর রাজকীয় বাহিনীকে অযোধ্যার বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত দেখিয়া (৬২৪ হিঃ/১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে) পূর্ববঙ্গের সেন-রাজগণের বিরুদ্ধে সসৈন্যে পূর্ববঙ্গে অভিযান করিলেন।[১] নৌবহরও তাঁহার অনুসরণ করিল। সুতরাং রাজধানী লক্ষ্ণৌতি একপ্রকার অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। তিনি কখনও কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, দিল্লীশ্বর ইলতুৎমিসও তাঁহার এই অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন।

ঘিয়াসউদ্দীনের অদূরদর্শিতা

পূর্ববঙ্গের কোন্ অঞ্চলে ঘিয়াসউদ্দীন যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহা যথাযথ জানা যায় না। কিন্তু তাঁহার এই অনুপস্থিতির সুযোগে পূর্বপরিকল্পনানুযায়ী অকস্মাৎ অযোধ্যার শাসনকর্তা শাহজাদা নাসীরউদ্দীন মামুদ বঙ্গের অরক্ষিত রাজধানী লক্ষ্ণৌতি আক্রমণ করিলেন।[২] এই সংবাদ শ্রবণমাত্র ঘিয়াসউদ্দীন দ্রুতবেগে অশ্বারোহণে লক্ষ্ণৌতিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন; সঙ্গে অতি অল্পসংখ্যকমাত্র সৈন্য, কারণ অধিকাংশ সৈন্যই তাঁহার ন্যায় দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই—সেনাবাহিনীর অধিকাংশই ছিল পশ্চাতে।

অতি-বুদ্ধিমান ঘিয়াসউদ্দীন দ্বিতীয় বার ভুল করিলেন। অত্যধিক আত্মবিশ্বাস ও স্বীয় বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া তিনি শত্রুসৈন্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলেন—অনুগামী সেনাবাহিনীর জন্য তিনি অপেক্ষা করিলেন না। এমন কি, বর্ষার জন্যও তিনি অপেক্ষা করিতে পারিতেন; কারণ, বর্ষায় বঙ্গের কর্দমাক্ত ভূমিতে দিল্লীর অশ্বারোহী বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করা কষ্টকর এবং অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল। ঘিয়াসউদ্দীন পথপর্যটনে পরিশ্রান্ত স্বল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া দুর্ধর্ষ তুর্কী অশ্বারোহী-বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। তুর্কী সেনাবাহিনী পূর্বেই তাঁহার দুর্গ বসনকোট অধিকার করিয়াছিল। রাজধানীর বহির্ভাগে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। ঘিয়াসউদ্দীনের ভাগ্যলক্ষ্মী এইবার বিরূপা হইলেন। সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন অতি সহজেই তাঁহার অনুচরবর্গসহ পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তাঁহার ছিন্ন শির ধূলায় লুণ্ঠিত হইল (৬২৪ হিঃ/১২২৬ খ্রীঃ)।[৩]

নাসীরউদ্দীন মামুদের লক্ষ্ণৌতি আক্রমণ

সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের রাজ্যসীমা : সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের রাজ্যসীম যথাযথ জানা যায় না; কারণ, তাঁহার রাজত্বকালে কোন অনুলেখ বা রাজ্য সীমা-নির্দেশক কোন মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে অনুমিত হয় যে, তাঁহা রাজ্যসীমা বঙ্গদেশে সরকার লক্ষ্ণৌতি (মালদহ অঞ্চলের অংশ), পূর্ণিয়া (কুশীনদী পূর্বদিকস্থ পূর্ণিয়া অঞ্চলের কতকাংশ), তাজপুর (পূর্ণিয়ার পূর্বপ্রান্ত), পিঁজ (দিনাজপুর), ঘোড়াঘাট (কুচবিহারের দক্ষিণে তিস্তা হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য ভূভাগ—বর্তমান রংপুর অঞ্চল), বরবকাবাদ (লক্ষ্ণৌতির দক্ষিণে—বর্তমান রাজশা

---

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr, p. 595

২) *ibid.* p. 585.

৩) *ibid.* Text, p. 114

অঞ্চল), বাজুহা সরকারের পশ্চিমাংশ (বর্তমান রাজশাহীর কতকাংশ ও বগুড়া অঞ্চল), তান্ডা (সকরিগলি হইতে রাজমহল—সাঁওতাল পরগণার কিয়দংশ এবং মুর্শিদাবাদের কতকাংশ), শরিফাবাদ (নগর—বীরভূম অঞ্চল), সুলেমানাবাদ (বর্ধমান অঞ্চল) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বরবকাবাদ, শরিফাবাদ ও সুলেমানাবাদ তাঁহার স্বয়ং বিজিত রাজ্য। তিনি দক্ষিণ-বিহারও পুনরধিকার করিয়াছিলেন এবং উত্তর-বিহারে গণ্ডক নদী এবং দিল্লীর অধীন অযোধ্যা-প্রদেশ পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের এই বিস্তৃত রাজ্যসীমার মধ্যে তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মতন শক্তিশালী কোন মুসলিম আমীর কিংবা হিন্দু রাজা বা মহাসামন্ত ছিলেন না। বিহারে এবং গঙ্গার দক্ষিণে সরকার তান্ডার বহির্ভাগে ঘিয়াসউদ্দীনের বিজয় সামরিক অধিকারের (Military Occupation) নামান্তর মাত্র ছিল। ইখতিয়ারউদ্দীনের বিজিত রাজ্যখণ্ডের বহির্ভাগে (উত্তরে দেবকোট, দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে কুশী এবং পূর্বে পুনর্ভবা নদী) বহু শক্তিশালী হিন্দু নরপতি ছিলেন। তাঁহাদের নীতি ছিল **বেতসীবৃত্তি**—অর্থাৎ শক্তিশালী মুসলিম আক্রমণের নিকট তাঁহারা মাথা নত করিলেও সুযোগমত উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইতেন অর্থাৎ মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেন।[১] ফলে একই অঞ্চল বহুবার মুসলিম শক্তি কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল এবং স্থায়িভাবে কোন অঞ্চল কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এইটিই ছিল বঙ্গে এবং ভারতে মুসলিম বিজয়ের সাধারণ ধারা। এমন কি, মুঘল বিজয়ের পূর্বে বঙ্গের সমগ্র অঞ্চলে মুসলিম সেনাবাহিনীর পদার্পণও ঘটে নাই এবং বলবনী বংশের পূর্ব পর্যন্ত বরেন্দ্রীর বাহিরে মুসলিম শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিতও হয় নাই।[২]

সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের রাজ্যসীমা

হিন্দু নরপতিদের বেতসী বৃত্তি

সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের চরিত্র ও কৃতিত্ব: ভারতের অপর প্রান্তে অতি সাধারণ গর্দভচালকরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া ঘিয়াসউদ্দীন স্বীয় বুদ্ধি ও বিক্রম বলে পূর্বভারতে রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি দিল্লীর সুলতানকেও সাময়িক ভাবে প্রতিহত করিয়াছিলেন। ঘিয়াসউদ্দীন ছিলেন শিহাবউদ্দীন মুহম্মদ ঘুরী, কুতুবউদ্দীন, ইখতিয়ার-উদ্দীন ও ইলতুৎমিসের সমসাময়িক (১১৯৩-১২১০ খ্রীঃ) এবং তাঁহাদের সহযোগে কার্য করিবার সুযোগও তাঁহার জীবনে আসিয়াছিল। তারপর বঙ্গের স্বাধীন সুলতানরূপে তিনি দিল্লীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন। দুর্ধর্ষ আলী মরদান তাঁহার সহকর্মী ছিলেন।

ইখতিয়ারউদ্দীনকে হত্যা করিয়াছিলেন তাঁহার সহকর্মী আমীর আলী মরদান; মুহম্মদ শীরাণকে হত্যা করিয়াছিলেন তাঁহার স্বজাতীয় আমীরবর্গ, আর আলী মরদান নিহত হইয়াছিলেন হুসামউদ্দীনের হস্তে। তাঁহারা সকলেই প্রায় জীবনের মধ্যাহ্নে নিহত হইয়াছিলেন এবং সেই হত্যার মূলে ছিল ঈর্ষা, শক্তিপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ও

---

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 29

২) For details, see *Foundation of Muslim Rule in India*, Habibullah, Chap. II.

বিশ্বাসঘাতকতা। তাঁহাদের কেহই জীবনে স্বীয় কর্মশক্তির পূর্ণ বিকাশের সুযোগ লাভ করেন নাই। কিন্তু হুসামউদ্দীনের সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার জীবিতকালেই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সহকর্মিগণ একে একে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন—হুসামউদ্দীনই শেষ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ভারতবর্ষে তাঁহার কর্মজীবন প্রায় বত্রিশ বৎসর (১১৯৫-১২২৭ খ্রীঃ)। যদি ত্রিশ বৎসর বয়সেও তিনি ভারতে আগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ষাট বৎসরেরও অধিক। তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত। প্রথম জীবনের দুঃখময় দিনের স্মৃতি কখনও তিনি বিস্মৃত হন নাই। বীণাবাদক যেমন বীণার তারের বা সুরের সহিত পরিচিত থাকেন, তেমনই হুসামউদ্দীনও তাঁহার স্বজাতীয়গণের কর্মধারার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি অতি স্থিরমস্তিষ্ক ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। সর্বদাই তিনি স্বীয় শক্তি-অনুযায়ী চলিতে চেষ্টা করিতেন এবং অনিশ্চিতের মধ্যে সহজে হস্তক্ষেপ করিতেন না। আলী মরদানের সহিত তিনি অতি সন্তর্পণে সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন এবং ইলতুৎমিসের সহিতও প্রথম সুযোগে সন্ধি করিয়াছেন। সুযোগ ও সময়ের জন্য অপেক্ষা করিবার মত ধৈর্যও তাঁহার ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনিই বঙ্গের প্রথম স্বাধীন সুলতান। কারণ, আলী মরদান ছিলেন প্রথমে কুতুবউদ্দীনের অধীনে নিযুক্ত শাসক—পরে বিদ্রোহী। হুসামউদ্দীন দুর্ধর্ষ আলী মরদানকে হত্যা করিয়া বাহুবলে লক্ষ্ণৌতির সুলতানী পদ লাভ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি বাগদাদের খলিফা আল্-নাসীরের স্বীকৃতিপত্রও লাভ করিয়াছিলেন। এদিক হইতে বিবেচনা করিলে ঘিয়াসউদ্দীনই হিন্দুস্থানের প্রথম ধর্মসম্মত মুসলিম শাসক।

স্থিরমতি ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হুসামউদ্দীন

পাঠানযুগে ভারতবর্ষে একাদিক্রমে চৌদ্দ বৎসর রাজত্ব করা বা শাসনদণ্ড পরিচালনা করার মধ্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। দুর্ধর্ষ তুর্ক, আফগান ও খালজী আমীরগণ স্বেচ্ছায় বা বিনা যুদ্ধে কাহারও প্রভুত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু ঘিয়াসউদ্দীন সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা, কূটবুদ্ধি, দূরদর্শিতা ও অমায়িক ব্যবহার দ্বারা তাঁহার সহকর্মীদের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে কোন অন্তর্বিদ্রোহ হয় নাই—ইহাও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক। বাস্তবিক পক্ষে আলী মরদানের নৃশংস অত্যাচারের পরে বঙ্গের প্রজাসাধারণ ঘিয়াসউদ্দীনের সুশাসনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিল; আলী মরদানের অত্যাচারের বিভীষিকা হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

প্রজানুরঞ্জক ঘিয়াসউদ্দীন

ঘিয়াসউদ্দীন কেবল দুঃসাহসী সৈনিক, সমরকুশল সেনানায়ক এবং কূটনীতিজ্ঞ রাজনীতিবিদ্‌ই ছিলেন না; তিনি সুদক্ষ শাসকও ছিলেন। তাঁহার সুশাসনে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রজার কল্যাণে তিনি সতত সচেষ্ট ছিলেন। তিনি রাজ্যের কল্যাণার্থে এবং সৈন্য, বাণিজ্য ও লোক চলাচলের সুবিধার জন্য রাজ্যমধ্যে বহু রাজপথ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। দেবকোট হইতে লাখ্‌নোর পর্যন্ত সুদীর্ঘ রাজপথ তাঁহারই গৌরবকীর্তি।

সুশাসক ঘিয়াসউদ্দীন

সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন শিল্প এবং সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। তিনি গৌড়ের বিখ্যাত জুম্মা মসজিদ এবং আরও কতিপয় মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন উলেমা, ফকির ও সৈয়দগণকে উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে মোঙ্গলবীর চিঙ্গিস খানের আক্রমণে মধ্য এশিয়ার তাসখন্দ, খোরাসান প্রভৃতি মুসলিম জ্ঞানকেন্দ্র বিধ্বস্ত হইলে সেই অঞ্চলের মুসলিম বিবুধমণ্ডলী ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইলতুৎমিসের ন্যায় ঘিয়াসউদ্দীনের উদারতার খ্যাতিও হিন্দুকুশের অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সুতরাং মুসলিম সুধী ও সৈয়দগণ পরম আগ্রহে দিল্লীর দরবারে এবং বঙ্গদেশে ঘিয়াসউদ্দীনের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঘিয়াসউদ্দীন তাঁহাদিগকেও সমভাবেই সাহায্য ও বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল সুধী ও সুফীগণ বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারে সহায়তা করেন। তাঁহাদের আগমনে লক্ষ্ণৌতি মুসলিম জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হইল। কেবল মুসলিম সুধীবর্গই মোঙ্গল আক্রমণে বিধ্বস্ত, বিভ্রান্ত ও স্থানচ্যুত হইয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই—বহু ভাগ্যান্বেষী মুসলিমও প্রবল স্রোতে ভারতে প্রবেশ করে এবং ভারতের মুসলিম শক্তি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে।

শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ঘিয়াসউদ্দীন

মীনহাজের বিবরণে দেখা যায় যে, ঘিয়াসউদ্দীন প্রিয়দর্শন, প্রিয়বাক্ ও প্রিয়-ব্যবহারী ছিলেন। শত্রুও তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট বা বিক্ষুব্ধ হইত না। এমন কি, ঘিয়াসউদ্দীনের মৃত্যুর পর সুলতান ইলতুৎমিসও লক্ষ্ণৌতিতে আগমন করিয়া তাঁহার মৃত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিখ্যাত ইতিহাসকার মীনহাজ ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান নাসীরউদ্দীনের সভাসদ এবং রাজ-ইতিহাসলেখক হইয়াও মামলুক সুলতানগণের প্রতিদ্বন্দ্বী ঘিয়াসউদ্দীনের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন।

প্রিয়দর্শন, প্রিয়বাক ও প্রিয়-ব্যবহারী ঘিয়াসউদ্দীন

দূরদর্শী ঘিয়াসউদ্দীন জীবনে দুইবার অদূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন। তিনি রাজধানী লক্ষ্ণৌতি অরক্ষিত রাখিয়া সমস্ত সেনাবাহিনী ও নৌবহরসহ পূর্ববঙ্গে অভিযান করিয়াছিলেন। তৎপর লক্ষ্ণৌতি প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বল্প-সংখ্যক পরিশ্রান্ত ও রণক্লান্ত সৈন্যসহ নাসীরউদ্দীন মামুদকে আক্রমণ করিয়াছিলেন; —ইহাই তাঁহার অদূরদর্শিতার নিদর্শন। এই ভুলের জন্যই তাঁহার পতন হইল, জীবন নষ্ট হইল, বাঙ্গলা দেশ দিল্লী সুলতানীর অন্তর্ভুক্ত হইল।

ঘিয়াসউদ্দীনের অদূরদর্শিতা

পঞ্চম অধ্যায়

মামলুক বা দাসগোষ্ঠীর অধীনে বঙ্গদেশ

(৬২৪/১২২৬—৬৮৪/১২৮৫ খ্রীঃ)

সূচনা : দাসগোষ্ঠীর রাজত্বকালের ষাট বৎসরে (১২২৬-১২৮৫ খ্রীঃ) দিল্লীর অধীন প্রায় পঞ্চদশ জন শাসনকর্তা বঙ্গদেশ শাসন করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে দশজনই ছিলেন দিল্লীর সুলতানগণের অধীন 'ক্রীতদাস'। ইসলামে 'ক্রীতদাস' শব্দটির অর্থ একটু ব্যাপক। 'দাস' অর্থে কেবল ভৃত্যই নির্দেশ করে না। ইসলামের রীতি অনুসারে বহুক্ষেত্রে রাজাও যুদ্ধে পরাজিত হইলে দাসের পর্যায়ে অবনমিত হইতেন। এমন কি, পরাজিত ব্যক্তির স্ত্রী-পুত্র-কন্যাও দাসের পর্যায়ে অপনীত হইতেন। ইসলামের রীতি অনুসারে বিগত পরশ্বের রাজপুত্র যুদ্ধে পরাজয়ের পরে অদ্যকার দাস, প্রভুর অনুগ্রহ লাভ করিলে আগামী কল্যকার জামাতা, ভাগ্যবান হইলে আগামী পরশ্বের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

ইসলামে 'দাস' শব্দের অর্থ

ইসলামের রাজনীতিতে কয়েক প্রকার দাসের উল্লেখ আছে, যথা—

বিভিন্ন প্রকারের দাস

(১) প্রকাশ্য বিপণিতে বিক্রীত দাস,
(২) ক্রীতদাসের সন্ততি দাস,
(৩) যুদ্ধে পরাজিত বন্দী দাস,
(৪) বেতনভোগী দাস।

'দাস' শব্দটির প্রতিশব্দ আরবী ভাষায় আব্‌দ্‌, ফারসী ভাষায় বান্দা এবং তুর্কী ভাষায় মামলুক। অবশ্য আব্‌দ্‌, বান্দা ও মামলুক ব্যবহারিক ভাবে বিভিন্ন অর্থব্যঞ্জক। ভারতের মুসলিম ইতিহাসে 'দাস' শব্দটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং দাস-গণের অনেকেই বঙ্গদেশের রাজনীতির সহিত বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন।

বঙ্গের ইতিহাসে বিখ্যাত এই দাস বা মামলুকগণ ছিলেন মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং প্রধানতঃ তাঁহারা ছিলেন খিতাই তুর্ক, কিপচাক তুর্ক কিংবা উজবেগী তুর্কজাতীয়। তাঁহারা সকলেই প্রথম জীবনে ক্রীতদাসরূপে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশের শাসনকর্তৃপদ লাভের পূর্বেই তাঁহারা দিল্লীর দাস সুলতানগণের দরবারে বিশেষ ক্ষমতাশালী আমীরের পদ লাভ করিয়াছিলেন, কিংবা রাজ-সরকারে অথবা রাজপরিবারে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন, অথবা প্রাদেশিক শাসনকর্তৃপদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রভুশ্রেণীর অনুরূপ এই সমস্ত মামলুকগণও বহুসংখ্যক দাস বা মামলুক পোষণ করিতেন এবং এই মামলুকগণই ছিলেন তাঁহাদের সহায় ও অবলম্বনস্বরূপ। এই মামলুক শাসকবৃন্দের অধীনে লক্ষ্ণৌতির রাজদরবার ঐশ্বর্যে ও আড়ম্বরে দিল্লীর দ্বিতীয় সংস্করণে পরিণত হইল। তাঁহাদের প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থাও ছিল দিল্লীর শাসন ব্যবস্থারই অনুরূপ। ইলতুৎমিসের বংশধরগণের অধীনে বঙ্গদেশে বিকেন্দ্রিক সামন্ততন্ত্রেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

দাসদের পদোন্নতি ও বঙ্গদেশের শাসন-কর্তৃপদ লাভ

এই সামন্ততন্ত্র মাত্র দিল্লী কিংবা লক্ষ্ণৌতিরই বৈশিষ্ট্য ছিল না, পৃথিবীর যে সকল দেশে তুর্কী মামলুকগণ কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন, প্রায় সর্বত্রই ছিল এই একই শাসন-ব্যবস্থা।

মামলুক যুগের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যঃ এই যুগের ইতিহাস অন্তর্দ্বন্দ্ব, সিংহাসন লাভের জন্য বিরোধ এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কাহিনীমাত্র। সুলতান ইলতুৎমিসের পরবর্তী উত্তরাধিকারিগণ কেহই এই বিশৃংখল অবস্থার অবসান করিতে পারেন নাই। বিহার, অযোধ্যা, কনৌজ, কারামাণিকপুর প্রভৃতি বঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বঙ্গের সিংহাসন বা শাসনকর্তৃত্ব লাভ। এমন কি, স্বাধীনতার অবসান বা বিলুপ্তির পরেও বঙ্গের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসত্তা বিনষ্ট হয় নাই বরং বঙ্গের শাসনকর্তাই ছিলেন 'মালিক-উশ্-শার্ক' (পূর্বাঞ্চলের প্রভু বা অধিপতি)—এই গৌরবময় উপাধির অধিকারী। বঙ্গে একটি সাধারণ রীতি হইয়া উঠিয়াছিল যে, বঙ্গের অধিপতি বা শাসনকর্তাকে কেহ পরাজিত বা পদচ্যুত করিতে পারিলেই তিনি অবিসংবাদিত ভাবে 'সমগ্র বঙ্গের শাসনকর্তা' উপাধি লাভ করিতেন বা বঙ্গের শাসনকর্তারূপে স্বীকৃত হইতেন। বঙ্গের সাধারণ প্রজাবর্গ (হিন্দু বা মুসলিম) কেহই শাসনকর্তার জয়-পরাজয় সম্বন্ধে খুব উৎসাহী বা আগ্রহশীল ছিল না। রাজসিংহাসনের প্রতি আনুগত্যই ছিল তাহাদের ধর্ম—সিংহাসন বা মসনদের অধিকারী ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে তাহারা সচেতন ছিল না। সুতরাং সিংহাসনের দ্বন্দ্ব কিংবা রাজার পরিবর্তন বঙ্গদেশের সাধারণ প্রজাদিগকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করিত না।

বঙ্গের লোভনীয় শাসনকর্তৃপদ

বঙ্গের প্রজাসাধারণের মতন বঙ্গের মামলুক শাসকবর্গও তাঁহাদের অধিকর্তা দিল্লীর সুলতানগণের প্রতি আনুষ্ঠানিক আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য সমাপন করিতেন। দিল্লীর সুলতানের নামে তাঁহারা খুত্‌বা পাঠ করিতেন, মুদ্রা প্রচলন করিতেন এবং তাঁহাকে মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন। কিন্তু সুযোগ উপস্থিত হইলেই তাঁহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দিল্লীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন। লক্ষ্ণৌতি তখন ছিল বঙ্গের রাজধানী বা শক্তিকেন্দ্র। সেইজন্য সেই যুগের লক্ষ্ণৌতির নামকরণ হইয়াছিল বুলঘকপুর বা বিদ্রোহী-নগরী।

বুলঘকপুর লক্ষ্ণৌতি

প্রথম যুগের সংঘর্ষ ও বিরোধের তীব্রতা হ্রাস পাওয়ায় এই সময় হইতেই বিজেতা মুসলিম ও বিজিত হিন্দুগণের মধ্যে মিলনের সূত্রপাত হয়। উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ প্রায়ই মুসলিম বিজিত অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের ধর্ম ও রীতিনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেন। এই সময়েই মুসলিম রাজধানীতে অনেক হিন্দুকে সম্মানিত অধিবাসিরূপে বাস করিতে দেখা যায়। এমন কি, লক্ষ্ণৌতির মুসলিম শাসকবর্গকে বরেন্দ্রীর হিন্দু প্রজাবর্গ বিন্দুমাত্র বিব্রত করে নাই, যদিও উড়িষ্যার হিন্দুগণ বঙ্গ-রাজধানী লক্ষ্ণৌতি আক্রমণের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল।

এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, লক্ষ্ণৌতির মুসলিম শক্তি এই সময়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই তুলনায় কামরূপ, পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যার হিন্দু রাজশক্তি অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। কামরূপের বার ভুঁইঞা গোষ্ঠী

লক্ষ্ণৌতির দুর্বল রাজশক্তি

প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কামরূপের অনেক বার ভুঁইঞা ছিলেন ভারতে আগত মোঙ্গলগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। গ্রীক, শক, কুষাণ, হূণ প্রভৃতি জাতির মতন এই মোঙ্গলগোষ্ঠীও হিন্দুধর্মের উদারবক্ষে স্থানলাভ করিয়াছিল এবং কোচ, মেচ, থারু প্রভৃতি মোঙ্গল জাতিগুলি ভারতের ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় দেশ-রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহারা বঙ্গের পূর্বাঞ্চলে করতোয়া ও সুবর্ণশ্রী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে প্রায় শতাধিক বৎসর মুসলিম অভিযানের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ-প্রাচীর রচনা করিয়াছিল।

কামরূপের বার ভুঁইঞা

কামরূপের পূর্বদিকে গৌহাটিতে, উত্তর-ব্রহ্মের শান আক্রমণকারিগণ অহোম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। সেই সময়ে অহোম রাজ্যের অধিপতি ছিলেন সুকাফা এবং সুতেফা। শানগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল। কিন্তু আসামের হিন্দুগণের সংস্পর্শে আসিয়া তাহারাও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম অভিযানকারীদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রতিরোধ-প্রাচীর রচনা করিয়াছিল।

গৌহাটিতে অহোম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

পূর্ববঙ্গের সেনবংশ তখন পতনোন্মুখ—সেনবংশীয় নরপতিগণ তখন হিন্দু-সমাজকে রক্ষার অন্তরালে কৌলিন্য ও আচার-বিচারের বিধানে সংস্কারের জালে আবদ্ধ করিতে ব্যস্ত। সেই সুযোগে চন্দ্রদ্বীপে (বর্তমান বরিশাল অঞ্চলে) ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে দনুজমাধবদেবের আবির্ভাব বা অভ্যুত্থান হইল। লক্ষ্ণৌতির মুসলিম শক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন উড়িষ্যার পূর্ব-গঙ্গবংশীয় নরপতিগণ। গঙ্গবংশের অধীন একজন সামন্ত উড়িষ্যার বৈতরণীতীরে জাজনগরে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। মুসলিম ইতিহাসকারগণ জাজনগরের রায় বা রাজাকে গঙ্গ-সম্রাটের সহিত ভুল করিয়াছেন, ফলে মুসলিম ইতিহাসে নামের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইয়াছে।

চন্দ্রদ্বীপে দনুজমাধব-দেবের অভ্যুত্থান

নাসীরউদ্দীন মামুদ

(৬২৪/১২২৬-৬২৬/১২২৮ খ্রীঃ)

ঘিয়াসউদ্দীনকে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশে দিল্লীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব ও গৌরব নাসীরউদ্দীনেরই প্রাপ্য। তিনি বিহার ও বঙ্গদেশকে একজন শাসকের অধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্ণৌতিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। নাসীরউদ্দীন ঘিয়াসউদ্দীনের প্রভূত ধনরত্ন, মণিমুক্তা দিল্লীতে প্রেরণ করিয়া উলেমা, সৈয়দ ও সুফীদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।[১] সেইজন্য তাঁহারা নাসীরউদ্দীনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার পিতারও তিনি অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, কারণ পুত্র বঙ্গবিজয় করিয়া পিতার মান রক্ষা করিয়াছিলেন (ফেব্রুআরি, ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দ)।

নাসীরউদ্দীনের বঙ্গবিজয়

১২২৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে বাগদাদের খলিফা আল্-মুস্তান্সির বিল্লাহ দিল্লীতে ইলতুৎমিসকে 'খিলাত' (ভূষণ), তরবারি, স্বীকৃতিপত্র এবং 'শামস্-উদ্দীন'

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr., p. 629

(ধর্ম-সূর্য) উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নাসীরউদ্দীন লক্ষ্ণৌতিতে পিতার প্রতিনিধি। শামসুদ্দীন ইলতুৎমিস পুত্রকে স্নেহের ও রাজকীয় সম্মানের নিদর্শন-স্বরূপ উহার মধ্য হইতে একখণ্ড খিলাত, একটি রক্তবর্ণ রাজচ্ছত্র, একটি চন্দ্রাতপ এবং 'মালিক-উস-শার্ক' (পূর্বাঞ্চলের আমীর) উপাধি প্রদান করিলেন।[১] কিন্তু এই সম্মান ও উপাধি ভোগ করার সৌভাগ্য নাসীরউদ্দীনের হইল না। দিল্লীর প্রতিনিধির বঙ্গদেশে আগমনের কয়েকদিনের মধ্যেই নাসীরউদ্দীন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং নাসীরউদ্দীনের মৃত্যুসংবাদ বহন করিয়াই দিল্লীর প্রতিনিধি দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন (মে, ১২২৮ খ্রীঃ)।

নাসীরউদ্দীনের মৃত্যু

ম্যালিক-উস্-শার্ক নাসীরউদ্দীন মামুদ ছিলেন সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎ-মিসের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। পুত্রের অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে ইলতুৎমিস অত্যন্ত শোকার্ত হইয়া পড়িলেন। নাসীরউদ্দীনের মৃতদেহ লক্ষ্ণৌতি হইতে দিল্লীতে নীত হইল।[২] ইলতুৎমিস প্রিয়পুত্রের সমাধির উপরে একটি মনোরম স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করাইলেন। ইহা বর্তমানে "সুলতান গাজীর মকবরা" নামে খ্যাত এবং কুতুব-মিনারের দেড়ক্রোশ পশ্চিমে মল্লিকপুরে অবস্থিত।[৩]

নাসীরউদ্দীন মামুদ লক্ষ্ণৌতিতে স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন। এই সকল মুদ্রায় তাঁহার নামের সহিত খলিফা আল্-মুস্তানসির বিল্লাহের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।[৪] এই জাতীয় একটি স্বর্ণমুদ্রা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় সংরক্ষিত আছে। খলিফা আল্-মুস্তানসির ৬২৩ হিজরায় (১২২৫ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ এডওয়ার্ড টমাস কোচবিহারে আবিষ্কৃত ইলতুৎমিসের কতিপয় মুদ্রাকে লক্ষ্ণৌতির মুদ্রা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অবশ্য এই সকল মুদ্রায় লক্ষ্ণৌতি বা লক্ষ্মণাবতীর নাম উল্লেখ নাই। তাঁহার একটি মুদ্রা ৬২২ হিজরায় (১২২৪ খ্রীঃ) মুদ্রিত হইয়াছিল, ইহাতে আল্-নাসীরউদ্দীন বিল্লাহের নাম মুদ্রিত আছে।[৫] ৬২৪ হিজরায় (১২২৬ খ্রীঃ) মুদ্রিত দুইটি মুদ্রায় খলিফা আল্-জাহির-বে-আমৃর বিল্লাহের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মুদ্রা যদি লক্ষ্ণৌতির মুদ্রা হয়, তাহা হইলে প্রথমটি ইলতুৎমিসের প্রথম গৌড়াভিযানের পরে সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের রাজত্বকালে মুদ্রিত হইয়াছিল। অপর মুদ্রাদ্বয় ঘিয়াসউদ্দীনের মৃত্যুর পর নাসীরউদ্দীন কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল। কারণ ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে নাসীরউদ্দীন বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

নাসিরউদ্দীন ও খলিফার নামাঙ্কিত মুদ্রা

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr., p. 680

২) Thomas, *Initial Coinage of Bengal*, Part II, p. 27

৩) *Ibid*, p. 28 note

৪) *Ibid*, p. 29

৫) *Ibid*, p. 28, No. 9

মালিক ইখতিয়ারউদ্দীন বল্‌কা খালজী

(৬২৬/১২২৮—৬২৮/১২৩০ খ্রীঃ)

নাসীরউদ্দীনের মৃত্যুর পরেই ইখতিয়ারউদ্দীন বল্‌কা মালিক নামক একজন আমীর বিদ্রোহী হইয়া লক্ষ্ণৌতি অধিকার করিলেন।[১] তবকাৎ-ই-নাসীরী অনুসারে এই বিদ্রোহী বল্‌কা মালিক হুসামউদ্দীন আইয়াজের পুত্র।[২] কিন্তু রিয়াজ-উস্‌-সালাতীন অনুসারে এই বিদ্রোহীর নাম হুসামউদ্দীন খালজী।[৩] এই বিদ্রোহীর প্রকৃত নাম একটি মুদ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই মুদ্রাটির একদিকে শামস্‌উদ্দীন ইলতুৎমিসের নাম এবং অপর দিকে দৌলত শাহ্-বিন-মৌদুদের নাম অঙ্কিত আছে।[৪] তবকাৎ-ই-নাসীরী গ্রন্থে ইলতুৎমিসের রাজ্যের আমীরগণের তালিকায় মালিক ইখতিয়ারউদ্দীন দৌলত শাহ্-ই-বল্‌কা ইবনে হুসামউদ্দীন আইয়াজ খালজীর নাম উল্লিখিত রহিয়াছে। ইহাতে অনুমিত হয় যে, মুদ্রার দৌলত শাহ্-বিন্-মৌদুদ ও তবকাৎ-ই-নাসীরীর ইখতিয়ারউদ্দীন দৌলত শাহ্-ই-বল্‌কা একই ব্যক্তি। দৌলত শাহের মুদ্রা ৬২৬ হিজরায় (১২২৪ খ্রীঃ) মুদ্রিত হইয়াছিল এবং এই জাতীয় একটিমাত্র মুদ্রাই এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ইখতিয়ারউদ্দীন বল্‌কা খালজীর পরিচয়

ইখতিয়ারউদ্দীন বল্‌কা খালজী দিল্লীর রাজকীয় সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া দিল্লীর পথে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ইখতিয়ারউদ্দীন দেড় বৎসরকাল বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ইলতুৎমিস ইহাতে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে তাঁহার প্রিয়পুত্র নাসীরউদ্দীনের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া 'দুর্ভাগ্যের দেশ' বঙ্গের প্রতি ইলতুৎমিস প্রথমে উদাসীনই ছিলেন। কিন্তু রাজার কর্তব্য অচিরেই পিতার শোকার্ত হৃদয়কে অতিক্রম করিয়া গেল। ৬২৮ হিজরার প্রারম্ভে (নভেম্বর, ১২৩০ খ্রীঃ) ইলতুৎমিস স্বয়ং লক্ষ্ণৌতি আক্রমণ করিলেন। ইখতিয়ারউদ্দীন দিল্লীর সুলতানকে প্রতিহত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি বন্দী হইলেন এবং তাঁহার শিরশ্ছেদ হইল। সেই বৎসরই বিহারের শাসনকর্তা আলাউদ্দীন জানীকে বঙ্গের এবং সাইফ-উদ্দীন আইবককে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া ইলতুৎমিস দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।[৫]

ইলতুৎমিসের লক্ষ্ণৌতি আক্রমণ

মালিক আলাউদ্দীন জানী

(৬২৭/১২২৯-৬২৮/১২৩০ খ্রীঃ)

আলাউদ্দীনের দেহে রাজরক্ত প্রবাহিত ছিল। তিনি ছিলেন তুর্কীস্থানের শাহজাদা। কিন্তু মোঙ্গল আক্রমণের ভয়ে তিনি ভারতবর্ষে পলায়ন করিয়াছিলেন। রাজপুত্রোচিত সকল গুণেরই তিনি অধিকারী ছিলেন এবং রাজরক্তের আভিজাত্য-বোধও তাঁহার মধ্যে ছিল। আলাউদ্দীন জানীই বঙ্গের প্রথম শাসক, যাঁহার

আলাউদ্দীনের পূর্ব পরিচয়

---

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. p. 617

২) *Ibid*, p. 626

৩) *Rias-us-Salatin*, Tr., p. 72

৪) Thomas, *Initial Coinage of Bengal*, Part II. p. 81, No. 18

৫) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr., Pp. 618-19

ধমনীতে রাজবংশের রক্তধারা প্রবাহিত ছিল। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই দিল্লীশ্বর ইল্‌তুৎমিস তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া মালিক সাইফউদ্দীন আইবককে বিহার হইতে বঙ্গদেশের শাসনকর্তৃপদে প্রেরণ করিলেন। আলাউদ্দীন জানীর পদচ্যুতির কারণ সম্বন্ধে সমসাময়িক ইতিহাস নীরব। সম্ভবতঃ দাস সুলতানের সঙ্গে রাজবংশের সন্তানের আভিজাত্যমূলক কোন ব্যাপারে মতান্তর হইয়াছিল। কারণ ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর আলাউদ্দীন জানীকে লাহোরের সামন্তরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। সুলতান রুক্‌নুদ্দীন এবং সুলতানা রাজিয়ার সময়ে এই আলাউদ্দীন জানীই সামন্ত বিদ্রোহ পরিচালনা করিয়াছিলেন। অবশেষে সুলতানা রাজিয়ার সময়ে তাঁহাকে নিহত করিয়া তাঁহার ছিন্নশির দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছিল (১২৩৭ খ্রীঃ)।[১] আলাউদ্দীন জানী সুলতান ইলতুৎমিস, রুক্‌নুদ্দীন ও সুলতানা রাজিয়ার বিরোধিতা করিয়াছিলেন—ইহার কারণ বোধ হয় আভিজাত্যের প্রতিযোগিতা।

আলাউদ্দীন জানীর পদচ্যুতি

মালিক সাইফউদ্দীন আইবক (৬২৮/১২৩০-৬৩৩/১২৩৫ খ্রীঃ)

সাইফউদ্দীন জন্মে ছিলেন তাতার বংশীয়। তাঁহার আকৃতি এবং প্রকৃতিতে তাঁহার বংশের প্রভাব পরিলক্ষিত হইত এবং স্বীয় যোগ্যতায় তিনি তাঁহার সমসাময়িক আমীরগণের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আইবক ছয় বৎসরকাল যোগ্যতার সহিত বঙ্গের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্‌ বা পূর্ব বাঙ্গলা অঞ্চলে অভিযান করিয়াছিলেন এবং বাঙ্‌ অঞ্চল হইতে আনীত বহু হস্তী দিল্লীতে ইলতুৎমিসের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন; এই হস্তী উপহার পাইয়া ইলতুৎমিস সাইফউদ্দীনকে "যুগানতাত" (প্রেরণকারী) উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সাইফউদ্দীন প্রাণত্যাগ করেন।[২] রিয়াজ-উস-সালাতীনের মতে তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।[৩] সাইফউদ্দীনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে বিশৃঙ্খলা ও অন্তর্বিদ্রোহ দেখা দেয়।

ইজ্জউদ্দীন তুঘরিল তুঘান খান (৬৩৩/১২৩৫-৬৪২/১২৪৪ খ্রীঃ)

সাইফউদ্দীনের মৃত্যুর পর আউর খান নামক একজন দুর্ধর্ষ মালিক লক্ষ্ণৌতি অধিকার করিলেন (৬৩০/১২৩৩-৬৩৩/১২৩৬ খ্রীঃ)। সম্ভবতঃ তিনি সাইফউদ্দীন আইবকের ক্রীতদাস বা মামলুক ছিলেন। কিন্তু বিহারের শাসনকর্তা তুঘান খান লক্ষ্ণৌতির অধিকার দাবি করিলেন। তিনি বিহার হইতে লক্ষ্ণৌতি অভিমুখে এক অভিযান পরিচালনা করিলেন। লক্ষ্ণৌতি ও বসনকোটের মধ্যবর্তী স্থানে দুই খানের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হইল। সংগ্রামের সময় তীরবিদ্ধ হইয়া আউর খান মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। নিহত আমীরের অনুচরগণ রাজধানী লক্ষ্ণৌতি পরিত্যাগ করিতে

লক্ষ্ণৌতির অধিকার লাভের জন্য আউর খান ও তুঘরিল তুঘান খানের মধ্যে সংঘর্ষ

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. p. 41
২) *ibid*, p. 732
৩) *Riyas-us-Salatin*, Tr. p. 77

বাধ্য হইল। তুঘরিল তুঘান খান বঙ্গের অধিপতি হইলেন—রাঢ়, বরেন্দ্রী তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। বিহার ও বঙ্গ একই শাসকের অধীনে আনীত হইল।

তুঘরিলের প্রথম জীবন

তুঘরিল তুঘান প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। ইলতুৎমিসের প্রাসাদে তাঁহার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে প্রথমে তিনি সুলতানের পানীয়-বিভাগের (সাকি-ই-খাস) এবং পরে লেখনী-বিভাগের (সার-ই-দোয়াতদার) তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। লেখনী-বিভাগে কার্য করিবার সময় সুলতানের একটি মূল্যবান মস্যাধার অপহৃত হয়। সেই অপরাধে তুঘরিল পদচ্যুত হইয়া রন্ধনশালার (চাস-নিগার) তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। অবশেষে তিনি পুনরায় প্রভুর কৃপা আকর্ষণ করেন এবং অশ্বশালার অধ্যক্ষ (আমীর-ই-আখোর) নিযুক্ত হন। তুঘরিলের স্নেহধন্য মীনহাজউদ্দীন সিরাজ লিখিয়াছেন,—তুঘরিল ঔদার্য, মহত্ত্ব এবং মানবোচিত বহু সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন; তাঁহার আকৃতিতে অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ছিল এবং ব্যবহারে তিনি মানুষের হৃদয় জয় করিতে পারিতেন।[১] ক্রমশঃ স্বীয় যোগ্যতাবলে তিনি বিহারের শাসনকর্তৃপদ অধিকার করেন। তারপর বঙ্গের শাসক সাইফউদ্দীনের মৃত্যুর পর আউর খানকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তিনি সম্মিলিত বঙ্গ-বিহারের শাসক-পদ লাভ করেন।

তুঘরিলের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা

আউর খানের সঙ্গে যুদ্ধে তুঘরিল তুঘান দিল্লীর সুলতানের অনুমতি বা সম্মতি লাভের অপেক্ষা করেন নাই। বাহুবলে বঙ্গ অধিকার করিলেও তিনি দিল্লীর বিরোধিতা করেন নাই, বরং দিল্লীর প্রাধান্য নামতঃ স্বীকার করিয়া তিনি স্বীয় শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ়ই করিয়াছিলেন। অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ সুলতানা রাজিয়া বেগম তুঘরিলকে একটি মনোরম রক্তবর্ণ রাজচ্ছত্র এবং রাজনিশান উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন।[২] দিল্লীর মসনদের সঙ্গে সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। মসনদের প্রতিই তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল, ব্যক্তির উপর নহে—এই নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি নয় বৎসরকাল দিল্লীর সুলতানগণের প্রিয়পাত্র ছিলেন। অথচ ১২৩৬ খ্রীঃ হইতে ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই নয় বৎসরে ছয় জন সুলতান—ইলতুৎমিস, রুক্‌নুউদ্দীন ফিরুজ, রাজিয়া বেগম, মুইজউদ্দীন বহরাম, আলাউদ্দীন মাসুদ ও নাসিরউদ্দীন মামুদ—দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। তুঘরিল প্রত্যেকের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া অভিনন্দন ও উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকের নামেই খুত্‌বা পাঠ করেন; ফলে কেহই তুঘরিলের উপর অসন্তুষ্ট হন নাই বা তাঁহাকে পদচ্যুত করেন নাই।

তুঘরিলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা

একদিকে তুঘরিল সুদূর দিল্লীর মসনদের স্তবস্তুতি করিতেন, অন্যদিকে বাঙ্গলার মসনদের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য দিল্লীর শাসনাধীন প্রদেশগুলিকে আঘাত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই বা কুণ্ঠিত হন নাই। এই বিষয়ে বহাউদ্দীন হিল্লাল ছিলেন তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা। হিল্লাল সম্ভবতঃ সিরিয়া দেশবাসী ছিলেন।

---

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. p. 736

২) *ibid*, p. 737

ঘিয়াসউদ্দীন আইয়াজ খালজীর মৃত্যুর পর হইতে বঙ্গের শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল—বঙ্গের শক্তিবৃদ্ধি ও সীমানা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং শক্তিশালী নৌবহর গঠন করিলেন। কিন্তু এই সেনাবাহিনী লইয়া তিনি দিল্লীর রাজশক্তিকে আঘাত করেন নাই—তিনি অযোধ্যা, কারা মাণিকপুর এবং গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলের অধিপতি তাঁহার সমগোত্রীয় মামলুক শাসকবর্গের বিরুদ্ধেই স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তুঘরিল তুঘান খান অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল সমগ্র পূর্ব ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার। কার্যসিদ্ধির পূর্বেই তিনি একটি গুরুগম্ভীর উপাধি গ্রহণ করেন এবং এই উপাধিই তাঁহার উচ্চাভিলাষ সূচিত করে। বিহারে আবিষ্কৃত একটি শিলালিপিতে উল্লিখিত আছে,—মুসলিম-ই-আলা (প্রধান মুসলিম) ঘিয়াস-উল-ইসলাম-ওয়া-উল্ মুসলেমাইন (ইসলাম ও মুসলমানের মুকুট) মুঘীশ-উল-মুলুক-ওয়া-উল-সালাতীন (সাম্রাজ্য ও সম্রাটের মুখ্য ব্যক্তি) আবুলফতেহ্ তুঘরিল উল-সালাতীন (সাম্রাজ্যের বীরোত্তমের জনক তুঘরিল)। এই অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাঁহাকে বিষম বিপদের আবর্তে টানিয়া আনিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত রাজ্যচ্যুত, দেশত্যাগী ও ভাগ্যহীন করিয়াছিল।

তুঘরিলের উপাধি

তুঘরিলের জীবনের প্রধান ঘটনাবলী

(১) সুলতানা রাজিয়ার বশ্যতা স্বীকার, ত্রিহুত আক্রমণ (১২৩৬ খ্রীঃ)।

(২) বিহারে নৌ-অভিযান (১২৪২ খ্রীঃ), মীনহাজ-উস-সিরাজের আতিথ্য গ্রহণ।

(৩) সুলতান আলাউদ্দীন মাসুদের প্রতিনিধির বঙ্গে (লক্ষ্মৌতিতে) আগমন এবং তুঘরিলের খিলাত লাভ (১২৪৩ খ্রীঃ)।

(৪) জাজনগরের অধিপতি প্রথম নরসিংহদেবের লক্ষ্মৌতি আক্রমণ, কাটাসিনের যুদ্ধ; নরসিংহদেবের লাখনোর বিজয়।

অযোধ্যার মালিক তামার খানের লক্ষ্মৌতি অভিযান; তুঘরিলের পলায়ন এবং দিল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ (১২৪৫ খ্রীঃ)।

(৫) সুলতান নাসিরউদ্দীন কর্তৃক তুঘরিলকে অযোধ্যার শাসনভার অর্পণ (১২৪৬ খ্রীঃ)।

(৬) তুঘরিলের অযোধ্যা প্রবেশ ও মৃত্যু (১২৪৭ খ্রীঃ)।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তুঘরিল ত্রিহুতের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। সম্পূর্ণ ত্রিহুত বিজিত না হইলেও তুঘরিল এই অভিযানে অগণিত ধনরত্ন লাভ করেন এবং এই অর্থদ্বারা তিনি সেনাবল ও নৌবল বৃদ্ধি করিয়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন।

ত্রিহুত অভিযান ও অগণিত ধনরত্ন লুণ্ঠ

১২৪২ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে তুঘরিল বিরাট অশ্বারোহী বাহিনী, অসংখ্য পদাতিক সৈন্য ও শক্তিশালী নৌবহর লইয়া কারার উদ্দেশ্যে অভিযান আরম্ভ করিলেন। বঙ্গের সেনাবাহিনী গঙ্গার তীর অনুসরণ করিয়া চলিল। তখন আলাউদ্দীন

কারা অভিযান

মাসুদ দিল্লীর সিংহাসনে। মাসুদ অত্যন্ত দুর্বলচিত্ত ক্ষীণশক্তি মানুষ ছিলেন, সুতরাং তুঘরিলের ভয়ের কারণ কিছু ছিল না। বিহারের পথে বঙ্গের সেনাবাহিনী পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইল এবং চুনার, বারাণসী ও প্রয়াগ পর্যন্ত কোন বাধা প্রাপ্ত হইল না। অবশেষে তুঘরিল গঙ্গানদীর পঁচিশ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত কারা প্রদেশের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসে মালিক ইখতিয়ার-উদ্দীন কারাকাশ খান কারা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তখনও কারায় আসিয়া উপস্থিত হন নাই বা কার্যভার গ্রহণ করেন নাই। তুঘরিল কারা প্রদেশের সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিয়া কিছুদিন তথায় অবস্থান করিলেন। এই স্থানেই ইতিহাসকার মীনহাজ-উস্-সিরাজ অযোধ্যা হইতে আসিয়া তুঘরিলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই স্থান হইতেই তুঘরিল তাঁহার দূত শর্ক-উল-মুলুক-উল আশারীকে বহু উপঢৌকনসহ দিল্লীর দরবারে প্রেরণ করেন।[১] কারণ অযোধ্যা ও বাঙ্গালা দুইটি প্রদেশই ছিল দিল্লীর অধীন। একই সুলতানের অধীন এক প্রদেশের শাসক অন্য প্রদেশ আক্রমণ করিলে বিদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত হইতেন, কাজেই দিল্লীর সুলতান কারাকাশ খানের পক্ষে সৈন্য প্রেরণ করিতেও পারিতেন। তুঘরিলের এই আচরণ তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

দিল্লীশ্বরের নিকট তুঘরিলের দূত প্রেরণ

দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন মাসুদ এই ব্যাপারে অদ্ভুত আচরণ করিলেন। তুঘরিলকে শাসন না করিয়া তিনি বরং তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন। তিনি তুঘরিলের দূত আল আশারীর সঙ্গে দিল্লী হইতে কাজী জালালউদ্দীন কাশানীকে দিল্লীর দূতরূপে বহুমূল্য খিলাত, রাজচ্ছত্র, রক্তবর্ণ চন্দ্রাতপ তুঘরিলের সম্মানার্থ লক্ষ্ণৌতিতে প্রেরণ করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে তুঘরিল তাঁহার বন্ধু বিখ্যাত মীনহাজ-উস-সিরাজকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্ণৌতি অভিমুখে যাত্রা করিলেন (৭ই জুন, ১২৪৩ খ্রীঃ)।[২] কারণ দিল্লীর সম্মানকে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত অভ্যর্থনা করিতে হইবে। ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অগস্ট লক্ষ্ণৌতিতে বিরাট উৎসব ও আড়ম্বরের মধ্যে বাঙ্গলার মালিক ইজউদ্দীন তুঘরিল তুঘান খান দিল্লীশ্বরের প্রেরিত খিলাত, রাজচ্ছত্র ও চন্দ্রাতপ গ্রহণ করিলেন। ইহাই তুঘরিল তুঘানের জীবনের সর্বোত্তম সম্মানের দিন।

দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন মাসুদের অদ্ভুত আচরণ

কিন্তু সূর্যোদয়ে শিশিরবিন্দুর মত অনতিকাল পরেই তুঘরিলের গৌরব ঝরিয়া পড়িল। তুঘরিলের অনুপস্থিতির সুযোগে উড়িষ্যার রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গভীমদেবের পুত্র রাজা প্রথম নরসিংহদেব তাঁহার বিরাট বাহিনী লইয়া ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চল আক্রমণ করিলেন (১২৪ খ্রীঃ)। খালজী প্রাধান্যের সময়ে এই অঞ্চল কখনও কখনও আক্রান্ত হইলেও ঘিয়াসউদ্দীন খালজীর মৃত্যুর পর (১২২৭ খ্রীঃ) এই অঞ্চলে মুসলিম পদার্পণ ঘটে নাই। সপ্তগ্রাম তখনও অবিজিত ছিল এবং নদীয়া অঞ্চল তখনও বহু স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন হিন্দু নরপতির অধীনে ছিল। এই হিন্দু নরপতিগণ যে উড়িষ্যার শক্তিশালী হিন্দুরাজাকে মুসলমানের বিরুদ্ধে

জাজনগরাধিপতি নরসিংহদেবের রাঢ় আক্রমণ

---

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 47

২) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. p. 763

সাহায্য করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। প্রথমেই নরসিংহদেব (১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ষার পূর্বে) লাখনোর অঞ্চল লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, তখন তুঘরিল দিল্লীর খিলাত ও খেতাব লইয়া উৎসবে মত্ত; রাজ্যের কোথায় যে কি ঘটিতেছে উহার সংবাদ কে লইবে!

কাটাসিনের যুদ্ধ

এক বৎসর পরে তুঘরিল (৬৪১/১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে) হিন্দু-আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বিধর্মী হিন্দুর বিরুদ্ধে পরিচালিত এই 'পবিত্র ধর্মযুদ্ধে' ইতিহাসবিদ মীনহাজ-উস-সিরাজ সানন্দে যোগদান করিয়াছিলেন। তুঘরিলের সেনাবাহিনী আইয়াজের নির্মিত প্রশস্ত রাজপথ অনুসরণ করিয়া লাখনোরে উপস্থিত হইল এবং অজয় ও দামোদর অতিক্রম করিয়া আরও দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রসর হইল। নরসিংহদেব সম্মুখ যুদ্ধ সঙ্গত বিবেচনা না করিয়া অতর্কিত আক্রমণের সুযোগের প্রতীক্ষায় বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাটাসিন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কাটাসিনের চতুষ্পার্শ্ব গভীর অরণ্য ও বেত্রবন-সমাকীর্ণ ছিল। উদ্দেশ্য—একবার শত্রুকে সেই অরণ্যে প্রলুব্ধ করিয়া আনিতে পারিলে অতি অল্পায়াসে এবং অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াই অতর্কিত আক্রমণে শত্রুকে নিঃশেষ করা যাইবে। কার্যতঃ তাহাই হইল। ৬৪১/১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল মুসলিম সৈন্য কাটাসিন দুর্গ আক্রমণ করিল এবং তুমুল সংগ্রামের পর দুইটি পরিখা অধিকার করিল। হিন্দু সৈন্য পলায়ন করিতে বাধ্য হইল কিন্তু তাহারা কতিপয় হস্তী পশ্চাতে ফেলিয়া গেল। তখন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়।

মুসলিমের পরাজয়

তুঘরিল সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইবার আদেশ দিলেন এবং হিন্দু সৈন্যের পরিত্যক্ত হস্তীগুলিকে যাহাতে কোন প্রকারে উত্যক্ত করা না হয় সেই নির্দেশও দিলেন। মুসলিম সৈন্যগণ খাদ্য প্রস্তুতে কিংবা ভোজনে রত ছিল, সেই অসতর্ক মুহূর্তে হিন্দুসৈন্য দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া প্রভাতে পরিত্যক্ত হস্তীগুলি অধিকারের চেষ্টা করিল এবং দুইশত পদাতিক ও পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সমন্বিত একটি ক্ষুদ্র বাহিনী বেত্রবনের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া মুসলিম সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিল। এই অতর্কিত আক্রমণে মুসলিম সৈন্য বিভ্রান্ত, বিমূঢ় ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। হিন্দু সৈন্য মুসলিম সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বহু সৈন্য বিধ্বস্ত করিল। এমন কি কাটাসিন দুর্গের সত্তর মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত লাখনোর দুর্গেও মুসলিমগণ হিন্দু সেনাকে বাধা প্রদান করিতে পারিল না। নরসিংহদেবের সমরকৌশলের নিকট তুঘরিলকে নতিস্বীকার করিতে হইল। উড়িষ্যাধিপতি মুসলিম সৈন্যের প্রত্যাবর্তন পথে বহুস্থানেই অতর্কিত আক্রমণের জন্য সেনাবাহিনী লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানের অপর কোন অংশেই মুসলিম সৈন্যকে এমন ভাবে পরাজয় স্বীকার করিতে হয় নাই। মীনহাজ দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—'মুসলিম সৈন্য নির্মূল হইল, বহু ধর্মযোদ্ধা স্বর্গলাভ করিল।' মীনহাজ অবশ্য কত মুসলিম সৈন্য নিহত হইয়াছিল তাহা উল্লেখ করেন নাই। তবে অতি অল্প-সংখ্যক সৈন্য যে রক্ষা পাইয়াছিল ইহা সুনিশ্চিত। কারণ লক্ষ্মৌতিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই তুঘরিল তাঁহার মন্ত্রী শরফ-উল-মুল্‌ক আশারী ও কাজী জালালউদ্দীন

মীনহাজের খেদোক্তি

কাসানিকে বহু উপঢৌকনসহ দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন এবং দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন মাসুদের নিকট সাহায্যের জন্য কাতর আবেদন করিলেন।

উড়িষ্যাধিপতি কর্তৃক লাখনোর বিজয়

তুঘরিল কর্তৃক দিল্লীশ্বরের সাহায্য লাভের এই প্রচেষ্টা সফল হইয়াছিল। সুলতান আলাউদ্দীন মাসুদ কারা মাণিকপুরের শাসনকর্তা কারাকাশ খান এবং অযোধ্যার শাসনকর্তা তামার খানকে জাজনগরের বিধর্মী হিন্দুগণকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য সম্মিলিত অভিযানের আদেশ প্রদান করিলেন। ইতিমধ্যে উড়িষ্যাধিপতি নরসিংহদেব লাখনোর অবরোধ করিয়া দুর্গাধিপতি ফকর উল-মুল্‌ক করিমউদ্দীনকে হত্যা করিলেন। প্রায় সমস্ত মুসলিম সৈন্য নিহত হইল। রাঢ় অঞ্চলে মুসলিম অধিকার নিশ্চিহ্ন হইল।

উড়িষ্যাধিপতি কর্তৃক বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ

পরবৎসর (১৪ই মার্চ, ৬৪২/১২৪৪ খ্রীঃ) উড়িষ্যাধিপতি বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করিলেন। উড়িষ্যাধিপতি বহুসংখ্যক পদাতিক ও রণহস্তিসহ মুসলিম রাজধানী লক্ষ্ণৌতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।[১] তুঘরিল তুঘান লক্ষ্ণৌতির প্রাচীরের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। লক্ষ্ণৌতি অবরুদ্ধ হইল। পরদিবস লক্ষ্ণৌতিতে সংবাদ পৌছিল যে, দিল্লীর সেনাবাহিনী আগত-প্রায়; সম্ভবতঃ দুর্গে অবরুদ্ধ মুসলিম সৈন্যদের উৎসাহিত করিবার জন্য এই সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল। অবশ্য দিল্লীর সেনাবাহিনী তখন গঙ্গার দক্ষিণ তীর অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতেছিল এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তাহারা লক্ষ্ণৌতি বা রাজমহল পাহাড়ের সন্নিকটে উপস্থিত হইল। হিন্দুসৈন্য এইবার ভীত হইয়া লক্ষ্ণৌতির অবরোধ পরিত্যাগ করিল।[২]

নরসিংহদেবের পরিচয়

৬৪২/১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গবংশীয় প্রথম নরসিংহদেব ছিলেন জাজনগর বা উড়িষ্যার অধিপতি।[৩] তাঁহার পৌত্র দ্বিতীয় নরসিংহদেবের (১২৯৬ খ্রীঃ) প্রদত্ত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, 'শুভ্র গঙ্গাপ্রবাহ রোদনপরায়ণা রাঢ় ও বরেন্দ্রীর যবনীগণের নয়নাঞ্জন ধৌতকারী অশ্রুজলের সহিত মিশ্রিত হইয়া এবং প্রথম নরসিংহদেবের অদ্ভুত কার্যকলাপ দর্শনে বিস্ময়ে নিস্তরঙ্গা হইয়া যমুনায় পরিণত হইয়াছিল।'[৪] এই অলংকারোক্তি হইতে জানা যায় যে, নরসিংহদেব রাঢ় ও বরেন্দ্রী আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গঙ্গবংশীয়গণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রথম নরসিংহদেবের পিতা দ্বিতীয় অনঙ্গভীমদেবের রাজত্বকালে মুসলিম সেনা সম্ভবতঃ ঘিয়াসউদ্দীন আইয়াজের অধীন জাজনগর আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়াছিল। চাটেশ্বরে আবিষ্কৃত অনঙ্গভীমদেবের শিলালিপিতে

---

১) *Tabqat-i-Nasiri*. Tr. p. 665

২) *ibid*, p. 740

৩) *JASB*, Old Serirs, Vol LXXII, Pt. 1, 1903, p. 120

৪) রাঢ়বরেন্দ্রযবনীনয়নাঞ্জনাশ্রুপূরেণ দূরবিনিবেশিত-কালিমশ্রীঃ
তদ্বিপ্রলম্ভকরণাদ্ভুতনিস্তরঙ্গা-গঙ্গাপি নূনমমুনা যমুনাধুনাভূৎ ॥
JASB, Old Series, Vol, LXV, Pt. 1, p. 232 (শ্লোক ৮৪)

উল্লিখিত আছে যে, অনঙ্গভীমদেবের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বিষ্ণু বিন্ধ্যপর্বতের পাদমূলে ভীমাতটে তুম্মাণ পৃথ্বীপতিকে পরাজিত করিয়া যবনসমরে অস্ত্র সঞ্চালন করিয়া বহু শত্রুসেনা বিনষ্ট করিয়াছিলেন।[১] তবকাৎ-ই-নাসিরী অনুসারে জাজনগরের সেনাপতির নাম "সাবন্তর",[২] ইহা সংস্কৃত "সামন্তরাজ" এবং উড়িয়া অপভ্রংশ "সান্ত্রা" শব্দের পারসিক অক্ষরে লিখিত রূপ।[৩] তবকাৎ-ই-নাসিরী অনুসারে এই "সাবন্তর" উড়িষ্যারাজের জামাতা ছিলেন।[৪] চাটেশ্বর শিলালিপিতে রাজমন্ত্রী বিষ্ণুর প্রশংসাসূচক শ্লোকাবলী দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে, তবকাৎ-ই-নাসিরীর "সাবন্তর" ও জাজনগরের রাজমন্ত্রী 'বিষ্ণু' অভিন্ন ব্যক্তি। কলিঙ্গের গঙ্গবংশীয় রাজগণ ছিলেন ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়কন্যার বিবাহ সম্ভবপর নহে। এই কারণে বসু মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে, ঘিয়াসউদ্দীন আইওয়াজের শাসনকালে রাঢ় ও বরেন্দ্রী অভিযানে দ্বিতীয় অনঙ্গভীমদেবের পুত্র প্রথম নরসিংহদেব তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। মীনহাজ ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে জামাতা আখ্যা দিয়াছেন।[৫]

জাজনগরের কীর্তি

জাজনগরের হিন্দু সৈন্য লক্ষ্ণৌতির অবরোধ পরিত্যাগ করিলেও মুসলিমের দুর্ভাগ্যের অবসান হইল না। মুসলিমগণ আত্মকলহে বিব্রত হইয়া পড়িল। সাইফ-উদ্দীন যুগানতাতের জামাতা অযোধ্যার মালিক কমরউদ্দীন তামার খান তুঘরিলকে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করিরার ষড়যন্ত্র করিলেন। তুঘরিলের দুর্দিনে তিনি লক্ষ্ণৌতি অবরোধ করিলেন। উভয় পক্ষে সংঘর্ষ চলিল। অবশেষে একদিন দুইজন আমীর পরস্পর সম্মুখীন হইলেন এবং প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন কাল পর্যন্ত যুদ্ধ চলিল। তুঘরিলের অধিকাংশ সৈন্য মধ্যাহ্নভোজনের নিমিত্ত নগরে প্রত্যাবর্তন করিল। তুঘরিল তুঘান খান স্বল্পমাত্র সৈন্য লইয়া নগরদ্বারের বাহিরে শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই স্বল্পসংখ্যক সেনাদলও অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। তামার খান এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দূতমুখে তুঘরিল খানের অসতর্ক অবস্থার সংবাদ পাইয়াই তামার খান তুঘরিলের শিবির আক্রমণ করিলেন। তুঘরিল কোনপ্রকারে লক্ষ্ণৌতি নগরে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন (৪ঠা মে, ৬৪২/১২৪৪ খ্রীঃ)।

তুঘরিল তুঘান ও তামার খানের যুদ্ধ

লক্ষ্ণৌতি নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তুঘরিল খান বন্ধু মীনহাজকে তামার খানের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য দৌত্য কার্যে নিয়োগ করিলেন। মীনহাজ-কৃত সন্ধিতে স্থির হইল যে, তুঘরিল তুঘান লক্ষ্ণৌতি ও বিহারের অধিকার তামার খানের হস্তে সমর্পণ করিবেন, পরিবর্তে তামার খান তাঁহাকে হস্তী, ধনরত্ন ও অনুচরবর্গসহ বিনা বাধায় দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিতে দিবেন। কারা মাণিকপুরের শাসনকর্তা

মীনহাজের মধ্যস্থতায় তুঘরিল ও তামার খানের মধ্যে সন্ধি

---

১) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, ষোড়শ ভাগ, ১৩৫-৩৬ পৃঃ।

২) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. p. 763,

৩) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, ষোড়শ ভাগ, ১৩১ পৃঃ।

৪) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. p. 763

৫) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, ষোড়শ ভাগ, ১৩২-৩৩ পৃঃ।

কারাকাশ খান ও মালিক তাজউদ্দীনের সেনাবাহিনী এবং মীনহাজ-উস্-সিরাজ তাঁহার অনুচর ও পরিবারবর্গসহ তুঘরিল তুঘানের সহিত দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন (১১ জুলাই, ৬৪২/১২৪৪ খ্রীঃ)।[১]

সুলতান নাসিরউদ্দীন কর্তৃক তুঘরিল তুঘান অযোধ্যার শাসক নিযুক্ত

দিল্লীর আলাউদ্দীন মাসুদ এত ক্ষীণশক্তি এবং দুর্বলচিত্ত ছিলেন যে, তুঘরিল খানের উপর তামার খানের অত্যাচারের কোন প্রতিবিধানই তিনি করিতে পারিলেন না। তুঘরিল তুঘানকে নিরুপায় হইয়া বৎসরাধিককাল নিশ্চেষ্ট থাকিতে হইল। পর বৎসর (১০ই জুন, ৬৪৩/১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) নাসিরউদ্দীন মামুদ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি তুঘরিল খানের পক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং তুঘরিল খানকে অযোধ্যা প্রদেশের (তামার খানের পূর্বশাসিত) শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন।[২] তুঘরিল খান অযোধ্যা প্রবেশের অল্পদিনের মধ্যেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন (৬৪৪/১২৪৬ খ্রীঃ, ৯ই মার্চ)। নিয়তির এমনই বিধান যে, লক্ষ্ণৌতিতে তামার খানও সেই দিবসই শত্রুর অনুগমন করিলেন—পরলোকে যদি শত্রুর সন্ধান পাওয়া যায়, হয় তো সেইখানেই প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন।

তুঘরিলের শাসনকালে মোঙ্গল আক্রমণ

তুঘরিল তুঘান খানের সহিত কলিঙ্গরাজের যুদ্ধ এবং জাজনগর বা কলিঙ্গ-সেনা কর্তৃক লক্ষ্ণৌতি অবরোধের কথা একমাত্র তবকাৎ-ই-নাসিরী ব্যতীত মুসলমান-রচিত অন্য কোন ইতিহাস গ্রন্থে নাই। বাদায়ুনী, নিজামউদ্দীন আহম্মদ, গোলাম হুসেন সলীম প্রমুখ বিখ্যাত ইতিহাস-রচয়িতৃগণের গ্রন্থে তুঘরিল তুঘান খানের শাসনকালে তিব্বত ও চীনদেশের পথে আগত মোঙ্গল সেনাকর্তৃক লক্ষ্ণৌতি আক্রমণের কাহিনীর বিবরণ দেখা যায়। মীনহাজ তুঘরিল তুঘান খানের সমসাময়িক ব্যক্তি। তিনি তুঘান খানের সঙ্গে জাজনগরের সীমান্তে গমন করিয়াছিলেন, লক্ষ্ণৌতি শাসনের শেষভাগে তিনি লক্ষ্ণৌতিতে অবস্থান করিয়াছিলেন, তামার খানের সহিত সন্ধিস্থাপনে মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে দিল্লীতেও তুঘরিলের অনুগমন করিয়াছিলেন। সুতরাং অন্যান্য ইতিহাস-লেখক অপেক্ষা তাঁহার উক্তিই অধিকতর মূল্যবান ও বিশ্বাসযোগ্য। তবকাৎ-ই-নাসিরীতে তুঘরিলের শাসনকালে মোঙ্গল সেনা কর্তৃক লক্ষ্ণৌতি আক্রমণের কথার উল্লেখ নাই। তারিখ-ই-মুবারক শাহী, রৌজাৎ-উস-স্বাফ প্রভৃতি গ্রন্থেও এই মোঙ্গল আক্রমণের কাহিনী নাই।[৩] স্টুয়ার্ট প্রণীত বাঙ্গলার ইতিহাসেও এই মোঙ্গল আক্রমণের কথা নাই।[৪] রিয়াজ-উস-সালাতীনে ভুল লিখিত আছে যে, ৬৪২/১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে চিঙ্গিজ খাঁর ত্রিশ সহস্র মোঙ্গলসেনা উত্তরের পর্বতমালা ভেদ করিয়া লক্ষ্ণৌতি আক্রমণ করিয়াছিল। ইজউদ্দী তুঘরিল দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন মাসুদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন

রিয়াজ-উস-সালাতীনে ভ্রমাত্মক উল্লেখ

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. Pp. 740-41
২) *ibid.*
৩) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. p. 665
৪) Stewart, *History of Bengal*, Pp. 61-62

আলাউদ্দীন তামার খান ও কারাবেগকে বহু সৈন্যসহ লক্ষ্ণৌতিতে প্রেরণ করিলেন। মোঙ্গলসেনা যুদ্ধ না করিয়াই পরাজয় স্বীকার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল। তবকাৎ-ই-আকবরী গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ইখতিয়ারউদ্দীন যে পথে তিব্বত ও চীন আক্রমণ করিয়াছিলেন, মোঙ্গলসেনা সেই পথেই লক্ষ্ণৌতিতে আগমন করিয়াছিল। সুলতান আলাউদ্দীন মাসুদ শাহ তামার খান এবং কারাবেগকে তুঘরিলের সাহায্যার্থে লক্ষ্ণৌতিতে প্রেরণ করিলে মোঙ্গলসেনা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল।[১] বাদায়ুনীর মুন্তাখাব-উৎ-তাওয়ারিখে এই একই কাহিনী পাওয়া যায়। তারিখ-ই-ফেরিস্তার গ্রন্থেও ভুল উল্লেখ আছে যে, চিঙ্গিজ খান ৬৪২/১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিশ সহস্র মোঙ্গল সেনাসহ হিমালয় অতিক্রম করিয়া লক্ষ্ণৌতি আক্রমণ করিয়াছিলেন। এলফিনস্টোনের ভারতবর্ষের ইতিহাসেও এই বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।[২] তবকাৎ-ই নাসিরী গ্রন্থের অনুবাদক তাঁহার গ্রন্থে এই সকল বিবরণের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন।[৩]

চিঙ্গিজের লক্ষ্ণৌতি আক্রমণ—কাহিনীমাত্র

কথিত আছে যে, ৬৪২/১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূমি বা বীরভূমের পশ্চিম দিকস্থ পার্বত্যজাতি (সাঁওতাল) বীরভূমির রাজধানী নগর বা লাখনোর নগর লুণ্ঠন করিয়াছিল।[৪] এই সময়েই রামচন্দ্র কবিভারতীর আবির্ভাব হইয়াছিল। রামচন্দ্র বরেন্দ্রীর অন্তর্গত বীরাবতী নগরীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি কাত্যায়ন গোত্রীয় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, ফলে আত্মীয়-পরিজন কর্তৃক উত্ত্যক্ত হইয়া সিংহলে গমন করেন। সেই সময়ে সিংহলের অধিপতি ছিলেন পরাক্রমবাহু। রামচন্দ্র 'ভক্তিশতক' ও 'বৃত্তমালা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি কেদারভট্ট প্রণীত বৃত্তরত্নাকর গ্রন্থের টীকাও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থে সমসাময়িক কালের ইতিহাসের খণ্ড উপাদান নিহিত রহিয়াছে।

পার্বত্যজাতি কর্তৃক লাখনোর লুণ্ঠন

তুঘরিল তুঘান খানের চরিত্র ও কৃতিত্ব: ক্রীতদাসরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া স্বীয় কৃতিত্বের বলে তুঘরিল তুঘান খান হিন্দুস্থানের সর্বোচ্চ কর্মচারীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। প্রথমে সুলতানের পানীয় বিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া স্তরে স্তরে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদলাভ তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ছিল অপরিসীম। কিন্তু কোথায় কোন্ স্তরে বিশ্রাম করিতে হইবে এবং কখন যাত্রারম্ভ করা উচিত, তাহা তুঘরিল স্থির করিতে পারেন নাই। অনুপাতজ্ঞান বা মাত্রাবোধ তাঁহার ছিল না। কখনও তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, কখনও তিনি অতি অর্বাচীনের মত কার্যও করিয়াছেন, আবার কখনও তিনি বিপরীত বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন। দিল্লীর প্রত্যেক সুলতানের বশ্যতা স্বীকার, ব্যক্তি অপেক্ষা সিংহাসনের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন তাঁহার

---

১) *Tabqat-i-Akbari*, Tr. B. De, p. 83

২) Elphinstone, *History of India*, 7th ed., p. 377

৩) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr., p. 665

৪) গৌড়ের ইতিহাস, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, ২য় খণ্ড, ২০ পৃঃ

রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচায়ক। আবার দিল্লীর সুলতানের অধীন প্রদেশ কারা, অযোধ্যা ও দোয়াব অঞ্চল আক্রমণের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধিই প্রবল ছিল। একদিকে দিল্লীর অধীন কারা প্রদেশের সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ, অপরদিকে দিল্লীর দরবারে দূত এবং উপঢৌকন প্রেরণ তাঁহার চাতুর্যেরই পরিচয় দেয়। অবশ্য সুলতান আলাউদ্দীন মাসুদ পরাক্রমশালী এবং আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব-বোধ সম্পন্ন হইলে তুঘরিলের এই চাতুর্যের প্রত্যুত্তর অন্যভাবে প্রদান করিতেন। সুদীর্ঘ উপাধির প্রতি তাঁহার অত্যন্ত মোহ ছিল এবং বাগদাদের খলিফার অনুকরণে তিনি অতি দীর্ঘ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তুঘরিলের চরিত্রে মাত্রাজ্ঞানের অভাব

তুঘরিল তুঘান যে সুদক্ষ ও সুচতুর সেনানায়ক ছিলেন তাহাও বলা যায় না। কারণ, উড়িষ্যাধিপতি নরসিংহদেব এবং তামার খানের কূটকৌশলের নিকট তাঁহাকে নতিস্বীকার করিতে হইয়াছিল। নরসিংহদেবের সহিত সংগ্রামে এত অধিকসংখ্যক মুসলিম সৈন্য নিহত হইয়াছিল যে, ইহার পূর্বে বঙ্গদেশে একসঙ্গে এত মুসলিম সৈন্য কখনো বিধ্বস্ত হয় নাই।

তুঘরিল প্রথম জীবনে তাঁহার সহকর্মী অযোধ্যার শাসক কারাকাশের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তাঁহাকে স্বীয় কর্মফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। তুঘরিল খানের দুর্দিনে তাঁহার সহকর্মী অযোধ্যা প্রদেশের শাসক তামার খান তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া লক্ষ্ণৌতি হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে ভগবানের ন্যায়দণ্ডের সূক্ষ্মবিচার। তাঁহার জীবনের উত্থান যেমন নাটকীয়, পতনও তেমনই নাটকীয় ভাবেই হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃতিও ছিল উদ্দাম ও চঞ্চল। তিনি নিজেও শান্তি ভোগ করিতে পারেন নাই এবং অন্যকেও শান্তি ভোগ করিতে দেন নাই।

তুঘরিল তুঘান গুণগ্রাহী ছিলেন বলিয়া মনে হয়; কারণ ইতিহাসকার মীনহাজ-উস-সিরাজ তাঁহার সভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। মীনহাজের মতে তুঘরিল বহুগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তুঘরিল দয়াবান ও দাতা ছিলেন। মানুষের হৃদয় জয় করিবার অদ্ভুত ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। অবশ্য এই সকল স্তুতি বন্ধুর পক্ষেই স্বাভাবিক।

তামারখান (১২৪৪-৪৬ খ্রীঃ) ও জালালউদ্দীন মাসুদ (১২৪৬-৫০ খ্রীঃ)

তামার খান প্রায় দুই বৎসর লক্ষ্ণৌতি শাসন করিয়াছিলেন (৬৪২/১২৪৪-৬৪৪/১২৪৬ খ্রীঃ)। তাঁহার দুর্বল রাজত্বকালে বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় না। অবশেষে আলাউদ্দীন জানীর পুত্র মালিক জালালউদ্দীন মাসুদ জানী বঙ্গের শাসক নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি প্রায় চারিবৎসর কাল বঙ্গদেশ শাসন করেন (৬৪৪/১২৪৬ খ্রীঃ মে,-৬৪৮/১২৫০ খ্রীঃ মার্চ) এবং 'মালিক-উস-শার্ক' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি 'শাহ' উপাধিও গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সুলতান নাসিরউদ্দীনের আনুগত্য তিনি অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার শাসনকালের একমাত্র নিদর্শন দেবকোটের নিকটবর্তী গঙ্গারামপুরের মসজিদের গাত্রে ক্ষোদিত লিপি।

তামার খান (১২৪৪-১২৪৬ খ্রীঃ) ও জালাল-উদ্দীন মাসুদ (১২৪৭-১২৫১ খ্রীঃ) বঙ্গের শাসনকর্তা

মালিক ইখতিয়ারউদ্দীন মুঘিসউদ্দীন উজবুক (৬৪৯/১২৫১—৬৫৪/১২৫৬ খ্রীঃ)
মালিক মুঘিসউদ্দীন উজবুক দিল্লীর নির্দেশানুসারে জালালউদ্দীন মাসুদ জানীর পরিবর্তে অযোধ্যা হইতে বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করেন (৬৫০/১২৫২ খ্রীঃ)। তাঁহার জীবন অতি বৈচিত্র্যময়। বিদ্রোহ করা ছিল তাঁহার স্বভাব। মুঘিসউদ্দীন বঙ্গের শাসনভার গ্রহণের পূর্বে সুলতান আলাউদ্দীন মাসুদের রাজত্বকালে বিদ্রোহ করিয়া বন্দী হইয়াছিলেন।[১] সুলতান নাসিরউদ্দীনের বিরুদ্ধেও তিনি দুইবার বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যেকবারই উলুঘ খানের (ভবিষ্যতে ঘিয়াসউদ্দীন বলবন) অনুগ্রহে মার্জনা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে অযোধ্যা প্রদেশের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[২]

মালিক মুঘিসউদ্দীন উজবুকের চারি বৎসরব্যাপী শাসনকাল নানা ঘাত-প্রতিঘাত, জয়-পরাজয় ও আশা-নিরাশার বৈচিত্র্যময় কাহিনীতে পূর্ণ।

৬৫০/১২৫২ খ্রীঃ—রাঢ়ের প্রথম অভিযান ও পরাজয়।

৬৫২/১২৫৪ খ্রীঃ—রাঢ়ের দ্বিতীয় অভিযান ও মদারণ বিজয়, দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সুলতান উপাধি গ্রহণ।

৬৫৩/১২৫৫ খ্রীঃ—কামরূপ অভিযান ও মৃত্যু।

মুঘিসউদ্দীন উজবুকের রাঢ় অভিযান ও পরাজয়

মীনহাজ বলেন যে, মালিক মুঘিসউদ্দীন ছিলেন স্বভাবতঃই উদ্দাম এবং চঞ্চল প্রকৃতির। কিন্তু তিনি সুদক্ষ সৈনিক এবং সুশাসক ছিলেন।

৬৫০/১২৫২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের শাসনভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই মালিক মুঘিসউদ্দীন উজবুক বরেন্দ্রীতে তাঁহার শাসন ও শক্তি সংহত করিলেন এবং উড়িষ্যায় মুসলিম পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়াই রাঢ় অভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করিলেন। এই সময়ে উড়িষ্যার অধিকার বঙ্গদেশে হুগলী জেলার পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল এবং উড়িষ্যাধিপতি নরসিংহ-দেবের জামাতা এই স্থানের সামন্ত নরপতি ছিলেন (মীনহাজ উল্লিখিত 'সাবন্তর' এবং উড়িয়া 'সান্ত্রী')। তাঁহার রাজধানী ছিল মদারণে (মীনহাজ-উক্ত উমারদন)।[৩]

রাঢ়ের দ্বিতীয় অভিযান ও মদারণ অধিকার

উভয়পক্ষে তিনটি যুদ্ধ হইল। শেষযুদ্ধে মালিক মুঘিসউদ্দীন পরাজিত হইলেন। হস্তি-সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার মত কৌশল তাঁহার জানা ছিল না বলিয়াই তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন। সম্মুখ যুদ্ধে হস্তীর শক্তি প্রভূত, কিন্তু দ্রুত আক্রমণ বা ক্ষেত্র পরিবর্তনে হস্তী অসুবিধাজনক।

মালিক মুঘিসউদ্দীন উড়িষ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধে দিল্লীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, দিল্লীতে তখন অন্তর্বিপ্লব চলিতেছিল; সুতরাং দিল্লী হইতে সাহায্য প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা ছিল না। মুঘিসউদ্দীন স্বীয় সেনাদল সুসংবদ্ধ করিলেন এবং শক্তি

---

১) *Tabqat-i-Nasiri.* Tr, p. 762

২) *ibid*

৩) *Hi tory of Bengal,* Dacca University, Vol. II, p. 51

সঞ্চয় করিয়া দুই বৎসর পরে পুনরায় রাঢ় আক্রমণ করিলেন (৬৫২/১২৫৪ খ্রীঃ নভেম্বর-ডিসেম্বর)। তিনি পূর্ব অভিজ্ঞতার বলে উড়িষ্যার প্রবল হস্তি-বাহিনীর সহিত সম্মুখ যুদ্ধ পরিহার করিলেন এবং দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনী লইয়া শ্লথগতি হিন্দু পদাতিক বাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে মালিক মুঘিসউদ্দীন বিজয়ী হইলেন—রাজধানী মদারণ বিজিত হইল, সামন্তরাজ পরাজিত হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। রাজধানীর বনজ সম্পদ সকলই তাঁহার হস্তগত হইল।[১] মুঘিসউদ্দীন সমগ্র নদীয়া অঞ্চল অধিকার করিলেন। নদীয়া দ্বিতীয়বার মুসলিম কর্তৃক বিজিত হইল। এই বিজয়ই মালিক মুঘিসউদ্দীনের সর্বপ্রধান সামরিক বিজয়।

বিজয়ের আনন্দে ও গর্বে মালিক মুঘিসউদ্দীনের হৃদয়ে এক নূতন আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হইল—দিল্লীর প্রভাবমুক্ত হইতে হইবে, সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে হইবে। ইচ্ছা-মাত্রই কর্ম—মুঘিসউদ্দীন সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। মুঘিসউদ্দীন লক্ষ্ণৌতির মুদ্রাশালা হইতে স্বীয় নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচার করিলেন। তিনি সুলতান **মুঘিসউদ্দীন আল্ দুনিয়া ওয়া আলাউদ্দীন আবুল মুজাফর উজবুক আস্ সুলতান** উপাধি গ্রহণ করিলেন—মুঘিসউদ্দীন স্বাধীন সুলতান হইলেন।

মুঘিসউদ্দীনের রাজ-উপাধি

দিল্লীর দরবার তখন আত্মকলহ, বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্তর্বিদ্রোহে অত্যন্ত বিপর্যস্ত। মালিক মুঘিসউদ্দীন কেন্দ্রীয় রাজদরবারের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিলেন। তিনি অযোধ্যা আক্রমণ করিয়া সগৌরবে অযোধ্যা নগরে প্রবেশ করিলেন এবং স্বীয় নামে খুতবা পাঠ করিলেন। এইবার মালিক মুঘিসউদ্দীন বঙ্গ, বিহার ও অযোধ্যার স্বাধীন সুলতান হইয়াছেন; আয়তনে তাঁহার রাজ্য দিল্লী-সুলতানের রাজ্যের সমান। তিনি ভাবিলেন তাঁহার সৈন্য অপরাজেয়; কারণ তিনি উড়িষ্যার অপরাজেয় বাহিনীকে পরাজিত করিয়াছেন, পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিয়াছে। সুতরাং তিনটি প্রদেশ বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ তিনি ত্রিবর্ণ চন্দ্রাতপ ব্যবহার করিলেন—রক্ত, শ্বেত এবং কৃষ্ণ। লক্ষ্ণৌতির মসজিদে তাঁহার নামে খুতবা পঠিত হইল, তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হইল।

মালিক মুঘিসউদ্দীনের অযোধ্যা অধিকার

মালিক মুঘিসউদ্দীনের ক্ষমতাকে খর্ব করিবার কোন প্রচেষ্টাই দিল্লীর সুলতানগণ করিলেন না। এই নীরবতায় উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হইয়া সুলতান উজবুক আসাম বিজয়ের পরিকল্পনা করিলেন (৬৫৪/১২৫৬ খ্রীঃ)। তখনও আসাম ছিল লক্ষ্ণৌতির মুসলিম শাসকবর্গের নিকট অজ্ঞাত দেশতুল্য।[২] বঙ্গের উচ্চাভিলাষী মালিকগণ মধ্যে মধ্যে আসামের সীমান্তে অভিযান প্রেরণ করিলেও আসামের রাজপ্রাসাদ তখনও মুসলিম পতাকাশোভিত হয় নাই। আসাম বঙ্গের পূর্ব সীমান্তবর্তী প্রদেশ। করতোয়া বা মীনহাজ-উক্ত বাগমতী নদী উভয় রাজ্যের সীমা রচনা করিয়া

মুঘিসউদ্দীনের আসাম অভিযান

---

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr., p. 63

২) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 53

প্রবাহিত হইত। বাগমতী নদী ছিল বিস্তারে গঙ্গা নদীর প্রায় তিনগুণ। এই বাগমতী নদীর তীরেই অবস্থিত ছিল প্রাচীন মর্দন (বর্ধন) বা পুণ্ড্রবর্ধন নগরী। বর্তমান মহাস্থানগড় প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আজিও বিদ্যমান।[১]

ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আসামে দ্রুত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবর্তন চলিতেছিল। আসামের পার্বত্য জাতিগুলি ছিল মোঙ্গল বংশীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী কিংবা প্রকৃতি-পূজক; ব্রাহ্মণ্যধর্ম আসামে তখনও সম্পূর্ণ প্রসারলাভ করে নাই। বন, পর্বত ও নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন বলিয়া আসাম ছিল প্রাচীন গ্রীসের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। মুঘিসউদ্দীনের আসাম-অভিযানকালেও তথায় কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। কোচবিহার, কামরূপ এবং গোয়ালপাড়া অঞ্চলে যে সকল বারভুঁইঞা রাজত্ব করিতেন, তাঁহারা একপ্রকার সামন্ততন্ত্র (Confederacy) রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যিনি শক্তিশালী হইতেন অন্য সকলে তাঁহারই নির্দেশ শিরোধার্য করিতেন। আসামের ইতিহাসের এই তমসাচ্ছন্ন যুগেই আসামের কোচবংশীয় বীর হাজোর আবির্ভাব হয় এবং তাঁহারই নামানুসারে কামরূপ অঞ্চল কোচ-হাজো বলিয়া আখ্যায়িত হয়। কোচ-হাজো, কুচবিহার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক অঞ্চল। কামরূপ জেলার একটি পরগণা আজও 'হাজো' নামে পরিচিত। হাজো পরাক্রমশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ঘোড়াঘাট ব্যতীত সমগ্র রংপুর জেলা কামরূপ বা গৌহাটীর শাসনাধীনে আনয়ন করেন।[২] আরও পূর্বদিকে ছিল আহোম বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুখফার (১২২৮-১২৬৮ খ্রীঃ) রাজ্য। এই সমগ্র অঞ্চলকেই মুসলিমগণ কামরূপ নামে অভিহিত করিত।

সমসাময়িক আসামের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতি

সুলতান মুঘিসউদ্দীন ঘোড়াঘাটের নিকট করতোয়া নদী অতিক্রম করিলেন এবং বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর তীর অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। মুসলিমগণ বিনাবাধায় কামরূপের রাজধানীতে উপস্থিত হইল। কামরূপ-রাজ সসৈন্যে এবং সপরিবারে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। কামরূপরাজ বিনা প্রতিরোধে কেন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার কোন কারণ কোন ইতিহাসে উল্লিখিত হয় নাই। সম্ভবতঃ কামরূপরাজ ধারণা করিয়াছিলেন যে, মুসলিমগণ লুণ্ঠন উদ্দেশ্যেই আসিয়াছে এবং লুণ্ঠন শেষেই তাহারা স্বরাজ্যে প্রস্থান করিবে। কাজেই যুদ্ধ করিয়া অনর্থক লোকক্ষয় তিনি সমীচীন বা প্রয়োজন বিবেচনা করেন নাই। তিনি সুলতান মুঘিসউদ্দীনকে বার্ষিক কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কামরূপরাজ প্রতি বৎসর মুঘিসউদ্দীনের নিকট সুবর্ণ ও হস্তী প্রেরণ করিতে এবং তাঁহার নামে খুতবাপাঠ এবং মুদ্রাঙ্কনের প্রতিশ্রুতিও দিলেন। সুবর্ণ ও শস্যের জন্য আসাম প্রদেশের খ্যাতি ছিল। মুঘিসউদ্দীন কামরূপের রাজধানী লুণ্ঠন করিয়া এত ধনসম্পদ লাভ করিয়াছিলেন যে, কামরূপ রাজ্য বিজয় ও সমগ্র রাজ্যের ধনসম্পদ লাভের প্রলোভন তিনি পরিত্যাগ

সুলতান মুঘিসউদ্দীন কর্তৃক বিনা বাধায় কামরূপের রাজধানী অধিকার ও লুণ্ঠন

---

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 53

২) Martin, *Eastern India*, Vol. III, p. 418

করিতে পারিলেন না। তিনি সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্তে বিধাতাপুরুষ অলক্ষ্যে হাস্য করিলেন।

আসাম-বিপর্যয়

সুলতান মুঘিসউদ্দীন কামরূপেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কামরূপের রাজধানী মুসলিম নগরীতে পরিণত হইল। তখন বসন্তকাল চলিতেছিল। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন বর্ষাকাল পর্যন্ত কামরূপের রাজধানীতেই অবস্থান করিবেন। আনন্দোৎসবে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, ভবিষ্যতের কোন চিন্তা নাই। সুলতান মুঘিসউদ্দীন আসামের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ অবগত ছিলেন না; তিনি সেনাবাহিনী কিংবা যুদ্ধাশ্বগুলির জন্য খাদ্য সংগ্রহ বা সঞ্চয়ের কোন ব্যবস্থাই করিলেন না। কামরূপরাজের কিন্তু বিশ্রাম নাই—তিনি দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন। তাঁহারই নির্দেশে বণিকগণ ছদ্মবেশে কামরূপের রাজধানী ও রাজধানীর সন্নিকটবর্তী অঞ্চলের সকল প্রকার খাদ্যসম্ভার ক্রয় করিয়া দূরবর্তী অঞ্চলে প্রেরণ করিলেন। বণিকগণ এত সংগোপনে এবং সন্তর্পণে কার্য সমাধা করিলেন যে, নগরস্থিত মুসলিমগণের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের উদ্রেক হইল না। পার্বত্য নদীগুলির ধারাপথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল—যাহাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে সমগ্র অঞ্চল প্লাবিত করিয়া মুসলিম সৈন্যের অগ্রগতি কিংবা অনুসরণ প্রতিরোধ করা যায়।[১] কামরূপরাজ শত্রু-শিবিরে খাদ্যাভাব ও বর্ষার আগমনের জন্য ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। আসামের বর্ষার ভয়ংকরী প্রকৃতির সঙ্গে সুলতান মুঘিসউদ্দীনের তখনও সম্যক পরিচয় হয় নাই।

কামরূপরাজের রণকৌশল

বর্ষা আসিল, সমস্ত দেশ জলে পূর্ণ হইয়া গেল। নৌকা ভিন্ন যানবাহন নাই; কিন্তু সেই সকল যানবাহনও স্থানীয় লোকের অধিকারে। রাজার ইঙ্গিতে স্থানীয় লোকেরা নৌকায় যাতায়াত প্রায় বন্ধ করিয়া দিল; নগরে খাদ্য সরবরাহও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অচিরে মুসলিম শিবিরে ভীষণ খাদ্যাভাব উপস্থিত হইল—প্রত্যাবর্তনের পথ নাই। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হিন্দুগণ এইবার চতুর্দিক হইতে মুসলিম সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করিল; চতুর্দিক হইতে বিষপূর্ণ তীর বর্ষিত হইতে লাগিল। আকাশ হইতে অবিশ্রাম বারিবর্ষণ হইতেছে; সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্ব-দেশে সমুদ্রোপম জলরাশি; চতুর্দিকে বুভুক্ষুর আর্তনাদ—অশ্বের তৃণ নাই, সৈন্যগণের খাদ্য নাই।

মুঘিসউদ্দীন নিজের নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিলেন—তিনি পশুর তৃণ বা সৈন্যের খাদ্য সংগ্রহ করেন নাই। কিন্তু এখন তিনি সম্পূর্ণ নিরুপায়; সন্ধির প্রস্তাব করিবার মত সাহসও তাঁহার নাই। লক্ষ্মণাবতীতে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত তাঁহার গত্যন্তর নাই। কারণ, এই স্থানে এইভাবে আরও কতিপয় দিবস অবস্থান করিতে হইলেই অনশনে ও শত্রুর হস্তে মৃত্যু অনিবার্য। সুলতান মুঘিসউদ্দীন কোন উপায়ে একজন স্থানীয় লোককে পথপ্রদর্শকরূপে সংগ্রহ করিলেন এবং তাঁহারই সাহায্যে পার্বত্য

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 54

উপত্যকা অতিক্রম করিয়া কুচবিহারের মধ্য দিয়া দেবকোট অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সদাসতর্ক অহমিয়া সৈন্যগণ সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল, মুঘিসউদ্দীনের যাত্রার প্রারম্ভে তাহারা সুলতানকে কোনপ্রকার বাধাপ্রদান করিল না। মুসলিম সেনাবাহিনী অল্পপরিসর এক গিরিবর্ত্মে উপস্থিত হইল। এইবার হিন্দু সৈন্যগণ চতুর্দিক হইতে তীরবর্ষণ আরম্ভ করিল; মুসলিম সৈন্য প্রমাদ গণিল। মুঘিসউদ্দীন কাপুরুষ ছিলেন না; তিনি সমস্ত অসুবিধার মধ্যেও হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সংগ্রাম পরিচালনা করিতে লাগিলেন; অকস্মাৎ তীরবিদ্ধ হইয়া তিনি ভূতলে পতিত হইলেন; মুসলিম সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করিল। সুলতান মুঘিসউদ্দীন সসৈন্যে সপরিবারে কামরূপরাজের হস্তে বন্দী হইলেন। আহত বন্দী সুলতান তাঁহার বিজেতার নিকট শেষ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন—"আমি জীবনের এই শেষ মুহূর্তে একবার পুত্রমুখ দর্শন করিতে বাসনা করি।" পুত্র পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে আনীত হইল। মৃত্যুপথযাত্রী পিতা পুত্রের কপোলে কপোল ন্যস্ত করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।[১] নিষ্করুণ মৃত্যুর এই করুণ স্মৃতি সুলতান মুঘিসউদ্দীনের জীবনের বহু নির্মম ঘটনাকে এক অপরূপ করুণ স্পর্শ দান করিল।

সুলতান মুঘিসউদ্দীন বন্দী

মুঘিসউদ্দীনের মৃত্যু

সুলতান মুঘিসউদ্দীন উজবুকের চরিত্র ও কৃতিত্বঃ মালিক ইখতিয়ার-উদ্দীন মুঘিসউদ্দীন উজবুক ছিলেন উজবুক জাতির সন্তান—বীরযোদ্ধা, কৌশলী সেনাপতি। উচ্চকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁহার জীবনের কর্মপ্রেরণার উৎস। উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া তিনি তিনবার দিল্লীর বিরোধিতা করিয়াছিলেন। প্রথমবার রাঢ়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও তিনি দুই বৎসর ধৈর্যসহকারে সুযোগের অপেক্ষা করিয়া-ছিলেন। পরাজয়কে তিনি কখনও চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। যুদ্ধ-কৌশল পরিবর্তিত করিয়া তিনি উড়িষ্যার বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করিয়াছিলেন। আসাম আক্রমণ মুঘিসউদ্দীনের উচ্চাকাঙ্ক্ষারই পরিণতি মাত্র।

মুঘিসউদ্দীন সুকৌশলী যোদ্ধা ছিলেন। মদারণ বিজয় এবং আসাম অভিযানে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সেনানায়কের কার্যে ভীরুতা প্রদর্শন করেন নাই। তবে আসামের যুদ্ধে পূর্বাহ্নে খাদ্য সংগ্রহ না করিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, ঐ ভুলের পরিণতিতে তাঁহার জীবননাশ হইয়াছিল, অসংখ্য মুসলিম সৈন্যও ধ্বংস হইয়াছিল।

সুলতান মুঘিসউদ্দীনের প্রধান দোষ ছিল হঠকারিতা। অযোধ্যা আক্রমণে তাঁহার হঠকারিতা প্রকাশ পাইয়াছে। আলাউদ্দীন মাসুদ না হইয়া বলবনের মত শক্তিশালী সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলেই মুঘিসউদ্দীনের এই হঠকারিতার প্রতিবিধান হইত। দিল্লীর বিরুদ্ধে বারংবার যুদ্ধ ঘোষণা এবং আসাম-রাজের বশ্যতা স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যানও তাঁহার হঠকারিতারই পরিচায়ক। দেহের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি বুদ্ধিকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। এই জন্যই উজবুক শব্দটি 'বুদ্ধিহীন শক্তিমান' অর্থে বাঙ্গলা দেশে ব্যবহৃত হয়।

হঠকারী মুঘিসউদ্দীন

---

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr. pp. 763-66

সুলতান মুঘিসউদ্দীন কিন্তু কোমলহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন—পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট মমতা ছিল। তিনি সন্তানবৎসল পিতা ছিলেন—মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার একমাত্র শেষ কামনা ছিল পুত্রমুখ দর্শন। সে আকাঙ্ক্ষা আহোমরাজ সুকাফা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

সুলতান মুঘিসউদ্দীনের রাজ্যসীমা

আসামে প্রথম ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তোলনের কৃতিত্ব কিন্তু সুলতান মুঘিসউদ্দীনেরই প্রাপ্য। তিনি রাঢ় অঞ্চলে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। তিনিই বঙ্গের মুসলিম রাজ্য দক্ষিণে নবদ্বীপ হইতে উত্তরে বর্ধন-কোট পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন এবং এই বিজয়কাহিনীর স্মরণার্থে বিজিত স্থানদ্বয়ের নাম সম্বলিত নূতন মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন।[১] তাঁহার আসাম বিপর্যয় কোচ, মেচ প্রভৃতি পার্বত্য মোঙ্গলীয় জাতিগুলির মনে আত্মবিশ্বাস আনিয়া দিয়াছিল; 'তুর্ক সেনাবাহিনী অপরাজেয়'—এই ভীতি তাহাদের দূর হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে রাজনৈতিক শক্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভের প্রেরণা জাগিয়াছিল এবং পরবর্তী তিনশত বৎসরের ইতিহাসে এই পার্বত্য জাতির জাগরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং বঙ্গদেশের মধ্যযুগীয় ইতিহাসকে ইহা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

জালালউদ্দীন মাসুদ জানী (৬৫৫/১২৫৭ খ্রীঃ)

কামরূপে সুলতান মুঘিসউদ্দীন উজবুকের শোচনীয় মৃত্যুর (আঃ ৬৫৪/১২৫৬ খ্রীঃ জুলাই) সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশ পুনরায় সুলতান নাসিরউদ্দীনের বশ্যতা স্বীকার করিল। জালালউদ্দীন মাসুদ জানী লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন এবং সুলতান নাসিরউদ্দীনের নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত হইল।[২] জালালউদ্দীন মাসুদ জানী বৎসরাধিককাল লক্ষ্ণৌতি শাসন করেন। ৬৫৫/১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে হস্তী ও ধনরত্ন উপঢৌকনস্বরূপে প্রেরিত হয়।[৩] ৬৫৫/১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই জালাল-উদ্দীন মাসুদ জানী পদচ্যুত হইয়াছিলেন। কারণ, উক্ত বৎসরে তাজউদ্দীন আরসালান খান যখন লক্ষ্ণৌতি আক্রমণ করেন, তখন ইজউদ্দীন বলবন উজবুকই লক্ষ্ণৌতির শাসক।[৪] ইজউদ্দীন বলবন উজবুক অকস্মাৎ লক্ষ্ণৌতি আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিলেন। ইজউদ্দীন দিল্লীর সম্মতির অপেক্ষা রাখেন নাই। পরে অবশ্য নাসিরউদ্দীন মামুদ শাহ মাসুদ জানীকে পুনরায় নিয়োগপত্র প্রদান করেন। কিন্তু উলুঘ খানের প্ররোচনায় তাঁহার নিয়োগপত্র প্রত্যাহার করা হয়। কারণ, মাসুদ জানী দিল্লীর ষড়যন্ত্রে উলুঘ খান বা বলবনের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

দিল্লীর বিরোধিতা

মালিক ইজউদ্দীন বলবন উজবুক (৬৫৫/১২৫৭-৬৫৬/১২৫৮ খ্রীঃ)

ইজউদ্দীন বলবন ছিলেন একজন উজবুক মালিক। প্রথমে ৬৫১/১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নায়েব আমীর-উল-মুসলিম (আমীর পরিষদের সহকারী) পদে কার্য করিতেন। ইজউদ্দীন বলবন মাসুদ জানীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুঘিসউদ্দীনের

১) *Catalogue of coins in the Indian museum*—Cal. Vol. II Part II, p. 146, No. 6
২) *Tabqat-i-Nasiri*, p. 712
৩) *ibid*. p. 713
৪) *ibid*. p. 769

মৃত্যুর পর স্বীয় বাহুবলে তিনি শ্বশুরকে পরাজিত করিয়া লক্ষ্ণৌতির সিংহাসন অধিকার করেন এবং প্রায় দুই বৎসরকাল বঙ্গদেশ শাসন করেন। তিনি দিল্লীর সহিত বিশেষ সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, তবে তাঁহার মুদ্রায় সুলতান নাসীরউদ্দীনের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ৬৫৭/১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দিল্লীতে দুইটি হস্তী ও মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেন। প্রতিদানে দিল্লী হইতে তাঁহাকে খিলাত্ ও বাঙ্গলার মালিকরূপে স্বীকৃতিপত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সুলতান নাসীরউদ্দীন ছয় মাস পরেই মালিক মাসুদ জানীকে দ্বিতীয়বার বঙ্গের শাসনকর্তৃপদে নিয়োগপত্র প্রদান করিলেন। উলুঘ খান বলবন এই নিয়োগের বিরোধিতা করেন। ফলে জামাতা ইজউদ্দীনই বঙ্গের শাসনকর্তৃপদে অধিষ্ঠিত রহিলেন।

মালিক ইজউদ্দীন বলবন সৈন্যসামন্ত লইয়া ৬৫৭/১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বাঙ্' প্রদেশে অভিযান করেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে কারা প্রদেশের শাসনকর্তা মালিক তাজউদ্দীন আরসালান খান অরক্ষিত লক্ষ্ণৌতি নগর আক্রমণ করেন। ইজউদ্দীনের অনুপস্থিতিতে নগরবাসিগণ তিনদিন পর্যন্ত আরসালান খানকে প্রতিরোধ করেন। রাজধানী আক্রমণের সংবাদে ইজউদ্দীন দ্রুত প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন।[১] আরসালান খান লক্ষ্ণৌতির শাসক নিযুক্ত হইলেন। নাগরিকদের প্রতিরোধের শাস্তিস্বরূপ সমস্ত নগর লুণ্ঠিত হইল; হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে নাগরিকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল।

বাঙ্ অভিযান

শাসকের অনুপস্থিতিতে প্রজাবর্গের এই প্রতিরোধ বাঙ্গলার ইতিহাসে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিত করিল। হিন্দু ও মুসলিমগণ সম্মিলিতভাবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিল। ইহার পূর্বে হিন্দুগণ মুসলিমদের আত্মকলহে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই।

মালিক তাজউদ্দীন আরসালান খান (৬৫৭/১২৫৮-৬৬৩/১২৬৪ খ্রীঃ)

তাজউদ্দীন আরসালান খান দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে ইলতুৎমিসের ক্রীতদাস ছিলেন এবং তাঁহার সময় হইতেই রাজপ্রাসাদের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি সুলতান ইলতুৎমিসের জামাদার (পরিচ্ছদ-রক্ষক) পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং বায়েনার মালিক বাহাউদ্দীন তুঘরিলের কন্যাকে বিবাহ করিয়া সম্ভ্রান্ত বংশের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলেন। মীনহাজের উক্তি অনুসারে আরসালান খান ষড়যন্ত্রপ্রিয়, কুচক্রী ও উচ্চাভিলাষী বীর যোদ্ধা ছিলেন। উদ্দামতা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই সকল গুণে তিনি ছিলেন মালিক মাসুদ জানীর সমপ্রায়। তিনি মাসুদ জানী ও কিসলু খানের সহযোগে বলবনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন (৬৫৫/১২৫৭ খ্রীঃ) এবং কারা, কনৌজ ও অযোধ্যা অঞ্চলে বহুবার লুণ্ঠনাভিযান প্রেরণ করেন। পরিশেষে দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করায় ৬৫৭/১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে বলবনের অনুগ্রহে তিনি কারা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত

আরসালানের প্রারম্ভ জীবন

১) *Tabqat-i-Nasiri*, Tr., Pp. 769-70

হন। কিন্তু কারার শাসনকর্তৃ পদ তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারিল না। বঙ্গের সিংহাসন তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতেছিল এবং বঙ্গের স্বাধীন সুলতান পদ লাভই তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল। সুতরাং তিনি বঙ্গের রাজনৈতিক ও আভ্যন্তরীণ, সকল বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবহিত ছিলেন। অবশেষে বঙ্গের শাসক ইজউদ্দীন বলবনের অনুপস্থিতির সুযোগে তিনি বঙ্গবিজয়ে যাত্রা করেন। তিনি একটি অপরিচিত পথেই বঙ্গের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন—তাঁহার আচরণে ও কথাবার্তায় মনে হইল, সম্ভবতঃ কালঞ্জরই তাঁহার অভিযানের লক্ষ্য। এই ভাবেই তিনি বঙ্গের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বঙ্গের শাসক ইজউদ্দীন বলবন উজবুককে পরাজিত ও নিহত করিয়া লক্ষ্ণৌতি, তথা বঙ্গ বিজয় করিলেন (৬৫৭/১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস)। কারা অঞ্চল পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল। ৬৬৩/১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বিহার-বঙ্গের স্বাধীন নরপতিরূপে বঙ্গদেশেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাজউদ্দীন আরসালান খানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তাতার খান বঙ্গের সুলতান পদ লাভ করিলেন[১] এবং দুই বৎসর পরে ৬৬৫/১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পিতার কবরের উপরে একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করিলেন।

আরসালানের বঙ্গবিজয়

এই স্থানেই তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে (১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং নাসিরীর সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে লিখিত বঙ্গের ইতিহাসেরও সমাপ্তি ঘটিয়াছে। কারণ পরবর্তী ইতিহাসকার জিয়াউদ্দীন বারানীর আবির্ভাব তখনও হয় নাই। তাজউদ্দীন আরসালান খানের রাজত্বকালের কোন মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয় নাই; ফলে তাঁহার বঙ্গদেশ শাসন কিংবা দিল্লীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধের কোন ইতিহাসই জানা যায় না। অবশ্য বিহারের বারদারী অনুলিপি বা অনুশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি সুলতান উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বাধীন সুলতানরূপেই বঙ্গ-বিহার শাসন করিয়াছিলেন।[২]

তাতার খান (৬৬৩/১২৬৪-৬৬৬/১২৬৭ খ্রীঃ)

পিতার সিংহাসনে পুত্রের নির্বিরোধে আরোহণ তুর্ক-আফগান যুগে একটা অস্বাভাবিক ও আশ্চর্যজনক ব্যাপার। তাতার খান পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন—কোন বিদ্রোহ হইল না, ভ্রাতৃযুদ্ধও হইল না, বহিরাক্রমণও হয় নাই। তাতার খান সুলতান নাসীরউদ্দীনের বশ্যতামূলক কোন কার্যও করেন নাই। কিন্তু ৬৬৪/১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বলবন দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিলে তাতার খান তাঁহার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বহুমূল্য উপঢৌকন দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। এই উপহারের মধ্যে ছিল বঙ্গের বিখ্যাত করিযূথ—সংখ্যায় তেষট্টি। দিল্লীতে এই উপঢৌকন ও প্রতিনিধি প্রেরণ তাতার খানের গভীর কূটনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক। সুদূর বঙ্গদেশ হইতে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও হস্তিযূথ উপহারে বলবন তৃপ্তিলাভ করিলেন;[৩] তার

তাতার খানের কূটনীতি

১) *Riyaz-us-Salatin*, Tr., p. 78

২) *History of Bengal*, Dacca University, Vol II., p. 56, F. N. 2

৩) Elliot, *History of India*, Vol. III, p. 103

উপর তাতার খান বলবনের বন্ধু আরসালান খানের পুত্র। বলবনের চেষ্টাতেই আরসালান খান কারা প্রদেশের শাসনভার লাভ করিয়াছিলেন এবং মাসুদ জানীর প্রতিযোগিতা নিরঙ্কুশ করিয়াছিলেন। প্রতিদানে সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন বলবনও তাতার খানের প্রতিনিধির সম্মানের জন্য বিরাট রাজকীয় অভ্যর্থনার আয়োজন করিলেন। বহুমূল্য উপহার বঙ্গদেশে প্রেরিত হইল।[১]

তাতার খানের কৃতিত্ব

রিয়াজ-উস-সালাতীন প্রণেতা সলিম গোলাম হুসেন বলেন, তাতার খানের শাসনে বঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহার সাহস, বীরত্ব, সততা এবং দানশীলতা তাঁহাকে সর্বজনপ্রিয় করিয়াছিল। সম্ভবতঃ তাতার খান স্বাধীন সুলতানরূপেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাতার খানের রাজত্বকাল সঠিক নির্ণয় করা যায় না। রিয়াজ-উস-সালাতীনের বিবরণ অনুসারে বলবনের আদেশে তাতার খান পদচ্যুত হইয়াছিলেন।

শেরখান (৬৬৬/১২৬৭-৬৭০/১২৭১ খ্রীঃ)

তাতার খানের মৃত্যুর পর আরসালান খানের বংশীয় আমীর শের খান বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি কিন্তু দিল্লীর সুলতান কর্তৃক বঙ্গের শাসক নিযুক্ত হন নাই। শেরখান ইলতুৎমিসের দাসচক্রের অন্যতম সভ্য ছিলেন। তিনি ৬৪৮/১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভাতিন্দার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ভাতিন্দার বিখ্যাত দুর্গ তিনি নির্মাণ করান। সুলতান নাসীরউদ্দীন ৬৫১/১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বলবনের বিরুদ্ধদলের প্রচেষ্টায় আরসালান খানকে তাঁহার স্থলে অভিষিক্ত করিলে শেরখান ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া তুর্কীস্থানে গমন করেন। শেরখান যে কখন হিন্দুস্থানে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন তাহার সঠিক কোন বিবরণ নাই। তবে তাতার খানের মৃত্যুর পর তিনি বঙ্গের শাসনকর্তৃপদ লাভ করেন। বারানী বলেন, শেরখানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।[২]

আমীন খান (৬৭০/১২৭১-৬৭৩/১২৭৪ খ্রীঃ)

আমীন খানের বিদ্রোহী মনোভাব

আমীন খান ছিলেন দিল্লীর আমীরদের মধ্যে অন্যতম এবং তিনি ছিলেন অযোধ্যা প্রদেশের শাসনকর্তা। বিগত কয়েক বৎসর পর্যন্ত দিল্লীর সাধারণ নিয়ম অনুসারে অযোধ্যার শাসনকর্তাই বঙ্গের শাসনকর্তৃপদে উন্নীত হইতেছিলেন। সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। বঙ্গের ঘটনাবলী বা রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সুতরাং তিনি বঙ্গের শাসনকর্তাকে অধিকতর শক্তিশালী করা সমীচীন বিবেচনা করেন নাই। অযোধ্যা, কারা, বিহার এবং বঙ্গদেশ একই শাসনকর্তার অধীনে থাকায় শাসনকর্তা নিজেকে দিল্লীশ্বরের সমকক্ষ শক্তিমান বলিয়া গর্ব অনুভব করিতেন। ফলে দিল্লীর

১) *Twarikh-i-Firuzshahi*, Text. 53 *Tabqat-i-Akbari*, Text, 40
Riyas-us-Salatin, Tr, 78

২) Elliot, *History of India*, Vol. III, p. 103

বিরুদ্ধে বাঙ্গলার শাসনকর্তা প্রায়ই বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন। ইহা যেন একটি সাধারণ নিয়মে পর্যবসিত হইয়াছিল। সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন বলবনের জীবনে এইরূপ একাধিক বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা ছিল। সুতরাং তিনি বঙ্গের শাসনকর্তার সঙ্গে একজন সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুলতান বলবনের নামাঙ্কিত ৬৬৭/১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রা হইতে অনুমিত হয় যে, আমীন খানের সহকর্মী হিসাবে বঙ্গের দ্বিতীয় শাসক নিযুক্ত হইয়াছিলেন তুঘরিল খান। দুইজন শাসক নিয়োগের ব্যবস্থা বাহিরের দিক হইতে সুচিন্তিত মনে হইলেও তুঘরিল খান স্বীয় ক্ষমতাগুণে শীঘ্রই আমীন খানের শক্তিকে অতিক্রম করিলেন এবং সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন বলবনের অসুস্থতার সংবাদে উৎসাহিত হইয়া তিনি আমীন খানকে পরাজিত করিয়া বঙ্গের একাধিপত্য লাভ করিলেন[১]। তুঘরিল স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং 'মুঘিসউদ্দীন' উপাধি গ্রহণ করিলেন[২]। তারিখ-ই-ফিরুজশাহীগ্রন্থ প্রণেতা জিয়াউদ্দীন বারানীর পিতামহ বলবনের বিরুদ্ধে তুঘরিলের বিদ্রোহ দমনার্থ লক্ষ্ণৌতিতে আগমন করিয়াছিলেন[৩]। কিন্তু বারানীর গ্রন্থে আমীন খানের অধীনে তুঘরিলের কার্য গ্রহণ কিংবা তুঘরিল কর্তৃক আমীন খানের পরাজয় সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই।

বলবনের সাফল্য

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পূর্ববঙ্গে সেনরাজশক্তি স্তিমিতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। পশ্চিমদিক হইতে মুসলিম এবং দক্ষিণদিক হইতে জলপথে মগ আক্রমণে সেনরাজ্য বিপর্যস্ত হয়। তদ্ব্যতীত চন্দ্রদ্বীপে (বর্তমান বাখরগঞ্জ অঞ্চল) দনুজমাধব দশরথদেবের আবির্ভাবেও সেনশক্তি ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছিল।

সুলতান মুঘিসউদ্দীন তুঘরিল (৬৬৭/১২৬৮-৬৮০/১২৮১ খ্রীঃ)

তুঘরিলের প্রথম জীবন

তুঘরিল খান প্রথম জীবনে ছিলেন ক্রীতদাস। বহু প্রভুর সেবা করিয়া তিনি উলুঘ খান বলবনের প্রসাদলাভ করিলেন। পরিচয় দিবার মতন কোন বংশগত আভিজাত্য তাঁহার ছিল না। প্রথম হইতেই কার্যগুণে তিনি উলুঘ খান বলবনের প্রিয়পাত্র ও স্নেহভাজন ছিলেন। উলুঘ খান বলবন তাঁহার শৌর্য, সাহস ও বুদ্ধির উপর আস্থাবান ছিলেন, নতুবা আমীন খানের সঙ্গে তাঁহাকে সহকারী শাসকরূপে নিযুক্ত করিতেন না।

বাঙ্গলার বিদ্রোহ-প্রবণতা

বাঙ্গলার জলবায়ুতে একটা বিদ্রোহের ইঙ্গিত রহিয়াছে; বাঙ্গলার আকাশে-বাতাসে বিদ্রোহের সুর ভাসিয়া বেড়ায়। দিল্লীর নিকট বাঙ্গলা চিরকাল একটা সমস্যা। দিল্লী হইতে বাঙ্গলার ভৌগোলিক দূরত্ব, নদনদী সমাকুল পথ, বাঙ্গলার ঘন বর্ষা, বাঙ্গলার হস্তী-সৈন্য, বাঙ্গলার মশক, বাঙ্গলার ম্যালেরিয়া চিরদিন দিল্লীর সুলতানদিগকে বিব্রত করিয়াছে। বিদ্রোহ ছিল বাঙ্গলার একটি সংক্রামক ব্যাধি।

---

১) *Muntakhab-ut-Tawarikh*, Vol. I, p. 190

২) Elliot, *History of India* Vol. III, p. 113

৩) *ibid.* p. 115

তুঘরিল খানকে বাঙ্গলার সহকারী শাসকরূপে নিযুক্ত করার মূলে ছিল বাঙ্গলার বিদ্রোহের সম্ভাবনা হ্রাস করার প্রয়াস। সেই উদ্দেশ্যে সুলতান বলবন বিহার প্রদেশে একটি স্বতন্ত্র শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে বঙ্গের বিদ্রোহে বিহার যোগদান করে নাই।[১]

বলবন কর্তৃক বঙ্গের বিদ্রোহ হ্রাসের প্রচেষ্টা

সুলতান বলবন অযোধ্যার শাসক আমীন খানকে বঙ্গের শাসক নিযুক্ত করিলেও অধিকাংশ ক্ষমতা স্বাভাবিক নিয়মেই তুঘরিল খানের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন; কারণ তুঘরিল ছিলেন প্রভুভক্ত, বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান। সুলতান বলবনের জ্ঞাতসারেই তুঘরিল খান প্রতিদিন তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতেছিলেন। এই ক্ষমতাবৃদ্ধিতে সুলতান বলবন ক্ষুণ্ণ হন নাই; কারণ তুঘরিলের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শাসনকর্তা আমীন খানের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ক্ষীণতর হইতেছিল। এই বিষয়ে সুলতান বলবনের পরোক্ষ সহানুভূতি ছিল। তুঘরিল খান সুলতান বলবনের চিন্তা ও কর্মধারার সুযোগ গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

তুঘরিলের শক্তিবৃদ্ধি

তুঘরিল শক্তিবৃদ্ধি ও অধিকার বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রথমেই পূর্বাঞ্চলের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। সেনরাজশক্তির ক্ষীণ আলোকরশ্মি তখনও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে রেখাসম্পাত করিতেছিল। তথায় তখন একটি নূতন রাজশক্তির বিকাশ হইতেছিল। দনুজমাধব রায় বাখরগঞ্জ এবং ঢাকা অঞ্চলে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার শক্তিকেন্দ্র ছিল ঢাকা জিলার অন্তর্গত সোনারগাঁয়ে। তুঘরিল দনুজমাধবের রাজ্যসীমার অদূরে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিলেন। এই দুর্গটি নারকিল্লা দুর্গ বা তুঘরিলেব দুর্গ নামে পরিচিত। বর্তমান ঢাকা হইতে পঁচিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত বিখ্যাত ফিরিঙ্গি দুর্গ লরিকোলের সঙ্গে নারকিল্লা দুর্গ অভিন্ন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। পদ্মানদীর অপর তীরে দুর্গের স্থান নির্বাচনের মধ্যে তাঁহার দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমতঃ এই স্থান দিল্লীর সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং দিল্লীর সৈন্য কর্তৃক ঐ স্থান আক্রমণের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প। দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ জয় করিতে হইলে সেই অঞ্চলে শক্তিকেন্দ্র-স্থাপন সৈন্যচালনার পক্ষে সুবিধাজনক এবং তৃতীয়তঃ দনুজমাধবের ক্রমবর্ধমান হিন্দুশক্তির বিরুদ্ধে একটি সহজ বাধা সৃষ্টি করা সহজ। তুঘরিল লরিকোল বা নারকিল্লা পর্যন্ত পদ্মানদীর উভয়তীরস্থ অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন এবং এই নবনির্মিত দুর্গেই তাঁহার ধনসম্পদ, পরিবার-পরিজন ও রাজবন্দীদের রাখিয়াছিলেন। বারানী তাঁহার ইতিহাসে এই স্থানকে "বাঙ্গলার অঞ্চল" (আরস-ই-বাঙ্গালা) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'দিয়ার-ই-বাঙ্গালা' বা বঙ্গের একটা বৃহৎ অংশ তখনও স্বাধীন ছিল। বারানীর গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, তুঘরিলের নিকট হইতে বলবন আরস-ই-বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন[২] এবং পুত্র বুঘরা খানকে দিয়ার-ই-বাঙ্গালা বিজয় করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

তুঘরিল খানের অধিকার বিস্তার—পদ্মানদীর উভয়তীরস্থ অঞ্চল অধিকার

তুঘরিলের দূরদর্শিতা

---

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 58

২) Barani, *Twarikh-i-Firusshahi*, Text, p. 93

ত্রিপুরা অভিযান

নারকিল্লা দুর্গ হইতে পূর্ব বাঙ্গলায় প্রবেশ সহজ ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যে তখন সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ চলিতেছিল। ত্রিপুরার অধিপতি ছিলেন রাজা-ফা (ফা বা ফয়া শব্দের অর্থ বৌদ্ধভিক্ষু)। রাজা-ফা-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রতন-ফা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন লাভ করিতে মনস্থ করিলেন এবং তুঘরিলের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তুঘরিল ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করিয়া রতন-ফাকে সিংহাসন লাভে সহায়তা করিলেন। প্রতিদানে রতন-ফা তুঘরিলকে একটি বিরাট বহুমূল্য 'মাণিক্য' উপহার দিলেন। কিংবদন্তি আছে যে, সেই মাণিক্যের সম্মানে তুঘরিল রতন-ফাকে 'মাণিক্য' উপাধি প্রদান করিলেন। সেই অবধি ত্রিপুরা-রাজপরিবারের উপাধি—'মাণিক্য বাহাদুর'। রতন-ফা-ই ত্রিপুরা-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

দনুজমাধব রায়

একদিকে ত্রিপুরা রাজ্য এবং অন্যদিকে মুসলিম আক্রমণের সম্ভাবনায় দনুজমাধব বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতাগুণে দনুজমাধব স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন। তুঘরিল সোনারগাঁও অধিকার করিয়াছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। বারানীর গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, বলবন পূর্ববঙ্গের কোন হিন্দুশক্তিকে পরাজিত করেন নাই; সুতরাং ইহা হইতেই অনুমিত হয় যে, দনুজ রায় এবং মুসলিম ইতিহাসকার বর্ণিত 'সোনারগাঁয়ের রায়' একই ব্যক্তি এবং তিনি চন্দ্রদ্বীপ বা বর্তমান বাখরগঞ্জ অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি তুঘরিলের শত্রু দিল্লীশ্বর বলবনের সহিত যোগদান করিয়া শক্তিসাম্য অব্যাহত রাখেন এবং পরবর্তী কালে বলবনকে তুঘরিলের পরাজয়ে ও নারকিল্লা দুর্গবিজয়ে সহায়তা করেন। তুঘরিলও অবশ্য ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া দনুজমাধবের বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

জাজনগর লুণ্ঠন

তুঘরিল পূর্ব বাঙ্গলার শক্তির বিরুদ্ধে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়া পশ্চিমে রাঢ় অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করিলেন এবং জাজনগরেও অভিযান করিলেন। জাজনগর রাজ্যের সীমা তখন উত্তরে ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল হইতে ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং বর্তমান বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও হুগলী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। জাজনগর লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন ও হস্তী তুঘরিলের হস্তগত হইল।[১]

দিল্লীর সহিত সংঘর্ষের সূত্রপাত

ইসলামের নিয়ম অনুসারে বিধর্মীর নিকট হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও মুহম্মদের নামে উৎসর্গ করা বিধিসম্মত। আল্লাহকে সম্মুখে পাওয়া যায় না; মুহম্মদ বহুকাল মৃত; তাঁহার স্থলে খলিফা অভিষিক্ত। সুতরাং খলিফার প্রতিনিধিরূপে লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ দিল্লীর সুলতানের প্রাপ্য। দিল্লীর সুলতানগণ চিরকাল এই অংশ দাবী করিয়াছেন এবং লাভও করিয়াছেন। তুঘরিল দিল্লীতে সুলতান বলবনের নিকট লুণ্ঠিত সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ প্রেরণ করেন নাই। অথচ সুলতান বলবন গুপ্তচরের মুখে শুনিতেছেন—প্রতিদিন লক্ষ্ণৌতিতে

---

১) Elliot, *History of India*, Vol. III, p. 18

জাজনগরের লুণ্ঠিত ধনরত্ন বিতরণ করা হইতেছে। তাঁহার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইল—সন্দেহের মেঘ ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল।

এই ঘটনাই বলবনের বিরুদ্ধে তুঘরিলের প্রথম বিদ্রোহের কারণ। এই সময়ে পুনঃ পুনঃ মোঙ্গল আক্রমণ স্থলতান বলবনের রাজত্বকে বিব্রত করিয়াছিল; তিনি একবারও পূর্বদিকে মনঃসংযোগের অবসর পান নাই। ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে বলবন লাহোর অভিযান করিয়াছিলেন; তাঁহাকে দুই বৎসর সসৈন্যে লাহোরে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তথায় স্থলতান বলবন অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং বহুদিন পর্যন্ত রাজদরবারে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সেই যুগে স্থলতানগণ প্রত্যহ দরবারে উপস্থিত হইয়া দর্শন দিতেন। রাজদর্শন করিয়া জনগণের বিশ্বাস হইত যে, রাজা জীবিত আছেন। ইহাতে ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা হ্রাস পাইত। স্থলতান বলবনের রাজধানীতে অনুপস্থিতির স্থযোগে নানাপ্রকার জনশ্রুতি প্রচারিত হইল। স্থলতানের অসুস্থতার সংবাদ ক্রমে মৃত্যুসংবাদে পরিণত হইল; স্থদূর বঙ্গদেশে প্রচারিত হইল যে, স্থলতান বলবন মৃত।[১]

স্থলতান বলবনের মৃত্যু সম্পর্কে জনশ্রুতি

স্থলতান বলবনের মৃত্যুর জনশ্রুতিতে তুঘরিল দিল্লীশ্বরের অধীনতাপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত মনে করিলেন এবং আমীন খানের সহিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল। লক্ষ্মৌতির বহির্ভাগে এক যুদ্ধে আমীন খান পরাজিত ও নিহত হইলেন (৬৭৪/১২৭৫ খ্রীঃ)। স্থলতান বলবন সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া তাঁহার অসুস্থতার সময়ে সংঘটিত তুঘরিলের কার্যাবলীকে লঘু করিবার জন্য দূতমুখে স্বীয় আরোগ্য সংবাদ বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন এবং তুঘরিলকে দিল্লীশ্বরের রোগমুক্তি উপলক্ষে উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে নির্দেশ দিলেন।[২] তুঘরিল স্থলতান বলবনের কূটনীতির উদ্দেশ্য অনুমান করিলেন। যদি তুঘরিল দিল্লীর স্থলতানের নির্দেশ অনুযায়ী উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন, উহা দ্বারা বশ্যতা স্বীকৃত হইত, না করিলে বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ পাইত। তুঘরিল এই নির্দেশের উত্তর প্রদান না করিয়া স্বয়ং 'মুঘিসউদ্দীন' উপাধি গ্রহণ করিলেন, স্বীয় নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করিলেন, নিজ নামে খুত্‌বা পাঠ করিলেন এবং প্রকাশ্যে বঙ্গের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। স্থলতান বলবন তাঁহার প্রিয় সামন্তের এই বিদ্রোহ ঘোষণায় ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অযোধ্যার শাসনকর্তাকে বাঙ্গলা আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন।

স্থলতান বলবন তখন প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ, রুগ্ন—তুঘরিল প্রৌঢ় ও শারীরিক শক্তিসম্পন্ন। বলবন কয়েক বৎসর ক্রমাগত মোঙ্গল যুদ্ধে বিব্রত—এই যুদ্ধে বলবনের বহু সৈন্য ও অর্থ ক্ষয় হইয়াছিল। অপরপক্ষে তুঘরিল তখন ত্রিপুরা রাজ্য জয় করিয়াছেন, জাজনগর লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন লাভ করিয়াছেন। তুঘরিলের রাজকোষ তখন পরিপূর্ণ—ধনবল ও জনবল দুই-ই যথেষ্ট। বলবনকে প্রজাবর্গ ভয় করিত, তুঘরিলকে প্রজাবর্গ ভালবাসিত। বলবনের বিরাগভাজনদের প্রতি

স্থলতান বলবন ও তুঘরিলের শক্তির তুলনা

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 60

২) *Twarikh-i-Mubarakshahi*, Text, Pp. 30-31

নিষ্ঠুরতার জন্য দিল্লীবাসীদের একটা আতঙ্ক ছিল। শত্রুর প্রতি সুলতান বলবন নির্মম ছিলেন; তুঘরিল ত্রিপুরা জয় করিয়া রাজভ্রাতার হস্তেই রাজ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং জাজনগরের লুণ্ঠিত দ্রব্যের অনেকাংশ লক্ষ্ণৌতির অধিবাসীদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি ছিলেন জনপ্রিয়। বলবনের অত্যাচারে বহু দরবেশ দিল্লী হইতে লক্ষ্ণৌতিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুঘরিল এই দরবেশদিগকে জাজনগরের লুণ্ঠিত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ দান করিয়া আল্লাহর নামে উৎসর্গের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে—তুঘরিল লক্ষ্ণৌতির অধিবাসীদের মধ্যে পাঁচমণ স্বর্ণ বিতরণ করিয়াছিলেন।[১] সুতরাং তুঘরিল উলেমাবৃন্দের সহানুভূতিও লাভ করিয়াছিলেন। এই স্বর্ণ দ্বারা সুফীগণ স্বর্ণবলয় নির্মাণ করিয়া পরিধান করিতেন। জাজনগর ও ত্রিপুরায় প্রাপ্ত অর্থসম্পদে লক্ষ্ণৌতির শক্তি-প্রতিপত্তি তখন দিল্লীর সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। বহু শান্তিপ্রিয় মুসলিম তখন মোঙ্গল আক্রমণস্থল হইতে সুদূরে বঙ্গদেশে বাস করা নিরাপদ মনে করিয়াছিলেন।

তুঘরিলের জনপ্রিয়তা

সৈন্যসংখ্যা তুঘরিলের বেশী ছিল এবং সৈন্য-ব্যবস্থাও সুষ্ঠু ছিল। তুঘরিলের নিজস্ব সেনাবাহিনী ছিল। সুলতান বলবন তাঁহার অধীন প্রাদেশিক জাবিতান, ইক্তাদার ও জায়গীরদারদের উপর নির্ভর করিতেন। তাহার উপর পঞ্জাব সীমান্ত রক্ষার জন্যও দিল্লীর সুলতান বলবনকে পুত্র শাহজাদা মুহম্মদ ও কোতোয়াল ফকরউদ্দীনের অধীনে সৈন্য-ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। দিল্লীর সুলতানের দায়িত্ব ছিল চতুর্দিক্ব্যাপী; সুদূর সীমান্ত রক্ষা তাঁহার ভীষণ সমস্যা ছিল। কিন্তু বাঙ্গলার সুলতানের সেই সমস্যা ছিল না। তাঁহার রাজ্যের সীমান্তে প্রকৃতিই তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিল। দিল্লী হইতে বঙ্গের ভৌগোলিক দূরত্বও তুঘরিলের পক্ষে অনুকূল ছিল। তুঘরিল বাঙ্গলাদেশের প্রতি গ্রাম ও পথের সহিত পরিচিত ছিলেন, কিন্তু দিল্লীর সৈন্যদের নিকট বঙ্গদেশ ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। নিজের দেশে, পরিচিত পরিবেশে যুদ্ধ করা অনেক সহজ। সর্বোপরি বঙ্গের প্রজাবৃন্দ হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে তুঘরিলের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। সুতরাং বলবনকে বঙ্গের যুদ্ধে চারিবার পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

তুঘরিলের রাজ্যরক্ষা-ব্যবস্থা

হিন্দু-মুসলিম প্রজাবৃন্দ কর্তৃক তুঘরিলের পক্ষ সমর্থন

তুঘরিলের সহিত সুলতান বলবনের পাঁচটি যুদ্ধ—

প্রথম যুদ্ধ—আমীর বা আমীন খান বনাম তুঘরিল (৬৭৬/১২৭৭ খ্রীঃ)।
দ্বিতীয় যুদ্ধ—তুরমতি খান বনাম তুঘরিল (৬৭৭/১২৭৮ খ্রীঃ)।
তৃতীয় যুদ্ধ—শিহাবউদ্দীন (বাহাদুর) বনাম তুঘরিল (৬৭৭/১২৭৮ খ্রীঃ)।
চতুর্থ যুদ্ধ—বলবন বনাম তুঘরিল (৬৭৯/১২৮০ খ্রীঃ)।
পঞ্চম যুদ্ধ—বলবন বনাম তুঘরিল (৬৮০/১২৮১ খ্রীঃ)।

প্রথম যুদ্ধঃ তুঘরিল কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদে সুলতান বলবনের আহারনিদ্রা ঘুচিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ আমীর খান আবতাগীন নামক একজন বৃদ্ধ

প্রথম যুদ্ধ (৬৭৬/১২৭৭ খ্রীঃ)

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 61

ক্রীতদাসকে তুঘরিলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।[১] ফেরিস্তার বিবরণ অনুসারে জানা যায়, প্রিয় আমীর তুঘরিলের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ বলবন অযোধ্যার শাসনকর্তা আমীন খানকে অবিলম্বে বঙ্গদেশ আক্রমণের আদেশ দিয়াছিলেন। ফেরিস্তা বলেন, আমীন খান এই অভিযান উপলক্ষে লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[২] ক্রীতদাস আমীর খান অপেক্ষা অযোধ্যার শাসক আমীন খানেরই তুঘরিলের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা ছিল, কারণ দিল্লীর সুলতানের নিজস্ব সৈন্যসংখ্যা অধিক ছিল না এবং তখনকার দিনের নিয়মানুসারে সামন্ত রাজা, জায়গীরদার ও ইক্‌তাদারগণই সুলতানের পক্ষে সৈন্য, অশ্ব ও খাদ্যের ব্যবস্থা করিতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বাঙ্গালার ইতিহাসের[৩] বিবরণ অনুসারে অযোধ্যার এই শাসনকর্তার নাম তুরমতি। আবার কেহ কেহ বলেন, তুরমতি তুঘরিলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন।[৪] যাহা হউক আমীন খান সসৈন্যে বিহারের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন। তুঘরিল তাঁহার গতিরোধ করিলেন; গোগড়া নদীর তীরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। আমীন খান পরাজিত হইলেন—তাঁহার বহু সৈনিক তুঘরিলের পক্ষে যোগ দিল, অবশিষ্ট সেনাদল অযোধ্যা অতিক্রমণকালে অযোধ্যার হিন্দু সৈন্য কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। পরাজয়ের অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া বলবন পরাজিত আমীনখানকে অযোধ্যার প্রবেশতোরণে, প্রকাশ্য রাজপথে ফাঁসিকাষ্ঠে হত্যার আদেশ দিলেন।[৫] বারানী বলেন—আমীন খান তুঘরিল কর্তৃক নারকিল্লা দুর্গে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।[৬] এইস্থানে সংবাদ অসম্পূর্ণ।

আমীন খানের পরাজয়

দ্বিতীয় যুদ্ধঃ পর বৎসর সুলতান বলবন অযোধ্যার নূতন শাসনকর্তা মালিক তুরমতিকে তুঘরিলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মালিক তাজউদ্দীন তামার খান শামসী সুলতানের নির্দেশে তুরমতির সহিত যোগদান করিলেন। দিল্লীর সৈন্য বিনা বাধায় সরযূ নদী অতিক্রম করিল এবং ত্রিহুতের পথে বঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হইল। দিল্লীর সেনাবাহিনীতে ছিল অশ্বারোহীর আধিক্য, আর বাঙ্গলার সেনাবাহিনীতে পদাতিক ও হস্তী-সৈন্য ছিল প্রবল শক্তিশালী। ত্রিহুত ও লক্ষ্ণৌতির মধ্যবর্তী স্থানে উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইল—কেহ কাহাকেও আক্রমণ করিতেছে না; কারণ ফলাফল অনিশ্চিত। এই অনিশ্চয়তা ও বিলম্বের সুযোগে তুঘরিল দিল্লীর সেনাদলকে প্রলুব্ধ করিলেন। একদিকে অর্থের প্রলোভন, অন্যদিকে পরাজিত হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলে নিষ্ঠুর শাস্তির সম্ভাবনা। ফলে বহু মালিক সসৈন্যে তুঘরিলের পক্ষে যোগ দিলেন। অবশেষে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল—দিল্লীর সৈন্যদলই

দ্বিতীয় যুদ্ধ (৬৭৭ হিঃ/ ১২৭৮ খ্রীঃ) তুরমতি খান বনাম তুঘরিল খান

তুরমতি খানের পরাজয়

---

১) Elliot, *History of India*, Vol. III, p. 113

২) *Ferishta*, Vol. I, p. 79

৩) *History of Bengal*, Dacca, University, Vol. II, p. 61

৪) Habibulla, *Foundation of Muslim Rule in India*, p. 165

৫) Elliot, *History of India*. Vol. III, p. 114

৬) Barani, *Opcit*. p. 84

পরাজিত হইল। পরাজিত সৈন্যবাহিনীকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়া সুলতান বলবন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া মালিক তুরমতিকে অযোধ্যার প্রকাশ্য রাজপথে হত্যার আদেশ দিলেন। কিন্তু মালিক তুরমতি নিষ্ঠুরতর অত্যাচারের ভয়ে আত্মহত্যা করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

তৃতীয় যুদ্ধ
(৬৭৭ হিঃ/১২৭৮ খ্রীঃ)
শিহাবউদ্দীন বনাম
তুঘরিল খান

তৃতীয় যুদ্ধঃ মালিক তুরমতির পরাজয়ের পর অযোধ্যার নূতন শাসনকর্তা শিহাবউদ্দীন তুঘরিলের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন।[১] ফুতুহ্-উস-সালাতীনের রচয়িতার মতে এই শাসনকর্তার নাম বাহাদুর খান। তিনি দিল্লীশ্বরের দাসগণের মধ্যে সর্বজন-বিদিত ও সর্বজন-সম্মানিত ছিলেন। শিহাবউদ্দীনও আমীন খানের পথ অনুসরণ করিয়া ত্রিহুতের পথে বঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন; তুঘরিল সসৈন্যে তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। বঙ্গের সীমান্তে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। শিহাবউদ্দীন তুঘরিলকে বন্দী করিয়া সুলতান বলবনের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন —এই প্রতিজ্ঞা পালনার্থে বীরবিক্রমে শত্রুর সহিত যুদ্ধও করিলেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় তাঁহার বহু সৈন্য তুঘরিলের পক্ষাবলম্বন করিল—ফলে শিহাবউদ্দীন পরাজিত হইলেন। এই পরাজয়ে দিল্লীর সুলতানের সম্মান, তথা বলবনের অপরাজেয়তার গৌরব ম্লান হইয়া গেল। বলবনের ধৈর্যচ্যুতি হইল—পরাজয় তাঁহার সহজ বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিয়া দিল। ক্ষুব্ধ আক্রোশে তিনি শিহাবউদ্দীনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। কিন্তু পরিষদবর্গের অনুরোধে তিনি এই মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করিলেন। পরাজয়ের গ্লানি অপনোদনের জন্য এবার তিনি স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিবেন স্থির করিলেন।[২]

শিহাবউদ্দীনের
পরাজয়

চতুর্থ যুদ্ধ
(৬৭৯ হিঃ/১২৮০ খ্রীঃ)
বলবন বনাম
তুঘরিল খান

চতুর্থ যুদ্ধঃ সুলতান বলবন অত্যন্ত সংগোপনে সৈন্য সংগ্রহ ও অভিযানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধের পরিকল্পনা ও আয়োজনে এক বৎসর অতিবাহিত হইল। তুঘরিলও এই একটি বৎসর স্বীয় রাষ্ট্রশাসনে মনোযোগ দিলেন। বলবন দিল্লী রাজ্য শাসনের ভার তাঁহার বিশ্বস্ত মালিক দিল্লীর কোতোয়াল কমরউদ্দীনের উপর সমর্পণ করিলেন। পশ্চিম প্রান্তে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের ভার তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মুহম্মদের উপর ন্যস্ত করিলেন।[৩] বলবন প্রকাশ্যে প্রচার করিলেন যে, তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বুঘরা খানের শাসিত সামানা (পূর্ব পঞ্জাব—পাতিয়ালা) প্রদেশে শিকারে যাত্রা করিতেছেন। সত্যই তিনি সামানা প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে বুঘরা খানকে তিনি সঙ্গে লইলেন এবং তাঁহার উপর অভিযানের পশ্চাদ্ভাগের ভার ন্যস্ত করিলেন। তিনি শিকার-বাহিনী সঙ্গে লইয়া দোয়াব অতিক্রম করিলেন (জানুআরি ১২৮০ খ্রীঃ) এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন (মার্চ, ১২৮০ খ্রীঃ)। সুলতান বলবন তাঁহার নৌবিভাগকে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে একটি নৌবাহিনী নির্মাণের আদেশ দিলেন।

বলবন কর্তৃক
নৌবাহিনী গঠন

---

১) *Twarikh-i-Mubarakshahi*, Pp. 41-42

২) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 62

৩) Elliot, *History of India*, Vol. III, p. 115

কারণ, বঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিতে হইলে শক্তিশালী নৌবাহিনীর একান্ত প্রয়োজন। অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াও বলবন প্রায় দুই লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। এই সৈন্যের মধ্যে বহু হিন্দুও ছিল।[১] এই নবসংগৃহীত দুই লক্ষের সহিত সামানা ও দিল্লী হইতে আনীত লক্ষাধিক সৈন্যও যুক্ত হইয়াছিল। মুহম্মদ তুঘলকের খোরাসান বিজয়ের পরিকল্পনা ব্যতীত, কোন মুসলিম নরপতির পতাকাতলে এককালে এত অধিক সৈন্য সমাবেশ হয় নাই। কেবলমাত্র সৈন্যবলের সংখ্যাধিক্য দ্বারাই তিনি বঙ্গবিজয় করিতে পারিতেন।

বলবনের সৈন্যবল

তুঘরিল শিকারের ছদ্মবেশে প্রতারিত হইলেন না। তিনি সুলতান বলবনের অগ্রগতি প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নৌবহর সহযোগে সরযূ নদীর সঙ্গম পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তুঘরিলের উদ্দেশ্য যুদ্ধ নহে—রাজকীয় বাহিনীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং বর্ষাগম পর্যন্ত দিল্লীর সৈন্যের অগ্রগতি রোধ করা। বঙ্গের ঘনবর্ষায় দিল্লীর সেনাবাহিনী প্রাকৃতিক দুর্যোগেই বিপর্যস্ত হইবে। ইতোমধ্যে বর্ষা আরম্ভ হইল—নদী তরঙ্গ-সংকুল, পথঘাট কর্দমাক্ত। সুলতান বলবন এই দৈবদুর্যোগকে গ্রাহ্য না করিয়া, সৈন্যদের পথকষ্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সৈন্য ও নৌবাহিনীকে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন।

বলবনের বঙ্গদেশে উপস্থিতি

তুঘরিল সম্মুখযুদ্ধ করা সমীচীন বিবেচনা করিলেন না, লক্ষ্ণৌতি রক্ষার চেষ্টাও করিলেন না। তিনি লক্ষ্ণৌতি পরিত্যাগ করিয়া জাজনগরের দিকে অগ্রসর হইলেন। লক্ষ্ণৌতির বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার তাঁহার অনুসরণ করিল। গঙ্গার অপর তীরে ঘিয়াসউদ্দীন আইয়াজ নির্মিত লক্ষ্ণৌতি-লাখনোর রাজপথের পার্শ্ববর্তী একস্থানে (লক্ষ্ণৌতি হইতে এক দিবসের পথ) তুঘরিল তাঁহার পরিবার-পরিজন সহ অবস্থান করিতেছিলেন। ইতোমধ্যে বলবন লক্ষ্ণৌতির চল্লিশ ক্রোশের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তুঘরিল আবার যাত্রা আরম্ভ করিলেন।[২] অগস্ট মাসের মধ্যভাগে (১২৮০ খ্রীঃ) বলবন লক্ষ্ণৌতি নগরীতে উপস্থিত হইলেন এবং সৈন্যদিগকে বিশ্রামের নির্দেশ দিলেন; বর্ষাশেষে পুনরায় তুঘরিলের পশ্চাদ্ধাবন করিবেন। বলবন শিপাহ্-সালার হিসামউদ্দীনকে লক্ষ্ণৌতির নূতন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার প্রতি নির্দেশ দিলেন, তুঘরিলের সংবাদ সত্বর বলবনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। হিসামউদ্দীন ছিলেন বিখ্যাত ইতিহাসকার জিয়াউদ্দীন বারানীর মাতামহ। তাঁহার নিকট হইতে বারানী সুলতান বলবনের লক্ষ্ণৌতি অভিযানের সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

বারানীর প্রদত্ত সংবাদের উপাদান

সুলতান বলবন সত্যই এই অভিযানে তুঘরিলের সন্ধান পান নাই, কিংবা জলপথে তুঘরিলের শক্তিকে বিধ্বস্ত করিতে পারেন নাই। বলবন কয়েক দিবস লক্ষ্ণৌতিতে অবস্থান করিয়া সেনাবাহিনীকে সুসংবদ্ধ করিলেন এবং শত্রুর অনুসন্ধানে দ্রুতগতিতে জাজনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। কারণ, সুলতান বলবন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তুঘরিলকে শাস্তি না দিয়া তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিবেন না, কিংবা শত্রুর

বলবনের প্রতিজ্ঞা

---

১) *ibid.* p. 116
২) *ibid.* p. 116

পশ্চাদনুসরণ-প্রচেষ্টাও পরিত্যাগ করিবেন না।[১] সুলতান বলবনের এই প্রতিজ্ঞায় তাঁহার সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দিল—কারণ তাহারা সুলতানের মনোভাবের সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত ছিল। তাহারা জানিত, কোনক্রমেই তাঁহার প্রতিজ্ঞার ব্যতিক্রম হইবে না।

পঞ্চম যুদ্ধ
(৬৮০ হিঃ/১২৮১ খ্রীঃ)
বলবন বনাম তুঘরিল

পঞ্চম যুদ্ধ : বলবন তুঘরিলের বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে দুইটি অভিযান করেন—একটি ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবং অপরটি ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দে। ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দে বর্ষাকালে বলবনের সেনাবাহিনী তুঘরিলের অনুসন্ধানে লক্ষ্ণৌতি হইতে বহুদূরে সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিল।[২] সোনারগাঁয়ের অদূরেই ছিল তুঘরিলের কেল্লা "নারকিল্লা"। ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তুঘরিলের জাজনগর অভিমুখে পলায়ন ছলনামাত্র ছিল; প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহার পরিবার-পরিজন, সঞ্চিত ধনসম্পদ সমস্তই এই নারকিল্লা দুর্গে সংগোপনে সংরক্ষিত করিয়াছিলেন। তুঘরিল জাজনগর অভিমুখে পলায়ন দ্বারা শত্রুকে বিভ্রান্ত করিতে এবং নারকিল্লা দুর্গকে শত্রুর দৃষ্টিবহির্ভূত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বারানী তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"বলবনের সেনাবাহিনী সত্তর-অশীতি ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া জাজনগরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইল।"[৩] তুঘরিলের অনুসন্ধানে বলবন জাজনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া কিরূপে সুবর্ণগ্রামে পৌছিলেন—ইহা একটি ঐতিহাসিক সমস্যা। বারানীর এই উক্তি বর্তমান ইতিহাসকারগণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমস্যার সমাধান করিতে অসমর্থ হইয়া তারিখ-ই-ফিরুজশাহী গ্রন্থের সারাংশ অনুবাদক স্যার হেন্‌রী ইলিয়ট বলিয়াছেন—"জাজনগর ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বদিকে অবস্থিত এবং ইহার বর্তমান নাম ত্রিপুরা।"[৪] ত্রিপুরার প্রাচীন নাম জাজনগর—ইহা অপর কোন উল্লেখযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে জাজনগর মহানদীর তীরে অবস্থিত ছিল এবং এককালে উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। বর্তমানে কটক জিলায় জাজপুর নামে একটি শহরও রহিয়াছে।

তুঘরলের পশ্চাদ্ধাবন

সুলতান বলবন তুঘরিলের অনুসন্ধানে জাজনগরে গমন না করিয়া সোনারগাঁয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া জাজনগরকে ব্রহ্মপুত্রের পূর্বদিকে কল্পনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কিংবা দ্বিতীয় জাজনগর সৃষ্টিও নিষ্প্রয়োজন। যে উদ্দেশ্যে বলবন সুবর্ণগ্রামে গিয়াছিলেন তাহাও বারানীর গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে—"তুঘরিল যাহাতে পরাজিত হইয়া জলপথে পলায়ন করিতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যে সুলতান বলবন দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের জলপথসমূহের অধীশ্বর দনুজ রায়ের সঙ্গে ব্যবস্থা করিতে সুবর্ণগ্রামে গমন করিয়াছিলেন।"[৫] বলবন অবশ্য এইস্থান হইতেই জাজনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন।

---

১) Elliot, *History of India*, Vol. III, p. 117
২) *ibid.* p. 116
৩) *ibid*, p. 117
৪) *ibid* Pp. 112-13, Foot Note
৫) *ibid*, p. 116

দনুজমাধব ছিলেন তুঘরিলের প্রতিদ্বন্দ্বী। বলবন প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য কাফেরের সাহায্য গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। সুলতান বলবন দনুজমাধবকে আমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ করেন। দনুজমাধব তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন কিন্তু শর্ত হইল যে, তাঁহারা উভয়েই স্বাধীন নরপতি এবং দনুজমাধবের প্রতি স্বাধীন নরপতির উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। দনুজমাধব সুলতানের দরবারে উপস্থিত হইলে সুলতানকে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে। দিল্লীর মুসলিম সুলতানের পক্ষে বঙ্গের হিন্দু নরপতিকে সম্মান প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠাবোধ স্বাভাবিক; ইহাতে মুসলমানের চক্ষে ইসলামের মর্যাদাহানি হইবে। সুলতান বলবনের সভাসদ মালিক বরবক কৌশলে কার্যসিদ্ধির ব্যবস্থা করিলেন—উহাতে উভয় পক্ষের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। হিন্দুরাজা দনুজমাধব সুলতান-দরবারে প্রবেশ করা মাত্রই মুসলিম সুলতান হস্তস্থিত কপোত উড়াইয়া দিবার জন্য দণ্ডায়মান হইবেন। ইহাতে দনুজমাধব দেখিবেন যে, দিল্লীর সুলতান দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, অথচ মুসলমান দরবারিগণ মনে করিবেন যে, সুলতান সহজভাবে কপোত উড়াইবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছেন। ব্যবস্থানুরূপ কার্য সমাধা হইল; উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট। দনুজমাধব ও সুলতান বলবনের মধ্যে স্থির হইল যে—স্থলে, জলে, কোথাও দনুজমাধব তুঘরিলকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে দিবেন না।

দনুজমাধবের সহিত বলবনের সন্ধি

ব্রহ্মপুত্র বা পদ্মানদীর মধ্য দিয়া তুঘরিল নারকিল্লা অভিমুখে যাত্রা করিলে দনুজ-মাধব বাধা দিবেন এবং অপর পক্ষে বলবন স্বয়ং স্থলপথে তুঘরিলের অগ্রগতি রুদ্ধ করিবেন।[১]

এই সংবাদ অবগত হইয়া তুঘরিল আর নারকিল্লায় পরিবার-পরিজন কিংবা ধনরত্ন রাখা নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না। বহু সৈন্যসামন্ত সহ তিনি জাজনগর রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইলেন। সুলতান বলবনও মালিক বরবক বেতরাসের অধীনে কয়েক সহস্র সৈন্য তুঘরিলের অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করিলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া স্বয়ং তুঘরিলের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। বেতরাসের বাহিনী প্রধান সেনাবাহিনী অপেক্ষা ১০/১২ ক্রোশ অগ্রে চলিতেছিল। চতুর্দিকে তুঘরিলের অনুসন্ধানে চরও প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্রোহী তুঘরিলের কোন সংবাদ নাই।[২] অবশেষে সেনাপতি মুহম্মদ শের আন্দাজ ও তাঁহার ভ্রাতা মালিক মকদ্দর শিবির হইতে ১০/১২ ক্রোশ দূরে একদল শস্য-ব্যবসায়ী বণিকের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাহারা তুঘরিলের নিকট শস্য বিক্রয় করিয়া ফিরিতেছিল।[৩] বণিকদল দেখিয়া তাঁহাদের সন্দেহ হইল। মালিক শের আন্দাজ তাহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কোন সদুত্তর পাইলেন না। তাহাদের উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া শের আন্দাজ তাহাদের মধ্যে দুই ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করিলেন। ভয়ে অন্যান্য

তুঘরিলের দুর্ভাগ্য

---

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 66
২) Elliot, *History of India*, Vol. III, p. 117
৩) *ibid*, Vol. III, p. 117

বণিকগণ প্রকাশ করিল যে, তুঘরিল সসৈন্যে নিকটবর্তী নদীতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। মালিক শের আন্দাজ অনতিবিলম্বে কয়েকজন দুঃসাহসী অশ্বারোহী সঙ্গে করিয়া তুঘরিলের সন্ধানে বহির্গত হইলেন। মাত্র ক্রোশখানেক দূরেই দেখিলেন তুঘরিলের সৈন্যগণ শিবির সংস্থাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছে; নিকটেই একটি প্রস্তরনির্মিত কূপ। কেহ খাদ্যগ্রহণে ব্যস্ত, কেহ বা নিঃসংকোচে সংগীত চর্চা করিতেছে। হস্তী ও অশ্বগুলি মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছে। কেহই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নহে; পরদিন তাহারা জাজনগর রাজ্যে প্রবেশ করিবে। মালিক শের আন্দাজ দুইজন বণিককে দুইজন তুর্কী অশ্বারোহীর তত্ত্বাবধানে মালিক বরবক-বেতরাসের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, তাঁহারা তুঘরিলের সন্ধান পাইয়াছেন এবং তাঁহাকে দ্রুত আসিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন।[১]

বণিকগণের বিবরণ

(৬৮১
বল

অতর্কিতভাবে মালিক শের আন্দাজ তুঘরিলের শিবির আক্রমণ করিলেন। এই অতর্কিত আক্রমণে তুঘরিলের সৈন্যগণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। শের আন্দাজের বাহিনীর ভীষণ চীৎকার শুনিয়া তাহারা মনে করিল সুলতান বলবন সসৈন্যে আক্রমণ করিয়াছেন। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। নিকটেই একটি নদী ছিল—তুঘরিল সন্তরণ করিয়া নদী অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিলেন। অকস্মাৎ শত্রুপক্ষের একটি তীর তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হইল। অন্য একজন শত্রু-সৈনিক তাঁহার শিরশ্ছেদ করিল। তুঘরিলের ছিন্ন শির সুলতান বলবনের নিকট প্রেরিত হইল।[২] বলবন সন্তুষ্ট হইয়া তুঘরিলের হত্যাকারীকে তুঘরিলকুশ (তুঘরিল-হন্তা) উপাধিতে ভূষিত করিলেন। সুলতান বলবন ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন—সঙ্গে অসংখ্য বন্দী, অগণিত ধনরত্ন। সগৌরবে নগরে প্রবেশ করিয়া সুলতান বলবন অর্ধক্রোশব্যাপী প্রকাণ্ড রাজপথের পার্শ্বে ফাঁসিমঞ্চ নির্মাণের আদেশ দিলেন। তুঘরিলের সহায়ক ভ্রাতুষ্পুত্র, জামাতা, পাত্র-মিত্র, অমাত্য, সৈন্য, ভৃত্য, ক্রীতদাস, যে যেখানে ছিল—প্রত্যেককে ফাঁসি দেওয়া হইল; গলিত মৃতদেহ ফাঁসিকাষ্ঠেই শুষ্ক হইল,[৩] কাহাকেও বা হস্তী-পদতলে দলিত করা হইল। দিল্লীর যে সকল সৈনিক তুঘরিলের সহিত যোগ দিয়াছিল, তাহাদিগকে দিল্লী লইয়া যাইবার জন্য পৃথক করা হইল, কারণ দিল্লীর সৈন্যের শাস্তি দিল্লীতেই হইবে। সেখানে তাহাদের ভাগ্যে আরও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হইবে। তাহাদিগকে এমন শাস্তি দেওয়া হইবে—যেন দিল্লীর লোক ভবিষ্যতে দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কল্পনা না করে অথবা দিল্লীর বিরোধিতা না করে। সুলতান বলবন প্রদত্ত শাস্তি তখন সমগ্র ভারতে নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্তরূপে প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল।

তুঘরিলের ছিন্নশির

বলবন কর্তৃক বিদ্রোহিগণের চরম শাস্তি

সুলতান বলবন আরও কতিপয় দিবস লক্ষ্ণৌতি নগরে অবস্থান করিলেন এবং স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র বুঘরা খানকে লক্ষ্ণৌতির শাসক নিযুক্ত করিলেন। তিনি

---

১) Elliot, *History of India*, Vol. III, p. 117

২) *ibid*, p. 117

৩) *ibid*, p. 118

পুত্রকে রাজকীয় সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ রাজছত্র প্রদান করিলেন এবং তাঁহার জন্য কতিপয় কর্মচারী ও ইখতাদার নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং তুঘরিলের লুণ্ঠিত ও সঞ্চিত ধনরত্ন সকলই পুত্রকে প্রদান করিলেন। কেবল রণহস্তী ও স্বর্ণই তিনি দিল্লীতে লইয়া গেলেন। দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে পুত্রকে একান্তে আহ্বান করিয়া তিনি তাঁহাকে তিনটি প্রতিজ্ঞা করাইলেন—মামুদ বুঘরা খান বঙ্গবিজয় সমাপ্ত করিবেন, ষড়যন্ত্রকারীদের সহিত যোগ দিবেন না এবং মদ্যপান বা ব্যসনে লিপ্ত হইবেন না। তারপর বলবন লক্ষ্মৌতির রাজপথে সারিবদ্ধ ফাঁসিমঞ্চগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পুত্রকে দিল্লীর বশ্যতা অস্বীকার বা দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিলেন।[১] এই সম্বন্ধে বারানী একটি তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

বুঘরা খানের প্রতি বলবনের নির্দেশ

দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে একদিন বলবন তাঁহার পুত্র মামুদ বুঘরা খানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পুত্র তুমি কি জান কোথায় তুমি বাস করিতেছ?" পুত্র উত্তর করিলেন—"বঙ্গের প্রাচীন রাজ-প্রাসাদে, গৌড়ের বিখ্যাত বাজারের পার্শ্বে।" পিতা-পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মামুদ, তুমি কি দেখিতেছ?" মামুদ এই প্রশ্নে বিস্মিত হইলেন, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। বলবন আবার এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামুদ তুমি কি দেখিতেছ?" মামুদ দ্বিতীয়বার একই প্রশ্নের পুনরুক্তি শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন, এবং কি উত্তর দিবেন বুঝিতে পারিলেন না। পিতা তৃতীয়বারও সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর তিনি বলিলেন—"তুমি আমার শাস্তির নিদর্শনগুলি দেখিতে পাইতেছ?" মামুদ এইবার নীরবে মাথা নত করিয়া স্বীকৃতি জানাইলেন। "পুত্র! তুমি যদি কু-লোকের পরামর্শে দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিংবা ষড়যন্ত্রের চেষ্টা কর, তাহা হইলে সিন্ধু, মালব, অযোধ্যা ও লক্ষ্মৌতির শাসকদের মতই তোমার পরিণতি হইবে।"[২]

বুঘরা খানের উপর বলবনের অবিশ্বাস

অতঃপর বলবন দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন; মামুদ বুঘরা খানও কিছুদূর পর্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন। পিতাপুত্রে বিদায়ের মুহূর্তে বলবন তাঁহার কয়েকজন পুরাতন বন্ধু এবং পুত্র বুঘরা খানকে নিকটে আহ্বান করিলেন। বুঘরা খানকে নির্দেশ দিলেন—তাঁহার একজন কর্মচারী একটি লেখনী, মসী ও মস্যাধার আনয়ন করুক। তারপর তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—"আমি জানি, আমার এই পুত্র বিলাস-ব্যসনে মত্ত হইয়া রাজ্যশাসনে আমার কোন নির্দেশই প্রতিপালন করিবে না, তথাপি বহু অভিজ্ঞ এবং বয়োবৃদ্ধ আপনাদের সম্মুখে আমার পুত্রকে আমি কয়েকটি উপদেশ লিখিয়া দিয়া যাইতেছি। পিতারূপে ইহা আমার কর্তব্য।" পুত্রের প্রতি উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া বলবন পুত্রকে একটি রাজপরিচ্ছদ প্রদান করিলেন, স্নেহভরে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন

বলবনের দিল্লী প্রত্যাবর্তন

---

১) Elliot, *History of India*, Vol. III, p. 119

২) *ibid*, p. 120

এবং অশ্রুজলে পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিলেন।[১] তিন বৎসর পর বলবন দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন (১২৮২ খ্রীঃ)।

তুঘরিলের পরাজয়ের কারণ

সুলতান বলবনের জীবনের শেষ কার্য সুসম্পন্ন হইল। তুঘরিলের পরাজয়ের মূলে ছিল বলবনের জিঘাংসাবৃত্তি, দিল্লীর মর্যাদারক্ষার জন্য জীবন-পণ প্রচেষ্টা এবং দনুজমাধবের সহায়তা। দনুজমাধব তুঘরিলের পথ রুদ্ধ না করিলে তুঘরিলের নৌসেনাকে বিধ্বস্ত করা দিল্লীর নবগঠিত নৌবহরের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। শেষ পর্যন্ত ভাগ্য তুঘরিলের বিরোধিতা করিল। বণিকদের সহিত অকস্মাৎ শের আন্দাজের সাক্ষাৎ না হইলে শের আন্দাজ তুঘরিলের সন্ধান পাইতেন কি না সন্দেহ। একটি দিন সময় পাইলেই তুঘরিল জাজনগরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং তখন তাঁহাকে নিধন করা তুঘরিলকুশের পক্ষে সম্ভব হইত না।

শক্তিমান ক্রীতদাস তুঘরিল

তুঘরিলের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ মালিক তুঘরিল চৌদ্দ বৎসরকাল বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে কোন মুসলমান সুলতান এত দীর্ঘকাল বঙ্গদেশ শাসন করেন নাই। সেই যুগে ক্রীতদাসরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া সুলতানজাদী বিবাহ, শাসনকর্তৃপদ লাভ, দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করা বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না। তুঘরিল রাজপুত্ররূপে জীবন আরম্ভ করেন নাই। ক্রীতদাসরূপে বহুবার ক্রীত-বিক্রীত হইয়া তিনি উলুঘ খানের দাসচক্রের অন্তর্ভুক্ত হন। পরে তিনি শক্তি ও বুদ্ধিবলে উলুঘ খানের বিশ্বস্ততম অনুচরবর্গের অন্যতমরূপে স্থান লাভ করেন।

হিন্দু-মুসলমানের প্রিয় তুঘরিল

তুঘরিল সুশাসক ছিলেন—রাজ্যশাসনে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলিমের সমবেত সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুশাসনে দিল্লী অঞ্চলের বহু মুসলমান বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সুলতান বলবনের প্রতিহিংসা ও নিষ্ঠুরতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বহু আমীর, মালিক তুঘরিলের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুঘরিলের দানশীলতা তাঁহাকে যথেষ্ট জনপ্রিয় করিয়াছিল। পররাজ্য লুণ্ঠন মুসলিম রাষ্ট্রনিয়মে রাজধর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। সেই নিয়ম-অনুসারে তিনি জাজনগর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তিনি মুসলিম প্রথা-অনুযায়ী লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ আল্লার নামে দরবেশ আউলিয়া এবং নাগরিকগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু ত্রিপুরালুণ্ঠনের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, স্বীয় বন্ধু রতন-ফা'র রাজ্য বিবেচনা করিয়া তিনি ত্রিপুরা লুণ্ঠন করেন নাই।

দূরদর্শী তুঘরিল

তুঘরিলের রাজনীতিজ্ঞান ও দূরদর্শিতা যথেষ্ট ছিল। পূর্বাঞ্চলে তিনি নারকিল্লা দুর্গ স্থাপন করিয়া রাজপরিবার ও রাজকোষ নিরাপদ করিয়াছিলেন এবং দনুজ-মাধবের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অন্যদিকে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া শক্তিসাম্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি জাজনগর বিজয় করিয়া তথায় মুসলিম শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গে মুসলিম গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও তুঘরিলেরই প্রাপ্য।

---

১) Elliot, *History of India*, Vol. III, p. 121

সামরিক শক্তির বিচারে তুঘরিল একজন বিচক্ষণ ও কর্মকুশল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নৌসেনা ও হস্তী-সৈন্য দিল্লীর অপরাজেয় অশ্বারোহী বাহিনীকেও বহুকাল বিব্রত করিয়াছিল। মালিক আমীন খান, তুরমতি খান, শিহাবউদ্দীন, তামার খান এবং তাজউদ্দীন খানকে তুঘরিল অতি সহজেই পরাজিত করিয়াছিলেন। এমন কি, সুলতান বলবনের মতম দুর্ধর্ষ সেনানায়কও তুঘরিলকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। তুঘরিলের সুগঠিত অতি দ্রুতগামী নৌবাহিনী ছিল। তুঘরিলের দ্রুত স্থান পরিবর্তন, নূতন কর্মকেন্দ্র-নির্বাচন এবং সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা অতি সুব্যবস্থিত ছিল। সুলতান বলবনের মতন বিচক্ষণ সেনাপতি তিন বৎসর চেষ্টা করিয়াও তুঘরিলের সন্ধান পান নাই—আলেয়ার মত তিনি বলবনের স্পর্শের বাহিরেই ছিলেন। জলপথে দনুজমাধব তুঘরিলের গমনাগমনে বাধাপ্রদান না করিলে বলবন দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তুঘরিল সম্মুখ যুদ্ধে কখনও পরাজিত হন নাই। মালিক শের আন্দাজ আকস্মিকভাবে তাঁহার বিশ্রামস্থানের সন্ধান পাইয়াছিলেন। অতি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি ধৈর্যচ্যুত হন নাই—নিরাশ হন নাই। জীবনের শেষদিন, শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। জীবিত অবস্থায় তিনি শত্রুহস্তে পতিত হন নাই—সুলতান বলবনকে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে দেন নাই। বাঙ্গলাদেশে তুঘরিল সর্বপ্রথম একটি জাতীয় বাহিনী গঠন করেন। বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলিম জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বহিঃশত্রু দিল্লীর বিরোধিতা করিয়াছিল।

নিপুণ যোদ্ধা তুঘরিল

যুদ্ধে অপরাজেয় তুঘরিল

বঙ্গের জাতীয় সেনা-বাহিনী সংগঠক তুঘরিল

তুঘরিল ও সুলতান বলবনের চরিত্র সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করিলে তুঘরিল বিশ্বাসঘাতক বলিয়া নিন্দিত হইতে পারেন। কারণ, সুলতান বলবনের অনুগ্রহই তুঘরিলের সমস্ত উন্নতি ও পদবৃদ্ধির মূল। বলবনই তাঁহাকে বঙ্গের সহকারী শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন, ত্রিপুরা জয়ে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং অযোধ্যার মালিকের সহিত প্রতিযোগিতায়ও সুলতান বলবন তুঘরিলের প্রতিবন্ধকতা করেন নাই। মনে একটি প্রশ্ন জাগে—এত প্রিয়পাত্র তুঘরিলকে কেন তিনি বঙ্গের প্রধান শাসক নিযুক্ত করেন নাই? উহার কারণ ছিল এই যে, তখনকার দিনে পদাধিকার বলে অযোধ্যার শাসনকর্তাই লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তৃপদ লাভ করিতেন। অবশ্য, বঙ্গের দুইজন শাসনকর্তা নিয়োগ তখন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। উদ্দেশ্য—একজন অন্যজনের সম্ভাব্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বিদ্রোহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।

তুঘরিল কি বিশ্বাসঘাতক?

জাজনগরের লুণ্ঠিত সম্পদের অংশ দিল্লীতে প্রেরণ না করিয়া তুঘরিল প্রথম দিল্লীর বিরোধিতা করেন। সুলতান বলবন এই ব্যাপারটি লঘু করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তুঘরিলের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ পুনঃস্থাপনের প্রচেষ্টাও করিয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে—তুঘরিল কেন জাজনগরের লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ দিল্লীতে প্রেরণ করেন নাই? তাহার কারণ এই যে, পঞ্জাবের মোঙ্গল-যুদ্ধের পর সুলতান বলবনের অসুস্থতার সংবাদ তিনি পাইয়াছিলেন। এমন কি, সুলতান বলবনের মৃত্যুসংবাদও বাঙ্গলায় পৌছিয়াছিল। সুতরাং এই অনিশ্চিত অবস্থায় দিল্লীতে ধনরত্ন প্রেরণ করিলে তুঘরিলের কিছু লাভ হইত না, বরং ক্ষতিই হইত। প্রশ্ন উঠিতে পারে, তুঘরিল কেন

স্থলতান বলবনের আরোগ্যসংবাদ পাইয়াও রোগমুক্তি-উৎসবের অনুষ্ঠান করেন নাই? তাহার কারণ এই যে, ততদিনে তুঘরিল দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্থলতান ঘিয়াসউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, স্বীয় নামে খুত্‌বা পাঠ করিয়াছেন, মুদ্রাঙ্কন করিয়াছেন—যদি তিনি পুনরায় দিল্লীর বশ্যতা স্বীকারও করিতেন, স্থলতান বলবনের প্রতিহিংসানল হইতে পরিত্রাণ পাইতেন কি না সন্দেহ। কারণ, তুঘরিল প্রভু বলবনের চরিত্রের সহিত সম্যক পরিচিত ছিলেন। স্থলতান বলবন জীবনে কাহাকেও ক্ষমা করেন নাই। তাঁহার অভিধানে 'ক্ষমা' বলিয়া কোন শব্দ ছিল না। স্থলতান বলবনের ধারণা ছিল—হস্ত অগ্নিস্পর্শ করিলে দগ্ধ হইবেই। স্থতরাং তুঘরিল বশ্যতা স্বীকার করিলেও বলবন তাঁহাকে ক্ষমা করিতেন কি না সন্দেহ। অভিজ্ঞতাই তুঘরিলের বহু সিদ্ধান্তের যুক্তি।

ক্ষমাহীন বলবন

বঙ্গদেশে তুঘরিলের দান

মুসলিম বিজেতারূপে তুঘরিলের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। তুঘরিল পূর্ববঙ্গে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রবর্তন করেন, নারকিল্লা দুর্গ স্থাপন করিয়া মুসলিম উপনিবেশ স্থাপনের সূচনা করেন। তাহার বদান্যতায় আকৃষ্ট হইয়া বহু দরবেশ, স্থফী ও আউলিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং পরবর্তিকালে বঙ্গদেশে মুসলিম ধর্মপ্রচারে সহায়তা করেন। তাঁহারা বঙ্গদেশের বহু দরগা ও মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন। তুঘরিলের চরিত্র ও কৃতিত্ব সমসাময়িক যুগের ব্যতিক্রম ছিল না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বলবনী বংশের অধীনে বঙ্গদেশ

৬৮৬/১২৮৭—৭২৮/১৩২৮ খ্রীঃ

সূচনাঃ সুলতান মুঘিসউদ্দীন তুঘরিলের মৃত্যুর পর একচল্লিশ বৎসরকাল (১২৮৭—১৩২৮ খ্রীঃ) সুলতান বলবনের বংশধরগণ বঙ্গদেশ শাসন করেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম সুলতান বুঘরা খান তাঁহার পিতা বলবন কর্তৃকই বঙ্গের শাসক নিযুক্ত হইয়াছিলেন (১২৮৩ খ্রীঃ) এবং চারি বৎসরকাল তিনি তাঁহার পিতা দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াই বঙ্গের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পরই তিনি নিজেকে বঙ্গের স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তাহার পর হইতেই বঙ্গের স্বাধীন সুলতানী যুগের সূচনা। এই সময়ে দিল্লীতে ঘিয়াসউদ্দীন বলবনের বংশধর কায়কোবাদ, কায়ুমার্স, খালজী বংশের ছয়জন সুলতান (জালালউদ্দীন খালজী, রুকনউদ্দীন ইব্রাহিম শাহ, আলাউদ্দীন মুহম্মদ শাহ, শিহাবউদ্দীন ওমর শাহ, কুতুবউদ্দীন মুবারক শাহ এবং নাসিরউদ্দীন খসরু শাহ) এবং তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক ও তাঁহার পুত্র মুহম্মদ তুঘলক রাজত্ব করেন। এই সকল সুলতানগণের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন দুর্বল। মোঙ্গল আক্রমণ ও সিংহাসনের দ্বন্দ্বে তাঁহারা এত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে, বঙ্গবিজয়ে মনোনিবেশ করিবার অভিলাস ও অবসর তাঁহাদের ছিল না। একমাত্র শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন আলাউদ্দীন; তিনিও দাক্ষিণাত্য বিজয় ও পৃথিবী জয়ের স্বপ্নেই বিভোর ছিলেন; বিদ্রোহ-নগরী লক্ষ্ণৌতির প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ ছিল বলিয়া মনে হয় না। জালালউদ্দীন খালজী তো বঙ্গে এক সহস্র ঠগী দস্যুকেই নির্বাসিত করেন—অর্থাৎ বঙ্গদেশ সাধারণ সভ্য মানুষের বসবাসের একান্তই অযোগ্য ভূমি; পরোক্ষে এই সকল দস্যু দ্বারা বঙ্গের হিন্দুগণ উৎপীড়িত হউক—ইহাই হয়তো তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তুঘলক বংশের প্রথম সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন লক্ষ্ণৌতি বিজয় করিয়াছিলেন। তথাপি বঙ্গদেশ এই যুগে দিল্লীর সংস্পর্শ ও সংঘাত হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে দূরেই ছিল।

বলবনী বংশের অধীনে বঙ্গদেশ

এই যুগের সমসাময়িক কোন লিখিত ইতিহাস নাই। সুতরাং ইতিহাসকারদের পক্ষে এই যুগের সুসংবদ্ধ ইতিহাস রচনা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এই যুগের ইতিহাসের উপাদানের মধ্যে কেবল কয়েকটি অস্পষ্ট জীর্ণ মুদ্রা এবং বলবনী সুলতানগণের কয়েকখানিমাত্র লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল মুদ্রা ও লিপির পাঠোদ্ধার অত্যন্ত কষ্টকর এবং মুদ্রার তারিখ, নাম ইত্যাদি সম্বন্ধে এখনও নানা বিষয়ে মতদ্বৈধ রহিয়াছে।

ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব

এই যুগের শেষভাগ হইতেই লক্ষ্ণৌতির ইতিহাসের পরিবর্তে বঙ্গের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হয়। এই যুগের বঙ্গ চারিটি বিশিষ্ট ভাগে বিভক্ত—লক্ষ্ণৌতি,

সাতগাঁ (সপ্তগ্রাম), সোনারগাঁ (সুবর্ণগ্রাম) এবং চাটিগাঁ (চট্টগ্রাম)। এই সময়ে সুবর্ণগ্রামের শাসকগণই লক্ষ্মৌতির শাসকপদে উন্নীত হইতেন কিংবা সুবর্ণগ্রামের সিংহাসন অধিকার করিতে পারিলেই লক্ষ্মৌতির সিংহাসনও লাভ করা যাইত। শক্তি, সম্পদ ও ঐশ্বর্যে সুবর্ণগ্রামের রাজধানী বঙ্গের ইতিহাসবিখ্যাত রাজধানী লক্ষ্মৌতিকেও অতিক্রম করিয়াছিল।

বঙ্গদেশের ইতিহাস আরম্ভ

এই যুগের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য : বঙ্গে মুসলিম অধিকার বিস্তার

মিঃ স্টেপলটন বলিয়াছেন—এই যুগ বঙ্গদেশে এবং বঙ্গের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দ্রুত এবং স্থায়ী মুসলিম অধিকার বিস্তারের যুগ।[১] কয়েকটি কারণ এই যুগে বঙ্গদেশে মুসলিম অধিকার বিস্তারে সহায়তা করিয়াছিল। প্রথমতঃ, আলবারী তুর্কগণ ছিল আভিজাত্যাভিমানী ও স্বাতন্ত্র্যবিলাসী। তাহারা কাহারও প্রাধান্য বা আধিপত্য সহ্য করিতে পারিত না। এমন কি, খালজীগণকেও তাহারা নীচবংশীয় বলিয়া অবজ্ঞা এবং ঘৃণার দৃষ্টিতেই দেখিত। জালালউদ্দীন খালজী তাঁহার তুর্ক-প্রভুকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। সেই কারণেও খালজীগণের প্রতি আলবারী তুর্কগণের একটা সহজাত বিদ্বেষভাব ছিল—তাহারা মনে করিত খালজীগণ তাহাদের অধিকার হরণ করিয়াছে। সুতরাং বলবনীগণ দিল্লীর অধিকর্তা খালজীগণের সংস্পর্শ হইতে বহুদূরে বঙ্গদেশে অবস্থানই শ্রেয়তর বিবেচনা করিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বঙ্গের বলবনী সুলতানগণ দীর্ঘকাল খালজী এবং তুঘলক সাম্রাজ্যবাদের সর্বগ্রাসী কবল হইতে মুক্ত ছিলেন। মাত্র চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশ তুঘলক আক্রমণে বিব্রত হইয়াছিল। বারংবার মোঙ্গল আক্রমণ, দিল্লীর সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব, বিরোধ, ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ডের কাহিনী বলবনী সুলতানগণের অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং তাঁহারা দিল্লীর কণ্টকময় সিংহাসন অপেক্ষা বঙ্গের সুলতানীপদকেই অধিকতর নিরাপদ বিবেচনা করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, বঙ্গের বলবনী সুলতানগণ দিল্লীর সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের আশঙ্কায় বঙ্গের পশ্চিমে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন নাই—তাঁহারা দিল্লীর সহিত সংগ্রাম সযত্নে পরিহার করিয়া চলিয়াছিলেন; সুতরাং বলবনী সুলতানগণ মুসলিমশক্তি প্রতিরোধকারী বঙ্গের হিন্দুশক্তিকে পদানত করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ফলে বঙ্গে মুসলিম অধিকার সুদৃঢ় ও সুসংবদ্ধ হইয়াছিল।

বলবনী বংশের সময়ে বঙ্গদেশ—দিল্লীর সংস্পর্শের বাহিরে

দিল্লীর কণ্টকময় সিংহাসন

বঙ্গের বলবনী যুগ কেবল মুসলিম অধিকার বিস্তারেরই যুগ নহে—অংশতঃ সমন্বয় এবং সংহতিরও যুগ। রাজনৈতিক বিজয়েই কোন সুসভ্য দেশ বা জাতির বিজয় সুসম্পন্ন হয় না। কোন সুসভ্য জাতিকে সম্পূর্ণ বিজয় করিতে হইলে তাহাদের আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং সাংস্কৃতিক বিজয়ই প্রয়োজন। বঙ্গদেশে

১) JASB, New series, Vol. XVIII. 1922, p. 411

মুসলিম অধিকারের এই বলবনী যুগে বঙ্গের সাংস্কৃতিক বিজয়ও আংশিক সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এই সময়ে বহু গাজী এবং আউলিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং বঙ্গের ইতিহাসে তাঁহারাও এই সময় হইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। মিঃ স্টেপলটন বলিয়াছেন—"এই সময়ে বঙ্গদেশে বহু গাজী ও সন্তদের আগমন বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, ইহার পশ্চাতে দিল্লীর সুলতানগণের কোন বিশেষ কূটনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল।" সাধু-সন্তদের আগমনের পশ্চাতে কোন কূটনৈতিক উদ্দেশ্য থাকুক বা না-থাকুক, তাঁহাদের কর্মপদ্ধতি ও উদ্যম যে বঙ্গদেশে মুসলিম ধর্ম ও অধিকার বিস্তারে নানা দিক দিয়া সহায়তা করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বলবনী যুগে বঙ্গের সাংস্কৃতিক বিজয়

বঙ্গদেশ মুসলিম কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত বঙ্গের মুসলিম অধিকার শহর ও নগরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রাম কিংবা গ্রাম্য জীবনকে এই মুসলিম অধিকার বিশেষ প্রভাবান্বিত করে নাই; অর্থাৎ বঙ্গে মুসলিম বিজয়ের প্রথম একশত বৎসর ছিল সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয়ের যুগ। এইবার মুসলিম কর্তৃক বঙ্গের আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক বিজয়ও আরম্ভ হইল। সেনযুগে কৌলিন্য প্রথা ও জাতিভেদ প্রথার অত্যাচারে সমাজের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ উৎপীড়িত ও নিপীড়িত হইত। এই সময়ে মুসলিম সাধু-সন্তগণ শহর ও নগরের পরিবর্তে কোথাও কোথাও দেশের অভ্যন্তরে—গ্রামে প্রবেশ করিলেন। ইসলামের গাজী, কাজী, ফকির, আউলিয়ার উদ্যম ও কর্মপদ্ধতির ফলে বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল এবং এই সকল নবদীক্ষিত মুসলিম বঙ্গের মুসলিম শাসকবর্গের শক্তি বৃদ্ধি করিল। প্রারম্ভ যুগের মুসলিম যোদ্ধৃগণ হিন্দুর মন্দির ও হিন্দুর বিগ্রহ ধ্বংস করিয়াছিল। তাহাদের লক্ষ্য ছিল মন্দিরে সঞ্চিত ধনরত্ন ও মণিমুক্তা। কিন্তু ইহাতেও হিন্দুর ধর্মবোধ বা সংস্কৃতির ধারা বিনষ্ট হয় নাই। জাতি বা দেশ বাঁচিয়া থাকে তাহার সংস্কৃতির মাঝে, সভ্যতার মাঝে। যতদিন বঙ্গদেশে হিন্দু-সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত ছিল, ততদিন হিন্দুদের ধর্মবোধ বিনষ্ট হয় নাই বা আধ্যাত্মিক মৃত্যু হয় নাই। এই সময়ে মুসলিম সাধু-সন্তগণ তাঁহাদের চিন্তা ও কর্ম দ্বারা প্রারম্ভ যুগের রাজনৈতিক ও সামরিক বিজয়ের সহায়তা করিলেন। তাঁহারা ভগ্ন হিন্দুমন্দির ও বৌদ্ধবিহারগুলির সন্নিকটে বা ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মাণ করিলেন দরগা ও খানকা—ফলে হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিলোপ সাধিত হইল। ক্রমে ঐ সকল মন্দির ও বিহারের স্মৃতি বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়া গেল। বহু ক্ষেত্রে বাঙ্গালী হিন্দু-বৌদ্ধ তাহাদের অতীত গৌরবস্মৃতিকে ভুলিয়া আত্মবিস্মৃত হইল। বহু বাঙ্গালী হিন্দু ও বৌদ্ধ মুসলিম পীর ও আউলিয়াকে পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিল। কালের গতিতে প্রারম্ভ যুগের বিদ্বেষ ও বিরোধের তীব্রতা হ্রাস পাইল এবং হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় সহজ হইয়া আসিল। কিন্তু এই সমন্বয়ের ফলে হিন্দুজাতি তাহাদের স্বাভাবিক প্রতিরোধ-আকাঙ্ক্ষা হারাইয়া ফেলিল এবং তাহাদের রাজনৈতিক ভাগ্য সম্বন্ধেও উদাসীন হইয়া উঠিল। মুসলিম রাজনৈতিক বিজয় এইবার সাংস্কৃতিক বিজয়ের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করিল।

বঙ্গদেশে মুসলিম ধর্ম প্রসার

হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিলোপ

সুলতান নাসীরউদ্দীন বুঘরা খান

(৬৮২/১২৮৩ খ্রীঃ—৬৯০/১২৯১ খ্রীঃ)

নাসীরউদ্দীন বুঘরা খান বঙ্গের জাবিতান

তুঘরিলের মৃত্যুর পর বলবনের কনিষ্ঠ পুত্র বুঘরা খান বঙ্গের জাবিতান বা শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন—দিল্লীর সুলতানজাদা বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। আমীর, মালিক এবং জাবিতানবর্গের ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহহেতু বলবন এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বুঘরা খান বর্তমান পাতিয়ালার অন্তর্ভুক্ত সামানা প্রদেশের শাসনকর্তারূপেই জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তুঘরিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি পিতার অনুগামী হইয়াছিলেন এবং রাজকীয় সেনাবাহিনীর একাংশ তিনি পরিচালনা করেন। পিতা বলবন তাঁহাকে রাজদণ্ড ও রাজছত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন,[১] কিন্তু স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কনের অনুমতি তিনি লাভ করেন নাই। বুঘরা খানের নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

বলবন কর্তৃক পুত্র বুঘরা খানকে পূর্ববঙ্গ জয়ের নির্দেশ

বলবন তাঁহার পুত্র বুঘরা খানের চরিত্রের দুর্বলতার সহিত সম্যক পরিচিত ছিলেন। বুঘরা খান ছিলেন উদ্ধত, দায়িত্ববোধহীন এবং অত্যন্ত সুরাসক্ত। লক্ষ্ণৌতির পথিপার্শ্বে বৃক্ষবিলম্বিত মৃতদেহের প্রতি পুত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলবন পুত্রকে ভবিষ্যতেব জন্য সতর্ক করিয়া দিলেন। পুত্রের চরিত্রের শৈথিল্য হেতু বলবন দিল্লী যাত্রাকালে বুঘরা খানের জন্য দুইজন পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিলেন। তুঘরিল পরাজিত হইলেও তখন সোনারগাঁ (সুবর্ণগ্রাম) এবং সাতগাঁয়ের (সপ্তগ্রাম) হিন্দুশক্তি বিনষ্ট হয় নাই। বলবন রাজা দনুজমাধবের ঔদ্ধত্য বিস্মৃত হন নাই। সুতরাং বুঘরা খান ও তাঁহার উপদেষ্টাদ্বয়কে বলবন দনুজমাধবের রাজ্য বিজয়ের নির্দেশ প্রদান করিলেন। ফলে বুঘরা খান যখন লক্ষ্ণৌতিতে বিলাস-ব্যসনে কালাতিপাত করিতেছিলেন তখন মুসলিম সৈন্য পূর্ববঙ্গ বিজয়ে ব্যাপৃত ছিল।

১২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মুলতানে মোঙ্গলগণের সহিত সংঘর্ষে সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন বলবনের প্রিয়পুত্র সুলতানজাদা মুহম্মদের মৃত্যু হইল। প্রিয়পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে সুলতান মর্মাহত হইলেন।. তিনি বুঘরা খানকে দিল্লীর উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশ হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ প্রদান করিলেন।[২]

বুঘরা খানের বঙ্গে প্রত্যাবর্তন

বুঘরা খান ছিলেন আরামপ্রিয় নির্ঝঞ্ঝাট ব্যক্তি। দিল্লীর সিংহাসনের চতুষ্পার্শে ছিল মোঙ্গল আক্রমণের ভীতি ও ষড়যন্ত্রের বিভীষিকা। সুতরাং বুঘরা খান দুই মাসকাল দিল্লীতে অবস্থান করিয়াও পিতার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতে পারিলেন না—অথচ পিতার নির্দেশ অমান্য করিবার সাহসও তাঁহার ছিল না। সুতরাং সহসা একদিন শিকারের ছলে বহির্গত হইয়া তিনি পিতার অজ্ঞাতেই বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।[৩] পুত্রের এই ব্যবহারে সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন

---

১) Elliot, *History of India*, Vol. III, p. 120

২) *ibid.* p. 122

৩) *ibid.* p. 123

এবং বুঘরা খানের বঙ্গে প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাস পরেই বৃদ্ধ শোকাহত সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন (৬৮৬/১২৮৭ খ্রীঃ)।

দিল্লীর সুলতান পদে কায়কোবাদ

মৃত্যুর পূর্বে সুলতান বলবন তাঁহার শিশু পৌত্র কাই খসরুকে (মুহম্মদের পুত্র) দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। কিন্তু চতুর উচ্চাভিলাষী উজীর নিজামউদ্দীন কাই খসরুর পরিবর্তে বুঘরা খানের পুত্র কায়কোবাদকে দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কায়কোবাদ তখন অষ্টাদশবর্ষীয় তরলমতি যুবক। দিল্লীর আমীরগণও কায়কোবাদকে সুলতানরূপে গ্রহণ করিলেন। সুতরাং কায়কোবাদ সহজেই দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (৬৮৬/১২৮৭ খ্রীঃ, জুলাই)।[১]

বুঘরা খানের 'সুলতান নাসীরউদ্দীন মামুদ' উপাধি গ্রহণ

বঙ্গদেশে বুঘরা খান পিতার মৃত্যুতে সপ্তাহব্যাপী শোক পালন করিলেন[২] এবং সপ্তাহ শেষে 'সুলতান নাসীরউদ্দীন মামুদ' উপাধি গ্রহণ করিলেন (৬৮৬/১২৮৭ খ্রীঃ, সেপ্টেম্বর)।

উজীর নিজামউদ্দীনের চক্রান্তে কায়কোবাদ বিলাসস্রোতে মগ্ন

কায়কোবাদ ছিলেন তরুণবয়স্ক, আচার-আচরণে মার্জিত, শিষ্ট এবং অমায়িক; পিতামহ বলবনের নির্দেশে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত, স্বভাবে সংযত এবং সুরা ও নারীর প্রভাব হইতে মুক্ত। কায়কোবাদের এই নির্মলচিত্ততা উজীর নিজামউদ্দীনের স্বার্থ-সিদ্ধির পরিপন্থী হইয়া উঠিল। নিজামউদ্দীন ছিলেন দিল্লী সিংহাসনের অভিলাষী; সুতরাং স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি কায়কোবাদকে পাপের পথে আকর্ষণ করিলেন—কায়কোবাদের জন্য কিলোখরীর প্রাসাদে সুরা ও নারীর ব্যবস্থা হইল।[৩] কায়কোবাদ বিলাস-স্রোতে নিমগ্ন হইলেন। উজীর নিজামউদ্দীনের প্ররোচনায় এবং কায়কোবাদের আদেশে কাই খসরু নিহত হইলেন।[৪] সুলতান বলবনের পুরাতন ভৃত্যবর্গও একে একে অপসারিত হইল! কায়কোবাদের অধঃপতনের সংবাদ লক্ষ্ণৌতিতে পিতা বুঘরা খানের কর্ণগোচর হইল! বুঘরা খান যদিও দিল্লীর সিংহাসনের গুরুদায়িত্ব পরিহার করিয়াছিলেন, তথাপি কায়কোবাদের আচরণে তাঁহার বংশ-গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া পুত্র কায়কোবাদকে তিনি তিরস্কার করিলেন এবং তাঁহার স্বভাব পরিবর্তনের জন্য উপদেশসহ তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। লক্ষ্ণৌতি ও কিলোখরীর প্রাসাদে বহু পত্র বিনিময় হইল।[৫] কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। অবশেষে বুঘরা খান তাঁহার সেনাবাহিনীসহ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন —উদ্দেশ্য পুত্রকে সতর্ক ও সচেতন করিয়া সৎজীবনে ফিরাইয়া আনিবেন, কিংবা পৈত্রিক অধিকারসূত্রে দিল্লী অধিকার করিবেন।[৬] ঐতিহাসিক বারানী বুঘরা খানের দিল্লী অভিযানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীরব।

বুঘরা খানের দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা

---

১) Elliot, *History of India*, Vol. III, p. 125

২) Isami, *Futah-us-Salatin*, p. 183

৩) Elliot, *History of India*. Vol, III, p. 127

৪) *ibid*. p. 127

৫) *ibid*. p. 129

৬) *Riyaz-us-Salatin*, Tr. p. 88

দিল্লী গমনের পথে নাসীরউদ্দীন বুঘরা খান বিহারে উপস্থিত হইলেন। বিহার ছিল তখন দিল্লীর অধীন একটি প্রদেশ। বিহার হইতে অযোধ্যা বিজয়ের উদ্দেশ্যে তিনি উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হইলেন (৬৮৭/১২৮৮ খ্রীঃ)। কিলোখরীর প্রাসাদে এই সংবাদ পৌছিলে কায়কোবাদ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ইতোমধ্যে বুঘরা খান অযোধ্যায় সরযূনদীর তীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। শীঘ্রই কায়কোবাদের সেনাবাহিনীও অযোধ্যায় পৌছিল এবং সরযূনদীর অপর তীরে শিবির সংস্থাপন করিল। উভয় পক্ষেই দারুণ অস্বস্তিকর পরিস্থিতি—পিতা পুত্রকে পুনরায় একখানি পত্র লিখিলেন। খ্যাতনামা কবি আমীর খসরু এই অভিযানে কায়কোবাদের অনুগমন করিয়াছিলেন। কায়কোবাদের অনুরোধে আমীর খসরু পিতাপুত্রের সাক্ষাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া একটি খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছিলেন।—ঐ কাব্যগ্রন্থ কেবল কবির কল্পনা নহে—সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই ঐ কাব্য রচিত। মধ্যযুগের সকল ঐতিহাসিকই এই কাব্যগ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। বুঘরা খানের দ্বিতীয় পুত্র কৈকায়ুস সুলতান কায়কোবাদের শিবিরে প্রেরিত হইলেন—সঙ্গে পিতা কর্তৃক প্রেরিত প্রচুর উপঢৌকন। প্রত্যুত্তরে জ্যেষ্ঠ পুত্র দিল্লীর সুলতান কায়কোবাদও পুত্র কায়ুরমাসকে উজীর নিজামউদ্দীনের সহিত পিতার শিবিরে প্রেরণ করিলেন। পৌত্রের নিষ্পাপ মুখদর্শনে বুঘরা খানের হৃদয় স্নেহে আপ্লুত হইল, তাহার ক্রোধ শান্ত হইয়া গেল, তিনি পুত্রের সহিত সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। উজীর নিজামউদ্দীন পিতাপুত্রের মিলনের সম্ভাবনায় শঙ্কিত হইলেন। পিতাপুত্রের মিলনের পক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলি শর্ত আরোপ করিলেন, যে-সকল শর্ত কোন আত্মসম্মান-সম্পন্ন পিতার পক্ষে স্বীকার বা গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু বুঘরা খান ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ পিতা। তিনি পুত্রের সহিত সাক্ষাতের জন্য এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে, ঐ সকল শর্তেও তিনি বিচলিত বা সংকল্পচ্যুত হইলেন না। উজীর নিজামউদ্দীনের প্ররোচনায় পিতাপুত্রের সাক্ষাতের শর্ত স্থির হইয়াছিল যে, পিতা বুঘরা খান সরযূনদীর অপর তীরে পুত্রের শিবিরে পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন এবং দরবারে উপস্থিত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট পুত্রের হস্ত চুম্বন করিবেন—কারণ পুত্র কায়কোবাদ দিল্লীর সুলতান এবং পিতা বুঘরা খান বঙ্গের জাবিতান মাত্র।[১]

পুত্রের সহিত সাক্ষাতের জন্য পিতার ব্যাকুলতা

পিতাপুত্রের সাক্ষাতের শর্ত

ইসামী তাঁহার ফুতুহ-উস-সালাতীন গ্রন্থে পিতাপুত্রের সাক্ষাতের দৃশ্যের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি পিতার অপমান, পুত্রের ঔদ্ধত্য এবং উজীর নিজামউদ্দীনের চক্রান্তের ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। দিল্লীর সুলতান মুইজউদ্দীন কায়কোবাদ আমীরবর্গ ও পারিষদবর্গ পরিবৃত হইয়া মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন। বঙ্গের সুলতান পিতা নাসিরউদ্দীন বুঘরা খান অধীন জাবিতান-সুলভ বিনয়-সহকারে পুত্রসমীপে উপস্থিত হইলেন। পিতার এই অবমাননার দৃশ্য দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিগণের পক্ষে অসহ্য বোধ হইল। কিন্তু আমীর নিজামউদ্দীনের

ইসামীর বর্ণনায় পিতাপুত্রের সাক্ষাতের দৃশ্য

১) Elliot, *History of India*, Vol, III, p. 131

হৃদয় এই দৃশ্যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কারণ তাঁহার চক্রান্ত সিদ্ধ হইয়াছে। পিতার এই অবনত অবস্থা দর্শনে কায়কোবাদ বিচলিত ও স্তম্ভিত হইলেন—তিনি সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া পিতাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি নতমস্তকে পিতাকে অভিবাদন করিতে উদ্যত হইলে বুঘরা খান পুত্রকে মধ্য-পথেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন এবং সিংহাসনে উপবেশন করিতে বলিলেন। বাঙ্গলার স্থলতান করযোড়ে দিল্লীর স্থলতানের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। পুত্র পুনরায় সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া পিতার চরণ স্পর্শ করিলেন। পিতা পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। পিতাপুত্রের মিলন হইল। দরবার কক্ষে বিপুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল—আমীর ওমরাহগণ আনন্দে মণিমুক্তা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দরবার গৃহের বাহিরে অবস্থিত জনতাও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বাহিরেও মণিমুক্তা বর্ষিত হইতে লাগিল।

কিছুকাল বিপুল আনন্দ-উৎসবে অতিবাহিত হইল। বঙ্গের স্থলতান এইবার বঙ্গে প্রত্যাবর্তনে মনস্থ করিলেন। পিতা পুত্রকে বহু বিষয়ে সতর্ক করিলেন ও উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি উজীর নিজামউদ্দীনের উদ্দেশ্য ও চক্রান্ত সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি পুত্রকে নিজামউদ্দীন সম্বন্ধেও সাবধান করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গ পরিহার করিতে উপদেশ দিলেন।[১] পিতার উপদেশে পথে কয়েকদিন মাত্র তিনি সংযম অভ্যাস করিয়াছিলেন। উজীর নিজামউদ্দীনের পক্ষে কায়কোবাদের এই পরিবর্তন প্রীতিপ্রদ হইল না। পুনরায় নিজামউদ্দীনের চক্রান্তে স্থরা ও নারীর মোহ তরুণ যুবককে প্রলুব্ধ করিল। পিতার উপদেশ স্থরার স্রোতে ভাসিয়া গেল—স্থরাপানে ও ব্যভিচারে সমস্ত পথ অতিবাহিত হইল।[২] অস্বাভাবিক অত্যাচারের ফলে কায়কোবাদ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং রাজকার্য পরিচালনে অক্ষম হইয়া রাজপ্রাসাদেই আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। এই সময়ে পিতার উপদেশ স্মরণ করিয়া কায়কোবাদ স্থির করিলেন নিজামউদ্দীনকে অপসারিত করিতে হইবে—তাঁহার জীবনের দুষ্টগ্রহ দূর করিতে হইবে। কায়কোবাদ নিজামউদ্দীনকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইলেন। অবশেষে দিল্লীর মসনদকে নিজামউদ্দীনের প্রভাব হইতে দূরে রাখিবার উদ্দেশ্যে কায়কোবাদ তাঁহাকে মুলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু পথে স্থলতানের অনুচরগণ নিজামউদ্দীনকে হত্যা করিল।[৩] ইহার পর সামানার শাসনকর্তা মালিক জালালউদ্দীন ফিরুজ খালজী সমর বিভাগের উজীর বা সেনাপতি পদে (আরজ-উল-মূলক) নিযুক্ত হইলেন।[৪]

বুঘরা খানের বঙ্গে প্রত্যাবর্তন

নিজামউদ্দীনের হত্যা

ফিরুজ খালজী ছিলেন রক্তে তুর্ক, বসতিতে আফঘান। সুতরাং তাঁহার

১) Elliot, *History of India*, Vol. III, Pp. 130-131

২) *ibid.* p. 132

৩) *ibid.* p. 133

৪) *ibid.* p. 133

পদোন্নতিতে দরবারে তুর্ক ও অ-তুর্ক আমীরদের মধ্যে বিষম মতান্তর, ঈর্ষা ও ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল; স্থির হইল যে, অ-তুর্ক আমীরদিগকে গোপনে হত্যা করা হইবে। এই ব্যবস্থার জন্য সুলতানের সম্মতি বা অনুমতির প্রয়োজন। কিন্তু কায়কোবাদ তখন অনাচার-ব্যভিচার ও অত্যাচারহেতু কঠিন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন—রাজকার্য পরিচালনায় অক্ষম। সুতরাং দরবারের মালিকগণ কায়কোবাদের স্থলে তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্র কায়ুরমাসকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন—একজন তুর্ক আমীর শিশু সুলতানের অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন। পিতা বর্তমানে পুত্রের সিংহাসনারোহণের এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্তও বিধাতার অভিশাপস্বরূপ হইল। কায়কোবাদও পিতা বর্তমানে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দুইটি ব্যবস্থার প্রচ্ছদপট বিভিন্ন কিন্তু রূপ ও পরিণতি প্রায় একই।

দিল্লীর দরবারে তুর্ক ও অ-তুর্ক আমীরদের মতান্তর ও ষড়যন্ত্র

শিশু কায়ুরমাসকে কেন্দ্র করিয়া দিল্লীর দরবারে নানাপ্রকার চক্র রচিত হইল। এই গৃহবিবাদের ফলে কায়কোবাদ বিনা তত্ত্বাবধানে, বিনা অন্নজলে মৃত্যু বরণ করিলেন। তাঁহার মৃতদেহ বিনা আড়ম্বরে শয্যাবস্ত্রে আবৃত করিয়া যমুনার জলে নিক্ষিপ্ত হইল। জালালউদ্দীন ফিরুজ খালজী তখন শিশু সুলতানের অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই তিনি স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। নিরপরাধ শিশু কায়ুরমাস কারাগারে অবরুদ্ধ হইলেন এবং ফিরুজ খালজীর পুত্র আরকলি খানের হস্তে প্রাণদান করিয়া রাজরক্তের ঋণ পরিশোধ করিলেন।[১] দিল্লীতে বলবনী বংশের অবসান হইল।

কায়কোবাদ ও কায়ুরমাসের মৃত্যু

দিল্লীতে ফিরুজ জালালউদ্দীন খালজীর সিংহাসনারোহণের দুই মাস পরে এই শোচনীয় সংবাদ বাঙ্গলায় পৌছিল। সত্যই বুঘরা খান দুর্ভাগ্য—এক বৎসরের মধ্যে বহু ব্যাপার সংঘটিত হইল—উজীর নিজামউদ্দীন নিহত হইয়াছেন; দিল্লীতে ষড়যন্ত্রের আবর্ত চলিয়াছে—পুত্র কায়কোবাদ অনাচারে-অত্যাচারে পক্ষাঘাত-রোগগ্রস্ত; পৌত্র কায়ুরমাসকে কেন্দ্র করিয়া রাজনীতির খেলা চলিয়াছে। কায়কোবাদ নিহত হইয়াছেন—দিল্লীর সুলতানের মৃতদেহ অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধায় যমুনার জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কায়ুরমাস কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। মালিক জালালউদ্দীন ফিরুজ খালজী দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন—তাঁহার পিতার পরম গৌরবের দিল্লীর সিংহাসন আর তুর্কসন্তান বহনের গৌরবের অধিকারী নহে। মামলুক রাজত্বের অবসান হইয়াছে—মিশ্র খালজী এবং তুঘলকগণ তখন দিল্লীর হর্তাকর্তা-বিধাতা—সকল ক্ষমতার অধিকারী। বুঘরা খান অক্ষম—নিরুপায়।

এক বৎসরের ঘটনাবলী

পুত্র ও পৌত্রের এই শোচনীয় পরিণাম দর্শনে বুঘরা খানের সকল মানসিক শান্তি অন্তর্হিত হইল—জীবন অর্থহীন বলিয়া মনে হইল। বুঘরা খানের চরিত্রে তাঁহার পিতা সুলতান বলবনের চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল না—পিতার কর্মক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। বুঘরা খান ছিলেন প্রধানতঃ মানুষ, তারপর সুলতান।

বুঘরা খানের উপর দিল্লীর ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া

---

১) Elliot *History of India*, Vol. III, Pp. 134-35

সেইজন্যই তিনি অকুণ্ঠচিত্তে দিল্লীর সিংহাসনের মোহ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুত্র ও পৌত্রকে সিংহাসনের জন্য অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সিংহাসন ত্যাগ করিলেন—জীবনের কোন স্পৃহা, কোন আকর্ষণ আর রহিল না। পুত্র কৈকায়ুসের হস্তে রাজদণ্ড অর্পণ করিয়া বুঘরা খান বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন (৬৮৯/১২৯০ খ্রীঃ)। দিল্লীর খালজী স্থলতানের ভয়ে ভীত হইয়া তিনি রাজদণ্ড পরিত্যাগ করেন নাই। রিয়াস-উস-সালাতীনের গ্রন্থকার বলেন, জীবনের প্রতি বীতরাগ হইয়াই তিনি রাজদণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সিংহাসন পরিত্যাগের পর তিনি কত বৎসর জীবিত ছিলেন, এ সম্বন্ধে ইতিহাসকারগণের মধ্যে মতদ্বৈধ রহিয়াছে। সম্ভবতঃ স্থলতান শামসউদ্দীন ফিরুজ শাহ কর্তৃক লক্ষ্ণৌতি বিজয়ের পূর্বেই তিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন (৭০১/১৩০১ খ্রীঃ)।[১]

বুঘরা খানের রাজদণ্ড পরিত্যাগ

স্থলতান নাসীরউদ্দীন বুঘরা খানের চরিত্রঃ জন্মে তুর্কজাতীয় হইলেও বুঘরা খানের চরিত্রে তুর্ক জাতির দুর্ধর্ষতা ছিল না। রাজোচিত গুণ অপেক্ষা তাঁহার চরিত্রে মনুষ্যোচিত গুণই অধিক ছিল। বুঘরা খান স্বভাবে কোমল এবং বুদ্ধিতে প্রবীণ ছিলেন—ইহা পুত্র কায়কোবাদের প্রতি আচরণে এবং উপদেশের মধ্যেই প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি কর্মকুণ্ঠ ছিলেন। সেই কারণেই তিনি কণ্টকময় দিল্লীর সিংহাসনের মোহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি দিল্লীর সিংহাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে পুত্র কায়কোবাদ ও পৌত্র কায়ুরমাসের এই শোচনীয় পরিণতি হইত না। কিন্তু তিনি স্নেহময় পিতা ছিলেন এবং তাঁহার স্নেহকোমল ব্যক্তিত্বের জন্য তাঁহার সকল আমীর এবং প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশ তিনি শাসন করেন নাই—তথায় তিনি সগৌরবে রাজত্বই করিয়াছিলেন।[২]

বুঘরা খানের স্নেহ-কোমল চরিত্র

স্থলতান রুকনউদ্দীন কৈকায়ুস বলবনী (৬৯০/১২৯১-৭০১/১৩০১ খ্রীঃ)

বলবনী বংশের একমাত্র জীবিত সন্তান, স্থলতান নাসীরউদ্দীন মামুদের পুত্র কৈকায়ুস, পিতার ইচ্ছায় এবং পিতা বর্তমানেই বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (৬৯০/১২৯১ খ্রীঃ)। তিনি তখন তরুণবয়স্ক যুবক। তাঁহার রাজত্বের প্রথম নিদর্শন লক্ষ্ণৌতির মুদ্রাশালায় মুদ্রিত একটি রৌপ্যমুদ্রা। উক্ত মুদ্রাটি ৬৯০ হিজরায় (১২৯১ খ্রীঃ) মুদ্রিত হইয়াছিল। স্থলতান কৈকায়ুসের আরও কতকগুলি রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রা লক্ষ্ণৌতিতে ৬৯১, ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৪ ও ৬৯৫ হিজরায় (১২৯১, ১২৯২, ১২৯৩, ১২৯৪ ও ১২৯৫ খ্রীঃ) মুদ্রিত হইয়াছিল।[৩] স্থলতান রুকনউদ্দীনের আমলের (৬৯৮ হিজরা পর্যন্ত) তিনটি শিলালিপিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রা ও লিপি-প্রমাণ হইতে অনুমিত হয় যে, অন্ততঃ আট

রুকনউদ্দীন কৈকায়ুসের সিংহাসনারোহণ

১) *History of Bengal*, Dacca University Vol. II, p. 74

২) *ibid.* p. 74

৩) *Initial Coinage of Bengal*, p. 46

বৎসর কাল সুলতান কৈকায়ুস বঙ্গ ও বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন। বিহার অবশ্য তাঁহার পিতা নাসিরউদ্দীন বুঘরা খানই বিজয় করিয়াছিলেন এবং কৈকায়ুস বঙ্গের মসনদের সহিত বিহার প্রদেশও পিতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের বিভাগ চতুষ্টয়

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বঙ্গদেশ তখন চারিটি অংশে বিভক্ত ছিল—পশ্চিমে বিহার, দক্ষিণ-পশ্চিমে সপ্তগ্রাম, উত্তর-পূর্বে দেবকোট এবং দক্ষিণে বা দক্ষিণ-পূর্বে 'বাঙ' বা বঙ্গ। মধ্যস্থলে ছিল রাজধানী লক্ষ্মৌতি। তখন এই চারিটি সীমান্তকে বশে রাখিতে পারিলেই লক্ষ্মৌতির শাসক সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিতেন। বঙ্গের এই বিভাগগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রাকৃতিক সীমাদ্বারা সুরক্ষিত। এই বিভাগগুলির উপর স্বীয় অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেই লক্ষ্মৌতির শাসক নির্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে পারিতেন। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের আকাশে-বাতাশে সর্বত্রই যেন একটা বিদ্রোহের সুর ভাসিয়া বেড়াইত। সম্ভবতঃ বঙ্গের সতত পরিবর্তনশীল ভূপ্রকৃতি এই মনোভাব সৃষ্টির জন্য দায়ী। বঙ্গের বহু নদীই বহুবার গতি পরিবর্তন করিয়াছে, এক তীর ভাঙ্গিয়াছে অন্য তীর নূতন সৃষ্টি হইয়াছে—সুতরাং ভাঙ্গা-গড়া যেন বাঙ্গালীর মজ্জাগত। এমন কি, এই বঙ্গদেশের হিন্দু রাজ্যগুলি বিজিত হইবার পরেও বঙ্গের এই বিদ্রোহী মনোভাব বিদূরিত হয় নাই—বরং উত্তরাধিকার সূত্রেই যেন বঙ্গের মুসলিম শাসকগণও এই বিদ্রোহী মনোভাব লাভ করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই মুসলিম শাসকগণের এই মনোভাব প্রকাশ পাইতে থাকে এবং ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে বার ভুঁইঞার সময়ে ইহা সমগ্র দেশে বিস্তার লাভ করে; ফলে সমগ্র দেশটি বুঘলকপুর বা বিদ্রোহপুরী নামে আখ্যায়িত হয়।[১]

বিদ্রোহপুরী বঙ্গদেশ

সুলতান রুকনউদ্দীন কৈকায়ুসের সময়ে তাঁহার সামন্তদের কোন প্রকার বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া যায় না। সুলতান রুকনউদ্দীনের অধীন সামন্তদের মধ্যে বিহারের মালিক ফিরুজ ইখতিয়ারউদ্দীন আইতিগীন ছিলেন সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী।[২] ৬৯৭/১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মুঙ্গের জিলায় লক্ষ্মীসরাইয়ের সন্নিকটে একটি জুম্মা মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন জিয়াউদ্দীন উলুঘ খান। তিনি ছিলেন বিহারের সহকারী শাসনকর্তা ফিরুজ ইখতিয়ারউদ্দীন আইতিগীনের সহকর্মী। সেই বৎসরেই (৬৯৭/১২৯৭ খ্রীঃ) বঙ্গের প্রথম মুসলিম রাজধানী দেবকোটেও একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদটি বহু পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার একটি শিলালিপি গঙ্গারামপুরে (গৌড়ের উত্তরে) আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৩] এই লিপি হইতে জানা যায় যে, এই মসজিদটি সুলতান কৈকায়ুসের শাসনকালে মালিক শিহাবউদ্দীন জাফর খান বহরাম আইতিগীনের আদেশে নির্মিত হইয়াছিল। ৬৯৮/১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ সাতগাঁয়ে (বর্তমান ত্রিবেণী) প্রাপ্ত একটি আরবী শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, রুকনউদ্দীনের রাজত্বের শেষভাগে

বিহারের শাসনকর্তা মালিক ফিরুজ ইখতিয়ারউদ্দীন আইতিগীন

মুসলিম সেনাপতি জাফর খান কর্তৃক সপ্তগ্রাম অধিকার

---

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 75
২) *JASB*, Old Series, Vol. LXII, 1873, Pt. I, p. 247
৩) *JASB*, Old Series Vol, LXI, 1872, Pt. I, p. 103

গঙ্গারামপুরের মসজিদ নির্মাতা সিংহবিক্রম জাফর খান দক্ষিণ বঙ্গের প্রধান নগর সপ্তগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন[১] এবং সপ্তগ্রামে মুসলিম সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য তথায় একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গ বা সোনারগাঁ অঞ্চলের মত এই অঞ্চলও তখন মুসলিম কর্তৃক বিজিত হইতেছিল।[২] সম্ভবতঃ এই সময়ে হুগলী অঞ্চলের হিন্দু ভূপতি ভূদেব নৃপতির সঙ্গে জাফর খান নামক একজন মুসলিম সৈন্যাধ্যক্ষের যুদ্ধ হয়। জাফর খান যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উগওয়ান খান (উলুঘ খান) ঐ হিন্দু নরপতিকে পরাজিত করেন এবং তাঁহাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। এই জাফর খানের সমাধি ত্রিবেণীতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৩] মালিক উগওয়ান খান দেবকোটের খয়রাত্-উল-মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল মসজিদ-মাদ্রাসা ও উহাদের গাত্রে ক্ষোদিত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দশকে সুলতান কৈকায়ুসের শাসনকালে বাঙ্গলা দেশে মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল।

ভূদেব নৃপতি কর্তৃক জাফর খান নিহত

বঙ্গসুলতান কৈকায়ুসের রাজত্বকালে (১২৯১-১৩০১ খ্রীষ্টাব্দে) দিল্লীর সুলতান ছিলেন জালালউদ্দীন ফিরুজ খালজী এবং আলাউদ্দীন খালজী। এই সময়ে বঙ্গের পূর্ব সীমান্তে আসাম অঞ্চলে আহোম বংশীয় নরপতি সুখামফা একটি সুসংবদ্ধ রাজ্য স্থাপন করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন। ত্রিহুত অঞ্চলে হিন্দু সামন্তরাজগণও তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। এই সকল প্রতিবেশী রাজন্যবর্গ কিংবা দিল্লীর সুলতান জালালউদ্দীন ফিরুজ খালজীর সহিতও রুকনউদ্দীন কৈকায়ুসের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। জালালউদ্দীন ফিরুজ খালজী এক সহস্র ঠগী দস্যুকে দিল্লী হইতে বঙ্গে নির্বাসিত করিয়াছিলেন।

পার্শ্ববর্তী রাজন্য-বর্গের সহিত বঙ্গের সম্বন্ধ

দিল্লীর সুলতান জালালউদ্দীন খালজী তখন প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ দমন এবং মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধে অত্যন্ত বিব্রত ছিলেন। সুলতান জালালউদ্দীনের সিংহাসনারোহণের দ্বিতীয় বৎসরেই সুলতান বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র, কারা-মাণিকপুরের শাসনকর্তা ছাজ্জু খান স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কন করিলেন। অযোধ্যার শাসনকর্তা হাতিম খানও বিদ্রোহী হইলেন। অযোধ্যার হিন্দু জমিদারগণও তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন এবং দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিখ্যাত মোঙ্গল বীর মঙ্গাবরনী হইতে আরম্ভ করিয়া হলাগু খানের পৌত্র আবদুল্লা পর্যন্ত কেহই দিল্লীর সুলতানকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে দেন নাই। কৈকায়ুসের শাসনকালে আবদুল্লা হিন্দুস্থানের পশ্চিমপ্রান্তে পঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছিলেন (৬৯১/১২৯১ খ্রীষ্টাব্দ)। দিল্লীর শৌর্য ও ক্ষমতা পঞ্জাবেই

প্রাদেশিক শাসন-কর্তৃগণের বিদ্রোহ ও মোঙ্গল আক্রমণ

---

১) *Journal and proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, New series, Vol. V, p. 248

২) *Epigraphica Indo Moslemica*, 1917-18, Pp. 10-15

৩) *Journal and proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, New series, Vol. V, Pp. 245-46

নিবদ্ধ ছিল। জালালউদ্দীন বঙ্গদেশের প্রতি মনোনিবেশ করিবার কোন সুযোগই পাইলেন না। বঙ্গদেশ যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুজ শাহ বলবনী (৭০১/১৩০১-৭২২/১৩২২)

সুলতান শামসউদ্দীনের পরিচয়

সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুজ শাহ নাসীরউদ্দীন মুহম্মদ বুঘরা খানের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পরেও বলবনী বংশের আর দুইজন সুলতান বাঙ্গলা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুলতান শামসউদ্দীনের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে কোন কোন ঐতিহাসিক সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ তাঁহার মুদ্রায় সুলতান-ইবন-সুলতান (সুলতানের পুত্র সুলতান) শব্দগুলির উল্লেখ নাই। সাধারণতঃ "সুলতানের পুত্র সুলতান" উল্লেখ থাকিলে বংশ-পরম্পরায় রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া বিবেচিত হয় অন্যথা নূতন বংশ বা পৃথক বংশের ইঙ্গিত মনে করা যাইতে পারে। ইবন বাত্‌তুতার উল্লেখ অনুসারে মুদ্রাতত্ত্ববিদ টমাস এবং টমাসের অনুকরণে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইতিহাস-কারগণ শামসউদ্দীনকে সুলতান বলবনের বংশধর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত "সুলতান-ইবন-সুলতান" এই কথাযুক্ত সুলতান শামসউদ্দীনের কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত না হয়, ততদিন এই দ্বন্দ্বের অবসান হইবে না।[১]

সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুজের বংশ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত

টমাস, স্টেপলটন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইতিহাসকারগণ শামসউদ্দীন ফিরুজকে সুলতান নাসিরউদ্দীনের পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বাঙ্গলার ইতিহাস'-এর সংকলয়িতৃগণ এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের মতে শামসউদ্দীন ফিরুজ নাসিরউদ্দীনের পুত্র নহেন। সুলতান কৈকায়ুসের লক্ষীসরাই শিলালিপির আমীর ফিরুজ আইতিগীন আস-সুলতানী ও সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুজ অভিন্ন ব্যক্তি।[২] তিনিই ৬৯৮/১২৯৮-৭০১/১৩০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লক্ষৌতির সিংহাসন অধিকার করেন এবং সম্ভবতঃ সুলতান বলবন আরামবিলাসী পুত্র নাসিরউদ্দীন বুঘরা খানকে শাসনকার্যে সহায়তা করিবার জন্য ফিরুজ খান নামে যে দুইজন মালিককে লক্ষৌতিতে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদেরই অন্যতম। রুকনউদ্দীন কৈকায়ুসের পরবর্তী সুলতানগণের মধ্যে প্রথম এবং একমাত্র শামসউদ্দীন ফিরুজই সুলতান-ইবন-সুলতান (সুলতানের পুত্র সুলতান) এই উপাধি বা গৌরবপরিচয় গ্রহণ করেন নাই। অথচ তাঁহার পূর্ববর্তী সুলতান রুকনউদ্দীন সগর্বে "সুলতান-ইবন-সুলতান ইবন সুলতান" এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। শামসউদ্দীন যখন রুকনউদ্দীনেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তখন তিনি এই গৌরব উপাধি ও গৌরব পরিচয় কেন বর্জন করিবেন, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। মুদ্রাতত্ত্ববিদ টমাস অবশ্য বলিয়াছেন যে, শামসউদ্দীন ফিরুজ তাঁহার ক্ষমতায় এত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহার এত আত্মবিশ্বাস ছিল যে, "সুলতানের বংশধর" এই পরিচয়ের প্রয়োজন তাঁহার ছিল না। কিন্তু টমাসের এই যুক্তিও গ্রহণ করা কষ্টকর—কারণ তিনি যদি এতই শক্তিশালী ছিলেন তাহা হইলে

---

১) *History of Bengal*, **Dacca University, Vol. II, p. 77**

২) *History of Bengal*, **Dacca University, Vol III. p. 93,**

তাঁহার পুত্রগণ কেন বিদ্রোহী হইয়াছিলেন এবং 'সুলতান-ইবন-সুলতান' বলিয়া নিজেদের আখ্যায়িত করিয়াছিলেন? রাজার বংশধর বা সুলতানের বংশধর এই পরিচয়ের গৌরব ছিল যথেষ্ট—সুতরাং স্বেচ্ছায় কেন তিনি এই সুযোগ বা রাজবংশের গৌরব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? শামসউদ্দীন ফিরুজ যদি বুঘরা খানের পুত্রই হইবেন—তাহা হইলে তিনি রুকনউদ্দীনের ন্যায় নিশ্চয়ই "সুলতান-ইবন-সুলতান ইবন সুলতান" এই উপাধি গ্রহণ করিতেন।

শামসউদ্দীনের নামের সহিত "সুলতান-ইবন-সুলতান" এই উপাধি যে যুক্ত নাই—এই তথ্যটি প্রথমে ইতিহাসকার ব্লকম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশ করেন নাই। কৈকায়ুস ব্যতীত সুলতান নাসিরউদ্দীনের অন্য কোন পুত্রের উল্লেখ আমীর খসরু করেন নাই। বারানী বলেন ৬৮৩/১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কৈকায়ুসের সহিত আমীর খসরুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কায়কোবাদ ছিলেন উনবিংশতি বর্ষীয় তরুণ যুবক এবং কৈকায়ুস ছিলেন ষোড়শ-সপ্তদশ বর্ষীয় তরুণ। শামসউদ্দীন কৈকায়ুসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা[১] হইলে তাঁহার বয়স সেই সময়ে চতুর্দশ-পঞ্চদশ বৎসরের অধিক ছিল না। ৭১০/১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে শামসউদ্দীনের পুত্র জালালউদ্দীন এবং ঘিয়াসউদ্দীন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন শামসউদ্দীনের বয়স প্রায় আটত্রিশ-উনচল্লিশ। পিতার বয়স আটত্রিশ-উনচল্লিশ হইলে পুত্রের বয়স ষোল-সতর বৎসর হওয়াই সম্ভব, কিন্তু এই বয়সে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়া পুত্রের পক্ষে সম্ভবপর কিনা সন্দেহ।

---

১) দিল্লীর প্রথম মুসলিম সুলতান কুতুবউদ্দীনের জামাতা ছিলেন ইলতুৎমিস। ইলতুৎমিসের জামাতা বলবন এবং বলবনের পুত্র ছিলেন নাসীরউদ্দীন বুঘরা খান। সুলতান বলবনের বংশধরগণই বঙ্গে বলবনী সুলতান নামে অভিহিত।
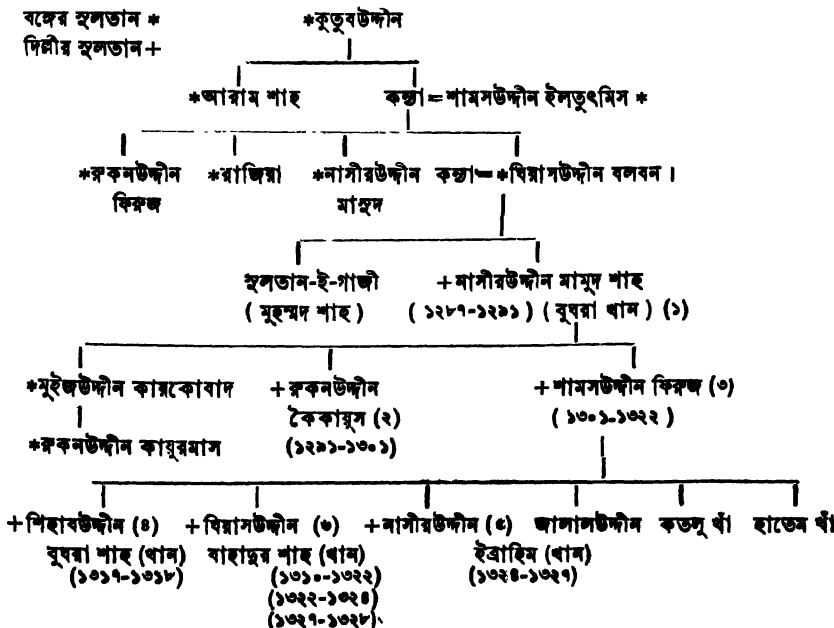
তদ্ব্যতীত ৯১৮/১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শ্রীহট্ট লিপিতে উল্লিখিত আছে যে, শামসউদ্দীনের নামের সহিত "দেহ্‌লভী" (দিল্লী) শব্দটি যুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু দিল্লীর কোন সুলতান বা সুলতানের বংশধর—কেহই এই দেহ্‌লভী উপাধি গ্রহণ করেন নাই। মিঃ স্টেপলটন বলেন, "ফিরুজশাহ্ (শামসউদ্দীন) 'দেহ্‌লভী' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি দিল্লী হইতে আগত সুলতান বুঘরা খানের পুত্র বা বংশধর।"[১] কিন্তু স্টেপলটনের এই যুক্তি সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নহে। 'বঙ্গের ইতিহাস' সংকলয়িতৃগণের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত) সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ় অভিমত যে, বাঙ্গলার সুলতান ফিরুজ শাহ্ ছিলেন দিল্লী হইতে নবাগত; বঙ্গের প্রাচীন রাজবংশের (বলবনী বংশ) সন্তান তিনি ছিলেন না এবং 'দেহ্‌লভী' শব্দের অর্থ দিল্লীর সুলতান নহে।[২]

দেহ্‌লভী শব্দের অর্থ

জালালউদ্দীন ফিরুজ খালজী কর্তৃক দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীতে আলবারীতুর্ক প্রভুত্বের অবসান হইয়াছিল, কিন্তু এই আলবারী তুর্কগণ আরও প্রায় চল্লিশ বৎসর (১২৯০-১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দ) বঙ্গ শাসন করিয়াছিলেন। অবশেষে মুহম্মদ তুঘলক বঙ্গবিজয় করেন এবং বঙ্গদেশ দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীন একটি প্রদেশে পরিণত হয়। সম্ভবতঃ আরামপ্রিয় বুঘরা খানের রাজত্বকালে সুলতান বলবনের ক্রীতদাস ফিরুজই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। কৈকায়ুসের রাজত্বকালে তিনি কৈকায়ুসের অধীনে বিহার প্রদেশের শাসক নিযুক্ত হন এবং কৈকায়ুসের মৃত্যুর পর বলবনী বংশের অবসানে তিনি বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহা অত্যন্ত যুক্তিবহ যে, বিহারের সামন্ত বা মালিক ফিরুজ আইতিগীন প্রায় অর্ধস্বাধীন ছিলেন এবং কৈকায়ুসের স্বাভবিক মৃত্যুর কিংবা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর তিনি বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।[৩] কিন্তু ইহাও অনুমান মাত্র।

বুঘরাখানের রাজত্বকালে ক্রীতদাস ফিরুজের প্রাধান্য

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুজ শাহ তাঁহার পুত্র তাজউদ্দীন হাতিম খানকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ৭০৯/১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দ এবং ৭১৫/১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ দুইটি শিলালিপিতে পিতা সুলতান ফিরুজ শাহ ও পুত্র বিহারের শাসনকর্তা হাতিম খানের নাম উল্লিখিত আছে। ইহাতে অনুমিত হয় ৭১৫/১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দেও হাতিম বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন এবং তিনিই সম্ভবতঃ দীর্ঘকাল পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই।[৪] ফিরুজ শাহের তৃতীয় একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ৭১৩/১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে দার-উল খয়রাত্ নামে ত্রিবেণীতে আর একটি মাদ্রাসা নির্মিত হইয়াছিল। এই মাদ্রাসাটি নির্মাণ করেন সপ্তগ্রামের মালিক শিহাবউদ্দীন জাফর খান খান-ই-জাহান। এই জাফর খান ত্রিবেণীর প্রথম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতা (৬৯৮ হিঃ/১২৯৮ খ্রীঃ) জাফর খান গাজী হইতে

তাজউদ্দীন হাতিম খান বিহারের শাসনকর্তা

সপ্তগ্রামের মালিক শিহাবউদ্দীন জাফর খান-ই-জাহান

---

১) *JASB*, Vol. XVIII, 1922, p. 413

২) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 82. *Foot note*, 1

৩) *ibid.* p. 77

৪) *JASB*, Old series, Vol. XLII, 1873, Pt. I. Pp. 249-50

সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। ত্রিবেণীর পাষাণনির্মিত এক দেবালয়েই জাফর খান গাজীর সমাধি রচিত হইয়াছিল (৬৯৮ হিঃ/১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে)।[১]

কৈকায়ুস কিংবা ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে সপ্তগ্রামের ইতিহাস কিংবা মুসলিম কর্তৃক সপ্তগ্রাম বিজয় সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ আজও রচিত হয় নাই। মিঃ স্টেপলটন জাফর খান গাজী ও জাফর খান খান-ই-জাহানকে অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জাফর খান গাজীও শামসুউদ্দীন ফিরুজ শাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ হুগলীর হিন্দু নরপতি ভূদেব নৃপতির সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। সাতগাঁ বিজয়ের প্রারম্ভেই তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। মিঃ মানির মতানুসারে এই ঘটনাও ঘটিয়াছিল ৬৯৮/১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে এবং ৭১৩/১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই।[২] কুরসী-নামার বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, জাফর খানের পুত্র উগওয়ান খান (উলুঘ খান) হিন্দুদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ইসলামধর্মে দীক্ষিত করেন এবং উগওয়ান খান বিজিত হিন্দুরাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। এই উগওয়ান খানকে লক্ষ্মীসরাই শিলালিপিতে উল্লিখিত জিয়াউদ্দীন উলুঘ খানের সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুমান করা হয়। সম্ভবতঃ শামসউদ্দীন ফিরুজ শাহ লক্ষৌতির সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহার কর্মচারী জিয়াউদ্দীন উলুঘ খানকে সপ্তগ্রামে স্থানান্তরিত বা বদলী করিয়াছিলেন এবং তিনি সপ্তগ্রামের হিন্দু সামন্তগণের সহিত প্রবল প্রতাপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কুরসী-নামাতে উল্লিখিত আছে যে, উলুঘ খানও সপ্তগ্রামেই পরলোক গমন করেন।[৩] অতঃপর সপ্তগ্রামের শাসনভার অর্পিত হইল জাফর খান বহরাম আইতিগীনের হস্তে। এই জাফর খান বহরাম ছিলেন কৈকায়ুসের রাজত্বকালে দেবকোটের মালিক বা সামন্ত (দেবকোট শিলালিপি ৬৯৭ হিঃ)। এই দ্বিতীয় জাফর খানই ত্রিবেণীতে দার-উল-খয়রাত নামক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং 'জিয়াউল হক ওয়া আল-দীন-জাফর খান খান-ই জাহান' (রাজ-সহায়ক ও ধার্মিকদের পৃষ্ঠপোষক) এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই তুর্ক মালিকই ফিরুজ শাহকে কৈকায়ুসের মৃত্যুর পর সকল অন্তর্বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করিয়াছিলেন। জাফর খান গাজী কখনও নিজেকে রাজসহায়ক বলিয়া গর্ব করেন নাই। তিনি কখনও সুলতান কৈকায়ুসের আধিপত্যকে অস্বীকার বা অবমাননা করেন নাই।

জাফর খান গাজী বনাম জাফর খান খান-ই জাহান

সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা জাফর খান বহরাম আইতিগীন

সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুজের রাজত্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্তমান ময়মনসিংহ জেলায় এবং ব্রহ্মপুত্র নদী অতিক্রম করিয়া শ্রীহট্ট জেলায় মুসলিম অধিকার বিস্তার। পূর্ববঙ্গ বিজয় সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যেই মুসলিমগণ শ্রীহট্ট বিজয়ে উদ্যোগী হইয়াছিল এবং শ্রীহট্ট অভিযানে তাহাদের কর্মকেন্দ্র ছিল সুবর্ণগ্রামে। শ্রীহট্ট বিজয়ের কাহিনী হিন্দু ও মুসলিম লেখকগণ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট জেলা বিজয়

১) *JASB*, Old series, Vol. XLII, 1870, Pt. I, p. 249
২) *JASB*, 1847
৩) *History of Bengal*, Dacca University. Vol. II. p. 78

প্রধানতঃ কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই এই বর্ণনাগুলি রচিত হইয়াছে। সেই সময়ে শ্রীহট্টে গৌরগোবিন্দ নামক একজন হিন্দু নরপতির উল্লেখ পাওয়া যায়। মুসলিম বিবরণীতে দেখা যায় যে, সেই সময়ে মুসলিম পীর ও উলেমাগণ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীহট্টে আগমন করেন। অবশেষে শামসুদ্দীন নামক বঙ্গের একজন সুলতান তাঁহাদের শুভ প্রচেষ্টাকে সফল করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্য সাহায্য প্রেরণ করেন (চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে)। শ্রীহট্ট বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ স্বরূপ হিন্দু ও মুসলিম লেখকগণ একই কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন—লক্ষ্মৌতিকে কেন্দ্র করিয়া যে সময়ে মুসলিম অধিকার পূর্ব ও দক্ষিণে বিস্তৃত হইতেছিল, সে সময়ে বহু উচ্চ-বর্ণের হিন্দু জন্মভূমি ও পৈতৃকগৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহট্ট অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কথিত হয় যে, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে কোন সময়ে হিন্দুরাজ্য শ্রীহট্টে গোপনে একটি গোহত্যা করা হয়। বাজ পক্ষী কিংবা চিল একখণ্ড গোমাংস হিন্দু রাজপ্রাসাদে কিংবা কোন ব্রাহ্মণের গৃহে নিক্ষেপ করে। ফলে শ্রীহট্টের হিন্দু নরপতি মুসলিম প্রজাগণের উপর কঠোর অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিলেন। মুসলিমগণ নিরুপায় হইয়া জনৈক গাজী বা সুলতানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। হিন্দুগণের পরাজয়ে এই ঘটনার পরিসমাপ্তি হইল।[১] কিন্তু এই ঘটনা অস্বাভাবিক নহে।

শ্রীহট্ট বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ

ইসলাম ধর্মপ্রচারে বহু স্থানে পীর এবং উলেমাগণ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সুলতান-গণের অগ্রদূতরূপে কায করিয়াছেন। ইসলাম ধর্ম অনুসারে অ-মুসলমানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা পুণ্যকর্ম। আবু-ইউসুফ বর্ণিত কিতাব-উল-খারাজ অনুসারে মুসলিম সুলতানদের আটটি অবশ্যকর্তব্য কর্মের মধ্যে অন্যতম ছিল বিধর্মীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দান। এই পুণ্য প্রচেষ্টার নাম 'জেহাদ'। মুসলিম সমাজে একটি অলিখিত মিলনসূত্র আছে যে, চারজন মুসলিম একমনে আল্লাহু-আকবর ধ্বনি করিয়া 'জেহাদ' আরম্ভ করিলে অন্য সকলেও তাহাতে যোগদান ও সাহায্য করিবে। বঙ্গদেশে এই সময়ে ইসলাম ধর্মপ্রচারে পীর, উলেমা, সুলতান ও আমীর সকলেই একযোগে কার্য করিয়াছিলেন। প্রত্যেক যুদ্ধের পরেই বিধর্মীকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া বন্দিত্ব বা মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলিমগণ রাজ্যবিজয় বা যুদ্ধবিগ্রহেই বিশেষভাবে উন্মত্ত ছিল। এই উন্মাদনা একটু প্রশমিত হইলে তাহারা ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করিল। দিল্লীতে সুলতান বলবনের অত্যাচারে নিপীড়িত ও বঙ্গে তুঘরিলের আতিথ্যে আকৃষ্ট হইয়া বহু পীর, সৈয়দ ও উলেমা পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা এই 'জেহাদ' প্রচেষ্টায় অগ্রণী ছিলেন।

মুসলিম-ধর্ম প্রচারে পীর-উলেমাগণের কার্যাবলী

সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুজ শাহ বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণকালে ছিলেন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক প্রৌঢ়। তাঁহার অন্ততঃ ছয় জন প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সমস্ত পুত্র পিতার হস্ত হইতে রাজক্ষমতা লাভের আশায় উন্মুখ ছিলেন এবং সুযোগ উপস্থিত হইলেই তাঁহারা পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন।

---

১) *History of Bengal*, **Dacca University, Vol. II, p. 78**

শামসউদ্দীন ৭০৭/১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শান্তিতেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার অধিকার সমগ্র বিহার, লক্ষ্ণৌতি, সাতগাঁ এবং সোনারগাঁ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার পর তাঁহার পুত্রগণ একে একে বিদ্রোহী হইতে থাকেন।

সুলতান শামসউদ্দীনের পুত্রগণের বিদ্রোহ

প্রথমে বিদ্রোহ করেন শামসউদ্দীনের পুত্র জালালউদ্দীন; লক্ষ্ণৌতির মুদ্রাশালা হইতে তিনি স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কন করেন। তাঁহাকে বিদ্রোহী হইতে দেখিয়া শামসউদ্দীনের অন্যান্য পুত্রগণও বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে থাকেন।[১] অপর পুত্র বাহাদুর খান পিতা ও ভ্রাতা জালালউদ্দীনকে বহিষ্কৃত করিয়া লক্ষ্ণৌতি অধিকার করিলেন (৭১০/১৩১০ খ্রীঃ)। তিনি ৭১০/১৩১০-৭১৪/১৩১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পিতার সহিত লক্ষ্ণৌতি হইতে স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলন করেন।[২] তিনি ছিলেন পিতার দ্বিতীয় পুত্র। ৭১৫/১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুর খান তাঁহার পিতা কর্তৃক লক্ষ্ণৌতি হইতে বিতাড়িত হইলেন এবং শিহাবউদ্দীন বুঘরা শাহ্ লক্ষ্ণৌতির অধিনায়ক হইলেন। তিনি দুই বৎসর লক্ষ্ণৌতির শাসনকার্য পরিচালনা করেন (৭১৭/১৩১৭-৭১৮/১৩১৮ খ্রীঃ)। এই সময়ে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন।[৩] বাহাদুর শাহের ক্ষমতা উত্তরবঙ্গে সাময়িকভাবে স্তিমিত হইয়াছিল। ৭১৭/১৩১৭ খ্রীষ্টাব্দে সোনারগাঁয়ের মুদ্রাশালায় প্রস্তুত বাহাদুর শাহের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে অনুমিত হয় যে, লক্ষ্ণৌতির অধিকারচ্যুত হইয়া তিনি সোনারগাঁ বিজয় করিয়া সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং ৭২০/১৩২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সোনারগাঁয়ে বসবাস করেন। সোনারগাঁ হইতে তাঁহার নামাঙ্কিত ৭২০/১৩২০-৭২৪/১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে! ৭২২/১৩২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শামসউদ্দীন ফিরুজের মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং অনুমিত হয় যে, সম্ভবতঃ ৭২২/১৩২২ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁহার রাজত্বের এবং জীবনের অবসান হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর বাহাদুর খান ভ্রাতাদের সকলকেই হত্যা করিলেন, রক্ষা পাইলেন একমাত্র নাসিরউদ্দীন ইব্রাহিম; কারণ তিনি পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। ৭২৮/১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে বাহাদুর মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুজ ৭১০/১৩১০-৭২২/১৩২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ (সপ্তগ্রাম) শাসন করিয়াছিলেন।[৪] পরবর্তী মুঘল সম্রাট শাহজাহানের মতই শামসউদ্দীনের পুত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ চলিয়াছিল এবং সকল সময়েই তাঁহাকে পুত্রদের বিরোধের জন্য সন্ত্রস্ত থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতাসম্পন্ন নরপতি ছিলেন, সেইজন্য শাহজাহানের মত শোচনীয় পরিণতি হইতে তিনি পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।

শামসউদ্দীন ফিরুজ লক্ষ্ণৌতি হইতে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়াতে রাজধানী পরিবর্তন করেন। কারণ শাসনকার্য, বসবাস এবং স্বাস্থ্যের দিক হইতে পাণ্ডুয়া অধিকতর

---

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 80

২) *Initial Coinage of Bengal*, p. 55

৩) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 80

৪) *Initial Coinage of Bengal*. p. 51.

উপযোগী বিবেচিত হইয়াছিল। তিনি পাণ্ডুয়ার নামকরণ করেন ফিরুজাবাদ এবং বঙ্গদেশের বহু নগরীরও নামকরণ করিয়াছিলেন ফিরুজাবাদ।[১] কিংবদন্তী আছে, বঙ্গের নূতন রাজধানী ফিরুজাবাদের নির্মাণ দিল্লীর সুলতান ফিরুজ তুঘলকের গৌরব-কীর্তি। কারণ, ফিরুজ শাহের নামের সহিত 'দেহ্‌লভী' বা দিল্লী কথাটি যুক্ত আছে। ইতিহাসকার টমাস কিংবা অন্য কেহই এই ফিরুজাবাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক কারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। ৭৩৩/১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মৌতি হইতে মুহম্মদ তুঘলকের মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল এবং ৭৪০/১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ার মুদ্রাশালা হইতে সুলতান ইলিয়াসের মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল। অতএব অনুমিত হয়, ৭৩৩/১৩৩৩-৭৪০/১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লক্ষ্মৌতি হইতে পাণ্ডুয়াতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল।[২] সুতরাং সাধারণ জনমত বা জনবিশ্বাস এই যে, ফিরুজ তুঘলক একডালা হইতে পশ্চাদপসরণের সময়ে পাণ্ডুয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উহার ফিরুজাবাদ নামকরণ করিয়াছিলেন—ইহা সত্য নহে। ৭২২/১৩২২-৮৯২/১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় একশত সত্তর বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে হাবসী সুলতান সাইফউদ্দীন ফিরুজ ব্যতীত ফিরুজ নামে অন্য কোন সুলতান বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। সুতরাং ফিরুজশাহ দেহ্‌লভীই এই পাণ্ডুয়া-ফিরুজাবাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। শামসউদ্দীন কেবল স্বীয় নামের গৌরববৃদ্ধি কিংবা স্বীয় নামকে অক্ষয় করিবার উদ্দেশ্যেই এই নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ব্যবসা বাণিজ্যের দিক হইতে এই পাণ্ডুয়া নগরী ছিল অধিকতর সুবিধাজনক; কারণ, স্থলপথ ও জলপথে এই নগরী হইতে সহজেই বিহার ও অযোধ্যায় যাতায়াত করা যাইত এবং খালজী আক্রমণের পক্ষেও লক্ষ্মৌতি অপেক্ষা পাণ্ডুয়া ছিল অধিকতর নিরাপদ স্থান। সুতরাং এই নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা সুলতান শামসউদ্দীনের দূরদর্শিতারই পরিচায়ক। পাণ্ডুয়া-ফিরুজাবাদ নগরী আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু সেই ধ্বংসস্তূপও বঙ্গের গৌরবস্মৃতি বহন করিতেছে।

বাহাদুর শাহ বলবনী (৭২২/১৩২২-৭২৮/১৩২৮ খ্রী:)

শামসউদ্দীন ফিরুজের মৃত্যুর পর (৭২২/১৩২২ খ্রী:) তাঁহার পুত্র বাহাদুর শাহ বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন;[৩] উক্ত বর্ষে মুদ্রিত ফিরুজ শাহের নামাঙ্কিত একটি রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ৭১০/১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহী পুত্ররূপে লক্ষ্মৌতিতে তাঁহার প্রথম সন্ধান পাওয়া যায়। পিতা শামসউদ্দীনের জীবিতকালে তিনি ৭১০/১৩১০-৭১৭/১৩১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে পিতার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপেই লক্ষ্মৌতিতে কিংবা উত্তরবঙ্গের কোন অংশে রাজত্ব করেন। তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রাই

---

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 81

২) *ibid.* p. 82

৩) *Initial Coinage of Bengal*, p. 49

তাঁহার স্বাধীনতার প্রমাণ।[১] অবশ্য তাঁহার পিতা সুলতান শামসউদ্দীন পুত্রের এই স্বাধীনতা স্বীকার করেন নাই। দুই বৎসর পরে (৭১৭/১৩১৭-৭১৮/১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার ভ্রাতা শিহাবউদ্দীন বুঘরা শাহ বাহাদুর শাহকে আসনচ্যুত করেন। কিন্তু বাহাদুর শাহ এই আসনচ্যুতির ক্ষতিপূরণ করিলেন পূর্ববঙ্গে—তিনি সুবর্ণগ্রাম অধিকার করিলেন এবং স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রমাণ দিলেন। পুনরায় ৭২০/১৩২০-৭২২/১৩২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পিতা-পুত্রকে লক্ষ্ণৌতির সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দেখা যায়। অবশেষে ৭২২/১৩২২ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ লক্ষ্ণৌতি ও সুবর্ণগ্রামে অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্বাধীন অধিকর্তা হইলেন। কিন্তু সাতগাঁ তাঁহার অধীনে ছিল কি-না তাহা সুনিশ্চিত ভাবে জানা যায় না। কারণ বাহাদুর শাহের কোন মুদ্রাতেই সাতগাঁয়ের উল্লেখ নাই। অথচ বারানীর বিবরণ অনুসারে জানা যায় যে, বঙ্গদেশ এই সময়ে লক্ষ্ণৌতি, সুবর্ণগ্রাম ও সপ্তগ্রাম—এই তিনটি রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন জাবিতান বা শাসনকর্তা ছিলেন।

বলবনী বংশের অন্তর্ভাগে বাঙ্গলা ও দিল্লী

বলবনী বংশের শেষ যুগে খালজী বংশ দিল্লীতে রাজত্ব করে (১২৯০-১৩২০ খ্রীঃ)। খালজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালউদ্দীন ও এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান আলাউদ্দীন ১২৯০-১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। খালজী সুলতান মুবারক খালজী ও খসরু খানের রাজত্বকালে (১৩১৬-১৩২০ খ্রীঃ) দিল্লীতে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং সেই গোলযোগের সুযোগে ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। খালজী বংশ বলবনী বংশকে দিল্লী হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল; সেই বিতাড়িত বংশের সন্তানগণ সুদূর বাঙ্গলাদেশে রাজত্ব করিতেন বলিয়া দুইটি বংশের সাক্ষাৎ সংঘর্ষের সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। তদ্ব্যতীত জালালউদ্দীন খালজী ছিলেন মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টায় সতত ব্যস্ত ও বিব্রত এবং আলাউদ্দীন ছিলেন দাক্ষিণাত্য বিজয় ও বিশ্বজয়ের স্বপ্নে বিভোর। সুতরাং খালজী যুগে বঙ্গের সহিত দিল্লীর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না। বাঙ্গলাদেশে এই সময়ে কৈকায়ুস, শামসউদ্দীন, বাহাদুর শাহ এবং ইব্রাহিম শাহ রাজত্ব করেন। তাঁহাদের কর্মকেন্দ্র বঙ্গদেশের চতুঃসীমার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। স্থানীয় হিন্দুরাজ্য আক্রমণ, ইসলাম ধর্মপ্রচার এবং সিংহাসনের জন্য পারিবারিক কলহেই তাঁহারা বিব্রত ছিলেন, দিল্লীর কোন ব্যাপারে বঙ্গের বলবনী বংশ হস্তক্ষেপ করে নাই।

ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলকের বাঙ্গলা আক্রমণের কারণ

সুলতান বলবনের পর ৬৮১/১২৮১-৭২৪/১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর কোন উল্লেখযোগ্য সেনাবাহিনী বাঙ্গলার ভূমি স্পর্শ করে নাই। বঙ্গদেশ 'পাণ্ডববর্জিত' এবং 'বিদ্রোহের দেশ' বলিয়াই বিবেচিত হইত। অথচ ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। জিয়াউদ্দীন বারানী বলেন—লক্ষ্ণৌতির জাবিতানের নির্মম অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া লক্ষ্ণৌতির কতিপয়

---

১) *Initial Coinage of Bengal*, p. 55

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলকের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাঁহাদের অনুরোধেই দিল্লীশ্বর ঘিয়াসউদ্দীন বঙ্গে অভিযান করেন। ইবন্ বাত্তুতা বলেন, নাসীরউদ্দীন ইব্রাহিম এবং শিহাবউদ্দীন বুঘরা শাহের অনুরোধে দিল্লীর তুঘলক সুলতান বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন।[১] জিয়াউদ্দীন বারানীর বিবরণের মধ্যে আংশিক সত্য নিহিত আছে। পিতা শামসউদ্দীনের সময় হইতেই পুত্র বাহাদুর শাহ ও বুঘরা শাহের বিবাদ চলিতেছিল। বাহাদুর শাহ ও বুঘরা শাহের দীর্ঘ ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের ফলে সাধারণ আমীর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জীবন ও পরিবার নিরাপদ ছিল না। সুতরাং বিপন্ন আমীরগণ যদি অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলার অবসান ও স্বস্তির আশায় বঙ্গেশ্বর হইতেও শক্তিশালী দিল্লীশ্বরের শরণাপন্ন হন, তবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, বরং ইহাই স্বাভাবিক। দিল্লীর সুলতানও যে বঙ্গের বিশৃঙ্খল ও অনিশ্চিত অবস্থার সুযোগে বঙ্গবিজয়ে প্রলুব্ধ হইবেন—তাহাতেও বিস্মিত হইবার কোন হেতু নাই। তারপর বাহাদুর শাহের অত্যাচারে ভ্রাতা শিহাবউদ্দীন বুঘরা শাহ ও ইব্রাহিম শাহের পক্ষে দিল্লীর সাহায্য প্রার্থনাও খুবই সম্ভবপর ব্যাপার। একথাও সত্য যে, নাসীরউদ্দীন ইব্রাহিম স্বয়ং ত্রিহুতে দিল্লীর সৈন্যের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন।[২] সুতরাং তিনি ঘিয়াসউদ্দীনকে আমন্ত্রণ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য কি! পুরস্কার স্বরূপ নাসীরউদ্দীন ইব্রাহিম লক্ষ্ণৌতির জাবিতানও নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

শিহাবউদ্দীন বুঘরা শাহ ও নাসিরউদ্দীন ইব্রাহিম শাহ কর্তৃক দিল্লীর সাহায্য প্রার্থনা

সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক পুত্র জুনা খানকে দিল্লীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া ৭২৪/১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে পূর্বাঞ্চলের পথে অভিযান আরম্ভ করিলেন।[৩] ত্রিহুত এবং বঙ্গবিজয়ের অভিপ্রায়ও তাঁহার ছিল। কারণ, প্রথমেই তিনি হিন্দু-স্বাধীনতার শেষ প্রতিনিধি মিথিলার কর্ণাটক বংশের উচ্ছেদ সাধন করেন। ত্রিহুতে দিল্লীশ্বরের মুদ্রাশালা নির্মিত হইল এবং ত্রিহুতের নাম হইল "তুঘলকপুর ওরফে (অথবা) ত্রিহুত।" ত্রিহুতেই বঙ্গের সুলতানজাদা নাসীরউদ্দীন ইব্রাহিম সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের পার্শ্বচররূপে যোগদান করিলেন এবং দিল্লীর সাহায্য লাভ করিলে বাহাদুর শাহকে বন্দী করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।[৪] সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন তাতার খান (পরে বহরাম খান) নামক একজন দুর্ধর্ষ সেনাপতিকে প্রচুর সৈন্যসহ নাসীরউদ্দীন ইব্রাহিমের সহিত প্রেরণ করিলেন। সেনাবাহিনী তাতার খানও নাসীরউদ্দীন ইব্রাহিম খানের অধীনে বঙ্গ অভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহাদের প্রথম লক্ষ্যস্থল ছিল লক্ষ্ণৌতি এবং পরিকল্পনা ছিল—পরে পূর্ব বাঙ্গলায় বাহাদুর শাহের নূতন শক্তিকেন্দ্রও তাঁহারা আক্রমণ করিবেন।

দিল্লীশ্বর ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলকের বঙ্গ অভিযান—ত্রিহুত বিজয়

বাহাদুর শাহ এই সময়ে বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার গয়েসপুরে (বর্তমান ময়মনসিংহ শহরের ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) একটি নূতন নগরী ও রাজধানী স্থাপন

---

১) *JASB, Old series,* Vol. XLIII 1874, pt. 1, p. 289
২) Elliot. *History of India,* Vol. III, p. 234
৩) *ibid.*
৪) *History of Bengal,* Dacca University, Vol. II, p. 84

করিয়াছিলেন। কারণ, লক্ষ্ণৌতির ভৌগোলিক অবস্থান সামরিক দৃষ্টিতে সুদৃঢ় এবং নিরাপদ ছিল না—দিল্লীর সৈন্যগণ লক্ষ্ণৌতির পথের সহিত পরিচিত ছিল। আবার সুবর্ণগ্রামে প্রত্যাবর্তনও সমীচীন ছিল না; কারণ, সুবর্ণগ্রাম তখন খুব সুরক্ষিত ছিল না, কিংবা সুবর্ণগ্রামে প্রত্যাবর্তন পরাজয় বলিয়াই গণ্য হইবার সম্ভাবনা ছিল। লক্ষ্ণৌতি, সুবর্ণগ্রাম এবং নববিজিত শ্রীহট্টের উপর প্রভাব ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে গয়েসপুরই ছিল রাজধানীর উপযুক্ত স্থান। তদ্ব্যতীত গয়েসপুর হইতে স্থলপথ ও জলপথে গমনাগমনও সুবিধাজনক ছিল। সুতরাং বাহাদুর শাহ গয়েসপুরে রাজধানী পরিবর্তন করিয়াছিলেন। মিঃ স্টেপলটন গয়েসপুরকে এনায়েতপুর গ্রামের সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন। এনায়েতপুরকে এখনও গ্রামবাসীরা (গিয়াস, খিয়াস, খেয়াস,) খেয়াইসপুর নামে অভিহিত করে। এই স্থানটি ছিল বানরা নদীর তীরে এবং মধুপুরের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে। গয়েসপুরের কোন ধ্বংসাবশেষ আজও আবিষ্কৃত হয় নাই—সুতরাং অনুমিত হয় যে, গয়েসপুর সম্ভবতঃ পরবর্তী কালের একডালা দুর্গের মতন কোন বন্য দুর্গ ছিল।[১] যাহা হউক, দিল্লীর সুলতানের সহিত ইব্রাহিমের যোগদান এবং লক্ষ্ণৌতি অভিযানের সংবাদ পাইয়া বাহাদুর শাহ শত্রুর অগ্রগতি প্রতিরোধ করিবার জন্য লক্ষ্ণৌতির দিকে অগ্রসর হইলেন।

গয়েসপুরে রাজধানী স্থাপনের যৌক্তিকতা

একমাত্র ইসামীর ফুতুহ-উস-সালাতীন নামক গ্রন্থেই বাহাদুর শাহের সহিত দিল্লীর রাজকীয় বাহিনীর সংঘর্ষের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। এই সংগ্রামে বাহাদুর শাহ বলবনীর প্রধান আক্রোশ ছিল তাঁহার ভ্রাতা নাসীরউদ্দীন ইব্রাহিমের উপর। তিনি ভীষণভাবে তাঁহার ভ্রাতার পরিচালিত দিল্লীর সেনাবাহিনীর বাম অংশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আক্রমণের বেগে দিল্লীর সৈন্য একসময়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিল্লীর সৈন্যদলের সংখ্যাধিক্যে বাহাদুর শাহের সেনাদল বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। উপায়ান্তর না দেখিয়া বাহাদুর শাহ সসৈন্যে স্থলপথে পূর্ব বাঙ্গলা অভিমুখে পলায়ন করিলেন। দিল্লীর রাজকীয় বাহিনীও মুক্ত তরবারি হস্তে হায়বৎউল্লার অধীনে তাঁহার অনুসরণ করিল। বাঙ্গলার সেনাবাহিনী গয়েসপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল—পথে দুই তিনটি গিরিশ্রেণী (সম্ভবতঃ মধুপুরের অরণ্য অঞ্চল) অতিক্রম করিয়া এক ক্ষীণতোয়া নদী কিংবা জলধারার সম্মুখে উপস্থিত হইল। এখানে বাহাদুর শাহের অশ্ব কর্দমে নিমজ্জিত হইল; অনুসরণকারী দিল্লীর সেনাবাহিনী তাঁহার এই অসহায় অবস্থার সুযোগে তাঁহাকে বন্দী করিল।

ইসামীর বর্ণনা—বাহাদুর শাহের সহিত দিল্লীর সেনা-বাহিনীর সংঘর্ষ

গলদেশে রজ্জুবন্ধন করিয়া বন্দী বাহাদুর শাহকে লক্ষ্ণৌতিতে সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক শাহের দরবারে উপস্থিত করা হইয়াছিল। ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক দুই মাস কাল লক্ষ্ণৌতিতে অবস্থান করিয়া লুণ্ঠিত ধনরত্ন সংগ্রহ করিলেন। নাসীরউদ্দীন ইব্রাহিম লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। সুবর্ণগ্রাম ও সপ্তগ্রাম দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত হইল। বহরাম খান (তাতার খান) দিল্লীর প্রতিনিধিরূপে বঙ্গের এই অংশ শাসন

ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলকের দিল্লী প্রত্যাবর্তন

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 85, F. N. 1

করিতে লাগিলেন।[১] ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক বাহাদুর শাহকে লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশরূপে গ্রহণ করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।[২] পথিমধ্যে পুত্র জুনা খানের ষড়যন্ত্রে (?) ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলকের অপঘাত মৃত্যু হইলেও বাহাদুর শাহ বলবনী বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে নীত হইলেন।[৩]

সুলতান নাসীরউদ্দীন ইব্রাহিম (৭২৪/১৩২৪-৭২৭/১৩২৭ খ্রীঃ)

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সুলতান শামসউদ্দীনের তৃতীয় পুত্র নাসীরউদ্দীন ইব্রাহিম বলবনী দিল্লীর অধীন জাবিতানরূপে লক্ষ্ণৌতির কার্যভার গ্রহণ করিলেন (৭২৪/১৩২৪ খ্রীঃ) এবং ঐ বৎসর হইতেই সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলকের সহিত যুক্ত নামে মুদ্রা প্রচলন করিলেন; ইহার কয়েকমাস পরেই মুহম্মদ তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (৭২৫/১৩২৫ খ্রীঃ ফেব্রুআরি-মার্চ)।

মুহম্মদ তুঘলক ও বঙ্গের শাসন-ব্যবস্থা

মুহম্মদ তুঘলক ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী সুলতান। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই তিনি পিতার বহু ব্যবস্থার পরিবর্তন করিলেন। প্রথমেই তিনি বাঙ্গলার প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। কারণ মৃত সুলতানের সদ্য প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রথমেই তিনি বন্দী বাহাদুর শাহকে মুক্তিপ্রদান করিয়া সসম্মানে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন এবং সুবর্ণগ্রামে বহরাম খানের নায়েব পদে নিযুক্ত করিলেন। মুহম্মদ তুঘলকের সন্দেহ ও আশঙ্কা জাগিয়াছিল যে, ঘিয়াসউদ্দীনের মৃত্যুতে সুদূর বঙ্গদেশে বহরাম খান ও নাসীরউদ্দীন ইব্রাহিম বিদ্রোহের চেষ্টা করিতে পারেন; সুতরাং উভয়ের শত্রু বাহাদুর শাহ বলবনীর সাহায্যে তাঁহাদিগকে সংযত ও অধীনে রাখা তিনি সহজ বিবেচনা করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গেই তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকেও তিনি বঙ্গে প্রেরণ করিলেন। মালিক পিণ্ডার খালজীকে কাদির খান উপাধি প্রদান করিয়া লক্ষ্ণৌতির শাসক নিযুক্ত করিলেন, মালিক আবু রেজা হইলেন উজীর। মালিক ইজ্জুদ্দীন ইয়াহিয়া সপ্তগ্রামের শাসক নিযুক্ত হইলেন।[৪]

মুহম্মদ তুঘলক নাসীরউদ্দীনকে সর্বাপেক্ষা অধিক অবিশ্বাস করিতেন। ইসামী বলেন, মুহম্মদ তুঘলক তাঁহাকে মুলতানে কিসলু খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তুর্ক পিতার সন্তান, বলবনের বংশধর—সুতরাং যুদ্ধে যোগদানের আমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। কিসলু খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া বংশের বীরত্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। এই আমন্ত্রণের পশ্চাতে ছিল বাঙ্গলাদেশ হইতে নাসীরউদ্দীন ইব্রাহিমকে স্থানান্তরিত করিবার গোপন ইচ্ছা। ইহার কারণ দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতা মিলিত হইয়াও অনর্থ সৃষ্টি করিতে পারেন, কিংবা দুই ভ্রাতা বিবদমান হইলেও অরাজকতা সৃষ্টির সম্ভাবনা।

---

১) Elliot, *History of India*, Vol. III, p. 235
২) *ibid.*
৩) *Tabqat-i-Akbari*, Tr., p. 213
৪) *Tarikh-i-Mubarakshahi*, p. 98

যাহাই হউক, কিসলু খানের পরাজয়ের পর নাসীরউদ্দীন ইব্রাহিমের নামাঙ্কিত কোন মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয় কিংবা তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয় (৭২৮/১৩২৮ খ্রীঃ)। অবশ্য মুহম্মদ তুঘলকের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গেই নাসীরউদ্দীন ইব্রাহিমের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল—রাজপদের গৌরবের তিনি অধিকারী ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। কাদির খানই ছিলেন লক্ষ্ণৌতির শাসক—তিনি নামে মাত্র নাসীরউদ্দীনের বশ্যতা স্বীকার করিতেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দিল্লীশ্বরের বশংবদ। ২৭/১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ তুঘলকের আমন্ত্রণে তিনি যখন দিল্লীতে গমন করেন তখন হইতেই তাঁহার নাম আর মুদ্রায় মুদ্রিত হয় নাই—যদিও তাঁহার স্থলতান উপাধি অক্ষুণ্ন ছিল। স্থতরাং তাঁহার মৃত্যু বা হত্যা কোনটাই বাঙ্গলার ইতিহাসকে প্রভাবান্বিত করে নাই।

নাসীরউদ্দীন ইব্রাহিমের পরিণতি

বাহাদুর শাহ বলবনী—দ্বিতীয় স্থলতানি

(৭২৪/১৩২৪-৭২৮/১৩২৮ খ্রীঃ)

৭২৪/১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিন বৎসর কাল বাহাদুর শাহ বলবনী স্থবর্ণগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন এবং মুহম্মদ তুঘলকের সহিত স্বীয় নাম যুক্ত করিয়া মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন। তিনি দুর্ধর্ষ ক্ষমতাশালী সেনাপতি তাতার খানের সহিত একযোগে পূর্ববঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার সহিত তাতার খানের বিরোধ হয় নাই। এই তিন বৎসর দিল্লীশ্বরের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া তাঁহারা চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার অনেকাংশ দিল্লী সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত করিলেন। তাতার খানের সিপাহসালার (অস্ত্রবাহক) ফকরউদ্দীন ভুলুয়াতে (বর্তমান নোয়াখালী) তাঁহার কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন এবং তথা হইতে তাতার খানের মৃত্যুর পর (৭৩৮/১৩৩৮ খ্রীঃ) স্থবর্ণগ্রাম অঞ্চল বিজয়ের চেষ্টা করেন।

তাতার খান ও বাহাদুর শাহের চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা বিজয়

মুহম্মদ তুঘলক মুলতানে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকার সময়ে (৭২৮/১৩২৮ খ্রীঃ) বাহাদুর শাহ বলবনী স্থবর্ণগ্রামে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। বাঙ্গলার বহু অধিবাসী এই বলবনী বংশকে বাঙ্গলার সন্তান এবং বাঙ্গালীর প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। বাহাদুরের সহিত তাতার খানের সংঘর্ষের ইতিহাস একমাত্র ইসামীই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইসামীর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বাহাদুর শাহ ময়মনসিংহ অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন। তাতার খান সসৈন্যে বিদ্রোহী বাহাদুরকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাহাদুর শাহ যমুনা নদী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাতার খান পলায়মান বিদ্রোহী সৈন্যকে পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। বাহাদুর শাহের বহু সৈন্য নদী অতিক্রমকালে জলমগ্ন হইল। বাহাদুর স্বয়ং বন্দী হইয়া তাতার খানের সম্মুখে আনীত হইলেন। নির্মমভাবে চর্মোৎপাটন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হইল। একটি কুশপুত্তলী বাহাদুর শাহের গাত্রচর্মে আবৃত করিয়া বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ স্থলতান মুহম্মদ তুঘলকের নিকট দিপালপুরে প্রেরিত

বাহাদুর শাহের শোচনীয় মৃত্যু

হইল। মুহম্মদ তুঘলক চল্লিশ দিবসব্যাপী উৎসবের আদেশ দিলেন। বাহাদুর শাহের গাত্রচর্মাবৃত কুশপুত্তলী দিল্লীর পথে পথে প্রদর্শিত হইল এবং বিদ্রোহীদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জনসাধারণের দৃষ্টিপথে বিলম্বিত করিয়া রাখা হইল।[১]

এইভাবে বিদ্রোহী সুলতান বাহাদুর শাহ মৃত্যুবরণ করিলেন এবং মরণেও তিনি গৌরবান্বিত হইয়া রহিলেন। তিনি সারাজীবনই বিদ্রোহ করিয়াছেন, বিদ্রোহের দুঃসাহসিকতার ফলও তিনি ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার উন্নতশির নত হয় নাই। কোন বিপত্তি, কোন প্রতিবন্ধকতাই তাঁহাকে হতোদ্যম করিতে পারে নাই—এমন কি বিদ্রোহী রূপেই তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় দশ বৎসর কাল দিল্লীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার মত আর কোন বঙ্গবীর অবশিষ্ট ছিলেন না। তুঘলক বংশের অভ্যুদয়ে বাঙ্গলায় বলবনবংশীয় স্বাধীন সুলতানগণের রাজত্বের অবসান হইল।

---

১) *JASB, Old Series*, Vol. XLIII. 1874, (1), p. 290
Futuh-us-Salatin, p. 428

সপ্তম অধ্যায়

তুঘলক যুগের অন্তর্ভাগে বঙ্গে বিদ্রোহ—ইলিয়াসশাহী বংশের অভ্যুদয়—বঙ্গের স্বাধীনতা

(৭২৮/১৩২৮—৮১৩-১৪/১৪১০-১১ খ্রীঃ)

সূচনা ঃ এই অধ্যায়ের বর্ণিত কাল (১৩২৮-১৪১০ খ্রীঃ) ৮২ বৎসর। বলবনী বংশ দিল্লী হইতে বিতাড়িত হইলেও স্বাধীনভাবে বঙ্গদেশে ১২৮৭-১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। এই সময়ে দিল্লীতে খালজী ও তুঘলক সুলতানগণ রাজত্ব করেন। খালজীগণ মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধ ও দাক্ষিণাত্য বিজয়ের প্রচেষ্টায় সতত বিব্রত ছিলেন—বঙ্গদেশের প্রতি দৃষ্টিপ্রদানের অবসর তাঁহাদের ছিল না। দিল্লীতে তুঘলক বংশ প্রতিষ্ঠিত হইলে তুঘলক সুলতানগণ বঙ্গদেশে দিল্লীর অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। মুহম্মদ তুঘলক বঙ্গের বিদ্রোহ নিরসনকল্পে বঙ্গে একই সময়ে একাধিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজত্বের শেষ ভাগে মুহম্মদ তুঘলক বিদ্রোহ দমনে বিব্রত হইয়া পড়িলেন—দিল্লী হইতে বিতাড়িত আমীর ইলিয়াস শাহ বঙ্গে স্বাধীন ইলিয়াস-শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ফিরুজ তুঘলক বহু চেষ্টা করিয়াও ইলিয়াস শাহ কিংবা তাঁহার পুত্রকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। ইলিয়াসশাহী বংশের ইতিহাস বঙ্গের এক গৌরবময় অধ্যায়।

ঐতিহাসিক উপাদানের স্বল্পতা ঃ এই যুগের ইতিহাসের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান মুদ্রা। এই যুগের লিখিত কয়েকখানি সমসাময়িক ইতিহাসও আছে—যেমন, জিয়াউদ্দীন বারানীর তারিখ-ই-ফিরুজশাহী, ইয়াহিয়া বিন আহম্মদ সরহিন্দির তারিখ-ই-মুবারকশাহী (১৪৩৪ খ্রীঃ), নিজামউদ্দীন বক্‌সীর তবকাৎ-ই-আকবরী (১৫৮৯ খ্রীঃ) এবং ইবন বাততুতার ভ্রমণকাহিনী। কিন্তু প্রায় প্রতি গ্রন্থের মধ্যেই মতদ্বৈধ রহিয়াছে ; কারণ এই সকল ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল দিল্লীর দরবারে—অবজ্ঞাত, অবহেলিত সুদূর বঙ্গের সীমারেখার বাহিরে। সুতরাং এই সকল গ্রন্থকারদের সকলেই সম্ভবতঃ বঙ্গের ইতিহাস-রচনায় একমাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। জনশ্রুতির মধ্যে আংশিক সত্য নিহিত থাকিলেও ঐতিহাসিক সত্যের প্রচুর অপলাপের সম্ভাবনা থাকে।

ইতিহাস ও জনশ্রুতি

এতদ্ব্যতীত বঙ্গের সুলতানগণ কর্তৃক প্রচারিত মুদ্রা এই যুগের ইতিহাস-রচনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই যুগের মুদ্রার সংখ্যা অতি মুষ্টিমেয়। যে কয়েকটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাদের গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং অনেক ক্ষেত্রে মুদ্রার পার্শ্বভাগ ভগ্ন হওয়ায় অনেক লিপি-অংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং মুদ্রার লিপি হইতেও ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

আধুনিক ইতিহাসকারগণের মধ্যে এই সকল লিপির পাঠ সম্বন্ধেও গভীর মত-ভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। মুদ্রাতে উল্লিখিত তারিখগুলিও সংখ্যায় লিখিত হয় নাই—অনেক স্থলে আরবী অক্ষরে লিখিত এবং লেখাও অত্যন্ত অস্পষ্ট। একই সুলতানের সকল মুদ্রা পাশাপাশি সংস্থাপিত এবং ভগ্ন অংশ সংযোজিত করিয়া মুদ্রা-লিপির পাঠোদ্ধার এবং মুদ্রায় উল্লিখিত সুলতানের রাজত্বকালের সন-তারিখ নির্ণয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাও সহজসাধ্য নহে। একমাত্র ডাঃ নলিনী-কান্ত ভট্টশালী মহাশয় কলিকাতা, ঢাকা ও শিলং মিউজিয়ামে সংরক্ষিত মুদ্রার তুলনামূলক পাঠ ও গবেষণা দ্বারা উহাদের অর্থ ও ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনেক মুদ্রাতত্ত্ববিদের পক্ষেই এইরূপ তুলনামূলক আলোচনা ও গবেষণা সম্ভবপর নহে। আধুনিক ইতিহাসকারগণ বহুক্ষেত্রে ডাঃ ভট্টশালী কৃত সমসাময়িক সময়পঞ্জী ও বংশানুক্রমকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

মুদ্রা ও মুদ্রালিপি প্রমাণ

মুহম্মদ তুঘলকের শাসনকালে বঙ্গদেশ ঃ পশ্চিমে রাজমহল পাহাড় হইতে পূর্বে গারো পাহাড় এবং বীরভূমি বা বীরভূমের গৈরিক মালভূমি হইতে ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যভাগে বঙ্গের সুবিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চল। এই অঞ্চলের উত্তরে গিরিরাজ হিমালয়ের উত্তুঙ্গ পার্বত্য ভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গরাশি। এই অঞ্চল নদীমাতৃক—নদীবাহিত পললপুষ্ট এবং ত্রিভুজাকার। এই ত্রিভুজের বামবাহু মালদহ-বাঁকুড়ার মধ্য দিয়া দক্ষিণে সমুদ্রতীর স্পর্শ করিয়াছে। দক্ষিণ বাহু রংপুর, ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্য দিয়া সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই অঞ্চল আয়তনে ইংলণ্ড-স্কটলণ্ডের মিলিত আয়তনের সমান এবং গঙ্গা ও যমুনা (ব্রহ্মপুত্রের জলধারা পুষ্ট) নদী দ্বারা তিনটি বিশিষ্ট অংশে বা অঞ্চলে বিভক্ত। উত্তরের অংশ গঙ্গা ও যমুনা নদী দ্বারা সীমাবদ্ধ। অবশিষ্ট অংশ গঙ্গা (ভাগীরথী) নদী দ্বারা দুই অংশে বিভক্ত—ভাগীরথীর পূর্বাংশের নাম পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমাংশের নাম রাঢ়ভূমি।

বঙ্গের তিনটি বিশিষ্ট বিভাগ

মুহম্মদ তুঘলক তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে বঙ্গদেশের এই প্রাকৃতিক সীমানির্দিষ্ট তিনটি বিভাগকে বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। উত্তরাংশের রাজধানী ছিল প্রাচীন গৌড় বা লক্ষ্ণৌতিতে, পূর্বাঞ্চলের রাজধানী ছিল সুবর্ণ-গ্রামে বা সোনারগাঁয়ে এবং পশ্চিমাংশের রাজধানী ছিল সাতগাঁয়ে বা সপ্তগ্রামে। মালিক পিণ্ডার খালজী লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। সুলতান মুহম্মদ তুঘলক তাঁহাকে 'কাদির খান' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিলেন। হিসামউদ্দীন আবু রেজা তাঁহার উজীর নিযুক্ত হইলেন। সাতগাঁয়ের শাসনভার ইজ্জউদ্দীন ইয়াহিয়ার হস্তে ন্যস্ত হইল, সোনারগাঁয়ের শাসক হইলেন সুলতান মুহম্মদ তুঘলকের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাতার খান বা **বহরাম খান**। মুহম্মদ তুঘলক বন্দী বাহাদুর শাহকে সসম্মানে মুক্তি প্রদান করিলেন এবং সোনারগাঁয়ে বহরাম খানের নায়েব নিযুক্ত করিলেন। বাহাদুর শাহও সুলতানকে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং প্রতিশ্রুতির

মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের প্রারম্ভে বঙ্গের নূতন শাসন-ব্যবস্থা

প্রতিভূস্বরূপ স্বীয় পুত্রকে দিল্লীর দরবারে প্রেরণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন।[১] বহরাম খানের সহকর্মিরূপে বাহাদুর শাহকে প্রেরণের পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গের বিদ্রোহ দমন। কারণ বহরাম ও বাহাদুর ছিলেন পরস্পর শত্রু, অথচ দুইজনেই দিল্লীশ্বরের নিযুক্ত কর্মচারী। পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়াই দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে মিলিত হইয়া বিদ্রোহ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

বাহাদুর শাহের বিদ্রোহ, পরাজয় ও মৃত্যু

এই ব্যবস্থায় দেশের শান্তি কিছুদিন অব্যাহত ছিল এবং শাসনকার্যও নির্ঝঞ্ঝাটেই নিষ্পন্ন হইয়াছিল (৭২৫/১৩২৫-৭২৮/১৩২৮ খ্রীঃ)। বাহাদুর শাহ স্বীয় মুদ্রায় মুহম্মদ তুঘলকের নাম মুদ্রিত করিয়া তাঁহার আনুগত্যের প্রমাণ দিলেন, কিন্তু পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ দিল্লীতে প্রেরণের প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করিলেন না। ৭০৮/১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বাহাদুরের পরাজয় ও মৃত্যুই এই বিদ্রোহের পরিণতি।

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর বঙ্গের শাসন-ব্যবস্থা

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর বঙ্গের তিনটি অঞ্চল—লক্ষ্ণৌতি, সাতগাঁ এবং সোনারগাঁ দিল্লীর সুলতানের অধীনে চলিয়া গেল এবং দিল্লীশ্বরের নিযুক্ত প্রতিনিধিই এই অঞ্চল শাসন করিতে লাগিলেন। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর সোনারগাঁয়ের সর্বময় কর্তা হইলেন বহরাম খান[২]। সাতগাঁয়ে ইজউদ্দীন ইয়াহিয়া[৩] এবং লক্ষ্ণৌতিতে কাদির খান[৪] শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। দশ বৎসর কাল (৭২৮/১৩২৮-৭৩৮/১৩৩৮ খ্রীঃ) বঙ্গদেশে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব কিংবা দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ হয় নাই। ৭৩৮/১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সোনারগাঁয়ে বহরাম খানের মৃত্যু হইল।[৫] সম্ভবতঃ তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যুই হইয়াছিল। রিয়াজ উস্-সালাতীন গ্রন্থে ভ্রমবশতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, কাদির খানের অস্ত্রবাহক ফকরউদ্দীন স্বীয় প্রভু কাদির খানকে হত্যা করিয়াছিলেন। তারিখ-ই-মুবারকশাহী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ফকরউদ্দীন বহরাম খানের অস্ত্রবাহক ছিলেন, কাদির খানের নহে। তিনি ছিলেন প্রভুর দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ। সুতরাং দিল্লী হইতে নূতন শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া আসিবার পূর্বেই তিনি সোনারগাঁয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন (৭৩৯/১৩৩৯ খ্রীঃ)।

ফকরউদ্দীনের পরিচয়

ফকরউদ্দীনের বিদ্রোহ ও পরাজয়

ফকরউদ্দীন কর্তৃক স্বাধীনতা-ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় পূর্ববঙ্গে সমরানল প্রজ্বলিত হইল। সাতগাঁ এবং লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তা ইজউদ্দীন ইয়াহিয়া ও কাদির খান ফকরউদ্দীনের বিরুদ্ধে মিলিত হইলেন। মালিক হুসামউদ্দীন আবু রেজা ও কারামাণিকপুর অঞ্চলের শাসনকর্তা আমীর ফিরুজ খানও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। তাঁহারা একযোগে সোনারগাঁ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ফকরউদ্দীন মুবারক শাহ পরাজিত হইয়া সসৈন্যে সোনারগাঁ পরিত্যাগ করিলেন

---

১) Barani, *Tarikh-i-Firusshahi*, Tr., p 461

২) Isami, *Futuh-us-Salatin*, Tr., p. 85. F. N.

৩) *Muntakhab-ut-Tawarikh*, Tr., part. I. p. 308

৪) *Tarikh-i-Mubarakshahi*, Tr., p. 408

৫) Elliot, *History of India*, Vol. III, p. 242

এবং মেঘনা অতিক্রম করিয়া ভুলুয়াতে প্রস্থান করিলেন; সোনারগাঁ দিল্লীর অধীনে চলিয়া গেল। লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তা কাদির খান সোনারগাঁয়েরও শাসক হইলেন। ইজউদ্দীন ও ফিরুজ খান স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। আবু রেজা সোনারগাঁয়েই রহিলেন।

সোনারগাঁয়ে কাদির খান

সোনারগাঁ হইতে ফকরউদ্দীনকে বিতাড়িত করিয়া কাদির খান বহুসংখ্যক হস্তী লাভ করিলেন। সোনারগাঁয়ের প্রভূত ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হইল। কাদির খান ছিলেন অত্যধিক অর্থলোলুপ; মালিক আবু রেজার পরামর্শ উপেক্ষা করিয়াই তিনি স্বয়ং সমস্ত লুণ্ঠিত সম্পদ আত্মসাৎ করিলেন। সৈন্যগণও তাহাদের লুণ্ঠিত দ্রব্যের প্রাপ্য অংশ হইতে বঞ্চিত হইল—ফলে সৈন্যগণ অসন্তুষ্ট হইল। আরও লুণ্ঠনের আশায় কাদির খান সোনারগাঁয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বর্ষা আরম্ভ হইল—পশ্চিমের সহিত যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া গেল। পূর্ববঙ্গের জলবায়ুর উষ্ণ-আর্দ্রতায় এবং কর্দমে কাদির খানের বহু অশ্ব ও সৈন্য বিনষ্ট হইল। বর্ষাগমে ম্যালেরিয়ার প্রকোপও বৃদ্ধি পাইল। কাদির খানের সেনাবাহিনীতে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইল। সুযোগ বুঝিয়া ফকরউদ্দীন পুনরায় সোনারগাঁয়ে উপস্থিত হইলেন। কাদির খানের অসন্তুষ্ট সেনাবাহিনী বিদ্রোহী ফকরউদ্দীনের সহিত যোগদান করিল। কাদির খান পরাজিত ও নিহত হইলেন।[১] ফকরউদ্দীন সোনারগাঁয়ের শাসক বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

কাদির খানের শাসনকাল

রিয়াজ-উস্-সালাতীনের মতানুসারে কাদির খান চৌদ্দ বৎসর লক্ষ্ণৌতি শাসন করেন (৭২৫/১৩২৫-৭৩৯/১৩৩৯ খ্রীঃ)। তিনি মুহম্মদ তুঘলকের সিংহাসনারোহণের বৎসর লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং ৭৩৯/১৩৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ফকরউদ্দীনের বিরুদ্ধে রাজকীয় বাহিনী পরিচালনা করিতে চেষ্টা করিয়া নিহত হন।[২]

ফকরউদ্দীন কর্তৃক লক্ষ্ণৌতি বিজয়

সোনারগাঁ বিজয়ে উৎসাহিত হইয়া ফকরউদ্দীন লক্ষ্ণৌতি বিজয়ের আয়োজন করিলেন এবং তাঁহার ক্রীতদাস মুকলিসকে একদল সৈন্যসহ লক্ষ্ণৌতি বিজয়ে প্রেরণ করিলেন। লক্ষ্ণৌতি অধিকৃত হইল; লক্ষ্ণৌতির প্রভূত ধনসম্পদ ফকরউদ্দীনের হস্তগত হইল। বদায়ুনী বলেন, ফকরউদ্দীন মুকলিসকে লক্ষ্ণৌতির শাসক এবং আলী মুবারককে তাঁহার সৈন্যবাহিনীর আরিজ বা পরিদর্শক নিযুক্ত করেন।[৩]

রিয়াজ-উস-সালাতীন কর্তৃক ফকরউদ্দীনের ভাগ্যবর্ণনা

রিয়াজ-উস্-সালাতীনের বর্ণনা অনুসারে, ফকরউদ্দীন লক্ষ্ণৌতির সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মুকলিস নামক তাঁহার সেনাপতিকে বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল জয় করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাদির খানের সেনাপতি আলী মুবারক মুকলিসকে পরাজিত ও নিহত করেন। আলী মুবারক স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সুলতান আলাউদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ফকরউদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া (৭৪১/১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন।[৪] সুলতান

---

১) *Riyaz-us-Salatin*, Tr., p. 96
২) *Muntakhab-ut-Tawarikh*, Part I, p. 308
৩) *ibid.*
৪) *Riyaz-us-Salatin*, Tr., p. 96

ফকরউদ্দীন সম্বন্ধে রিয়াজ-উস্-সালাতীনের এই উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে; কারণ প্রথমতঃ, ফকরউদ্দীনের যত মুদ্রা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাদের সকলগুলিই সুবর্ণগ্রামে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল।[১] দ্বিতীয়তঃ, আলাউদ্দীন আলী শাহের যত মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সকলই ফিরুজাবাদে মুদ্রাঙ্কিত।[২] সুতরাং আলী মুবারক লক্ষ্মৌতির অধিকর্তা হইলে তাঁহার মুদ্রায় লক্ষ্মৌতির মুদ্রাশালার নাম অঙ্কিত থাকিত। তৃতীয়তঃ, ফকরউদ্দীন কাদির খানের অস্ত্রবাহক হইলে এবং প্রথমে লক্ষ্মৌতি অধিকার করিলে তাঁহার কোন-না-কোন মুদ্রায় লক্ষ্মৌতির উল্লেখ থাকিত। চতুর্থতঃ, ৭৪১/১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দে ফকরউদ্দীনের মৃত্যু হইতে পারে না; কারণ তাঁহার নামাঙ্কিত ৭৫০/১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

জিয়াউদ্দীন বারানীর তারিখ-ই-ফিরুজশাহী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বহরাম খানের মৃত্যুর পর ফকরউদ্দীন কাদির খানকে হত্যা করিয়া সাতগাঁ, সোনারগাঁ এবং লক্ষ্মৌতির অধীশ্বর হইয়াছিলেন।[৩] কিন্তু লক্ষ্মৌতি অধিকৃত হইলে কাদির খানের সৈন্যাধ্যক্ষ আলী মুবারক মুকলিসকে সম্মুখ যুদ্ধে হত্যা করিয়া লক্ষ্মৌতিতে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া দিল্লীতে তাঁহার বিজয়বার্তা প্রেরণ করিলেন এবং লক্ষ্মৌতির শাসনকর্তৃপদ লাভের প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। কিন্তু দিল্লীশ্বর মুহম্মদ তুঘলক তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন এবং দিল্লী হইতে তাঁহার বিশ্বস্ত কোতোয়াল মালিক ইউসুফকে লক্ষ্মৌতির শাসকরূপে প্রেরণ করিলেন। বঙ্গভূমি স্পর্শ করিবার পূর্বেই পথে মালিক ইউসুফ প্রাণত্যাগ করিলেন।[৪] এই সময়ে দিল্লীর সুলতান পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে বিদ্রোহ দমনে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন; অনিশ্চিত বঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাতের অবসর তাঁহার ছিল না। সুতরাং আলী মুবারক বিনা নিযুক্তিতেই লক্ষ্মৌতির শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে লাগিলেন এবং 'আলাউদ্দীন আলী শাহ' উপাধি গ্রহণ করিলেন (৭৩৯/১৩৩৯ খ্রীঃ)। এইভাবে বঙ্গদেশ দিল্লী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

তারিখ-ই-ফিরুজশাহী গ্রন্থে ফকরউদ্দীনের বিবরণ

জিয়াউদ্দীন বারানীর তারিখ-ই-ফিরুজশাহী গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, ৭৪১/১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ তুঘলক বঙ্গে অভিযান করিয়া লক্ষ্মৌতি অধিকার করেন। ফকরউদ্দীন এই সংগ্রামে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তাঁহাকে দিল্লীতে লইয়া গিয়া হত্যা করা হইল। ৭৪১/১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ তুঘলক বঙ্গে অভিযান করিতে পারেন, কিন্তু ফকরউদ্দীন নিহত হন নাই। কারণ, মুদ্রায় প্রাপ্ত প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, তিনি ৭৫০/১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লক্ষ্মৌতিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদি মুহম্মদ তুঘলক এই সময়ে বঙ্গে অভিযান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বঙ্গের অন্যান্য নরপতি বা মালিক—যেমন আলাউদ্দীন আলী শাহ কিংবা হাজী ইলিয়াস—কেহই নিষ্কৃতিলাভ করিতেন না।

তারিখ-ই-মুবারকশাহীর বর্ণনা—মুহম্মদ তুঘলকের বঙ্গ অভিযান

---

১) H. N. Wright, *Catalogue of Coins in the Indian Museum*, *Cal.* Vol. II, Part II, p. 149
২) *ibid.*
৩) Elliot, *History of India*, Vol. III, p. 243
৪) *Tarikh-i-Mubarakshahi*, p. 105. *Muntakhab-ut-Tawarikh*, Part I. Tr., p. 308

আলী মুবারক বা আলাউদ্দীন আলী শাহ

(৭৩৯/১৩৩৮-৭৪৩/১৩৪২ খ্রীঃ)

আলী মুবারক প্রায় সতর মাস নির্ঝঞ্ঝাটে লক্ষ্ণৌতি শাসন করিলেন। দিল্লীর সুলতানের অবসর নাই যে বঙ্গের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন—সাম্রাজ্যের চতুর্দিক বিদ্রোহবহ্নিতে ধূমায়মান। কিন্তু আলী মুবারক দীর্ঘদিন শান্তি ভোগ করিতে পারিলেন না; দিল্লী হইতে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কিংবা ধাত্রীপুত্র ইলিয়াস বাঙ্গলা দেশে আগমন করিলেন—উদ্দেশ্য লক্ষ্ণৌতির সিংহাসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা।[১] সামান্য যুদ্ধের পর ইলিয়াস দক্ষিণ-বাঙ্গলায় প্রস্থান করিলেন, সেই অরক্ষিত স্থানে ৭৪৩/১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলন করিলেন।[২]

বঙ্গের তিনটি বিভাগ —তিনজন শাসক

এইরূপে এই সময়ে বঙ্গদেশ আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। ফকরউদ্দীন পূর্বাঞ্চলে (সোনারগাঁয়ে), আলী মুবারক পশ্চিমাংশে (লক্ষ্ণৌতিতে) এবং ইলিয়াস দক্ষিণাংশে (সাতগাঁয়ে) শাসন করিতেন। ইবন্ বাত্তুতা বলেন—আলী শাহ এবং ফকরউদ্দীনের মধ্যেই ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। ফকরউদ্দীন পূর্ববঙ্গ আক্রমণের প্রতিশোধ-গ্রহণকল্পে বর্ষাগমে লক্ষ্ণৌতি আক্রমণ করেন। কারণ, তাঁহার নৌবল ছিল অধিকতর শক্তিশালী; সুতরাং বর্ষাকালেই তাঁহার সুবিধা হইত। আলী শাহ ৭৪৩/১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লক্ষ্ণৌতি শাসন করেন এবং সেই বৎসরেই তিনি পরলোক গমন করেন কিংবা তাঁহার ভ্রাতা ইলিয়াস কর্তৃক নিহত হন। কথিত আছে যে, তিনি শেখ জালালউদ্দীন তাব্রিজির সমাধিতে বিখ্যাত পাণ্ডুয়া মসজিদ নির্মাণ করেন। অবশ্য শেখ জালালউদ্দীনের মৃত্যু হয় ৬৪৪/১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ আলী শাহের প্রায় একশত বৎসর পূর্বে। সুতরাং এই মসজিদ সম্ভবতঃ আলী শাহের পূর্বেই নির্মিত হইয়াছিল।[৩]

ফকরউদ্দীনের শেষ জীবন

আলী শাহের প্রতিদ্বন্দ্বী ফকরউদ্দীন আবুল মুজাফর মুবারক শাহ আরও কিছুকাল সোনারগাঁ অঞ্চল শাসন করেন। ফকরউদ্দীন সোনারগাঁ হইতে চট্টগ্রামে অভিযান করিয়াছিলেন। ফলে চট্টগ্রাম তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। তিনি মেঘনার তীরবর্তী চাঁদপুর হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ৭৪৯/১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফকরউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইখতিয়ারউদ্দীন 'গাজীশাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজত্ব আরম্ভ করেন। ৭৫০/১৩৪৯-৭৫৩/১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সোনারগাঁয়ের মুদ্রাশালায় অঙ্কিত তাঁহার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ৭৫৩/১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দীন গাজী শাহ ইলিয়াস শাহ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন।

---

১) Ahmed, *Supplement to I. M. C.* II, 1939, p. 39

২) *History of Bengal*, Dacca University, Vol, II, p. 99

৩) *ibid*

ফকরউদ্দীনের শাসনকালে মরক্কো দেশীয় পর্যটক ইবন বাত্‌তুতা বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করেন (৭৪৩/১৩৪২-৭৪৬/১৩৪৫ খ্রীঃ)। তাঁহার বিবরণী হইতে তৎকালীন বঙ্গের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মনৈতিক জীবনের চিত্র পাওয়া যায়।

ইবন বাত্‌তুতার শ্রীহট্টে গমন

ইবন বাত্‌তুতার বঙ্গ-ভ্রমণ কাহিনী

ইবন বাত্‌তুতা চীন পরিভ্রমণের প্রাক্কালে সাতগাঁয়ের পথে বঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সাতগাঁ ছিল হুগলী নদীর মোহনায় একটি বিখ্যাত সমুদ্রবন্দর। সাতগাঁ হইতে তিনি শ্রীহট্ট অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টে তখন **কোরায়েশ বংশীয়** বিখ্যাত ফকীর শেখ জালালউদ্দীন তাব্রিজি বাস করিতেছিলেন। এই মুসলিম ফকীর ধর্মপ্রচারোদ্দেশে ভারতে আগমন করেন এবং ঘিয়াসপুরে শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পূর্বাঞ্চলের পথে অগ্রসর হইলেন এবং ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রত্যন্তসীমা শ্রীহট্টকে তাঁহার প্রচারকেন্দ্ররূপে নির্বাচন করিলেন।[১] এই ফকীর ছিলেন দীর্ঘদেহ। সংযমের কঠোরতায় তাঁহার দেহ অত্যন্ত শীর্ণও হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার সংযম-পবিত্র জীবনাদর্শে আকৃষ্ট হইয়া স্থানীয় বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রীহট্টের নিকটবর্তী একটি পর্বতকন্দর ছিল তাঁহার প্রিয় আবাসভূমি। তিনি তথায় সর্বক্ষণই উপাসনায় মগ্ন থাকিতেন। দশ দিবস উপবাসের পর একাদশ দিবসে সামান্য গো-দুগ্ধ পান করিয়া উপবাস ভঙ্গ করিতেন। একটি গাভীই ছিল তাঁহার একমাত্র সম্পদ। সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি দণ্ডায়মান থাকিয়া উপাসনা করিতেন। সুতরাং তৎকালে এই মুসলমান ফকীরের সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই অদ্ভুত ফকীরকে দর্শন করিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত হইয়া ইবন বাত্‌তুতা শ্রীহট্টে গমন করেন। ইবন বাত্‌তুতা লিখিয়াছেন যে, এই ফকীর প্রতিদিন প্রভাতে মক্কায় তাঁহার প্রভাতী নমাজ সম্পন্ন করিতেন এবং দিবসের অবশিষ্ট কাল তিনি ঐ পর্বতকন্দরেই অবস্থান করিতেন। তদ্ব্যতীত প্রতিবৎসর ঈদ উপলক্ষে তিনি মক্কায় গমন করিতেন। ইবন বাত্‌তুতার এই কাহিনী হইতে মনে হয়, মুসলিম সুফী উলেমাগণ ও ফকীরগণ তাঁহাদের উন্নত জীবনধারায় হিন্দুগণকে আকৃষ্ট করিতেন এবং মুসলিম ধর্ম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করিতেন। অবশ্য ইহার মধ্যে অনেক সত্য-অসত্য আলেখ্য রহিয়াছে।

ইবন বাত্‌তুতার ভ্রমণ কাহিনী

সিলেটে ফকীর জালালউদ্দীন

ইবন বাত্‌তুতার যবদ্বীপ যাত্রা

তিন দিবস ঐ মুসলিম ফকীরের খানকায় (ক্ষুদ্র কুটির) অবস্থান করিয়া ইবন বাত্‌তুতা নদীপথে সোনারগাঁ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় যবদ্বীপগামী একটি অর্ণবপোত যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিল। ইবন বাত্‌তুতা ঐ অর্ণবপোতে যবদ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

ইবন বাত্‌তুতার এই ভ্রমণপথ সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রমণকাহিনীর অনুবাদকগণের

১) *JASB*, 1873, Pp. 278-80

মধ্যেই মতভেদ রহিয়াছে। ইবন বাত্‌তুতা স্বয়ং বলিয়াছেন, তিনি সাতগাঁয়ের পথে বঙ্গে প্রবেশ করেন।[১] সাতগাঁ ছিল যমুনা ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে—সমুদ্রের উপকূলে এবং তথায় হিন্দুগণ পুণ্যস্নান উপলক্ষে গমন করিত। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীর অনুবাদক লী ও সাঙ্গুনেতি "সাদকাওয়ান" শব্দকে চট্টগ্রামের নামান্তর মনে করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই যে, এই নগরীটি গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল এবং সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁয়ের নিকটেই গঙ্গা (গঙ্গার শাখা ভাগীরথী) এবং যমুনা (একটি স্থানীয় নদী) মিলিত হইয়াছে। চট্টগ্রামে কোন যমুনা নদীর অস্তিত্ব নাই। সাতগাঁ বর্তমান ত্রিবেণী সঙ্গমের নিকট অবস্থিত ছিল, কিংবা বর্তমান ত্রিবেণী প্রাচীন সপ্তগ্রামেরই স্মৃতি বহন করিতেছে। ত্রিবেণীতে তিনটি বেণী বা জলধারা মিলিত হইয়াছে (গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী); কিন্তু তিনটি জলধারাই আবার পৃথক স্রোতে প্রবাহিত। কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

ইবন বাত্‌তুতার ভ্রমণপথ

"মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙ্গালী, বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে॥"

দ্বিতীয়তঃ, চট্টগ্রাম যথার্থই সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল না—উহা দেশের অভ্যন্তর-ভাগে অবস্থিত ছিল। কিন্তু সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ ছিল সমুদ্রসৈকতে অবস্থিত এবং তৎকালীন বঙ্গের একটি সমৃদ্ধ সমুদ্রবন্দর; আজ অবশ্য সমুদ্র সপ্তগ্রাম হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। সুতরাং যে নগরী হইতে ইবন বাত্‌তুতা শ্রীহট্টে গমন করেন উহা চট্টগ্রাম নহে, সম্ভবতঃ প্রাচীন সপ্তগ্রাম বন্দর।[২] কিন্তু মুদ্রাতত্ত্ববিদ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহোদয় তাঁহার তথ্যপূর্ণ গ্রন্থে বিশদভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যে নগরী হইতে ইবন বাত্‌তুতা যাত্রা করিয়াছিলেন উহা চট্টগ্রাম,—সাতগাঁ নহে।[৩]

পৃথিবীর সমৃদ্ধ নগর ও জনপদের তুলনায় বঙ্গের অপর্যাপ্ত শস্য ও ধনসম্পদ

আফ্রিকা দেশীয় এই ভূপর্যটক আফ্রিকা ও এশিয়ার সুসভ্য ও সমৃদ্ধ অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বিখ্যাত নগরী কায়রো, বসরা, সিরাজ, ইস্পাহান, বুখারা, সমরখন্দ, তীরমিজ, বাল্ক, হিরাত, পিকিং পরিদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গের ন্যায় ধান্যের প্রাচুর্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির এত স্বল্পমূল্য কোথাও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। স্বর্ণভূমি বঙ্গদেশ ছিল প্রাচুর্যে ও ঐশ্বর্যে নন্দনকানন তুল্য।

ইবন বাত্‌তুতার সমকালে বঙ্গের দ্রব্যমূল্য

ইবন বাত্‌তুতা তৎকালীন বঙ্গের অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীতে বঙ্গের দ্রব্যমূল্যও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি এই দ্রব্যমূল্য লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া দিল্লীর রৎল বা ওজনের পরিমাণ অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করিয়াছেন। ইউল এবং টমাসের নির্দেশ অনুযায়ী এক রৎলের ওজন প্রায় ২৮.৮ পাউণ্ড বা বঙ্গের ওজনের ১৪ সেরের সমান। একটি স্বর্ণ দীনার ছিল ১০টি রৌপ্য দীনারের সমান মূল্যবান এবং একটি রৌপ্য

১) Sanguinetti. *Ibn Batluta*, Tr., p. 212-16

২) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 100, F. N. 2

৩) N. K. Bhattasali, *Coins & Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal*. Pp. 145-49

দীনার ছিল আট দিরহামের সমতুল্য[১] অর্থাৎ বর্তমান এক টাকার সমান। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তৎকালীন দ্রব্যমূল্যের একটি চিত্র পাওয়া যাইবে।[২]

১টি দুগ্ধবতী গাভী—৩৲ টাকা।
১টি হৃষ্টপুষ্ট মুরগী —৩ পাই।
২টি পায়রা —৩ পাই।
১টি হৃষ্টপুষ্ট মেষ —।০ আনা।
১ মণ চিনি —১।৵০ আনা।
১ মণ মধু —২৸৵০ আনা।
১ মণ ঘি —১।৵০ আনা।
১ মণ তিল তৈল —॥৵৬ আনা।
১ মণ চাউল —৴৯ আনা।
১৫ গজ সূক্ষ্মবস্ত্র —২৲ টাকা।
১ জন সুন্দরী ক্রীতদাসী—১০৲ টাকা।

ইবন বাত্তুতা স্বয়ং এক স্বর্ণ দীনার বা ১০৲ টাকায় আসুরা নাম্নী একটি সুন্দরী ক্রীতদাসী ক্রয় করেন। ইবন বাত্তুতার একজন সহকর্মী দুই স্বর্ণ দীনারে অর্থাৎ ২০৲ টাকায় লুলু (লাখ) নামে একজন ক্রীতদাস ক্রয় করেন। মুহম্মদ আল মাসুদী নামে একজন মরক্কোবাসী তাঁহার স্ত্রী ও একটি ভৃত্যসহ কিছুকাল বঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি ইবন বাত্তুতাকে বলিয়াছিলেন যে, বঙ্গে অবস্থান কালে তাঁহাদের তিনজনের উপযুক্ত এক বৎসরের খাদ্য-সামগ্রী ক্রয় করিতে তাঁহার মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয় হইত।[৩] দ্রব্যমূল্যের এই তালিকা হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে, তৎকালীন বঙ্গে খাদ্যসম্ভার কত প্রচুর ছিল এবং মানুষের জীবন-যাত্রাও কত সহজ ছিল।

মুসলিম ফকীরগণের প্রতি ফকরউদ্দীনের আচরণ

ইবন বাত্তুতার ভ্রমণ কাহিনী হইতে আরও জানা যায় যে, সে সময় বঙ্গদেশ মুসলিম ধর্মপ্রচারের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে তখন বহু মুসলিম ফকীর ও উলেমা বাস করিতেন। কথিত হয় যে, ৬৮১/১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মৌতির কালান্দরী (সুফী সম্প্রদায়ের একটি শাখা) সম্প্রদায় তুঘরিলকে দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সহায়তা ও উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং তুঘরিলের নিকট হইতে তিনমণ সুবর্ণ পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সুবর্ণ দ্বারা তাঁহারা

১) Yule's *Cathay and the Way Thither*, p. 439. Thomas, *Chronicles of Pathan Kings*, p. 227, F. N.

২) N. K. Bhattasali. *Coins & Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal*. p. 144

৩) N. K. Bhattasali, *Coins & Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal*, p. 137, F.N.
I Gold dinar = 10 Silver dinar; 1 Silver dinar = 8 dirhams = Re. 1.
Thomas, *Chronicles*, p. 227

তাঁহাদের সম্প্রদায়ের প্রতীক লৌহবলয়কে স্বর্ণবলয়ে পরিবর্তিত করেন।[১] ফকর-উদ্দীনের শাসনকালে ফকীর ও উলেমাগণ বহু সুবিধা ভোগ করিতেন। তাঁহারা বিনা শুল্কে, নৌকায় ভ্রমণ করিতেন, তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যাদি বিনা মূল্যেই তাঁহাদিগকে সরবরাহ করা হইত এবং যখন তাঁহারা কোন নগরে উপস্থিত হইতেন তখন অর্ধ দীনার উপহারসহ তাঁহারা অভ্যর্থিত হইতেন।[২]

ফকরউদ্দীন ও ফকীর সৈয়দা

সুলতান ফকরউদ্দীনের এত অধিক ফকীর-প্রীতি ছিল যে, তিনি সৈয়দা নামক একজন ফকীরকে সপ্তগ্রামে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া তাঁহার কোন এক শত্রুর (সম্ভবতঃ ত্রিপুরার) বিরুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করেন। সুলতানের অনুপস্থিতির সুযোগে সৈয়দা বিদ্রোহী হইলেন এবং সুলতান ফকরউদ্দীনের একমাত্র পুত্রকে হত্যা করিলেন। এই স্থানে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সুলতান ফকরউদ্দীনের ঐ নিহত পুত্র ব্যতীত অন্য কোন পুত্র ছিল না; তাঁহার উত্তরাধিকারী ইখতিয়ারউদ্দীন গাজী শাহ সম্ভবতঃ তাঁহার পালিতপুত্র ছিলেন। কারণ, ইখতিয়ারউদ্দীন গাজী শাহ তাঁহার মুদ্রায় স্বীয় পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে অন্য কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। এই বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া সুলতান ফকরউদ্দীন সত্বর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।[৩] বিদ্রোহ দমিত হইল—সৈয়দা তাঁহার অনুচরবর্গসহ সোনার-গাঁয়ে পলায়ন করিলেন। সুলতান সোনারগাঁ অবরোধের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সোনারগাঁয়ের অধিবাসিগণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া বিদ্রোহী ফকীর সৈয়দা ও তাঁহার অনুচরবর্গকে সুলতানের সেনাবাহিনীর হস্তে সমর্পণ করিল এবং সুলতানকে সমস্ত সংবাদ নিবেদন করিল। সুলতানের আদেশে ফকীর সৈয়দার ছিন্নমুণ্ড তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল। ফকীর সৈয়দার বিদ্রোহের ফলে বহু ফকীরের প্রাণদণ্ড হইল।[৪]

সুলতান ফকরউদ্দীনের শক্তিকেন্দ্র

ইবন বাত্‌তুতার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ফকরউদ্দীন সাতগাঁয়ে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী বা শক্তিকেন্দ্র ছিল সোনারগাঁয়ে; কারণ ৭৪০/১৩৪০-৭৫০/১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার যত মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সকলই সোনারগাঁয়ের মুদ্রাশালায় মুদ্রিত হইয়াছিল। ইবন বাত্‌তুতা তাঁহার ভ্রমণকাহিনীর সর্বত্রই ফকরউদ্দীনকে বঙ্গ বা বাঙ্গলার সুলতান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—কখনও লক্ষ্ণৌতির সুলতান বলিয়া অভিহিত করেন নাই। ইবন বাত্‌তুতা বাঙ্গলা বলিতে পূর্ববঙ্গকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং এই অঞ্চলের রাজধানী ছিল সোনারগাঁয়ে। ফকরউদ্দীন "সাতগাঁয়ে এবং বাঙ্গলায় বিদ্রোহী হইয়াছিলেন"—এই উক্তি হইতে অনুমিত হয় যে, সাতগাঁ স্থায়িভাবে ফকরউদ্দীনের কর্তৃত্বাধীনে ছিল না। জিয়াউদ্দীন বারানীও লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তাকে

---

১) Gibb's *Ibn Battuta*, p. 267

২) *Tarikh-i-Firusshahi*, p. 91

৩) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II. p. 102

৪) N. K. Bhattasali, *Coins and Chronology* etc. p. 138

পরাজিত করিয়া তিনি সাতগাঁ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহার পূর্বেই তিনি সোনারগাঁয়ে তাঁহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[১] ইবন বাত্‌তুতা আরও বলিয়াছেন যে, সোনারগাঁ ছিল দুর্ভেদ্য নগরী। সম্ভবতঃ সোনারগাঁয়ের রক্ষা-ব্যবস্থা অতি সুদৃঢ় ছিল এবং সেই কারণেই ইবন বাত্‌তুতা সোনারগাঁকে দুর্ভেদ্য নগরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২]

সুলতান ফকরউদ্দীনের শাসনকালে হিন্দু প্রজাবর্গের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। জমিতে উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ মাত্র তাহারা ভোগ করিত, অবশিষ্ট অর্ধাংশ সুলতানের প্রাপ্য ছিল। তদুপরি তাহাদিগকে করও প্রদান করিতে হইত। প্রধানতঃ জলপথেই দেশের বাণিজ্য চলাচল হইত এবং নদীগুলিতে নৌযান শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিত। ইবন বাত্‌তুতা বলিয়াছেন—"বঙ্গদেশের নদীতে অসংখ্য নৌকা চলাচল করে। প্রত্যেক নৌকায় একটি করিয়া ডঙ্কা থাকে। যখন নৌকাগুলি পরস্পরকে অতিক্রম করে তখন ঐ সকল নৌকা হইতে ডঙ্কাধ্বনি করা হয়—পরস্পর সম্মান বিনিময় হয়। সম্ভবতঃ জলদস্যুতা নিবারণের জন্যই এরূপ ব্যবস্থা ছিল।[৩]

ফকরউদ্দীনের শাসনকালে হিন্দুপ্রজার অবস্থা ও দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য

ইবন বাত্‌তুতার জন্মভূমি পৃথিবীর বৃহত্তর মরুভূমির পার্শ্বদেশে। বহুকাল তিনি দিল্লীরও অধিবাসী ছিলেন; সুতরাং ঊষর শুষ্ক দেশের তুলনায় বঙ্গের সজল-শ্যামল রূপ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বঙ্গের দিগন্তবিস্তৃত হরিৎ শস্যক্ষেত্র, শ্যামল প্রান্তর, নানাবিধ ফলশোভিত বৃক্ষরাজি তাঁহার মনোহরণ করিয়াছিল। তিনি নদীপথে পঞ্চাশ দিবসে শ্রীহট্ট হইতে সোনারগাঁয়ে আগমন করেন। এই নদীপথের বাঁকে বাঁকে গ্রাম, জনপদ ও বিপণিগুলি তাঁহার নিকট ছায়াচিত্রের পট-পরিবর্তনের মতই মনোমুগ্ধকর এবং বিস্ময়কর প্রতিভাত হইয়াছিল। নদীর তীরে তীরে কমলালেবুর বৃক্ষগুলি মিশরের নীলনদের তীরভূমির স্মৃতি তাঁহার মনে জাগ্রত করিয়াছিল। জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক দ্রব্যাদির প্রাচুর্য এবং মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী মানুষকে আকৃষ্ট করিলেও গ্রীষ্মকালে এই দেশের জলবায়ুর উষ্ণ-আর্দ্রতা পশ্চিমদেশীয়গণের পক্ষে বড়ই পীড়াদায়ক ও কষ্টকর হইয়া উঠিত; সেই কারণে পশ্চিমদেশীয় পর্যটক বঙ্গদেশের নামকরণ করিয়াছেন "দোজাক-ই-পুর-নিয়ামত" আশীর্বাদপূত নরক—("A hell crammed with blessings")[৪]

মরুবাসীর দৃষ্টিকোণে বঙ্গদেশ

---

১) N. K. Bhattasali, *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal*, p. 148

২) *ibid.*

৩) Gibb's *Ibn Battuta*, p. 271

৪) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 102

ইলিয়াসশাহী বংশপঞ্জী

(মুদ্রার ভিত্তিতে)

১। শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ—৭৪৩/১৩৪২—৭৫৮/১৩৫৮ খ্রীঃ
২। সেকেন্দার শাহ (ইলিয়াসের পুত্র)—৭৫৮/১৩৫৭—৭৯৫/১৩৯৩ খ্রীঃ
সম্ভবতঃ সেকেন্দার দুই বৎসর পূর্বেই বিদ্রোহী পুত্রের হস্তে নিহত হন—(মুদ্রা ৭৫৯-৭৯১ হিঃ)
৩। ঘিয়াসউদ্দীন আজম শাহ (ঐ পুত্র)—আঃ ৭৯৫/১৩৯৩—৮১৩/১৪১০ খ্রীঃ
৪। সাইফউদ্দীন হামজা শাহ (ঐ পুত্র)—৮১৩/১৪১০—৮১৪/১৪১১ খ্রীঃ
৫। শিহাবউদ্দীন বায়াজিদ শাহ (ঐ দত্তক পুত্র)—৮১৫/১৪১২—৮১৭/১৪১৩ খ্রীঃ
(মুদ্রা ৮১৬ এবং ৮১৭ হিঃ)
৬। আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ (ঐ পুত্র)—৮১৭/১৪১৪ খ্রীঃ

সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ

(৭৪৩/১৩৪২—৭৫৮/১৩৫৭ খ্রীঃ)

ইলিয়াস শাহের প্রথম জীবন ঃ ইলিয়াস শাহ ছিলেন আলী মুবারকের ধাত্রী-পুত্র। রিয়াজ-উস-সালাতীন অনুসারে আলী মুবারক প্রথমে মালিক ফিরুজ রজবের (সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলকের) একজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। ফিরুজ রজব ছিলেন সুলতান মুহম্মদ তুঘলকের খুল্লতাত-পুত্র। মুহম্মদ তুঘলক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ফিরুজ রজবকে খাসদবীর নিযুক্ত করেন। এই সময়ে হাজী ইলিয়াস কোন (অজ্ঞাত-কারণ) অন্যায় কার্য করিয়া দিল্লী হইতে পলায়ন করেন। মালিক ফিরুজ আলী মুবারকের উপর হাজী ইলিয়াসের অনুসন্ধানের ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু তিনি হাজী ইলিয়াসের সন্ধান করিতে পারেন নাই; সেই অপরাধে তিনি দিল্লী হইতে নির্বাসিত হইলেন। মনের দুঃখে আলী মুবারক বঙ্গদেশে আগমন করিয়া কাদির খানের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন এবং কালে তিনি প্রধান অশ্বারোহীর পদ (আমীর-ই-আখোর) লাভ করেন। মালিক ফকরউদ্দীন বিদ্রোহী হইয়া কাদির খানকে হত্যা করিলে আলী মুবারক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং 'আলাউদ্দীন আলী শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন (৭৪২/১৩৪১ খ্রীঃ)

ইলিয়াসের পরিচয়

সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের শাসক হইলে হাজী ইলিয়াস বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইলেন। আলী মুবারক ইলিয়াসের সন্ধান পাইয়াই তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। কিন্তু ইলিয়াসের মাতার অনুরোধে তিনি ইলিয়াসকে মুক্তি প্রদান করিলেন। হাজী ইলিয়াস আলী মুবারকের অধীনে উচ্চ-রাজপদও লাভ করিলেন। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি আলী মুবারকের সেনাদলকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন এবং খোজাগণের সাহায্যে আলী মুবারককে হত্যা করিয়া নিজেকে সুলতানরূপে ঘোষণা করিলেন (৭৪৩/১৩৪২ খ্রীঃ)। তিনি 'সুলতান

হাজী ইলিয়াসের বঙ্গে আগমন

শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ' উপাধি গ্রহণ করিলেন।[১] উপকারীকে হত্যা করিয়া ইলিয়াস পরোপকারের প্রতিদান দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাই ছিল সে যুগের মুসলিম রাজনীতির ধারা।

ইলিয়াস শাহের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ তুঘলকের অত্যাচারের ফলে তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে সমগ্র উত্তর ভারতে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল। এলাহাবাদের পূর্বদিকস্থ গোরক্ষপুর, চম্পারণ এবং ত্রিহুতের হিন্দু নরপতিগণ দিল্লীর বশ্যতা অস্বীকার করিয়া প্রায় স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একতা ছিল না। দিল্লী-সুলতানের অধিকার বিলুপ্তি এবং হিন্দু সামন্তগণের অনৈক্য ইলিয়াস শাহকে এই অঞ্চলে অভিযান প্রেরণে প্রলুব্ধ করিল।[২]

ত্রিহুত বিজয়

ইলিয়াস শাহের প্রথম লক্ষ্য হইল ত্রিহুত। ত্রিহুত এই সময়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন হইতেছিল—সমগ্র রাজ্যটি দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। হরিসিংহদেবের পৌত্র শক্তিসিংহ উত্তরাংশের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল শিমরাঁও। দক্ষিণাংশের অধিকারী ছিলেন কামেশ্বর; তিনি ছিলেন সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলকের মনোনীত এবং তাঁহার রাজধানী ছিল দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে মধুবনীতে।[৩] এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর আত্মকলহের সুযোগে ইলিয়াস ত্রিহুতের বহু অংশ জয় করিলেন (৭৪৫/১৩৪৪ খ্রীঃ)।

নেপাল বিজয়

ত্রিহুত বিজয়ের একবৎসর পরেই ইলিয়াস নেপাল বিজয়ের পরিকল্পনা করিলেন। হঠাৎ কেন তাঁহার মনে এই দুর্গম গিরিরাজ্য আক্রমণের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় তাঁহার কোন কারণ জানা যায় না বা সমসাময়িক ইতিহাসে তাহার কোন নির্দেশ নাই। সম্ভবতঃ মধুবনী বা উত্তর-দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলেই তিনি নেপালের সম্পদ সম্বন্ধে সংবাদ পাইয়াছিলেন। কোন্ পথে যে বাঙ্গলার সৈন্য কাটামুণ্ডুতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারও কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু বাঙ্গলার সেনাবাহিনী কাটামুণ্ডুতে উপস্থিত হইলে নেপালরাজ জয়পালদেব কিংবা তাঁহার মন্ত্রী জয়ষষ্ঠীমল মুসলিম সৈন্যকে প্রতিরোধ কিংবা মন্দিরের শুচিতা রক্ষার কোন ব্যবস্থাই করিলেন না। ইলিয়াস বিনা বাধায় নগরে প্রবেশ করিয়া স্বয়ম্ভূনাথের স্তূপ এবং শাক্যমুনির স্তম্ভ ধ্বংস (অগ্নিসাৎ) করিয়া ইসলামের বাঞ্ছিত পুণ্য সঞ্চয় করিলেন।[৪] ইতিহাসকার জয়সওয়াল বলেন যে, ইলিয়াস পশুপতিনাথের মন্দিরের ধনরাশিও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইলিয়াস দীর্ঘকাল কাটামুণ্ডুতে অবস্থান করেন নাই। সম্ভবতঃ পার্বত্য যুদ্ধের অনিশ্চিত ফলাফল সম্বন্ধে মুসলিম সেনাবাহিনী সন্দিহান হইয়া

---

১) *Riyaz-us-Salatin*, p. 98

২) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 103

৩) Grierson's notes on *Mediaeval poets & kings of Mithila. Ind. Ant.*, Vol. XIV, 1885, Pp. 192 & 57 and Bendall's *History of Nepal & Surrounding Kingdoms*, *JASB*, Vol, LXXII, Pt. I, 1903

৪) *JBORS*, 1936, Pp. 81-91

উঠিয়াছিল। কিংবা কাটামুণ্ডুর দুর্গম পার্বত্য উপত্যকায় সমতলের সেনাবাহিনীর রণকৌশল প্রদর্শনের কোন সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়াই ইলিয়াস স্বল্পকাল মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

ইলিয়াস শাহের উড়িষ্যা অভিযান

এই সকল বিজয়ে উদ্দীপ্ত হইয়া ইলিয়াস বঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বিজয়ে অভিলাষী হইলেন। বঙ্গের পশ্চিমে সুবর্ণরেখা-গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে উড়িষ্যা সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিশালী রাজ্যরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই দেশ ছিল মন্দিরের দেশ; এই অঞ্চলেই ছিল ভুবনেশ্বরের মেঘেশ্বর-বলরাম-কৃষ্ণ এবং সুভদ্রা মন্দির, কিষাণপুরের চাটেশ্বর মন্দির, কোনারকের সূর্যমন্দির এবং পুরীর জগন্নাথ মন্দির। এই সকল মন্দির বঙ্গের বহু পুণ্যার্থীকে প্রতিবৎসরই আকর্ষণ করিত। এই রাজ্যের ঐশ্বর্য এবং মন্দিরের সঞ্চিত ধনরাশি দীর্ঘকাল হইতেই বঙ্গের মুসলিম শাসকবর্গকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। কিন্তু উড়িষ্যাধিপতি তৃতীয় অনঙ্গভীম, প্রথম নরসিংহ এবং তৃতীয় নরসিংহের পরাক্রমে উড়িষ্যা শতাধিক বৎসর মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত ও প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।[১]

উড়িষ্যার ধনৈশ্বর্যের কাহিনী প্রবাদস্বরূপ হইয়া উঠিলেও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত মুসলিম বিজয়বাহিনী উড়িষ্যার মন্দিরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। ইলিয়াসের বিজয়বাহিনী প্রায় বিনা বাধায় চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত অগ্রসর হইল এবং অগণিত রত্নরাজি লুণ্ঠন করিয়া ইলিয়াস বঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

চম্পারণ ও গোরক্ষপুর বিজয়

ত্রিহুত, নেপাল ও উড়িষ্যা বিজয়ের পর ইলিয়াস পুনরায় ত্রিহুত অতিক্রম করিয়া চম্পারণ ও গোরক্ষপুরে অভিযান করেন। ঐ অঞ্চলের হিন্দু রাজন্যবর্গ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার কারিলেন। পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইল।[২] এই সমস্ত ঘটনাই মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের শেষাংশে ঘটিয়াছিল।

মুহম্মদ তুঘলক ও বঙ্গদেশ

বাঙ্গলাদেশের সমস্ত সংবাদই সুলতান মুহম্মদ তুঘলক অবগত ছিলেন। কিন্তু বারংবার মোঙ্গল আক্রমণ, রাজধানী পরিবর্তন ও প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণের বিদ্রোহ প্রভৃতি কারণে তাঁহার পক্ষে সুদূর বঙ্গদেশের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হয় নাই। বঙ্গদেশ স্বীয় বিবাদ-বিসংবাদ, অন্তর্বিদ্রোহ ইত্যাদি কোন সমস্যার সমাধানের জন্যই দিল্লীর মুখাপেক্ষী ছিল না। দিল্লীর নির্লিপ্ততার সুযোগে ইলিয়াস শাহ বঙ্গে স্বীয় শক্তি ও শাসন সুদৃঢ় করিয়া লইলেন। ইলিয়াস স্বীয় নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করিলেন; ৭৫৩/১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে ফকরউদ্দীনের পুত্র ইখতিয়ারউদ্দীনকে পরাজিত করিয়া সোনারগাঁ অধিকার করিলেন। পুনঃপুনঃ সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া তিনি দিল্লীর সুলতানীপদ অধিকারের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

৭৫২/১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে ফিরুজ শাহ তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি বঙ্গদেশের ব্যাপারে চিন্তিত হইলেন। কারণ ইলিয়াস শাহ দিল্লীর সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছেদন করিয়াছেন, স্বীয় নামে খুত্‌বা পাঠ করিয়াছেন, স্বীয় নামাঙ্কিত

---

১) H. C. Roy, *Dynastic History of Northern India*, Vol. I, Pp. 478-87

২) *Tabqat-i-Akbari*, Tr., p. 244. *Riyas-us-Salatin*, Tr., p. 99

মুদ্রা প্রচলন করিয়াছেন, বারাণসী পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছেন, এমন কি, দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস নির্মিত হউজ-ই-শামসী নামক হামাম বা স্নানাগারের অনুকরণে একটি বৃহৎ মনোরম হামাম নির্মাণ করিয়াছেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা দিল্লীর সুলতানের অনুকরণ করিবেন—ইহা ঔদ্ধত্য। এই ঔদ্ধত্যের শাস্তিবিধান করিতে হইবে; দিল্লীর সুলতান শাহানশাহ মুহম্মদ ফিরুজউদ্দীন তুঘলক বিন রজব স্বয়ং ধাত্রীপুত্র ইলিয়াসের শাস্তিবিধান করিবেন। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য—মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বে হাজী ইলিয়াসের যে শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছিল, উহা খর্ব করিতে হইবে। জিয়াউদ্দীন বারানী রচিত তারিখ-ই-ফিরুজশাহী অনুসারে শামস উদ্দীন ইলিয়াস শাহ কর্তৃক গৌড়ে মুসলিম এবং জিম্মিদের (মুসলিম আশ্রিত বিধর্মী বা হিন্দু) প্রতি অত্যাচারের কাহিনী এবং তীরভুক্তি বা ত্রিহুত আক্রমণ ও লুণ্ঠনের সংবাদে ফিরুজ শাহ স্বয়ং অভিযান করিয়াছিলেন (৭৫৪/১৩৫৩ খ্রীঃ, নভেম্বর)।

ফিরুজশাহ তুঘলক ও বঙ্গদেশ

বঙ্গের ইতিহাস-লেখকগণ সকলেই প্রায় জিয়াউদ্দীন বারানীর অভিমত গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, সুলতান ফিরুজ শাহ ৭৫৪/১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁহার বঙ্গ অভিযান আরম্ভ করেন এবং ৭৫৫/১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন অর্থাৎ বঙ্গ অভিযান উপলক্ষ্যে প্রায় আট মাস তিনি দিল্লীর বাহিরে ছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাসকারগণের অন্যতম শামসী সিরাজ আফিফ বলেন যে, লক্ষ্মৌতি পৌছিতেই তাঁহার এগার মাস লাগিয়াছিল এবং প্রত্যাবর্তনেও সমপরিমাণ সময়ই কাটিয়াছিল। সম্ভবতঃ শামসী সিরাজ আফিফের বিবরণই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। কারণ, এই অভিযান কেবল লক্ষ্মৌতি অভিযানই ছিল না, পথে তিনি অযোধ্যা হইতে কুশী পর্যন্ত অঞ্চলও অধিকার করিয়াছিলেন। গোরক্ষপুর, করুষ (পালামৌ) এবং ত্রিহুতের সামন্তবর্গ বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়া তিনি একডালা দুর্গ আক্রমণ করেন। তাঁহার প্রত্যাবর্তনের কাল ছিল ঘটনাবহুল—এই সময়ে তিনি দোয়াব অঞ্চলে তাঁহার অধিকার বিস্তার করেন। সুতরাং এই দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল অভিযান দশ মাসে সম্পূর্ণ হইতে পারে না—ইহাই সম্ভব। বিহারের একটি স্তূপগাত্রে ক্ষোদিত অনুলিপি হইতে জানা যায় যে, ফিরুজ ৭৫৩ হিজরায় উক্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।[১] সুতরাং এই লিপি-প্রমাণ হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি ৭৫৩ হিজরায় অভিযান আরম্ভ করেন এবং ৭৫৫ হিজরায় উহা সমাপ্ত হয়।

ফিরুজ তুঘলকের বঙ্গ অভিযান

বঙ্গ অভিযানের উদ্দেশ্যে সুলতান ফিরুজ বিরাট সেনাবাহিনী সংগ্রহ করিলেন। সেই সেনাবাহিনীতে ছিল নব্বই সহস্র অশ্বারোহী, লক্ষাধিক পদাতিক এবং সহস্র নৌবহর। এই রাজকীয় বাহিনী দোয়াব অঞ্চলের মধ্য দিয়া অযোধ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়া গোরক্ষপুর ও চম্পারণ অঞ্চলে উপস্থিত হইল। গোরক্ষপুর ও খারাসরের

১) *Epigraphica Indica*, Vol. II, p. 292

হিন্দু নরপতিদ্বয় বহু উপঢৌকন এবং বার্ষিক করপ্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।[১] এই সকল হিন্দু রাজন্যগণের মধ্যে উদয়সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য।[২] উদয়সিংহ প্রভৃতি হিন্দু নরপতিগণ ফিরুজ শাহের সহিত যুদ্ধযাত্রাও করিয়াছিলেন। শামসী সিরাজ আফিফ তাঁহার গ্রন্থে ফিরুজ কর্তৃক গৌড় অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আফিফ লিখিয়াছেন যে, বঙ্গের নৌবহর গঙ্গা-গোগরা এবং গঙ্গা-গণ্ডকীর সঙ্গমস্থলে রাজকীয় বাহিনীর গতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিল। অবশেষে কুশী নদীর তীরে তাহারা দিল্লীর সেনাবাহিনীকে বাধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত হইল।

সুলতান ফিরুজ প্রতিপক্ষ দ্বারা প্রতিহত হইবার মত মানুষ ছিলেন না। তিনি কৌশল অবলম্বন করিলেন। ফিরুজ কুশীনদীর সঙ্গমে সংগ্রাম কিংবা নদী অতিক্রম যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। তিনি কুশীনদীর তীর অনুসরণ করিয়া উত্তর দিকে প্রায় এক শত ক্রোশ অগ্রসর হইলেন। বাদশাহী সৈন্য নেপাল-সীমান্তে উপস্থিত হইল—নিকটেই কুশীনদীর উৎপত্তিস্থল। নদী ছিল শিলাবহুল ও খরস্রোতা—কিন্তু উৎসমুখে নদীটি অগভীর। সুলতান ফিরুজের আদেশে উৎসমুখে অগভীর নদীগর্ভে হস্তিযূথকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দণ্ডায়মান করান হইল এবং হস্তিপৃষ্ঠে সাময়িক সেতু রচিত হইল। হস্তিপৃষ্ঠে রচিত সেতু অবলম্বনে চম্পারণ বা চম্পকারণ্যের নিকটে বাদশাহী সেনাবাহিনী কুশী বা কৌশিকী অতিক্রম করিল। ফিরুজ শাহ কুশী অতিক্রম করিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণে ইলিয়াস দ্রুত রাজধানী পাণ্ডুয়ায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। সুলতান ফিরুজ তুঘলক চম্পারণের পথে পাণ্ডুয়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন।[৩]

ফিরুজ তুঘলকের অগ্রগতি

বাদশাহী সৈন্যের কুশী অতিক্রম

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ারের সময় হইতে কাদির খানের শাসনকাল পর্যন্ত (১২০০-১৩৩৯ খ্রীঃ) প্রাচীন গৌড় বা লক্ষ্ণৌতি (লক্ষ্মণাবতী) ছিল বঙ্গের রাজধানী। ইলিয়াস শাহ সমগ্র বঙ্গে আধিপত্য লাভের পর পাণ্ডুয়া নগরীতে রাজধানী পরিবর্তিত করেন এবং তারপর তিনি ফিরুজ শাহের সহিত বিরোধে অবতীর্ণ হন। প্রাচীন লক্ষ্মণাবতী নগরীর দশ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে এবং মহানন্দা ও কালিন্দী নদীর সঙ্গমস্থল হইতে মাত্র তিন ক্রোশ উত্তরে ছিল ইলিয়াস শাহের রাজধানী পাণ্ডুয়া নগরী। এই রাজধানী পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে কোথাও বিশেষ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নাই। তথাপি মনে হয়, নদীর গতি-পরিবর্তনের ফলে লক্ষ্ণৌতি নগরী অস্বাস্থ্যকর এবং মনুষ্যবাসের অনুপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল। অন্তর্দ্বন্দ্বে ও বারংবার লুণ্ঠনে লক্ষ্ণৌতি হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছিল। লক্ষ্ণৌতির পথ দিল্লীর সেনাবাহিনীর সুপরিচিত ছিল—এই সকল কারণেই শামসউদ্দীন লক্ষ্ণৌতি হইতে পাণ্ডুয়াতে রাজধানী পরিবর্তন করিয়াছিলেন।[৪]

গৌড় হইতে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী পরিবর্তন

---

১) *Bibliotheca Indica*, Pp. 516-88
২) *Tarikh-i-Firusshahi*, Afif. Ed. by S. Gupta, p. 29
৩) Elliot, *History of India*, Vol. III, Pp. 293-94
৪) Monomohan Chakravarty, *Notes on Gaur*, etc., *JASB*, Vol. V. 1909, No. 7, Pp. 204-34

রাজধানী পাণ্ডুয়া প্রায় অরক্ষিত অবস্থায়ই ছিল; কারণ, সুলতান শামসউদ্দীন পাণ্ডুয়া পরিত্যাগ করিয়া দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রিয়াজ-উস-সালাতীনে বর্ণিত আছে যে, তিনি স্বীয় পুত্রের হস্তে দুর্গরক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।[১] ফিরুজ শাহ অতি অল্পায়াসেই পাণ্ডুয়া অধিকার করিলেন—ইলিয়াসের পুত্র বন্দী হইলেন।

পাণ্ডুয়া নগরীতে ফিরুজের ঘোষণা

পাণ্ডুয়া নগরী অধিকার করিয়া সুলতান ফিরুজ কয়েকটি ঘোষণা প্রচার করিলেন। প্রথমেই পাণ্ডুয়া নগরীর অধিবাসিদিগকে তাহাদের ধনসম্পদ ও জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশ্বাস প্রদান করা হইল। পাণ্ডুয়ার নূতন নামকরণ হইল ফিরুজাবাদ—অবশ্য এই নাম পূর্বেও ছিল। ফিরুজাবাদে দিল্লীর সুলতানের নামে খুত্‌বা পঠিত হইল। ইসলামের অনুশাসন ভঙ্গ ও নারীর উপর অত্যাচারের অপরাধে ইলিয়াস ধর্মদ্রোহী, নারীহন্তা ও রাজদ্রোহী বলিয়া ঘোষিত হইলেন। সুলতান ফিরুজ ইলিয়াসের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য বঙ্গের আমীর-উলেমাগণকে আহ্বান করিলেন। মুসলিম চিকিৎসক ও অভিজাতবর্গকে (আমীর) বৃত্তি, সাহায্য ও ভূমিদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইল। তিনি ইলিয়াসের প্রবর্তিত রাজস্ব-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া প্রজাবর্গের এক বৎসরের রাজস্ব মার্জনা করিলেন। স্থির হইল, জায়গিরদার ও ইজারাদারগণ তাঁহাদের সমস্ত সৈন্যসহ বাদশাহের পক্ষে যোগদান করিলে তাঁহাদের ভূমি ও বৃত্তি দ্বিগুণিত হইবে, সেনাদলের অর্ধাংশসহ যোগদান করিলে তাঁহারা দেড়গুণ বর্ধিত হারে বৃত্তি ও ভূমি লাভ করিবেন এবং স্বয়ং একাকী যোগদান করিলে নির্বিঘ্নে তাঁহারা তাঁহাদের সম্পত্তি ভোগদখল করিবেন।[২]

একডালার প্রথম অবরোধ

সুলতান ফিরুজের বঙ্গাভিমুখে অগ্রগতির সংবাদে ইলিয়াস রাজধানী পাণ্ডুয়া পরিত্যাগ করিয়া পরিবার-পরিজন ও ধনরত্নাদিসহ দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুয়া নগরীর অভিজাতশ্রেণীও সপরিবারে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। ফিরুজ পাণ্ডুয়া অধিকার করিয়া একডালা দুর্গ অবরোধ করিলেন।

কিন্তু এই একডালা দুর্গের অবস্থিতি সম্বন্ধে ইতিহাসকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বাঙ্গলার ইতিহাসে (২য় খণ্ড) এবং স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঙ্গলার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে এই একডালার অবস্থিতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আলোচিত হইয়াছে।[৩] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বাঙ্গলার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত আছে যে, দিনাজপুর জেলার ধঞ্জর পরগনায় মহানন্দার দুইটি উপনদী—বালিয়া ও চিরামতী (সাঁড়াশীর দুইটি বাহুর ন্যায়) বক্রাকারে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত। সেই নদীদ্বয়-রচিত অর্ধবৃত্তের মধ্যেই একডালা দুর্গ অবস্থিত ছিল।[৪] স্থানটি সুদৃঢ় মৃন্ময় প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। স্থানটি

---

১) *Riyas-us-Salatin*, Tr., p. 100

২) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, Pp. 106-07

৩) বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,—১১৬-১৭ পৃঃ

৪) একডালা প্রাচীন গৌড়ের ৪২ মাইল এবং পাণ্ডুয়া নগরীর ২৩ মাইল উত্তরে, ঘোড়াঘাট হইতে ১৫ মাইল পশ্চিমে টাঙ্গন নদীর অপর তীরে অবস্থিত ছিল।

পরিবেষ্টন করিয়া চল্লিশ হস্ত বিস্তৃত একটি পরিখাও খনন করা হইয়াছিল।[১] অর্থাৎ দুর্গটি দুইটি জলধারা (নদী ও পরিখা) বেষ্টিত বলিয়া উত্তর ভারতীয় আক্রমণকারিদিগের নিকট উহা দ্বীপরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল (জজিরা-ই-একডালা)।[২]

একডালা দুর্গের বর্ণনা

তারিখ-ই-ফিরুজশাহী গ্রন্থে একডালা দ্বীপ বা দ্বীপমালা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।[৩] জিয়াউদ্দীন বারানীও বলিয়াছেন যে, একডালার একপার্শ্ব জলবেষ্টিত ছিল।[৪] পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে নদীর মোহানায় বহু দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। সেইজন্য এই অঞ্চল বদ্বীপ বঙ্গ বা দ্বীপময় বঙ্গ নামে পরিচিত। তেমনই গৌড় নগরের পূর্বাংশে বহু জলাভূমি ও হ্রদ ছিল এবং এই নগরের উপকণ্ঠেই কালিন্দী, গঙ্গা ও মহানন্দা প্রবাহিত হইত। সুতরাং বর্ষাকালে এই অঞ্চল জলপূর্ণ হইত এবং উচ্চস্থানগুলিকে এই বিস্তীর্ণ সমুদ্রবৎ জলরাশির মধ্যে দ্বীপের ন্যায়ই পরিলক্ষিত হইত। এই কারণেই সম্ভবতঃ মুসলিম ইতিহাসকার একডালাকে দ্বীপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা হইতেই অনুমিত হয় যে, একডালা ছিল দুর্ভেদ্য ও দুর্গম—বিশেষতঃ বর্ষাকালে।

সুলতান ফিরুজের কৌশল

সুলতান ফিরুজ শাহ একডালা দুর্গের সন্নিকটে শিবির সংস্থাপন করিলেন এবং কাষ্ঠস্তূপ ও পরিখা দ্বারা শিবির-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। অতঃপর উভয়পক্ষে খণ্ডযুদ্ধ ও সংঘর্ষ চলিল। কিন্তু বঙ্গের সুলতানের সাক্ষাৎ মিলিল না—তিনি অরণ্য ও নদীবেষ্টিত একডালার দুর্গাভ্যন্তরেই রহিলেন। দ্বাবিংশতি দিবস দিল্লীর সেনাবাহিনী একডালা অবরোধ করিয়া রহিল। এই সময়ে দিল্লীর সেনাবাহিনীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল; সংকীর্ণ স্থানে বহুলোকের অবস্থানহেতু স্থানটি অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল; তাহার উপর দিবারাত্র অসহ্য মশকদংশন। বঙ্গের জলে, আর্দ্র বায়ুতে দিল্লীর সেনাদলের কষ্টের সীমা রহিল না। বর্ষাকাল সমাগত দেখিয়া সুলতানও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কারণ, বঙ্গের ভয়ঙ্করী বর্ষার প্রলয়ংকর রূপ সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট ধারণা ছিল। তিনি জানিতেন, বর্ষাগমের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দিল্লী প্রত্যাবর্তন অসম্ভব না হইলেও কষ্টকর হইয়া উঠিবে। তাঁহার ধারণা ছিল যে, ইলিয়াস বর্ষার পূর্বে যুদ্ধে অগ্রসর হইবেন না। তিনিও ইলিয়াসের অপেক্ষা কম চতুর ছিলেন না—তিনি কৌশল অবলম্বন করিলেন। ফিরুজ একডালার অবরোধ উত্তোলন করিয়া পাণ্ডুয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং একডালার সাত ক্রোশ দূরে শিবির সংস্থাপন করিলেন—নিকটে একটি জলধারা। শিবিরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে অগ্নিসংযোগ করা হইল।[৫] দিল্লীর সেনাবাহিনীর প্রস্থানের সংবাদে একডালা দুর্গের বাঙ্গালী সেনাবাহিনী উল্লসিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে একদল কালন্দর (ফকীর) বঙ্গের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা গৌড়ের সেনাদল কর্তৃক ধৃত

কালন্দরী ফকীরের কীর্তি

১) Ziauddin Barani, *op. cit.*, Pp. 590-91

২) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 108

৩) Elliot, *History of India*, Vol. III, p. 294

৪) Ziauddin Barani, *op. cit.*, p. 589

৫) *Tarikh-i-Firuzshahi* and *Bibliotheca Indica*, p. 113

হইয়া সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াসের সম্মুখে নীত হইলেন এবং সুলতানকে নিবেদন করিলেন যে, বাদশাহী সৈন্য নানাভাবে বিব্রত হইয়া অবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং তাহারা দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতেছে।

ভাগ্য ছিল বিরূপ। সেইজন্যই সম্ভবতঃ ফিরুজ শাহ কর্তৃক একডালার অবরোধ পরিত্যাগ কিংবা ফকীরদের আগমন ও তাঁহাদের নিবেদিত সংবাদের মধ্যে কোন কৌশল থাকিতে পারে—সে সম্বন্ধে ইলিয়াসের মনে কোন প্রশ্ন বা সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই। লক্ষ্মণসেনের দরবারে জ্যোতিষী এবং ইলিয়াসের দরবারে ফকীরদের আগমনের ফল প্রায় একই হইয়াছিল। হিন্দু এবং মুসলিম যেন একই ধাতুতে গড়া —জ্যোতিষী বা সাধু-সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস হিন্দুদের মজ্জাগত—মুসলমানদের মধ্যেও উহার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। ফকীরগণ বলিয়াছেন, দিল্লীর বাহিনী দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিতেছে, সুতরাং এই সংবাদের সত্যতা নিরূপণের চেষ্টারও কোন প্রয়োজন ইলিয়াস অনুভব করিলেন না। তিনি সহজ বিশ্বাসেই ফকীরদের উক্তি গ্রহণ করিলেন।

বঙ্গের শিবিরে ফকীরগণের আগমন—ইলিয়াসের সহজ বিশ্বাস

সুলতান ইলিয়াস মনের সমস্ত দ্বিধা দূর করিয়া তাঁহার সমগ্র সেনাবাহিনীসহ অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সেনাবাহিনীতে ছিল দশ সহস্র অশ্বারোহী, পঞ্চাশটি হস্তী ও দুইলক্ষ পদাতিক সৈন্য।[১] একডালার সাত ক্রোশ দূরে তিনি দিল্লী-সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। সুলতান ইলিয়াস ভাবিয়াছিলেন, অতর্কিতে পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণ করিয়া শত্রুসৈন্যকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিবেন। কিন্তু সুলতান ফিরুজ জানিতেন, সম্মুখযুদ্ধে বঙ্গের সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করা কষ্টকর; সুতরাং তাঁহার লক্ষ্য ছিল বঙ্গের সুলতানকে তাঁহার নিরাপদ দুর্ভেদ্য আশ্রয় হইতে বাহিরে আনয়ন করা। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি কালন্দর বা ফকীরগণকে ইলিয়াসের শিবিরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। সুলতান প্রস্তুত ছিলেন—তিনি তাঁহার সেনাদলকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন—সেনাবাহিনীর দক্ষিণ ভাগের নায়ক ছিলেন মালিক দীলান আমীর-ই-শীকার, বামভাগে হিসামউদ্দীন নুয়া এবং কেন্দ্রভাগে ছিলেন তাতার খান।

ইলিয়াস কর্তৃক দিল্লী-বাহিনীর পশ্চাদনুসরণ

উভয়পক্ষে যুদ্ধ অপরিহার্য হইয়া উঠিল। মালিক দীলান বঙ্গের সেনাবাহিনীর বামপার্শ্ব প্রবলবেগে আক্রমণ করিলেন এবং প্রতিহত হইলেন। মালিক হিসামউদ্দীন নুয়াও প্রবলবেগে বঙ্গের বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। সুলতান ফিরুজ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উৎসাহবাক্যে তাঁহার সেনাদলকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিলেন। সমস্ত দিন তুমুল যুদ্ধ হইল এবং অপরাহ্নে বঙ্গের সেনাদল বিব্রত ও বিভ্রান্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিল।[২] ইলিয়াস বাধ্য হইয়া রাজচ্ছত্র, রাজদণ্ড যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুলতান ফিরুজ ইলিয়াসের আটচল্লিশটি হস্তী অধিকার করিলেন।[৩]

দিল্লী-সৈন্য ও বঙ্গ-বাহিনীর সংঘর্ষ

১) Elliot, *History of India*, Vol. III, Pp. 294-95
২) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 109
৩) Elliot, *History of India*, Vol, III, Pp. 295-97

রিয়াজ-উস-সালাতীন অনুসারে চুয়াল্লিশটি হস্তী যুক্ত হইয়াছিল।[১] দিল্লীর সৈন্য পাণ্ডুয়ার প্রত্যাবর্তন করিল এবং পুনরায় একডালা অবরোধ করিল।

একডালার দ্বিতীয় অবরোধ

দ্বিতীয়বার একডালা অবরোধ করিয়াও দিল্লীশ্বর ফিরুজ একডালা অধিকার করিতে পারিলেন না। এইবারে কতদিন একডালা অবরুদ্ধ ছিল তাহা কোন মুসলিম ইতিহাসকার লিপিবদ্ধ করেন নাই। এই অবরোধের পরিণাম চিন্তা করিয়া দুর্গের অধিবাসিগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কারণ, বলবন কর্তৃক তুঘরিলের আত্মীয়স্বজনের শাস্তির কাহিনী তখনও বঙ্গদেশে নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার প্রবাদরূপে প্রচলিত ছিল। সুতরাং অবরুদ্ধা দুর্গবাসিনীগণ একডালার প্রাসাদশীর্ষে আরোহণ করিয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন এবং করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই করুণ আর্তনাদ শ্রবণে সুলতান ফিরুজ অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। ফিরুজের মনে হইল, একডালা অধিকার করিতে গেলে বহু মুসলিমের প্রাণহানি হইবে এবং অবরোধবাসিনী বহু সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণী তাঁহার সৈন্যগণের হস্তে লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা হইবেন। একডালার অবরোধবাসিনীগণের ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া সুলতান ফিরুজ দিল্লী প্রত্যাবর্তনে কৃতসংকল্প হইলেন[২] এবং তাঁহার সেনাবাহিনীকে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন। এই কাহিনী সমসাময়িক ইতিহাস-রচয়িতা শামসী সিরাজ আফিফ তাঁহার তারিখ-ই-ফিরুজশাহী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শামসী সিরাজ আফিফের বর্ণনা

ফিরুজের মুসলিম রক্তপাতে অনিচ্ছা এবং নারীর আর্তনাদে ফিরুজের চিত্তবিভ্রমকেই বঙ্গ অভিযান অসম্পূর্ণ রাখিয়া সেনাবাহিনীকে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের নির্দেশের হেতু বলিয়া আফিফ উল্লেখ করিয়াছেন। এই কাহিনী সম্ভবতঃ সুলতান ফিরুজের দুর্বলতা গোপন করার উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছে। জিয়াউদ্দীন বারানী লিখিয়াছেন—সুলতান ফিরুজ একডালা বিজয়ের চেষ্টা না করিয়া বঙ্গের বন্দী, হস্তী ও বিজয়ের অন্যান্য নিদর্শনগুলি সঙ্গে লইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার দুর্বলতারই পরিচায়ক। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বর্ষাকাল আসিয়া পড়িল এবং পরাজয়ের পরিবর্তে বঙ্গের এই বর্ষাগমই ফিরুজের দিল্লী প্রত্যাবর্তনের কারণ বলিয়া নির্দেশিত হইল।[৩] দিল্লী প্রত্যাবর্তনের আদেশে সৈন্যগণ অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিল—ইহা শামসী সিরাজ আফিফও স্বীকার করিয়াছেন; কারণ বঙ্গের বর্ষার ভীষণ রূপ সম্বন্ধে তাহারা অবহিত ছিল। কেবল মালিক তাতার খান দিল্লীশ্বর ফিরুজকে গৌড়রাজ্য অধিকারের পরামর্শ দিয়াছিলেন।[৪] ফিরুজ শাহ একাদশ মাস গৌড়াভিযানে ব্যাপৃত ছিলেন। এই যুদ্ধে একলক্ষ অশীতি সহস্র বাঙ্গালী সৈন্য নিহত হইয়াছিল।

---

১) *Riyas-us-Salatin*, Tr. p. 102

২) Elliot, *History of India*, Vol. III, p. 297

৩) *Ibid*, p. 254

৪) *Ibid*, p. 297

৫) *Ibid*, p. 297

রিয়াজ-উস-সালাতীন রচয়িতা বলেন যে, বর্ষাগমে ফিরুজ সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইলিয়াসও দুর্গাভ্যন্তরে নানা অসুবিধা ভোগ করিতেছিলেন; সুতরাং ইলিয়াস সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পূর্বে ফিরুজ হাজী ইলিয়াসের সহিত সন্ধি করিলেন (৭৫৫/১৩৫৪ খ্রীঃ)। এই সন্ধির শর্তানুসারে শামসউদ্দীনের পুত্র ও গৌড়ের বহু বন্দী মুক্তিলাভ করিলেন। এই সন্ধিস্থাপনের পরেই ফিরুজ একডালার অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন।[১] আকবরের সমসাময়িক মুন্তাখাব-উত-তাওয়ারিখ রচয়িতা আবদুল কাদির বাদায়ুনীও এইরূপ সন্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[২] তবকাৎ-ই-আকবরীর রচয়িতা নিজামউদ্দীন আহম্মদও বলিয়াছেন যে, ফিরুজ ইলিয়াসের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া বন্দীদিগকে মুক্তিপ্রদান করিয়াছিলেন।[৩] কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাসকার শামস-ই-সিরাজ আফিফ এই সন্ধির কোন উল্লেখ করেন নাই; উপরন্তু তিনি লিখিয়াছেন যে, ফিরুজ শাহ দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলে ইলিয়াস একডালায় প্রবেশ করিয়া ফিরুজ শাহের নিযুক্ত শাসনকর্তাকে হত্যা করিয়াছিলেন (সম্ভবতঃ পাণ্ডুয়াতে, কারণ একডালা সবদা ইলিয়াসের অধীনে ছিল)।[৪]

দিল্লী ও বাঙ্গলার সন্ধি

সন্ধি হউক বা না হউক, দিল্লীর সুলতান দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন কবিলেন। তিনি একডালা জয় করিতে পারেন নাই কিংবা পরাজিত হইয়াছিলেন এবং শামসউদ্দীনই রহিলেন বঙ্গের সুলতান—এই দুইটি কথাই সত্য। ইলিয়াসও যে দিল্লীর সম্বন্ধে খুব নিঃশঙ্ক ছিলেন, তাহা নহে। ১৩৫৫ এবং ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস বহু উপঢৌকনসহ দিল্লীতে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৭৫৭/১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে বাঙ্গলা ও দিল্লীর সীমান্ত নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ দিল্লীর সুলতান সমানাধিকারের দাবিতে বাঙ্গলার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। ফিরুজ বঙ্গদেশ হইতে হস্তী প্রেরণের জন্যও ইলিয়াসকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠান। ৭৫৮/১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ হইতে মালিক তাজউদ্দীন হস্তী উপহারসহ দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। বিনিময়ে সুলতান ফিরুজও বঙ্গের সুলতানকে তুরস্ক এবং আরবের অশ্ব, খোরাসানের ফল এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি প্রেরণ করেন।[৫] এইরূপে প্রতি বৎসরই উভয় রাজ্যের মধ্যে দূত ও শুভেচ্ছা-বিনিময় হইত।

কামরূপ-বিজয়

সুলতান ইলিয়াসের জীবনের শেষ গৌরব বা কীর্তি হইল কামরূপ-বিজয়। বরেন্দ্রীর উত্তর-পূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অবস্থিত কামরূপ প্রাচীনকাল হইতেই একটি শক্তিশালী রাজ্য ও হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। বরেন্দ্রী বা বঙ্গদেশ মুসলিম কর্তৃক বিজিত হইলে বঙ্গের বহু হিন্দু স্বীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে কামরূপে গমন করেন। কামরূপের ধনৈশ্বর্য বহুপূর্বেই লক্ষ্ণৌতির মুসলিম শাসকবর্গের দৃষ্টি

---

১) *Riyaz-us-Salatin*, Tr., p. 102
২) *Muntakhab-ut-Tawarikh*. Tr. by Rankin, Vol. II, p. 325
৩) *Tabqat-i-Akbari*, Tr., p. 245
৪) Elliot, *History of India*, Vol. III, p. 298
৫) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 109

আকর্ষণ করিয়াছিল। ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসউদ্দীন আইয়াজ এবং ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মালিক উজবুক কামরূপের বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভিযান করিয়াছিলেন। একশত বৎসর পরে ৭৫৮/১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস কামরূপের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। কামরূপের সামাজিক ইতিহাসে যে বংশপঞ্জী লিপিবদ্ধ আছে, উহা হইতে জানা যায় যে, সেই সময়ে ইন্দ্রনারায়ণ ছিলেন কামতা বা কামরূপের অধিপতি। কিন্তু মুসলিম আক্রমণকারিদিগকে প্রতিহত করিবার মত সামর্থ্য বা যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। পূর্বে আসাম এবং ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে কাছাড় অভিযানে তাঁহার শক্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। ১৩২৯ খ্রীষ্টাব্দে একজন হিন্দু নরপতি কামরূপে প্রায় স্বাধীনতাই ঘোষণা করিয়াছিলেন।[১] কামরূপ রাজ্যের এই দুর্বলতার সুযোগে বঙ্গের মুসলিম বাহিনী ব্রহ্মপুত্রের তীর অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইল এবং রাজধানী কামরূপ নগর অধিকার করিল। ইলিয়াস কর্তৃক এই কামরূপ নগর অধিকার সম্বন্ধে ইতিহাসকার-গণের সন্দেহ রহিয়াছে। কিন্তু সেকেন্দর শাহ প্রচলিত মুদ্রা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ৭৫৯/১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই কামরূপ বিজিত হইয়াছিল এবং কামরূপে একটি মুদ্রাশালা নির্মিত হইয়াছিল। কারণ, সেকেন্দর শাহের মুদ্রাতে কামরূপ মুদ্রাশালার উল্লেখ আছে। সুতরাং কামরূপ ইলিয়াসের শাসনকালেই বিজিত হইয়াছিল; কারণ, সেকেন্দর শাহকে সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। কামরূপ-বিজয়ের অত্যল্পকাল পরেই সুলতান ইলিয়াসের কর্মময় জীবনের অবসান হয়। সম্ভবতঃ তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যুই হইয়াছিল; কারণ অস্বাভাবিক মৃত্যুর উল্লেখ নাই।

[কা]মরূপে ব্যর্থ অভিযান

কি ভাবে কোন্ সময়ে ইলিয়াসের রাজত্বের অবসান হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন ইঙ্গিত নাই। রিয়াজ-উস-সালাতীন অনুসারে ৭৫৯/১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীশ্বর ফিরুজ বঙ্গের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান করিয়াছিলেন। তারিখ-ই-মুবারক শাহীতেও এই বৎসরেই ইলিয়াসের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। কিন্তু ৭৬০/১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি মুদ্রায় ইলিয়াসের নাম অঙ্কিত আছে, সুতরাং মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন ৭৫৯/১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে ইলিয়াসের মৃত্যু হইয়াছিল।

ইলিয়াসের রাজত্বের অবসান

ইলিয়াসের চরিত্র ও কৃতিত্ব

ইলিয়াস কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। জন্মে তিনি ধাত্রীপুত্র, রাজরোষে পলাতক, কিন্তু ভাগ্যগুণে তিনি বাঙ্গলার সুলতানপদ লাভ করেন এবং বাহুবলে ত্রিহুত, নেপাল, উড়িষ্যা ও কামরূপ বিজেতারূপে গৌরব অর্জন করেন। সুলতান মুহম্মদ তুঘলকের বিষদৃষ্টি তাঁহাকে সুদূর বঙ্গদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। আলী মুবারক তাঁহার মাতার অনুরোধে ধাত্রীমাতার পুত্র ইলিয়াসকে আশ্রয় ও উচ্চ রাজপদ প্রদান করিয়াছিলেন। ইলিয়াস কিন্তু সেই সহৃদয়তার

বঙ্গের সিংহাসন অধিকার

---

১) Rant Kunchi Grant, *Social History of Kamarup*, Vol. I, p. 251

মর্যাদা রক্ষা করেন নাই, বরং তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। অবশ্য রাজ্য বা সম্পদের লোভে অনেকেরই এইরূপ দুর্বুদ্ধি হইয়া থাকে এবং এইরূপ কৃতঘ্নতা মুসলিম ইতিহাসে নূতন নহে।

লক্ষ্ণৌতির সিংহাসন লাভ করিয়া ইলিয়াস সিংহবিক্রমে সিংহাসনের মর্যাদা রক্ষা ও গৌরববৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। ত্রিহুত, নেপাল ও উড়িষ্যা বিজয় তাঁহার সামরিক প্রতিভার পরিচায়ক। নেপাল বিজয়ের মধ্যে তাঁহার আফঘানসুলভ দুর্ধর্ষতার আভাস পাওয়া যায়। দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে বিদ্রোহ ঘোষণা তাঁহার দুঃসাহসের পরিচয় দেয়। দুর্গম হিমালয় ও আসাম অভিযান ইলিয়াসের অদমনীয় পৌরুষের প্রমাণ। ফিরুজ তুঘলকের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তাঁহার দূরদর্শিতারই সাক্ষ্য বহন করে।

ইলিয়াসের দুঃসাহসিক কার্যাবলী

ইলিয়াসের কূটনীতিজ্ঞানও যথেষ্ট ছিল। দিল্লীর বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি কখনও যুদ্ধ করেন নাই। অবশ্য যুদ্ধ যখন অবশ্যম্ভাবী হইল, তখন বিনাযুদ্ধে দিল্লীশ্বরের বশ্যতাও তিনি স্বীকার করেন নাই। আবার সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত হইলে উহা তিনি উপেক্ষাও করেন নাই। সন্ধির পর তিনি দূত ও উপহার প্রেরণ করিয়া মিত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন। ইলিয়াস যতদিন জীবিত ছিলেন, ফিরুজও ততদিন তাঁহার সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ইলিয়াসকে ভীতির চক্ষেই দেখিতেন। নতুবা ইলিয়াসের মৃত্যুর পরই তাহার পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন কেন? সুতরাং সহজেই অনুমিত হয় যে, ইলিয়াস যোগ্যতা-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। অবশ্য দিল্লীর আমীর-ওমরাহগণ ইলিয়াসকে প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই এবং দিল্লীর দরবারী ইতিহাসকারগণও পূর্বভারতের এই মুসলিম বীরকে স্বচ্ছন্দমনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং দ্বেষবশতঃই তাঁহারা যেন ইলিয়াসকে 'ভাঙহি' (ভাঙখোর) এবং 'কুঁড়হি' (কুষ্ঠরোগী) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তারিখ-ই-ফিরুজশাহী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইলিয়াস কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া রোগমুক্তি কামনায় 'বাহ্‌রাইসের' দরগায় গমন করেন এবং দরগার পবিত্র ধূলিকণা তিনি সর্বাঙ্গে লেপন করেন। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত কোন নিরপেক্ষ ইতিহাসকার কর্তৃক এই সকল উক্তি সমর্থিত না হয়, ততদিন এই সকল তথ্য বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

ইলিয়াসের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা

ইলিয়াস শাহ তাঁহার রাজ্যে একটি নূতন রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু সুলতান ফিরুজ পাণ্ডুয়া অধিকার করিয়া এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করেন। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে ইলিয়াস হাজীপুরের প্রতিষ্ঠাতা। ফিরুজাবাদের বিরাট হামাম বা স্নানাগারও তাঁহারই আদেশে নির্মিত হইয়াছিল।

ইলিয়াস নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে পীর সিরাজউদ্দীন এবং শেখ বিয়াবানি বঙ্গদেশে আগমন করেন। পীর সিরাজউদ্দীনকে বলা হইত 'হিন্দুস্থানের দর্পণ'। শেখ বিয়াবানি ৭৫৫/১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ইলিয়াস তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। সেইজন্য তিনি একডালায় অবরুদ্ধ

থাকিলেও ছদ্মবেশে শেখ বিয়াবানির শবানুগমন করিয়াছিলেন। শেখ বিয়াবানির শব সমাধিস্থ হইলে তিনি সুলতান ফিরুজ শাহের সহিতও সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু সুলতান ফিরুজ কিংবা অপর কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। পরে ফিরুজ এই সংবাদ শ্রবণে দুঃখ প্রকাশ করেন।[১] এই ঘটনায় ইলিয়াসের ধর্মনিষ্ঠা ও অসীম সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইলিয়াসের ধর্মনিষ্ঠা

সেই যুগে ইলিয়াসের সুদীর্ঘ পনর বৎসর (৭৪৩/১৩৪২-৭৫৮/১৩৫৭ খ্রীঃ) রাজত্বকাল তাঁহার যোগ্যতারই পরিচয় দেয়। তাঁহার রাজত্বকালে কোন অন্তর্বিদ্রোহ কিংবা আত্মকলহ হয় নাই। তিনি তাঁহার পুত্র সেকেন্দর শাহকে সোনারগাঁয়ের জাবিতান নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পুত্র কখনও সিংহাসনের জন্য পিতার বিরোধিতা করেন নাই। দিল্লীর সহিত তিনি মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন ও আমরণ সেই মিত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন। দিল্লীর সহিত বার্ষিক দূত ও উপহার বিনিময় বঙ্গের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল। সেই যুগে সুলতান ইলিয়াসের স্বাভাবিক মৃত্যুও একটু অস্বাভাবিক।

সেকেন্দর শাহ ইলিয়াসী

(৭৫৯/১৩৫৮—৭৯৫/১৩৯৩ খ্রীঃ)

ইলিয়াসের মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র 'সেকেন্দর শাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া বিনা রক্তপাতে পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (৭৫৯/১৩৫৮ খ্রীঃ)।[২] সুলতান ফিরুজের প্রথম বঙ্গাভিযানের সময়ে তিনি পাণ্ডুয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। ফিরুজ পাণ্ডুয়া অধিকার করিলে তিনি দিল্লীশ্বরের হস্তে বন্দী হন, কিন্তু পরে সন্ধির শর্তানুসারে তিনি মুক্তিলাভ করেন। পরে তিনি সোনারগাঁয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ৭৫৮/১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত সেকেন্দর শাহের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৩] এই মুদ্রা হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি পিতার অনুমতিক্রমে সোনারগাঁ শাসন করিতেন, কিংবা পিতার বিরোধিতা করিয়া তিনি সোনারগাঁ অধিকার করিয়াছিলেন। কারণ, স্বাধীন কিংবা বিদ্রোহী শাসনকর্তা ব্যতীত কেহ স্বনামে মুদ্রাঙ্কন করেন না। যাহা হউক, ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর সেকেন্দর লক্ষ্মৌতির সুলতান পদে সমাসীন হইলেন।

সেকেন্দর শাহের সিংহাসনারোহণ

সেকেন্দর পিতার মতই যোগ্যতাসম্পন্ন নরপতি ছিলেন। তিনি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। তিনি স্থির করিলেন—দিল্লীর সহিত বঙ্গের মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে সিংহাসনারোহণের পরেই তিনি আলম খানকে দিল্লীতে দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। কয়েক মাস পরেই তিনি বাঙ্গলায় দিল্লীর রাজদূত মালিক সাইফউদ্দীনের মারফত উপহার-স্বরূপ পাঁচটি হস্তী দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও দিল্লীর সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল।

দিল্লীর সহিত দূত ও উপহার বিনিময়

---

১) *Riyas-us-Salatin*, Eng. Tr., p. 103
২) *Riyas-us-Salatin*, Eng., Tr., by Stewart. Pp. 103-04
৩) N. K. Bhattasali, *Coins* and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, p. 40

ফিরুজ তুঘলকের প্রথম লক্ষ্মৌতি অভিযান ব্যর্থ হয় নাই। তিনি বঙ্গের রাজধানী পাণ্ডুয়া অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গের সুলতান ইলিয়াসকে তিনি সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন নাই, কিংবা ইলিয়াস তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন নাই; যদিও প্রতি বৎসর দূত এবং উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া তিনি দিল্লীশ্বরের সহিত মিত্রতা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ফিরুজও বঙ্গের সুলতানকে দূত এবং উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন। তথাপি প্রতিদ্বন্দ্বী বঙ্গ-সুলতান ইলিয়াসের এই স্বাধীনতায় দিল্লীশ্বরের গৌরব ও সম্মান ক্ষুণ্ন হইতেছিল—তিনি স্বচ্ছন্দমনে ইলিয়াসের স্বাতন্ত্র্যকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন—কখন ইলিয়াসের ক্ষমতা চূর্ণ করিবেন। শীঘ্রই সুযোগও উপস্থিত হইল।

ফিরুজ শাহের প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরেই শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ নৌকা-যোগে সুবর্ণগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সহসা সুলতান ফকরউদ্দীন মুবারক শাহকে আক্রমণ করিয়া সোনারগাঁ অধিকার করেন (৭৫৩/১৩৫২ খ্রীঃ)।[১] ফকর-উদ্দীন পরাজিত ও নিহত হইলেন। জাফর খান নামক একজন সম্ভ্রান্ত পারসিকের সহিত ফকরউদ্দীনের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল এবং এই জাফর খান রাজস্ব বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুলতান ফকরউদ্দীনের মৃত্যুসময়ে তিনি সোনারগাঁয়ে উপস্থিত ছিলেন না—কার্যব্যপদেশে তিনি রাজ্যের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ফকরউদ্দীনের মৃত্যুতে তাঁহার আত্মীয়-পরিজন ও অনুচরবর্গ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। জাফর খান এই সংবাদ শ্রবণে আর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন না। সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া তিনি সিন্ধুদেশের থাট্টা বন্দরে উপস্থিত হইলেন।[২] তবকাৎ-ই-আকবরী অনুসারে ৭৫৮/১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জাফর খান থাট্টা হইতে দিল্লীর উপকণ্ঠে সুলতান ফিরুজ তুঘলকের দরবার হিসার-ই-ফিরুজ নগরে দিল্লীশ্বরের দর্শনপ্রার্থী হইলেন;[৩] উদ্দেশ্য শ্বশুর-হন্তা ইলিয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ। কারণ তিনি জানিতেন যে, ইলিয়াসের সহিত সন্ধি বা মৈত্রী স্থাপন করিলেও উহাই সুলতান ফিরুজের বঙ্গ-দিল্লী সম্বন্ধের শেষ সিদ্ধান্ত নহে। জাফর খান সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং তাঁহার প্রার্থনা নিবেদন করিলেন।

জাফর খানের দিল্লী আগমন

ইলিয়াসের প্রতিদ্বন্দ্বী মৃত ফকরউদ্দীনের জামাতা জাফর খানকে সুলতান ফিরুজ পরম সমাদরেই গ্রহণ করিলেন। সুলতান ফিরুজ মনে করিলেন, বঙ্গবিজয় ও তাঁহার নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধারের ইহাই সুবর্ণ সুযোগ। সুলতান ফিরুজ জাফর খানকে প্রথমে নায়েব-উজীর নিযুক্ত করিলেন এবং জাফর খানও তাঁহার অনুচরবর্গের জন্য বার্ষিক চারিলক্ষ মুদ্রা (তাম্র) মঞ্জুর করিলেন। কথিত আছে যে, প্রথম দিনেই জাফর খান ও তাঁহার অনুচরবর্গকে প্রয়োজনীয় সকল পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদান করা হইয়াছিল এবং বস্ত্রাদি ধৌতকরণের জন্য তিনি ত্রিংশৎ সহস্র মুদ্রা

ফিরুজ তুঘলক ও জাফর খান

---

১) Elliot, *History of India*, Vol. III, p. 304

২) *ibid.* Pp. 303-4

৩) *Tabqat-i-Akbari*, Eng. Tr., p. 246

পাইয়াছিলেন।[১] দিল্লীতে সুলতান ফিরুজের প্রিয় সবুজ-প্রাসাদ (কসর-ই-সবজ) তাঁহার বাসের জন্য নির্ধারিত হইল; নিঃশব্দে বঙ্গ অভিযানের আয়োজন চলিতে লাগিল। জাফর খান প্রধান উজীরপদে উন্নীত হইলেন—উপাধি হইল 'শাহ-ই-আজম জাফর খান'।

ফিরুজ তুঘলকের দ্বিতীয় বঙ্গাভিযান

ইলিয়াসের মৃত্যুসংবাদে ফিরুজ বঙ্গের সহিত বন্ধুত্বের মুখোশ ও ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিলেন—তিনি সেকেন্দর শাহকে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতে আদেশ করিলেন এবং এই স্বীকৃতি আদায়ের উদ্দেশ্যেই যেন সত্তর হাজার অশ্বারোহী, চারিশত সত্তরটি হস্তী, লক্ষাধিক পদাতিক সৈন্য সঙ্গে লইয়া ৭৬০/১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতি অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।[২] ফিরুজ বিরাট বাহিনীসহ কনৌজ ও অযোধ্যার পথে জৌনপুরে আসিয়া ছয়মাস অবস্থান করিলেন।[৩] বোধ হয়, সুলতান ফিরুজের উৎসাহের প্রথম উন্মাদনা তখন শেষ হইয়া গিয়াছিল। সুলতান ফিরুজের স্বভাবের একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, সমস্ত কাজই তিনি প্রথমে খুব উৎসাহের সহিত আরম্ভ করিতেন, কিন্তু শেষরক্ষা করিতে পারিতেন না। ছয়মাস পরে আবার তিনি গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন; সেকেন্দর শাহও ছিলেন পিতার উপযুক্ত পুত্র। পিতার ন্যায় তিনিও সসৈন্যে জলবেষ্টিত দুর্গম একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সুলতান ফিরুজের প্রতীক্ষায় রহিলেন। ইচ্ছা করিয়াই তিনি সম্মুখযুদ্ধ পরিহার করিলেন। সুলতান ফিরুজের সৈন্যদল একডালা দুর্গ অবরোধ করিল।[৪]

সেকেন্দর শাহের সুযোগ্য পরিচালনা ও দুর্গরক্ষা-ব্যবস্থা

বর্তমানে কয়েকটি মৃত্তিকাস্তূপ, বদ্ধ জলাশয় ও ভগ্ন জলাধার ব্যতীত প্রাসাদ-মসজিদ-শোভিত দুর্গনগরী একডালার অস্তিত্বের কোন নিদর্শনই বিদ্যমান নাই। কিন্তু একদিন এই নগরী সুদৃঢ় প্রাকার ও সুগভীর পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। ফিরুজের সেনাবাহিনীর সমস্ত প্রচেষ্টাই যেন একডালার দুর্গপ্রাচীরে প্রতিহত হইল। উভয়পক্ষে খণ্ডযুদ্ধ ও তীর বর্ষণ চলিতে লাগিল। দিল্লীর শিবিরে জাফর খানও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনিও বঙ্গের আমীরবর্গের মধ্যে মতান্তর, মনান্তর কিংবা দুর্গরক্ষায় কোন দুর্বলতার সন্ধান পাইলেন না বা সৃষ্টি করিতে পারিলেন না। অপরদিকে সেকেন্দরের সুযোগ্য পরিচালনায় তাঁহার সেনাবাহিনী সুশৃঙ্খলভাবে দিল্লীর সৈন্যকে প্রতিহত করিয়া দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিল। আফিফ বলেন, কিছুকাল পরে রক্ষিসৈন্যের পদভারে অথবা অন্য কোন কারণে অকস্মাৎ একদিন একডালা দুর্গের একাংশ ধ্বসিয়া পড়িল। সুলতানজাদা ফতে খান এবং মালিক হিসামউদ্দীন সুলতান ফিরুজকে এই ভগ্ন অংশের মধ্য দিয়া দুর্গ আক্রমণ করিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সুলতান ফিরুজ এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। আফিফ আরও বলেন, দিল্লীসৈন্যের হস্তে দুর্গান্তঃপুরবাসিনীগণ লাঞ্ছিত ও অপমানিত

---

১) বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪০ পৃঃ
২) Elliot, *History of India*, Vol. III, Pp. 304-05
৩) *Op. cit.*, Pp. 306-07
৪) *Op. cit.*, p. 308

হইবেন—এই আশঙ্কায় ফিরুজ এই আক্রমণ অনুমোদন করেন নাই। সেইদিনই সন্ধ্যা হইতে রাত্রি প্রভাতের মধ্যে সেকেন্দর দুর্গপ্রাচীর সংস্কার করিয়া ফেলিলেন।[১] ভগ্ন প্রাচীরের মধ্য দিয়া দুর্গ আক্রমণ না করার হেতু বোধ হয় সুলতান ফিরুজের চরিত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল—শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতাই ছিল তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব।

ফিরুজ ও সেকেন্দর শাহ ইলিয়াসীর সন্ধি

সুলতান ফিরুজের সৈন্য দুর্গের বাহিরে অবস্থান করিতেছিল। সেকেন্দরের সেনাবাহিনী দুর্গাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ। কেহ কাহাকেও আক্রমণ করিবার সাহস পায় নাই। খণ্ডযুদ্ধে যুদ্ধাভিলাষী সৈনিকের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। উভয় সেনাদলই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। সেই অবসরে দিল্লীর আমীর আজম হুমায়ুন হায়বৎ খান অগ্রসর হইয়া সেকেন্দর ইলিয়াসের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। আমীর আজম হুমায়ুনের ব্যক্তিগত স্বার্থও ছিল। তিনি ছিলেন বাঙ্গলার অধিবাসী এবং তাঁহার দুই পুত্র তখন বঙ্গ-সুলতান সেকেন্দর ইলিয়াসের অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। সুলতান ফিরুজের প্রধান শর্ত ছিল সোনারগাঁয়ের নিহত জাবিতান ফকরউদ্দীনের জামাতা দিল্লীর শাহ ই-আজম জাফর খানকে সোনারগাঁয়ে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সেকেন্দর শাহ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অন্য শর্ত হইল পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী দিল্লীতে উপঢৌকন প্রেরণ করিতে হইবে। সেকেন্দর এই শর্তানুযায়ী চল্লিশটি হস্তিসহ বহু মূল্যবান উপঢৌকন দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। মালিক হায়বৎ খানের অনুরোধে সুলতান ফিরুজ সেকেন্দর শাহ ইলিয়াসকে অশীতি সহস্র তাম্রমুদ্রা মূল্যের একটি মুকুট ও পঞ্চশত আরব ও তুরস্কদেশীয় অশ্ব উপহার প্রেরণ করেন।[২] সুলতান ফিরুজ অতঃপর দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন (৭৬০/১৩৫৮ খ্রীঃ)। ফিরুজ শাহ ভাবিলেন তিনি বিজয়ী—বঙ্গের সুলতান মনে করিলেন দিল্লীশ্বর ভীরু।

গৌড়েশ্বরের প্রেরিত উপহার দিল্লীতে পৌছিলে সুলতান ফিরুজ শাহ-ই-আজম জাফর খানকে আহ্বান করিয়া সোনারগাঁয়ের শাসনকর্তৃপদ গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন।

জাফর খান সোনারগাঁয়ে শাসনকর্তৃপদ গ্রহণে অভিলাষী ছিলেন না। সম্ভবতঃ তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যুর যথোপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় নাই; কিংবা দিল্লীর দরবারে নিশ্চিন্ত বিলাসজীবনের পরিবর্তে বাঙ্গলার অনিশ্চিত রাজনৈতিক আবর্তে তিনি নিজেকে বিজড়িত করিতে চাহিলেন না। ফলে সোনারগাঁ এবং লক্ষ্মৌতিতে পূর্বের মত সেকেন্দর শাহের কর্তৃত্বই অব্যাহত রহিল—দিল্লীর সহিত বঙ্গের রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন হইল এবং পরবর্তী দুই শতাব্দীকাল এই অবস্থাই অপরিবর্তিত রহিল।

---

১) Elliot, *History of India*, Pp. 308-09

২) বাঙ্গলার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪৩ পৃঃ

সেকেন্দর শাহ সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বঙ্গে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে এত দীর্ঘকাল রাজত্ব অভূতপূর্ব এবং অস্বাভাবিক। সেকেন্দর শাহের শাসনকালে নির্মিত প্রাসাদ, মিনার, হামাম ও মসজিদের ধ্বংসীভূত নিদর্শন হইতে অনুমিত হয় যে তিনি শিল্পানুরাগী ও শিল্পস্রষ্টা ছিলেন। এই সকল শিল্প ও স্থাপত্য-নিদর্শনের মধ্যে পাণ্ডুয়ায় আদিনা মসজিদ, পীর সিরাজউদ্দীনের মসজিদ ও তৎসংলগ্ন সমাধিসৌধ, গৌড়ের কোতোয়ালী দরওয়াজা, দিনাজপুরের অন্তর্গত গঙ্গারামপুরে মোল্লা আতার মসজিদ এবং হুগলীতে মোল্লা সিমলাই-এর মসজিদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আয়তনের বিশালতায় আদিনা মসজিদ ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে অতুলনীয়। এই মসজিদ কারুকার্যখচিত স্তম্ভশোভিত। এই বিশাল মসজিদটি উপাসনাগৃহ অপেক্ষা বিরাট দুর্গনগর বলিয়াই প্রতিভাত হয়। রিয়াজ-উস-সালাতিনের মতানুসারে এই মসজিদ ১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয় এবং চারি বৎসর পরে ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে উহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়—এই মর্মে একটি প্রস্তরলিপি আজও মসজিদটির প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন রহিয়াছে। আয়তনের বিশালতায় এবং বিরাটত্বে আদিনা মসজিদ দামস্কাসের খলিফা ওমরের মসজিদের সহিত তুলনীয়। ঐতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় বলেন যে, নিকটবর্তী একটি বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করিয়া এই মসজিদের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল।[১] মসজিদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আজও বহু দেবদেবীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক পার্সী ব্রাউনের অভিমত এই যে, লক্ষ্মণাবতীর হিন্দু মন্দির ও প্রাসাদ ধ্বংস করিয়াই এই মসজিদের উপকরণাদি সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

শিল্পানুরাগী ও শিল্পস্রষ্টা সেকেন্দর শাহ

আদিনা মসজিদ ভারতের বৃহত্তম মসজিদ

সেকেন্দর শাহ নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। মুসলিম সাধু-সন্তদের প্রতিও তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার শাসনকালে সেখ আবদুল হক নামে কোরায়েশী বংশের একজন ফকীর পাণ্ডুয়াতে বাস করিতেন। তাঁহার জনপ্রিয়তায় ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া সেকেন্দর তাঁহাকে সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত করেন। পীর আবদুল হক অবশ্য পুনরায় পাণ্ডুয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডুয়াতেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

নিষ্ঠাবান মুসলিম সেকেন্দর শাহ

সেকেন্দর শাহের অষ্টাদশ জন পুত্রের মধ্যে আত্মকলহ তাঁহার শেষ জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছিল। একদিকে প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত সপ্তদশটি পুত্র, অন্যদিকে দ্বিতীয়া মহিষীর গর্ভজাত একমাত্র পুত্র ঘিয়াসউদ্দীন। ঘিয়াসউদ্দীন রূপে-গুণে-কর্মকুশলতায় পিতার প্রিয়পাত্র ছিলেন। সেকেন্দর শাহ প্রিয়পুত্র ঘিয়াসউদ্দীনকেই রাজ্যভার প্রদানের সংকল্প করিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রথমা পত্নী রুষ্ট হইলেন। তিনি সেকেন্দর শাহের নিকট অভিযোগ করিলেন যে, ঘিয়াসউদ্দীন পিতাকে বিষ প্রদানে হত্যা করিয়া সিংহাসন লাভের চেষ্টা করিতেছেন। ঘিয়াসউদ্দীন এই সংবাদ শুনিয়া বুঝিলেন যে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে—বিপদ আসন্ন। সুতরাং বিপদ-

সেকেন্দর শাহের শেষ জীবন

১) গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, ৫৮ পৃঃ

আশঙ্কায় মৃগয়াচ্ছলে তিনি সোনারগাঁয়ে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি পিতার বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন (৭৮৯/১৩৮৮ খ্রীঃ)। মুদ্রা-প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, তিনি সোনারগাঁ এবং সাঁতগাঁয়ে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই বৎসরই স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কনও করেন। এইবার পিতাপুত্রে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পিতা প্রিয় পুত্রের হস্তে নিহত হইলেন—তাঁহারই রাজধানীর অদূরে গোয়ালপাড়া গ্রামে। সম্ভবতঃ যুদ্ধের জন্য ঘিয়াসউদ্দীন পাণ্ডুয়া পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। নতুবা রাজধানীর এত সন্নিকটে যুদ্ধের কোন হেতু নাই। যাহা হউক, প্রিয় পুত্রের হস্তে বীর পিতার নিধন অত্যন্ত মর্মান্তিক শোচনীয় ঘটনা। পিতা বা পুত্র কেহই এই শোচনীয় পরিণতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ঘটনার সমাবেশ এবং বিমাতার প্ররোচনাই এই মর্মান্তিক পরিসমাপ্তির জন্য বহুলাংশে দায়ী। পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী আদিনা মসজিদের পার্শ্বে তাঁহার শবদেহ সমাহিত করা হইয়াছিল। রিয়াজ-উস-সালাতিনের মতে সেকেন্দর শাহ নয় বৎসর কয়েক মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন।[১] স্টুয়ার্ট বলেন ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সেকেন্দর শাহের মৃত্যু হইয়াছিল।[২] অবশ্য মুদ্রা-প্রমাণ হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি আরও অন্ততঃ এক বৎসর জীবিত ছিলেন।

সেকেন্দরের শোচনীয় পরিণতি

প্রায় একশত আশি বৎসর (১৩৫৭-১৫৩৭ খ্রীঃ) দিল্লীর সঙ্গে বঙ্গের কোন সম্বন্ধ ছিল না। এই সময়টি দিল্লীর পক্ষেও অত্যন্ত বিপজ্জনক ও দুর্যোগময় হইয়া উঠিয়াছিল। সুলতান ফিরুজ শাহের ছিল অত্যধিক ও অস্বাভাবিক দাসপ্রীতি এবং এই দাসগোষ্ঠী বৃদ্ধ সুলতানের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহারা শাসন-ব্যবস্থার সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করিল এবং ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থে তাহারা সমগ্র শাসন-ব্যবস্থাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিল। তাহা ছাড়া দুর্ধর্ষ খঞ্জবীর তৈমুরলঙ্গের দিল্লী আক্রমণ তুঘলক-শাসনের ভিত্তিকে শিথিল করিয়া দিল। সৈয়দ সুলতানগণ তাঁহাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থেই সতত বিব্রত ছিলেন। লোদী সুলতানগণ অন্তর্বিদ্রোহেই বিপর্যস্ত হইতেছিলেন। এই অবস্থায় বাবর পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন। সুতরাং সৈয়দ ও লোদী সুলতানগণ কেহই বঙ্গদেশের প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। বঙ্গদেশ বিদ্রোহের দেশ বা বিদ্রোহীদের দেশ বলিয়াই বিবেচিত হইত এবং সুলতান ফিরুজ তুঘলকের পর দিল্লীর আর কোন সুলতান বঙ্গদেশকে দিল্লীর অধীনে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন নাই। সুদীর্ঘ একশত আশি বৎসর পরে শের শাহ বঙ্গের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেন।

দিল্লীর সহিত বঙ্গের সম্বন্ধ

সুতরাং বঙ্গদেশ এই সুদীর্ঘকাল পশ্চিমের আক্রমণ হইতে মুক্ত ছিল। উত্তর-পূর্ব দিকে অহোমরাজ্য তখনও সুসংহত ও সুসংবদ্ধ হয় নাই—কুচবিহারের শক্তিশালী রাজবংশের অভ্যুদয় তখনও হয় নাই। উড়িষ্যার লুণ্ঠিত সম্পদে বঙ্গের

---

১) *Riyas-us-Salatin*, Tr., p. 108

২) Stewart, *History of Bengal*, p. 89

ধনভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইলিয়াসশাহী সুলতানগণ পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য ও বিলাসেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন; তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল দিল্লীর সহিত কোন সম্পর্ক না রাখা এবং বাঙ্গলাকে দিল্লীর সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখা।

বঙ্গে স্বাধীন ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবন—নবজীবনের সূচনা

প্রায় দুইশত বৎসরের এই স্বাধীন নির্ঝঞ্ঝাট জীবন বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে নবজীবনের সঞ্চার করিল। দিল্লীর সুলতানগণ এই সুদূর প্রান্তস্থিত প্রদেশটির প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করেন নাই, 'বিদ্রোহের দেশ' বঙ্গের কুখ্যাতি, বঙ্গের বনহস্তী, বঙ্গের মশক ও ম্যালেরিয়া, বঙ্গের স্রোতস্বতী নদী ও উহাদের প্লাবন দিল্লীর সুলতানগণকে আতঙ্কগ্রস্তই করিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান কিংবা বহিরাগত কোন কোন মুসলমানও তথায় বসবাস করিতে আগ্রহান্বিত হয় নাই। পূর্বদিকে বারাণসী পর্যন্ত তাহাদের যাতায়াত ও কর্মকেন্দ্র ছিল এবং মুসলমান যুগ হইতে এই অঞ্চল মুঘলসরাই নামে পরিচিত হইয়াছে। এই অঞ্চল অতিক্রম করিতে হইলে অর্থাৎ বঙ্গদেশে যুদ্ধব্যপদেশে যাইতে হইলেই সেই যুগে মুসলিম সৈনিকগণ দ্বিগুণ বেতন ও ভাতা দাবি করিত। সুতরাং বঙ্গদেশের মুসলিমগণ বঙ্গের হিন্দুদের সহিত প্রতিবেশিসুলভ সৌহার্দ্য এবং প্রীতির সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পাশাপাশি বসবাস আরম্ভ করিল। এই নীতি ভবিষ্যতে সুফলপ্রসূ হইয়াছিল।

এই সময়ে হিন্দু রাজশক্তি ছিল দুর্বল—মেরুদণ্ডহীন। সমস্ত ক্ষমতা রাজকর্মচারি-গোষ্ঠীর হস্তে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। মুসলিম বিস্তার প্রতিরোধ করিবার মত হিন্দু-জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ কোন নায়কের অভ্যুদয় তখন হয় নাই। রাজা গণেশ এবং দনুজমর্দন ব্যতীত কোন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হিন্দু নায়ক বা রাজার অভ্যুদয়ও সেই যুগে ঘটে নাই। সেই সময়ে হিন্দুগণ যেন ঘটনা-প্রবাহের নীরব দ্রষ্টামাত্র ছিল। তাহারা মুসলিম সুলতানগণের সিংহাসনের দ্বন্দ্বে কিংবা অন্তর্বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে নাই। তাহারা রাজস্ব বিভাগে কিংবা শাসনকার্যের অন্য কোন দপ্তরে রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইতে পারিলেই পরিতৃপ্ত থাকিত এবং যুগ যুগ ব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে হিন্দুগণ সুনিপুণভাবেই এসকল কার্য সুসম্পন্ন করিত।

মুসলিমগণও বঙ্গের গ্রাম্য জীবনের আচারনিষ্ঠা ও শাসন-ব্যবস্থায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে নাই। গ্রাম-প্রধানগণ পূর্বের মতই তাঁহাদের কার্য পরিচালনা করিতেন। হিন্দুগণ তাহাদের অধিকার এবং ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণের অধিকার হইতে বিচ্যুত হয় নাই। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহার্থে সকল হিন্দুকেই জিজিয়া কর প্রদান করিতে হইত।

ঘিয়াসউদ্দীন আজম শাহ

৭৯৫/১৩৯১ খ্রীঃ—৮১৩/১৪০৯ খ্রীঃ

পিতৃহন্তা ঘিয়াসউদ্দীন 'আজম শাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি তাঁহার সপ্তদশজন বৈমাত্রেয়

ভ্রাতার চক্ষু উৎপাটিত করিলেন।[১] সিংহাসনের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের চক্ষুরুৎপাটন পূর্বক অন্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা, পোস্তজল পান করাইয়া বুদ্ধির বিকৃতি ঘটানো, কিংবা বিষ প্রয়োগে ধীরে ধীরে হত্যা করা কনস্টান্টিনোপলে তুর্কীদের মধ্যেই অধিক প্রচলিত ছিল। সেখানে একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে যে, রাজার কোন আত্মীয় নাই। বাঙ্গলাদেশে সিংহাসনের লোভে ভ্রাতৃগণের চক্ষু বিনষ্ট করা এই প্রথম।

সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের সপ্তদশ বৎসর রাজত্বের বিশেষ ঘটনা—আসামে বিফল অভিযান, জৌনপুরের জাবিতান খাজা জাহানের সঙ্গে উপহার বিনিময় (১৩৯৪-৯৯ খ্রীঃ), চৈনিক দূত চেঙ হোর অভ্যর্থনা ও উপহার প্রেরণ (১৪০৯ খ্রীঃ)।

আসাম অভিযান

আসাম বুরুঞ্জীতে সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন কর্তৃক আসাম অভিযানের ইতিহাস পাওয়া যায়। অহোম-রাজ সুধাঙ্ ফা কাম্‌তারাজ্যের (রঙপুর জেলা) বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন; কারণ, কাম্‌তারাজ তাও সুলাই নামক একজন অহোম বিদ্রোহীকে তাঁহার দরবারে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই দুই প্রতিবেশী রাজ্যের বিরোধের সুযোগে সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন কাম্‌তারাজ্য আক্রমণ করিলেন। কাম্‌তারাজ মুসলিম আক্রমণ প্রতিরোধ মানসে অহোমরাজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন এবং সুধাঙ্ ফা-র সঙ্গে মিলিত হইয়া ঘিয়াসউদ্দীনের সৈন্যদলকে আক্রমণ করেন। ঘিয়াসউদ্দীন সসৈন্যে করতোয়া নদীর অপর তীরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

জৌনপুরের সঙ্গে সম্বন্ধ

বাঙ্গলার সীমান্ত তখন জৌনপুরের সীমানা স্পর্শ করিয়াছিল। দিল্লীর সৈন্য বহুবার জৌনপুরের মধ্য দিয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিল। সুতরাং ঘিয়াসউদ্দীন জৌনপুরের জাবিতান খাজা জাহানের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন এবং তাঁহার নিকট কয়েকটি হস্তী উপঢৌকন প্রেরণ করেন। সৈয়দ আমলে দিল্লীর কোন সুলতান বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন নাই।

চীনের সহিত দূত বিনিময়

এই সময়ে বঙ্গদেশ বহির্ভারতের সহিতও বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিত। চীনের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, এই সময়ে চেঙ হো, ওয়াঙ চিঙ হুঙ প্রভৃতি কয়েকজন চৈনিক প্রতিনিধি বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। উদ্দেশ্য—চীন সম্রাটের পলাতক প্রতিদ্বন্দ্বী হুই-তির সন্ধান। চীনের প্রতিনিধিদল ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলাদেশে পদার্পণ করেন। চৈনিক প্রতিনিধিদলের সহিত আগত চৈনিক দোভাষী মা-হুয়ান বাঙ্গলাদেশ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে ঘিয়াসউদ্দীন চীন সম্রাটের নিকট বহু উপঢৌকন প্রেরণ করেন (১৪০৯ খ্রীঃ)। এই উপহার বিনিময় পরবর্তী কালেও চলিয়াছিল। সুলতান সাইফউদ্দীনও চীন-সম্রাটকে উপহার এবং সুবর্ণপাতে পত্র প্রেরণ করেন।

সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের রাজত্বের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় না। কিন্তু কিংবদন্তী ও মা-হুয়ানের বিবরণ হইতে সুলতানের চিন্তাধারা ও চরিত্র এবং তৎকালীন বাঙ্গলার অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

---

১) *Riyaz-us-Salatin*, Tr., p. 108

কাব্যরসিক ঘিয়াসউদ্দীন

সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন কাব্যরসিক ছিলেন। তিনি স্বয়ং কবিতা রচনা করিতেন। সুদূর পারস্যদেশের বিখ্যাত কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁহার পত্রালাপ হইয়াছিল। হাফিজকে তিনি বঙ্গদেশে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, একদা সুলতান আজম শাহ (ঘিয়াসউদ্দীন) অত্যন্ত পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছেন, জীবনের কোন আশা নাই, মৃত্যু অবধারিত; তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে। মুসলিম রীতি অনুসারে শবদেহ সমাধিস্থ করিবার পূর্বে স্নান করাইয়া সুগন্ধি দ্রব্য অনুলেপন এবং নববস্ত্র (কফন) পরিধান করাইতে হয়। সাধারণতঃ প্রিয় আত্মীয়স্বজনই এই কার্যের ভারপ্রাপ্ত হন এবং ইহা অত্যন্ত সম্মানসূচকও বটে। ঘিয়াসউদ্দীন তাঁহার প্রিয় ক্রীতদাসী সরবা, গুল ও লাল নাম্নী তিনজন অন্তঃপুরিকাকে এই কার্যের জন্য নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ঘিয়াসউদ্দীন ভাগ্যক্রমে রোগমুক্ত হইলেন এবং এই তিনজন ক্রীতদাসীকে যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। ফলে, তাহারা অন্যান্য ঈর্ষাপরায়ণা অন্তঃপুরিকাগণের চক্ষুঃশূলস্বরূপ হইল এবং তাহাদিগকে দেখিলেই অন্তঃপুরিকাগণ গাস্‌সালিন বা শব-রজকিনী বলিয়া বিদ্রূপ করিত। সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের নিকট এই সম্বন্ধে অভিযোগ করিলে তিনি কৌতুক অনুভব করিলেন এবং একটি কবিতার চরণ দ্বারা তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু তিনি কবিতার দ্বিতীয় পদটি পূরণ করিতে পারিলেন না। তিনি পারস্য-কবি হাফিজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন এবং দ্বিতীয় চরণটি পূর্ণ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। তিনি বঙ্গের দরবারে পারস্য-কবিকে আমন্ত্রণও করিলেন। হাফিজ কবিতার দ্বিতীয় চরণটি পূর্ণ করিয়া পাঠাইলেন,[১] কিন্তু বঙ্গে আগমনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। সম্ভবতঃ দীর্ঘ পথের কষ্টের জন্যই তিনি কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। কাহিনীটি সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, ইহা যে সুলতানের কাব্যপ্রীতির নিদর্শন—সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের মহত্ত্ব

অন্য একটি কাহিনী হইতে সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের মহত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একদিন কাজীর দরবার হইতে সুলতানের আহ্বান আসিল। তথায় উপস্থিত হইয়া সুলতান শুনিলেন যে মৃগয়াকালে তাঁহার তীরে বিদ্ধ হইয়া একজন বিধবা রমণীর একটিমাত্র পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সুতরাং কাজী তাঁহার শাস্তিবিধান করিলেন—সুলতানকে সেই বিধবা রমণীর ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। সুলতান নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ প্রদান করিলেন এবং স্বীয় অপরাধের জন্য ঐ রমণীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বিচারশেষে সুলতান তাঁহার রাজপরিচ্ছদের অভ্যন্তর হইতে একটি তরবারি বাহির করিলেন এবং কাজীকে কহিলেন—"আপনি যদি আজ সুলতান বলিয়া ন্যায়ের অমর্যাদা করিতেন, তাহা হইলে এই তরবারি দ্বারা আপনার শিরশ্ছেদ করিতাম।" কাজী তাঁহার বিচারাসনের নিম্ন হইতে একটি চাবুক বাহির করিয়া বলিলেন—"আপনি যদি আজ সুলতান বলিয়া আইনের

১) *Riyas-us-Salatin*, Tr., Pp. 105-6
Abid Ali, *Memoirs of Gaur and Pandua*, p. 26

অমর্যাদা করিতেন, তাহা হইলে এই চাবুকের আঘাতে আজ আপনার পৃষ্ঠদেশ ক্ষত-বিক্ষত হইত।"[১] সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন ছিলেন বিখ্যাত মুসলিম সাধু শেখ নুর কুতুব-উল-আলমের সহকর্মী এবং শেখ হাফিজউদ্দীন নাগোরীর শিষ্য।

রিয়াজ-উস্-সালাতিনের মতে ৭৯৫/১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের মৃত্যু হয়।[২] কিন্তু মুদ্রা হইতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ৭৯৯/১৩৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী মগপাড়াতে তাঁহার সমাধিসৌধ রহিয়াছে। পূর্ববঙ্গে তাঁহার সমাধিসৌধ হইতে অনুমিত হয় যে, সম্ভবতঃ সোনারগাঁয়ে সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের মৃত্যু হইয়াছিল। তবে, পূর্ববঙ্গে যে সমাধিসৌধ দৃষ্ট হয় উহা দ্বিতীয় সেকেন্দর শাহের সমাধি। কারণ, ঘিয়াসউদ্দীনের পিতা প্রথম সেকেন্দর শাহ পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন এবং সেকেন্দর শাহের এই সমাধি ঘিয়াসউদ্দীন কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের রাজত্বের আর কোন শিল্পনিদর্শন কিংবা অনুশাসন বা শিলালিপি পাওয়া যায় নাই। হিন্দু জমিদার গণেশের চক্রান্তে ঘিয়াসউদ্দীন নিহত হইয়াছিলেন।[৩]

ঘিয়াসউদ্দীনের মৃত্যু

সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন আজম শাহের রৌপ্যমুদ্রা মুয়াজ্জমাবাদ এবং ফিরুজাবাদে আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৪] এই সকল মুদ্রার সময়কাল হিজরী ৭৭২—৭৯৯ এবং হিজরী ৭৯১—৭৯৯। হিজরী ৭৯০—৭৯৮ সনে মুদ্রিত মুদ্রা সপ্তগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সপ্তগ্রাম এবং মৌজদাবাদে প্রাপ্ত মুদ্রা হইতে অনুমিত হয় যে, সেকেন্দর শাহের মৃত্যুর সতর বৎসর পূর্বে ঘিয়াসউদ্দীন পূর্ববঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ৭৯০/১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জিন্নতাবাদের মুদ্রাশালায় মুদ্রিত একটি মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে ইহা সত্যই সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের মুদ্রা কি-না এখনও সঠিক জানা যায় নাই। কানিংহামের মতে, গৌড়ের একটি ইষ্টকখণ্ডে সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের নাম খোদিত আছে।[৫] ইহা সম্ভবতঃ এই ঘিয়াসউদ্দীন সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের পুত্র ঘিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহ।

মা-হুয়ানের বঙ্গ-বিবরণ

সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের রাজত্বের একটি বিশেষ ঘটনা চৈনিক দোভাষী মা-হুয়ানের বঙ্গে আগমন। ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনসম্রাট য়ুঙ লো তাঁহার নির্বাসিত প্রতিদ্বন্দ্বী হুই-তির সন্ধানে চেঙ হো, ওয়াঙ-চিঙ-হুঙ প্রভৃতি কয়েকজন দূতকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজ্যসমূহে প্রেরণ করেন। মা-হুয়ান দোভাষীরূপে এই চৈনিক প্রতিনিধিদলের সহিত বঙ্গে আগমন করেন। চীনদেশীয় গ্রন্থে (ঈঙ-আই-শেঙ-লান)

দোভাষী মা হুয়ান

১) *Riyaz-us-Salatin*, Tr., Pp. 110-'11
২) *Op. cit.*, Tr. p. 111
৩) *Op. cit.*, Tr. p. 121
৪) *Op. cit*, Tr. p, 111
৫) *Archaeological Survey Report*, Vol. XV

বর্ণিত আছে যে, চেঙ হো সুইমন-তালা (সুমাত্রা) হইতে যাত্রা করিয়া বাষট্টি খানি জলযান এবং তিন সহস্র সৈন্যসহ একবিংশতি দিবসে বঙ্গের চেহ্-টি-গান (চাটগাঁ) বন্দরে উপস্থিত হইলেন। চেহ্-টি-গান হইতে নৌকাযোগে সোনা-উরহ্-কোঙ (সোনারগাঁও) বন্দরে উপস্থিত হইলেন। চেহ্-টি-গান হইতে সোনা-উরহ্-কোঙ-এর দূরত্ব ৫০০ লী অর্থাৎ প্রায় ১৬৬ মাইল। সোনারগাঁও হইতে লক্ষ্মণাবতীর দূরত্ব প্রায় ১০৫ মাইল।[১]

-হুয়ানের বিবরণ

মা-হুয়ানের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে বহু প্রাচীরবেষ্টিত নগরী আছে—উহাদের মধ্যে লক্ষ্মণাবতী অন্যতম। রাজা পাত্রমিত্রসহ নগরে বাস করেন। রাজধানীর অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ ও মুণ্ডিতকেশ; কিন্তু তাঁহাদের মস্তকে শ্বেতবর্ণের শিরস্ত্রাণ এবং কোমরে রঙ্গীন কোমরবন্ধ। তাঁহাদের পাদুকার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। সুলতান ও আমীরগণ মুসলমানী পোশাক পরিধান করেন। সাধারণ লোকের ভাষা বাংলা; ফার্সী ভাষাও অপ্রচলিত নহে—বিশেষতঃ অভিজাতদের মধ্যে। চীনদেশের গ্রীষ্মকালের ন্যায় এখানে সারা বৎসরই গ্রীষ্ম। এই দেশে ধান, গম, যব ও সর্ষপ জন্মে। নারিকেল, তাল ও কাজঙ হইতে মাদকদ্রব্য প্রস্তুত হয়। সুরা প্রকাশ্য বিপণিতে বিক্রীত হয়। আম, কাঁঠাল, কলা এবং ইক্ষুও প্রচুর জন্মে। বৎসরে দুইবার ফসল উৎপন্ন হয়।

বাঙ্গলার অধিবাসী

বাঙ্গলার কৃষি

দেশের অধিবাসীদের অধিকাংশ কৃষিজীবী। বণিক, জ্যোতিষী, শিল্পী এবং পণ্ডিতও আছেন। ধনী বণিকগণ পণ্যসম্ভার লইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিতে যান এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বৃহৎ নৌযান নির্মাণ করাইয়া থাকেন। এই দেশে ছয় প্রকার সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র নির্মিত হয়। রেশম-কীট প্রতিপালিত হয় এবং রেশম-বস্ত্রও বয়ন করা হয়। এই দেশের মুদ্রার নাম টঙ্কা। সাধারণ বিনিময়ের জন্য কড়িও ব্যবহৃত হয়। এই দেশে কোন নির্দিষ্ট পঞ্জিকা নাই—দ্বাদশ মাসে বৎসর গণনা করা হয়।

বাঙ্গলার শিল্প

এ দেশের লোক সাধারণতঃ চা পান করে না; তাম্বুল দ্বারা অতিথির অভ্যর্থনা করা হয়। এ দেশের রাজপথ ছায়াপ্রদ বৃক্ষশোভিত। পথিপার্শ্বে বিশ্রামশালা (সরাইখানা) ও বিপণি বিরাজিত। তথায় খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থাও আছে। নগরীতে বহু হামাম বা স্নানাগার বিরাজিত।

মা-হুয়ান নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়া-কৌতুক, পশুযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। এক শ্রেণীর নাট্যকার বিচিত্র বসনে ভূষিত হইয়া বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নাটক অভিনয় করে। অন্য এক শ্রেণীর গায়ক মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় অভিজাত সম্প্রদায়ের গৃহে গমন করিয়া সংগীত, নৃত্য ও বাদ্যের দ্বারা গৃহস্থের মনোরঞ্জন করে, পথে বাজীকর নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌতুক প্রদর্শন করে। পশুর মেলা ও মল্লযুদ্ধ মানুষের মনোরঞ্জন করে।

বাঙ্গলার আমোদ-প্রমোদ

১) বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪৮-৫৯ পৃঃ

চীনদেশের মিঙ রাজবংশের ইতিহাস অনুসারে ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলার গৈ-য়া-সজু-চিঙ (ঘিয়াসউদ্দীন) বহু উপঢৌকনসহ চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুলতান কি-য়েন-কু-চিঙ (সাইফউদ্দীন) দূত, পত্র এবং উপহার বিনিময় করেন।

সাইফউদ্দীন হামজা শাহ

(৮১৩/১৪১০—৮১৪/১৪১১ খ্রীঃ)

রাজা গণেশের সিংহাসনারোহণ

পিতার মৃত্যুর পর সাইফউদ্দীন হামজা শাহ সৈন্যাধ্যক্ষদের সহায়তায় বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু হামজা শাহের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গেই গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই গৃহযুদ্ধে কান্‌স বা রাজা গণেশ নামে একজন হিন্দু জমিদার প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। হামজা শাহ প্রায় দুই বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র শামস্‌উদ্দীন বা শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ বাঙ্গলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু রাজা গণেশ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই হিন্দু-পুনরুত্থান সূচিত হয় (১৪১০—১৫৪২ খ্রীঃ)।

অষ্টম অধ্যায়

গণেশী বংশের অধীনে বঙ্গদেশ—হিন্দুজাতির পুনরুত্থান

(৮১৩/১৪১০—৮৪৬/১৪৪২ খ্রীঃ)

সূচনা : ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীবীর তৈমুরের আক্রমণে দিল্লী-সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া গেল। দিল্লী-সুলতানের ক্ষমতা দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বে সীমাবদ্ধ হইল। সৈয়দবংশীয় সুলতানগণ আত্মরক্ষায় সতত বিব্রত ছিলেন—সুতরাং বঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাতের অবসর তাঁহাদের ছিল না। কেন্দ্রীয় শক্তির এই দুর্বলতার সুযোগে বাঙ্গলা দেশে রাজা গণেশ কর্তৃক হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজা গণেশ ও তাঁহার বংশধরগণ বত্রিশ বৎসর বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন (৮১৩/১৪১০—৮৪৬/১৪৪২ খ্রীঃ)। সেই যুগের চারিজন হিন্দু নরপতির মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে—রাজা গণেশ ও তাঁহার পুত্র জয়মল্ল, জিৎমল বা যদু সেন জালালউদ্দীন এবং দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব। রাজা গণেশের অধীনে বঙ্গদেশে হিন্দুশক্তির পুনরুত্থানের ইতিবৃত্ত অসংলগ্ন—সমসাময়িক কালের লিখিত কোন ইতিহাস নাই। কিংবদন্তী, কুলপঞ্জী ও মুদ্রায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই যুগের ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা হইয়াছে। মুসলিম অধিকৃত উত্তরাপথে রাজা গণেশই প্রথম হিন্দুর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। মুসলিমবিজিত বঙ্গে রাজা গণেশের আবির্ভাবকে মুসলিমগণ সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে নাই। সুতরাং তাহারা রাজা গণেশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিদ্বেষ প্রকাশের জন্য নানা কেচ্ছা-কাহিনীর অবতারণা করিয়াছে। কিন্তু মুসলিমগণের নিন্দার পরিমাণই রাজা গণেশের যোগ্যতার পরিমাপক।

রাজা গণেশের আবির্ভাব

ইলিয়াস শাহের বংশধর ঘিয়াসউদ্দীন আজম শাহের মৃত্যু হইলে বাঙ্গলার শাসন-ব্যবস্থায় নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। সুলতান ইলিয়াস শাহের প্রপৌত্রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বঙ্গের একজন হিন্দু জমিদার গৌড় ও বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ফার্সী ভাষায় লিখিত ইতিহাসে তিনি কানস্ নামে পরিচিত। দিল্লীর সিংহাসনে তখন ফিরুজশাহ্ তুঘলকের পর মামুদ শাহ্ তুঘলক আসীন (৭৯৫/১৩৯২—৮১৪/১৪১২ খ্রীঃ)। তাঁহার রাজত্বকালে বিখ্যাত তুর্কী বীর তৈমুর লঙ দিল্লী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া তুঘলক সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিলেন। তুঘলক বংশের পর সৈয়দবংশীয় খিজির খান সমরকন্দের প্রতিনিধিরূপে দিল্লীর শাসনভার পরিচালনা করেন (৮১৭/১৪১৪—৮২৪/১৪২১ খ্রীঃ)। তাঁহার বংশধর মুবারক শাহ (৮২৭/১৪২১—৮৩৭/১৪৩৩ খ্রীঃ) এবং মুহম্মদ শাহ (৮৩৭/১৪৩৩—৮৪৯/১৪৪৫ খ্রীঃ) দিল্লীর শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন ; কিন্তু তাঁহারা উভয়েই ছিলেন দুর্বল নরপতি। সুতরাং তাঁহাদের শাসনকালে উত্তর ভারতে মুসলিম আধিপত্য শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের এই দুর্বলতার সুযোগে সুদূর বঙ্গদেশে হিন্দুদের পুনরুত্থান সম্ভবপর হইয়াছিল।

বঙ্গে তখন মুসলমান অধিকারের দুইশত বৎসর অতীত হইয়াছে। পাঠান সামন্তবর্গ ইতোপূর্বেই দিল্লীশ্বরের অধীনতাশৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে বঙ্গে রাজ্য বিস্তার ও রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। মধ্যবঙ্গের সর্বত্র ইসলামের অর্ধচন্দ্রশোভিত পতাকা উড্ডীয়মান; বিজেতা পাঠানের প্রভাব সুবিস্তৃত—মুসলমান জায়গিরদার ও তাঁহাদের অনুচর বিদেশী যুদ্ধ-ব্যবসায়ীর সংখ্যাও ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে। পাঠান সামন্তবর্গের পরস্পর ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বে সমগ্র দেশ সংক্ষুব্ধ ও সম্পূর্ণ উপদ্রুত। মৃতপ্রায় হিন্দুসমাজ বিধর্মী বিজেতার সামরিক অত্যাচারে ম্রিয়মাণ। দেশের এই দুর্যোগের সময়ে রাজা কানস্ বা গণেশের আবির্ভাব।

বঙ্গের তদানীন্তন অবস্থা

১৪১০-১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশে হিন্দুশক্তির পুনরভ্যুত্থানের ইতিবৃত্ত অসংলগ্ন—সমসাময়িক ইতিহাসকারগণের রচিত কোন ইতিহাস নাই। কিংবদন্তী, কুলপঞ্জী ও মুদ্রা এই যুগের ইতিহাস রচনার প্রধান উপাদান। পরবর্তী যুগে তিনজন মুসলমান ইতিহাসকার তাঁহাদের গ্রন্থে এই সকল হিন্দু রাজন্যবর্গের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্রাট আকবরের সময়ে নিজামউদ্দীন বক্সী তাঁহার তবকাৎ-ই-আকবরীতে (১৫৯২ খ্রীঃ), আবুল ফজল তাঁহার আইন-ই-আকবরীতে (১৫৯৩ খ্রীঃ), বদায়ুনী তাঁহার মুন্‌তা-খাব-উৎ-তাওয়ারিখে (১৫৯৬ খ্রীঃ) সমগ্র ভারত-ইতিহাসের খণ্ডাংশরূপে বাঙ্গলার ঘটনা আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা রচনার উপাদান সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তী যুগে বৃটিশ রাজত্বকালে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গোলাম হুসেন সালিম রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থে বঙ্গের ইতিহাস বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গ-ইতিহাসের ঘটনা তিনি ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ৩৭৮ বৎসর পরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—সুতরাং জনশ্রুতি, কাহিনী ও কল্পনার সঙ্গে তথ্য মিশ্রিত করিয়া তিনি তাঁহার ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। গবেষণার কষ্টিপাথরে গোলাম হুসেনের বর্ণনাগুলি অনেকস্থলেই সত্য, অর্ধসত্য বা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। তদুপরি গোলাম হুসেনের রচনায় হিন্দুবিদ্বেষ পরিস্ফুট। সুতরাং, হিন্দু নরপতি গণেশ বা দনুজমর্দনের সম্বন্ধে সম্মানজনক সংবাদ পরিবেশন করিতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব

বৃটিশ যুগে ভারতের ইতিহাস রচনা আরম্ভ হইলে স্টুয়ার্ট, বুকানন, গ্রাণ্ট, ব্লকম্যান প্রভৃতি ইতিহাসকারগণ রাজস্ববিভাগীয় দলিল, আবিষ্কৃত মুদ্রা, পারিবারিক কুলপঞ্জী এবং কিংবদন্তীর সংমিশ্রণে তথ্যমূলক ইতিহাস রচনার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তথ্যের অভাবে এই ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় নাই। আবিষ্কৃত মুদ্রাগুলির মধ্যে একই বৎসরে দুই-তিনজনের নামাঙ্কিত মুদ্রাও দেখা যায়—আবার কোন বৎসরের কোন মুদ্রাই পাওয়া যায় নাই। মুসলমান সুলতানগণ মসজিদ বা কবরে শিলালিপি ব্যবহার করিতেন, মুদ্রাতে সন-তারিখ ব্যবহার করিতেন—সুলতানের নাম (কোথাও নিজ পরিচয় সমন্বিত বা পিতৃপরিচয় বিবর্জিত) উল্লিখিত থাকিত, সুতরাং উল্লিখিত সুলতানগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ন্যূনাধিক নিশ্চিত হওয়া যায়। রাজা গণেশের নামাঙ্কিত মুদ্রা বা শিলালিপির অভাবে তাঁহার বিষয়ে

রাজা গণেশ সম্বন্ধে আধুনিক ইতিহাস

লিখিত অর্ধ-ঐতিহাসিক, অনৈতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে হইবে। তিন শতাব্দীর বিভিন্ন ইতিহাসকারের পরস্পর-বিরোধী আংশিক বিবরণ দ্বারা সত্য অনেকটা ম্লান হইয়া গিয়াছে। মুসলিম ইতিহাসকার গোলাম হুসেন যদিও রাজা গণেশের জন্য সর্বাধিক মসী ব্যয় করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষ, সময়ের দূরত্ব এবং কল্পনাপ্রিয়তা তাঁহার রচিত ইতিহাসের ঘটনাকে অনেক স্থলে সন্দেহভাজন করিয়া তুলিয়াছে।

রাজা গণেশ ও তাঁহার পুত্রদের সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী ও কিংবদন্তী

রাজা গণেশের মুদ্রা বা শিলালেখ আবিষ্কৃত না হইলেও তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের বিভিন্ন গ্রন্থে তিনি বিভিন্নভাবে চিত্রিত হইয়াছেন। মুসলমান ইতিহাসকারগণের মতানুসারে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গলায় একজন হিন্দু জমিদার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সুলতান ইলিয়াস শাহের প্রপৌত্রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং গৌড় ও বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ফার্সী ভাষায় লিখিত ইতিহাসে তিনি কানস্ নামে পরিচিত।[১] কানস্ সংস্কৃত বা বাংলা গণেশ। ওয়েস্টমেকট (Westmacott) বলেন, কানস্-এর সংস্কৃত মূল গণেশ।[২] ব্লকম্যান (Blocmann) বলেন কানস্ গণেশ হইতে পারে না ; কারণ, ফার্সী মূল গ্রন্থে গাফ (گ)-এর পবিবর্তে সর্বত্র কাফ (ک)-এর ব্যবহার অসম্ভব।[৩] কিন্তু বেভারিজের (Beveridge) মতানুসারে কানস্ গণেশ হওয়াই স্বাভাবিক ; কারণ, হস্তলিখিত ফার্সী গ্রন্থে সাধারণতঃ গাফ (گ)-এর পরিবর্তে কাফ (ک)-এর ব্যবহার হয়।[৪] ডাক্তার বুকানন হ্যামিল্টন তাঁহার East India নামক গ্রন্থে দিনাজপুর জিলার বিবরণে গণেশ নামই ব্যবহার করিয়াছেন।[৫] রিয়াজ-উস্-সালাতিন অনুসারে গণেশ ভাতুরিয়ার রাজা বা জমিদার[৬], হ্যামিল্টনের মতানুসারে গণেশ দিনাজপুরের হাকিম[৭]। গণেশের জাতি সম্বন্ধেও নানা মতভেদ রহিয়াছে। বরেন্দ্র-কুলপঞ্জী অনুসারে গণেশ ব্রাহ্মণ ছিলেন,[৮] কায়স্থ কুল-পঞ্জিকা অনুসারে তিনি কায়স্থ এবং দিনাজপুরের রাজবংশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন।[৯] কিন্তু এই সকল কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিকতাও নিরূপিত হয় নাই।

রাজা গণেশের পরিচয়

---

১) *Riyas-us-Salatin Bibliotheca Indica*, p. 110
২) *Calcutta Review*, Vol. LV, p. 208
৩) *JASB—Old Lives*, Vol. XLIV 1875 pt. I, p. 287
৪) *Do*—Vol. LXI 1892, pt I., p. 118
৫) *Eastern India*, Vol. II, p 618
৬) *Riyas-us-Salatin*, Eng. Tr., p. 113 F. N.
৭) *Eastern India*, Vol. II, p. 618
৮) বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস, দুর্গাচরণ সান্ন্যাল, ৬৯-৭৪ পৃঃ
৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য কাণ্ড, ৩৬৮ পৃঃ

নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইয়াছে যে, সুলতান শামসউদ্দীনের মৃত্যুর পর রাজা কানস্ (গণেশ) নামক একজন হিন্দু জমিদার বঙ্গে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজা গণেশ বঙ্গদেশ হইতে ইসলামধর্ম বিলুপ্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন—বঙ্গদেশ মুসলিমের রক্তে রঞ্জিত হইল, বহু শিক্ষিত মুসলমান উলেমা এবং শেখ রাজা গণেশের আদেশে নিহত হইলেন। শেখ মুইন-উদ্দীন আব্বাসের পিতা শেখ বদর-উল্'-ইসলাম রাজা গণেশকে অভিবাদন না করায়, রাজা গণেশের আদেশে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। সেই দিনই অবশিষ্ট বহু মুসলিম উলেমাকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া মধ্যনদীতে নৌকা জলমগ্ন করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণনাশ করা হইল।[১] সুতরাং মুসলমানের হত্যায় বিচলিত হইয়া শেখ নূর কুতুব-উল'-আলম জৌনপুরের শার্কী সুলতান ইব্রাহিম শাহকে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিয়া পত্রপ্রেরণ করিলেন।[২] আবদুল কাদির বাদায়ুনীর মুন্তাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ গ্রন্থে বা ফেরিস্তার গ্রন্থে ইব্রাহিম শাহের বঙ্গ আক্রমণের উল্লেখ নাই। গোলাম হুসেন বলেন, সুলতান ইব্রাহিম শাহ বহুসংখ্যক সৈন্যসহ বঙ্গে অভিযান করিলেন—সুলতানী সৈন্য সরাই ফিরুজপুরে শিবির সন্নিবেশ করিল। রাজা গণেশ আক্রমণাশঙ্কায় ভীত হইয়া শেখ কুতুবের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শেখ সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি রাজা গণেশকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে উপদেশ দিলেন। রাজা গণেশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু মহিষী ত্রিপুরাদেবীর অনুরোধে রাজা গণেশ ধর্মান্তর গ্রহণে নিবৃত্ত হইলেন। সুতরাং তিনি তাঁহার পুত্র দ্বাদশবর্ষীয় বালক যদুমল্লকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করিয়া বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিতে স্বীকৃত হইলেন। যদুমল্ল ইসলামে দীক্ষিত হইলেন; তাঁহার নূতন নামকরণ হইল জালাল-উদ্দীন। তাঁহাকে বঙ্গের সিংহাসনেও প্রতিষ্ঠিত করা হইল।[৩] বঙ্গদেশে আবার ইসলামীয় রীতিনীতির প্রবর্তন হইল।

রিয়াস-উস-সালাতীন বা মুহম্মদ গোলাম হুসেনের মতানুসারে রাজা গণেশ ও যদু বা জালালউদ্দীনের কাহিনী

গণেশের পুত্র যদুমল্লের ইসলামধর্ম গ্রহণ

জালালউদ্দীন বা যদুমল্ল বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে শেখ নূর কুতুব-উল'-আলম ইব্রাহিম শাহকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুরোধ করিলেন। বঙ্গবিজয়া-ভিলাষী সুলতান ইব্রাহিম আসন্ন জয়ের মুখে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে অস্বীকার করিলেন। শেখ কুতুব-উল'-আলম তাঁহার আদেশ পালনে শৈথিল্য দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সুলতান ইব্রাহিম ও তাঁহার প্রধান কাজী শিহাবউদ্দীনকে অভিশাপ দিলেন—জৌনপুরে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহাদের মৃত্যু হইবে।[৪] সুলতান ইব্রাহিম অনিচ্ছা সত্ত্বেও জৌনপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেই বৎসরই তাঁহাদের উভয়ের মৃত্যু হইল। কিন্তু গোলাম হুসেনের এই বিবরণ সম্ভবতঃ সর্বথা সত্য নহে। কারণ, তারিখ-ই-ফেরিস্তা অথবা মুন্তাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ গ্রন্থে ইব্রাহিম শাহ কর্তৃক গৌড়রাজ্য

---

১) **Riyas-us-Salatin, Eng. Tr. p. 111**

২) ***I bid*, p. 113**

৩) ***I bid*, p. 112**

৪) ***I bid*, p. 114**

আক্রমণের উল্লেখ নাই। তদ্ব্যতীত রাজা গণেশের মৃত্যুর অন্ততঃ ষড়্‌বিংশতি বর্ষ পরে জৌনপুরে সুলতান ইব্রাহিম শাহের মৃত্যু হইয়াছিল।[১] ইব্রাহিম শাহ ৮৪৪/১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

রাজা গণেশের আচরণ

রাজা গণেশ ঘিয়াসউদ্দীন আজম শাহের সময় হইতে বাঙ্গলা দেশ পরিচালনা করিয়াছিলেন; চিরকাল তিনি ছিলেন মুসলিম-বিদ্বেষী; সুতরাং রাজা গণেশ যে বিনা যুদ্ধে ভীত হইয়া ইসলামধর্ম গ্রহণ করিবেন বা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবেন ইহা আশ্চর্যজনক মনে হয়। প্রথমতঃ ইসলামগ্রহণে স্বীকৃত হইয়াও মহিষী ত্রিপুরাদেবীর অনুরোধে রাজা গণেশ ইসলাম গ্রহণে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং পুত্রকে ধর্মান্তরিত করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা রাজা গণেশের মত ব্যক্তির পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়—বিশেষতঃ কোন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকই বোধ হয় এমন ভাবে ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে পারেন না। তবে ইহা যদি রাজনৈতিক কূটকৌশলের অঙ্গ হয়, তাহা হইলে কাহারও বলিবার কিছু থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, জালালউদ্দীন যদুসেন ৮১৮/১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেন এবং ৮৩৫/১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

গোলাম হুসেন বলেন যে, জৌনপুর-সুলতান ইব্রাহিম শাহের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ শ্রবণমাত্র রাজা কানস্‌ বা গণেশ পুত্র জালালউদ্দীনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সিংহাসন পুনরধিকার করিলেন। তৎপর তিনি সুবর্ণধেনু-ব্রত সম্পাদন করিয়া পুত্র যদুমল্ল বা জালালউদ্দীনকে পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করিলেন এবং ধেনুর সুবর্ণ যজ্ঞসম্পাদনকারী ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। যদু বা জালালউদ্দীন বিখ্যাত মুসলিম সাধু শেখ নূর কুতুব-উল'-আলম কর্তৃক ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন—সুতরাং ইসলামে তাঁহার আস্থা হ্রাস পাইল না। গণেশ পুনরায় মুসলিম নিধনে ব্যাপৃত হইলেন।[২]

যদুমল্লের পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ

অতঃপর রাজা কানস্‌ বা গণেশ আরও অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। শেখ নূর কুতুব-উল'-আলমের অনুচর ও আত্মীয়বর্গের উপর নিদারুণ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল—তাঁহাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠিত ও বাজেয়াপ্ত হইল। শেখ কুতুবের পুত্র শেখ আনোয়ার ও পৌত্র শেখ জাহিদ সুবর্ণগ্রামে নির্বাসিত হইলেন। রাজা গণেশ তাঁহাদিগকে পৈতৃক ধনসম্পদের সন্ধান দিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ঈপ্সিত ধনের সন্ধান প্রদান না করার শাস্তিস্বরূপ শেখ আনোয়ার নিহত হইলেন।[৩] শেখ জাহিদ প্রায় দৈবানুগ্রহেই রক্ষা পাইয়াছিলেন। শেখ আনোয়ার যেদিন নিহত হইলেন সেই দিনই রাজা কানস্‌ বা গণেশ তাঁহার রাজধানীতে পরলোক গমন করেন। কেহ কেহ বলেন, রাজা গণেশের পুত্র যদুই ষড়যন্ত্র করিয়া পিতাকে বিষ প্রদানে হত্যা করাইয়াছিলেন। রাজা কানস্‌ বা গণেশের স্বেচ্ছাচারী রাজত্বকালের দৈর্ঘ্য সপ্তবর্ষ মাত্র। এই কাহিনীও বিশ্বাস করা কঠিন, কারণ যদুর বয়স তখন মাত্র আঠার বা উনিশ বৎসর।

মুসলমানের প্রতি রাজা গণেশের নিষ্ঠুর অত্যাচার

---

১) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Cal., Vol. II, Part II p. 208

২) Riyas-us-Salatin., Eng. Tr., p. 115

৩) *I bid*, p. 116

যাহা হউক, পিতার মৃত্যুর পর যদু-জালালউদ্দীন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারিরূপে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি পিতার কার্যের প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন—বহু হিন্দুকে বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হইল। যে সকল ব্রাহ্মণ সুবর্ণধেনু-ব্রত যজ্ঞে রাজা কানস্ বা গণেশের নিকট হইতে গাভীর স্বর্ণপাত গ্রহণ করিয়াছিলেন জালালউদ্দীন তাঁহাদিগকে গোমাংস ভক্ষণ করিতে বাধ্য করিলেন। তিনি মুসলিম আইন অনুসারে দেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

তবকাৎ-ই-আকবরী বা নিজামউদ্দীনের দৃষ্টিতে রাজা গণেশ

নিজামউদ্দীন রচিত তবকাৎ-ই-আকবরীতে উল্লিখিত আছে—"সুলতান শামস্-উদ্দীনের মৃত্যুর পর কানস্ নামক একজন জমিদার ক্ষমতা লাভ করেন......... কানস্ (গণেশ) সাত বৎসর ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।... ...রাজা কানসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজ্যলাভের আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সুলতান জালালউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি সপ্তদশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।"[১]

সুতরাং নিজামউদ্দীনের বর্ণনানুসারে পিতা কানস্ বা গণেশের মৃত্যুর পর যদু বা জালালউদ্দীন ইসলাম গ্রহণ এবং সিংহাসনে আরোহণ করেন; অথচ গোলাম হুসেন বলেন যে, যদু পিতার ইচ্ছাতেই দ্বাদশ বৎসর বয়সেই ইসলামে দীক্ষিত এবং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন—অবশ্য পরে পিতা তাঁহাকে সুবর্ণধেনুব্রত দ্বারা পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করিয়া সমাজে গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আইন-ই-আকবরী ব আবুল ফজলের দৃষ্টিতে রাজা গণেশ

আবুল ফজল তাঁহার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, রাজা কানস্ শঠতা-পূর্বক সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের পৌত্র শামসুউদ্দীনকে রাজ্যচ্যুত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন এবং সুলতান জালালউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করিলেন।[২]

গোলাম হুসেনের বর্ণনার সহিত আবুল ফজলের বর্ণনারও সঙ্গতি নাই। আবুল ফজলও লিখিয়াছেন যে, পিতার মৃত্যুর পর যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তারিখ-ই-ফেরিস্তার দৃষ্টিতে রাজা গণেশ

তারিখ-ই-ফেরিস্তা গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, সুলতান সাইফউদ্দীন হামজা শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার আমীর-ওমরাহগণ তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় শামসুউদ্দীনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু শামসুউদ্দীনের নাবালকত্বের সুযোগে ইলিয়াসশাহী বংশের একজন হিন্দু আমীর শাসন-ব্যবস্থার উপর অধিকার স্থাপন করেন বা শক্তিশালী হইয়া উঠেন। ক্রমে তিনিই রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। ৮১৭/১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান শামসুউদ্দীনের মৃত্যু হইলে রাজা কানস্ বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন।[৩]

তারিখ-ই-ফেরিস্তায় আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাজা কানস্ যদিও মুসলমান ছিলেন না, তথাপি মুসলিমদের সহিত তাঁহার অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর মুসলিমগণ মুসলিম রীতি অনুসারে তাঁহাকে সমাধিস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

---

১) *Tabkat-i-Akbari*, Lucknow Edition, p. 524
২) Jarrett II, Eng. Tr., Part II, Pp. 147-149
৩) *Tarikh-i-Ferista*, Lucknow Edition, Vol. II, p. 297

কানস্‌ সাত বৎসর রাজ্যশাসন করেন। তিনি রাজমুকুট, রাজচ্ছত্র ইত্যাদি রাজোচিত প্রতীক বা চিহ্ন ধারণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জিৎমল লক্ষ্মৌতিতে উলেমাগণের সম্মুখে তাঁহাদের সম্মতিক্রমে ইসলাম গ্রহণ করিয়া জালালউদ্দীন নামে পরিচিত হইলেন এবং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সতর বৎসর (৮১৮-৮৩৫ হিঃ) বঙ্গ ও লক্ষ্মৌতিতে সগৌরবে রাজত্ব করিবার পর তিনি পরলোক গমন করেন। জালালউদ্দীনের পর তাঁহার পুত্র আহম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পিতার অনুরূপ যোগ্যতা সহকারেই তিনি ষোড়শবর্ষকাল রাজত্ব করেন।

জালালউদ্দীনের সিংহাসনারোহণ

সুতরাং তারিখ-ই-ফেরিস্তার বর্ণনা হইতে গোলাম হুসেনের বর্ণনা সম্পূর্ণ পৃথক্‌। প্রথমতঃ, ফেরিস্তার মতে রাজা গণেশ বা কানস্‌ মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, পিতার মৃত্যুর পর জিৎমল উলেমা ও আমীরগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, পিতার মৃত্যুর পর জিৎমল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয়, শেখ কুতুব-উল'-আলমের আদেশে ও অনুগ্রহে রাজ্যরক্ষার্থে রাজা গণেশ পুত্র যদুমল্লকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করাইয়া সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—ইহা অবিসংবাদিত সত্য নহে।

গোলাম হুসেন বলেন যে, ইব্রাহিম শার্কী জৌনপুরে প্রত্যাবর্তন করিলে রাজা গণেশ পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পুত্র যদুমল্লকে সুবর্ণধেনুব্রত দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিত করান। রাজা গণেশ ইসলাম-বিরোধী ছিলেন অথচ পুত্র যদুমল্ল ছিলেন ইসলামের অনুরাগী এবং ইসলাম ধর্মদ্বারা অনুপ্রাণিত। যদুমল্ল ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করেন নাই। গোলাম হুসেন বর্ণিত রাজা কানসের মুসলিম অত্যাচারের কাহিনী ফেরিস্তার বর্ণনানুযায়ী পরস্পর-বিরোধী। যদুমল্ল যদি বাল্যে দ্বাদশ বৎসর বয়সে ইসলামে দীক্ষিত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ বা বিবর্জন স্বেচ্ছাকৃত নহে।

রাজা গণেশ সম্বন্ধে গোলাম হুসেন ও তারিখ-ই-ফেরিস্তার মধ্যে পরস্পর-বিরোধী মতামত

ফেরিস্তার মতে জিৎমল সিংহাসনারোহণের সময়ে সর্বজনসমক্ষে ঘোষণা করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া জালালউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোলাম হুসেনের মতে পিতা রাজা গণেশের রাজনৈতিক প্রয়োজনে যদুমল্ল শেখ কুতুব-উল'-আলম কর্তৃক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শেখ কুতুব-উল'-আলম যদুসেনকে চর্বিত ও উচ্ছিষ্ট তাম্বুল সেবনে তাঁহার ধর্ম নষ্ট করিয়া ইসলামে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার হিন্দু সমাজে পুনঃপ্রবেশের অধিকার রহিল না। তথাপি পিতা গণেশ সুবর্ণধেনু ব্রত দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পুত্রকে হিন্দুধর্ম ও সমাজে পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—এই দুইটি বর্ণনাও পরস্পর-বিরোধী। ফেরিস্তার মতে জিৎমল স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোলাম হুসেনের বর্ণনানুযায়ী যদুমল্লকে পিতার রাজনৈতিক প্রয়োজনের নিমিত্ত ধর্ম বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। হয়ত পিতার উপর অভিমান এবং ক্ষোভেই তিনি প্রায়শ্চিত্তের পরেও ইসলামধর্ম ত্যাগ করেন নাই।

দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গীয় সামাজিক ইতিহাসে' লিখিয়াছেন—রাজা গণেশ বাদশার বেগমকে গোপনে নিকা করিয়াছিলেন। তিনি যখন গৌড়ে থাকিতেন তখন প্রায় মুসলমানের ন্যায় চলিতেন এবং পাণ্ডুয়াতে নিজ পরিবারবর্গসহ নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণের ন্যায় সদাচারে থাকিতেন। * * * * পিতা গণেশ যদিও হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, পুত্র যদুমল্ল কিন্তু মুসলমান প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। তদুপরি সান্যাল মহাশয়ের উক্তি অনুসারে "গণেশের জীবদ্দশাতেই যদু আজিমশাহের কন্যা আসমানতারার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে ধনবান লোকের পক্ষে উপপত্নী রাখা বা যবনীগমন দূষ্য ছিল না। আসমানতারার মাতা গণেশের উপপত্নী ছিলেন; সুতরাং গণেশ যদুকে নিবারণের কোন চেষ্টা করেন নাই। যদু সুলতান হওয়ার তিন বৎসর পরে আসমানতারার গর্ভসঞ্চার হইল। তিনি যদুকে কহিলেন—"আমি বাদশাহের কন্যা, আমার সন্তান ঘৃণিত জারজ হইবে ইহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। তুমি যদি আমাকে বিবাহ না কর, আমি আত্মহত্যা করিব।" রাজকন্যার প্রণয়মুগ্ধ যদু প্রথমে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে তাঁহাকে বিবাহ করিবার ব্যবস্থা খুঁজিলেন—কিন্তু পূর্বকালের দৃষ্টান্ত থাকিলেও এই বিবাহে ব্রাহ্মণ বা সমাজপতিদের অনুমতি পাওয়া গেল না। অগত্যা তিনিই মুসলমান হইয়া জালালউদ্দীন অর্থাৎ 'ধর্মের গৌরব' উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজকুমারীকে বিবাহ করিলেন। যদুর মাতা ত্রিপুরাদেবী ও পত্নী নবকিশোরী তাঁহার নাবালক পুত্র অনুপনারায়ণকে লইয়া ভাদুরিয়ার রাজধানী সাতগড়ায় (সপ্তদুর্গ নগর) চলিয়া গেলেন। জালালউদ্দীন যদুসেন আসমানতাবার পুত্র আহম্মদকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। গোলাম হুসেন কর্তৃক বর্ণিত ধর্মান্তর গ্রহণ কাহিনী যদি সত্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে সান্যাল মহাশয়ের বর্ণিত যদু-আসমানতারার বিবাহকাহিনীও অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।

দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয়ের বিবরণে রাজা গণেশ

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে বুকানন হ্যামিণ্টন দিনাজপুর জিলার বিবরণী প্রকাশ করেন।[১] উহাতে উল্লিখিত আছে যে, ঘিয়াসউদ্দীন ষোড়শ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র সাইফুদ্দীন তিন বৎসর রাজত্ব করেন এবং সাইফুদ্দীনের পরে তাঁহার ক্রীতদাস শিহাব্‌উদ্দীনও তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তারপর রাজা গণেশ নামে দিনাজপুরের একজন হিন্দু জমিদার শাসনক্ষমতা অধিকার করেন।

পূর্বভারত গ্রন্থে বা বুকানন হ্যামিণ্টনের দৃষ্টিতে রাজা গণেশ

শেখ বদর-উল'-ইসলাম এবং ফৈজ-ই-ইসলাম রাজা গণেশকে তাঁহার পদের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে অস্বীকার করিলে রাজা গণেশের আদেশে তাঁহারা নিহত হইলেন। .....শেখ কুতুবশাহ সুলতান ইব্রাহিমকে বিষয়টি জানাইলে সুলতান ইব্রাহিম প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে রাজমহল হইতে একদল সৈন্যসহ অগ্রসর হইলেন এবং সাত্‌রায় শিবির স্থাপন করিলেন। দিনাজপুরের রাজা ভীত হইয়া শেখ কুতুবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং পুত্র যদুসেনকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করাইয়া শেখ কুতুবের কৃপালাভ করিলেন। নবদীক্ষিত যদুসেন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত

১) **Martin's Eastern India, Vol. II. p. 618**

হইয়া শেখ কুতুবের অনুমতিক্রমে ইব্রাহিম শাহকে আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার শাসনক্ষমতা অধিকার করিলেন। বৃদ্ধ গণেশ তাঁহার পুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়া রাজ্য ও সিংহাসন পুনরধিকার করিলেন। চারি বৎসর কারাবাসের পর জালালউদ্দীন সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিলেন এবং হিন্দুগণকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। তিনি সাত বৎসর রাজত্ব করেন এবং তাঁহার পর তাঁহার পুত্র আহম্মদ শাহ সিংহাসনের অধিকারী হইলেন। আহম্মদ শাহ তিন বৎসর-কাল রাজত্ব করেন।

এই বিবরণ পাণ্ডুয়াতে প্রাপ্ত বুকানন সাহেবের হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে জানা গিয়াছে। কিন্তু বিবরণপাঠে মনে হয় ইহা গোলাম হোসেন লিখিত রিয়াজ-উস-সালাতীন গ্রন্থের অন্ধ অনুকরণ ও অনুবাদ মাত্র। সুতরাং এই বিবরণও খুব বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

রাজা গণেশ (৮১৩/১৪১০—৮১৭/১৪১৪ খ্রীঃ)

সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের সময়ে বহু হিন্দু রাজদরবারে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কারণ, প্রথম যুগের মুসলমান সুলতানগণ পরাজিত কাফেরকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের আমীর-ওমরাহ ও জায়গিরদার পদে সধর্মীয়গণকেই নিযুক্ত করিতেন, কিন্তু এই সকল সধর্মী আমীরগণ সিংহাসনের জন্য প্রতিযোগিতা করিতেন, বিদ্রোহ করিতেন। সধর্মী আমীরগণ নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করিতেন না, কিন্তু হিন্দুগণ নিয়মিত কর বা রাজস্ব প্রদানে অহেতুক বিলম্ব কিংবা অনিচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। সৈন্যবিভাগেও হিন্দুগণ দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে প্রাণপণেই যুদ্ধ করিতেন। আমীর খসরু বলেন যে, বাঙ্গলার মুলসমান সুলতানদের পক্ষে হিন্দুসৈন্য উড়িষ্যা অভিযানে যোগদান করিয়াছিল।[১] এই সকল কারণে মধ্যবঙ্গে তৎকালে রাজস্ব আদায়কারী একশ্রেণীর হিন্দু জমিদারের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিচার, রাজস্ব-আদায় প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ শাসন-বিভাগেও পাঠান সুলতান বড় একটা হস্তক্ষেপ করেন নাই। ফলে, পাঠান-অধীনে বঙ্গদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রাচীন শাসন-ব্যবস্থা ন্যূনাধিক অক্ষুণ্ণ ছিল। ভুঁইয়া বা ভৌমিক নামে পরিচিত এই জমিদারশ্রেণীর উপর পাঠানরাজ বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন। তখন বঙ্গদেশে মুসলমানের সংখ্যা অল্পই ছিল এবং তাহারাও একমত হইয়া কার্য করিতে পারিত না; বিশেষতঃ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। শামসউদ্দীন এই ভুঁইয়াদের সাহায্যেই প্রবল হইয়াছিলেন এবং রাজ্যলাভের পরে উত্তরবঙ্গের ভুঁইয়াদিগের অধীনে রাজকীয় সেনাদল গঠন করিয়াছিলেন। ভুঁইয়ারা শাসনকার্য ও সৈন্য পরিচালনে গৌড়-বাদশাহের সহকারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিজস্ব সেনাবাহিনীও থাকিত।[২] ভাদুরিয়া (ভাতুরিয়া) গ্রামের ভাদুরীবংশীয় জগদানন্দ শামসউদ্দীনের প্রধান উজীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন—তাঁহাকে ভাতুরিয়া

সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াসের রাজত্ব কালে শাসন কার্যে ও সৈন্যবিভাগে হিন্দুর অধিকার

সুলতান শামসউদ্দীন ও বাঙ্গলার বারভুঁইয়া

১) Quiran-us-Sadain, Asiatic Society Manuscript, quoted by Colebrook. p. 17

২) মধ্যযুগে বাঙ্গলা, ১২-১৩ পৃঃ।

বা ভাতুরিয়া পরগনা জায়গিররূপে প্রদান করা হইয়াছিল। পাঠান আমলে জায়গির প্রথার প্রচলন ছিল না বলিয়াই ভাতুরীগণকে তাঁহাদের জায়গিরের জন্য এক টাকা কর প্রদান করিতে হইত। এই কারণেই পরবর্তী কালে তাঁহারা 'একটাকিয়া ভাতুরী' নামে পরিচিত হন।[১]

সুলতান শামসউদ্দীন ও তাঁহার বংশের প্রধান দুইজন সুলতান—সেকেন্দর শাহ ও ঘিয়াসউদ্দীনের শাসনকালে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত থাকায় এই ভাতুরীবংশ ক্রমশঃ অর্থ ও বিত্তশালী হইয়া উঠে। সুলতান শামসউদ্দীনের পৌত্র সাইফুদ্দীন এবং প্রপৌত্র সুলতান দ্বিতীয় শামসউদ্দীন অত্যন্ত দুর্বল-প্রকৃতি শাসক ছিলেন। ভাতুরিয়ার গণেশনারায়ণ বা রাজা গণেশই ছিলেন তখন উত্তরবঙ্গের সর্বপ্রধান ব্যক্তি; তিনিই তখন সমস্ত রাজক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। নির্বোধ সুলতান শামসউদ্দীন রাজা গণেশ ও কয়েকজন মুসলিম আমীরকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। গণেশ পাঠান সামন্তবর্গের সহায়তায় অকর্মণ্য বাদশাহকে পরাজিত ও নিহত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিলেন। সাধারণতঃ দুর্বল এবং অপক্ব বালক নায়কের সময় রাজান্তঃপুরই রাজনীতির পীঠস্থান হইয়া উঠে—বাঙ্গলাদেশেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। রাজা গণেশও ক্রমশঃ রাজান্তঃপুরে প্রভাব বিস্তার করিলেন—কিংবদন্তী অনুসারে তিনি আজমশাহের মহিষীর সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেন।[২] হিন্দুর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য পণ্ডিত নরসিংহ নাড়িয়ালও রাজা গণেশকে প্ররোচিত করিলেন।[৩]

সুলতান শামস-উদ্দীনকে পরাজিত ও নিহত করিয়া রাজা গণেশ কর্তৃক সিংহাসন অধিকার

"সেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত।
সিদ্ধশ্রোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার বংশজাত ॥
যেই নরসিংহ যশঃ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ ॥
যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈল রাজা ॥"

রিয়াস্-উস-সালাতীন অনুসারে রাজা গণেশের চক্রান্তেই সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন আজমশাহ নিহত হইয়াছিলেন এবং উহার ত্রয়োদশ বর্ষ পরে তাঁহার পুত্র সাইফুদ্দীন হামজাশাহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আজমশাহের পৌত্র শামস-উদ্দীনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। শামসউদ্দীন কিঞ্চিদধিক তিন বৎসরকাল গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন (সম্ভবতঃ ৮০৯/১৪০৬—৮১২/১৪০৯ খ্রীঃ)।[৪] অবশ্য এই সময়ে সকল রাজক্ষমতা রাজা গণেশই পরিচালনা করিতেন। রিয়াস-উস-সালাতীনের মতানুসারে রাজা গণেশ শামসউদ্দীনের মৃত্যুর পর গৌড় ও বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ

---

১) বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস—দুর্গাচরণ সান্যাল

২) মধ্যযুগে বাঙ্গলা, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ১৪ পৃঃ

৩) অদ্বৈতপ্রকাশ, ১ম অধ্যায়, ৩ পৃঃ (১৪৯০ শকে রচিত)

৪) Riyas-us-Satatin, p. 112.

করিয়াছিলেন। ব্লকম্যান বলেন, গণেশ রাজপদবী গ্রহণ কিংবা সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। তিনি ক্রীড়াপুত্তলিকা-স্বরূপ শিহাবউদ্দীন বায়াজিদ শাহ নামক একজন মুসলমানকে সিংহাসনে উপবিষ্ট রাখিয়া স্বয়ং রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন।[১] রিয়াস্-উস্-সালাতীন অনুসারে এই শিহাবউদ্দীন শামস্উদ্দীনেরই নামান্তর মাত্র।[২] আবার কাহারও মতে রাজা গণেশ শামস্উদ্দীনকে কারারুদ্ধ অথবা হত্যা করিয়া আলাউদ্দীন ফিরুজ নামক একটি শিশুকে সিংহাসন প্রদান করেন এবং তাঁহাকেও কারারুদ্ধ অথবা হত্যা করিয়াছিলেন।

ইতিহাসকার রাখাল দাসের দৃষ্টিতে রাজা গণেশ

সাইফউদ্দীন হামজাশাহের পুত্র সুলতান দ্বিতীয় শামস্উদ্দীনের নামাঙ্কিত মুদ্রা কিংবা তাঁহার রাজত্বকালের কোন শিলালিপি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই—সুতরাং তাঁহার রাজত্বকাল কিংবা মৃত্যুকাল নির্ণয় অত্যন্ত কঠিন। শিহাবউদ্দীন বায়াজিদ শাহ ৮১৭/১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন—সে সম্বন্ধে সন্দেহের হেতু নাই; কারণ ৮১২-৮১৭ হিজরায় মুদ্রিত তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৩] মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণানুসারে শিহাবউদ্দীন বায়াজিদ-শাহ ৮১২-৮১৭ হিজরা পর্যন্ত (১৪০৯-১৪১৪ খ্রীঃ) ফিরুজাবাদে রাজত্ব করেন এবং ৮১৮ হিজরায় (১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ) রাজা গণেশের পুত্র যদু-জালালউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।[৪] বিখ্যাত মুদ্রাতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসকার রাখালদাস বলেন যে, ঘিয়াসউদ্দীন আজমশাহের মৃত্যুকাল হইতে জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহের অভিষেককাল পর্যন্ত (৭৯৯/১৩৯৬—৮১৮/১৪১৫ খ্রীঃ) গণেশ অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে তাঁহারই আদেশে গৌড়ে বাদশাহগণের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হইত। কিন্তু তিনি কখনও স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কন করেন নাই।[৫] মুসলমান সমাজে নিজ নামে মুদ্রাঙ্কন ও প্রকাশ্য নমাজের সময়ে নামোল্লেখ কেবল স্বাধীন রাজার পক্ষেই সম্ভব। গণেশের নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই; তিনি হিন্দু, সুতরাং নমাজের সময়ে তাঁহার নামোল্লেখ অসম্ভব এবং সুলতান শামস্উদ্দীনের মৃত্যুকাল হইতে গণেশের পুত্র যদু-জালালউদ্দীনের অভিষেককাল পর্যন্ত শিহাবউদ্দীন বায়াজিদ-শাহের নামে ফিরুজাবাদে মুদ্রাঙ্কন হইয়াছিল। আবিষ্কৃত মুদ্রার উপর নির্ভর করিয়া রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, ফিরুজাবাদে শিহাবউদ্দীনের নামাঙ্কিত মুদ্রা বস্তুতপক্ষে রাজা গণেশেরই মুদ্রা।[৬] এই মুদ্রাগুলি রাজা গণেশের সমসাময়িক। রাখালদাসের মতে রাজা গণেশ মুসলমানদের মনস্তুষ্টির জন্যই মুসলমান সুলতানের নাম মুদ্রায় উল্লেখ করিয়াছেন।[৭]

---

১) JASB—Old Series, Vol. XLII, 1873, part. 1, p. 263

২) Riyas-us-Salatin, Eng. Tr. p. 112.

৩) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Cal., Vol. II, Pp. 160—161. Nos. 89,90,91,92

৪) *Ibid.*, p. 161, No. 93.

৫) বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৬৯ পৃঃ

৬) বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ

রাজা গণেশ এই মুসলমান সুলতানের নামে খুৎবা পাঠ করাইতেন এবং মুসলমানী নামে মুদ্রাঙ্কণও করিয়াছিলেন। ফেরিস্তার বর্ণনার সঙ্গে রাখালদাসের এই উক্তির সামঞ্জস্য আছে। এই সকল কারণেই রাজা গণেশ মুসলিম-প্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং ইসলাম ধর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ না করিলেও মুসলমানগণ তাঁহাকে মুসলিম মনে করিয়া মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ সমাধিস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

রাজা গণেশের মুসলিম প্রীতি

রিয়াজ-উস-সালাতীন প্রণেতা গোলাম হুসেনের উক্তি অনুসারে রাজা গণেশ ইসলাম-বিরোধী—কারণ, তিনি কয়েকজন মুসলিম মোল্লা ও উলেমাকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই উক্তি যদি সত্যও হয়, তবে ব্যক্তিগত কারণের সঙ্গে এই হত্যার রাজনৈতিক কারণ থাকাই সম্ভব। মুসলমান মোল্লাগোষ্ঠী সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন আজম শাহের সময় হইতেই রাষ্ট্রশাসনে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিল। রাজা গণেশ বিধর্মী হিন্দু হইয়াও গৌড়রাজ্যে বাদশাহ অপেক্ষা পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মোল্লাসম্প্রদায় রাজা গণেশের প্রাধান্য স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাধান্যলাভের আশায় তাঁহারা বঙ্গের সতত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে হস্তক্ষেপ করিতেন। শেখ বদর-উল-ইসলাম রাজা গণেশকে দরবারে অভিবাদন করেন নাই, অর্থাৎ তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। রাজা গণেশ যদি বদর-উল-ইসলামের এই ঔদ্ধত্যকে প্রশ্রয় দিতেন, তবে তাঁহার বিদ্রোহ জনসাধারণের নিকট দৃষ্টান্তস্বরূপ সংক্রামিত হইত। তাহা ছাড়া তখন শক্তির যুগ—শক্তিকেই মানুষ ভয় করিত—সুতরাং মুসলিম রাজ্যে কোন প্রকারেই রাজা গণেশের পক্ষে কোন দুর্বলতা প্রকাশ সমীচীন হইত না। মুসলমান বিজিত বঙ্গে বহুকাল পরে একজন হিন্দুরাজা পরাক্রান্ত হইয়া উঠায় গৌড়দেশের মুসলিম সম্প্রদায় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। মোল্লা সম্প্রদায় রাজা গণেশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া কেচ্ছা কাহিনীর অবতারণা এবং কিতাব রচনা করিয়াছিলেন। মোল্লাগণ সম্ভবতঃ ধর্মান্ধ অজ্ঞ মুসলিমগণকেও রাজা গণেশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া রাজা গণেশের প্রাধান্য স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।[1] সেই বিরোধিতা বা বিদ্রোহ দমনের জন্যই রাজা গণেশ মুসলিম মোল্লা ও উলেমাগণের বিরুদ্ধে কঠোর বিধান প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং এই ব্যবস্থাই স্বাভাবিক।

মোল্লা-উলেমাগণের বিরুদ্ধে রাজা গণেশে কঠোর আচরণ

নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণ অনুযায়ী বলেন, সাইফউদ্দীন হামজা শাহের উত্তরাধিকারী ছিলেন শিহাবউদ্দীন বায়াজিদ শাহ—শামসউদ্দীন নহে।[2] সুতরাং শিহাবউদ্দীন ও শামসউদ্দীন পৃথক ব্যক্তি। রিয়াজ-উস-সালাতীন প্রণেতা গোলাম হুসেন বলিয়াছেন, শিহাবউদ্দীন এবং শামসউদ্দীন একই ব্যক্তি। কোন মুদ্রা বা শিলালিপিতে শামসউদ্দীনের নাম পাওয়া যায় নাই; অথচ আইন-ই-আকবরী, তবকাত-ই-আকবরী, মুন্তাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ ও ফেরিস্তার ইতিহাসে শামসউদ্দীনের উল্লেখ আছে। সাইফউদ্দীন হামজা শাহ ইব্‌ন আজমশাহ, শিহাবউদ্দীন বায়াজিদ

শিহাবউদ্দীন বনাম শামসউদ্দীন

(১) বাঙ্গলার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা।

(২) N. K. Bhattasali, Conis and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, P. 98

শাহ এবং আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ ইব্‌ন বায়াজিদ শাহের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] শিহাবউদ্দীন বায়াজিদ শাহের পিতার নাম উল্লেখ নাই। ইহাতে মনে হয় তিনি ইলিয়াসশাহী বংশের জারজ সন্তান। রাখালদাস এবং ব্লকম্যানের মতানুসারে অবশ্য শিহাবউদ্দীন রাজা গণেশেরই ছদ্মনাম। কিন্তু আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ ইব্‌ন বায়াজিদ শাহ নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হয় বায়াজিদ শাহ একজন জীবন্ত মানুষ ছিলেন—সুলতান ছিলেন—তাঁহার পুত্র ছিল। সেই পুত্র আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ নামে রাজত্ব করিয়াছেন। সুতরাং, রাজা গণেশই যে স্বয়ং শিহাবউদ্দীন বায়াজিদ শাহ তাহা যথার্থ নহে।

শিহাবউদ্দীন ও রাজা গণেশ

৮০২/১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরের আক্রমণের ফলে দিল্লী বিধ্বস্ত হয়—দিল্লীর সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ তুঘলকের অধিকার দিল্লীর চতুঃসীমার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। রাজা গণেশের রাজত্বকালে বাঙ্গলার সহিত দিল্লীর কোন সংঘর্ষ হয় নাই। বাঙ্গলার প্রতিবেশী রাজ্য জৌনপুরের সীমা বিহারের প্রান্তে রাজমহল পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শার্কীও দিল্লীর প্রান্তদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন এমন কোন ঘটনা বক্সী নিজামউদ্দীন, উলেমা আবুল ফজল, মোল্লা বদায়ুনী বা ফেরিস্তা উল্লেখ করেন নাই। বদর উল আলমের হত্যা, রাজা গণেশ কর্তৃক শেখ কুতুব-উল-আলমের পদচুম্বন, যদুসেন কর্তৃক শেখ কুতুবের চর্বিত তাম্বুল ভক্ষণ, যদুসেনের ইসলাম গ্রহণ প্রভৃতি ইসলামের গৌরবসূচক এবং হিন্দুর অপমানজনক কাহিনী সত্য হইলে মোল্লা বদাউনী অবশ্যই তাহা উল্লেখ করিতেন।

রাজা গণেশের সময়ে দিল্লী-বঙ্গ সম্পর্ক

মুসলমান অধিকৃত উত্তরাপথে রাজা গণেশই প্রথম হিন্দুর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন—সুতরাং তিনি বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং পরাক্রমশালী ব্যক্তি ছিলেন। মুসলমান ইতিহাসকারগণের নিন্দার পরিমাণই তাঁহার যোগ্যতার পরিমাপক। তিনি শক্তিশালী ব্যক্তি না হইলে এবং গৌড়ে মুসলিম শক্তি খর্ব না করিলে মুসলিম ইতিহাসকারগণ তাঁহার নিন্দায় এত মুখর হইয়া উঠিতেন না। তিনি স্বভাবতঃ মুসলিম বিরোধী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু মোল্লা ও উলেমাগণের ঔদ্ধত্য কিংবা অন্যায়-প্রশ্রয়-প্রয়াস তিনি সহ্য করেন নাই—অবশ্য রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতেও বিরোধী মোল্লা-উলেমাগণের প্রতি কোনরূপ দুর্বলতা, কোমলতা বা করুণা প্রদর্শন তাঁহার পক্ষে সমীচীন হইত না। রাজা গণেশ হিন্দুধর্মের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন—তাঁহার সুবর্ণধেনুব্রতই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রাজা গণেশের সময় হইতেই গৌড়ে ও বঙ্গে পুনরায় সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হইয়াছিল; বাংলাভাষারও উন্নতি সূচিত হইয়াছিল। রাজা গণেশ বিদ্যা এবং বিদ্বানেরও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। গাঁই (Gnai) বৃহস্পতি নামে একজন পণ্ডিত গৌড়ের সুলতান রাজা গণেশ ও তাঁহার মুসলিম উত্তরাধিকারিগণের নিকট 'রায়মুকুট' উপাধি

রাজা গণেশের কৃতিত্ব

---

(১) N. K. Bhattasali, Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal. Pp. 112-118

লাভ করেন। তিনি একখানি স্মৃতিগ্রন্থ, অমরকোষের টীকা এবং অন্যান্য বহু কাব্যের টীকা রচনা করেন। তাঁহার রচিত অমরকোষের টীকা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। তিনি ঐ টীকায় চৌদ্দ-পনরখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।[১] এই রাজা গণেশ কৃতীপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই—তিনি বাঙ্গলার ইতিহাসে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এবং ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। সম্ভবতঃ ৮১৭/১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কর্মময় জীবনের অবসান হয়।

রাজা গণেশ ও দনুজমর্দন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বাঙ্গলার ইতিহাসে রাজা গণেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বাঙ্গলার ইতিহাসে (২য় খণ্ড—পঞ্চম অধ্যায়) মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের মতের উপর নির্ভর করিয়া স্যার যদুনাথ রাজা গণেশের সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন আজম শাহের শাসনকালে দিনাজপুরের হিন্দু জমিদার গণেশ স্বীয় বুদ্ধি ও যোগ্যতাবলে রাজদরবারে প্রাধান্য লাভ করেন। সুলতান ঘিয়াস-উদ্দীনের দুর্বল উত্তরাধিকারিগণের রাজত্বে তিনিই প্রকৃতপক্ষে সমস্ত রাজক্ষমতা পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি এই ক্ষমতালাভে রাজান্তঃপুরিকাগণের এবং অসন্তুষ্ট বিরোধী আমীরগণের সহায়তাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে চেষ্টা করিয়া দুর্বল সুলতানদিগকে প্রাণ দিতেও হইয়াছে; অবশেষে ৮১৭/১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহকে হত্যা করিয়া বৃদ্ধ গণেশ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন।[২]

শার্কী সুলতান ইব্রাহিম শাহের সৈন্যগণ কর্তৃক বঙ্গ আক্রমণ

রাজা গণেশ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিলে বঙ্গের মুসলিমগণ—বিশেষতঃ মোল্লা ও উলেমাগণ স্বভাবতঃই বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া উঠিল। কারণ, সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের শাসনকাল হইতেই তাঁহারা অপরিমিত ধনসম্পদের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং রাজদরবারেও তাঁহাদের ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। গণেশের অভ্যুদয়ে তাঁহারা শঙ্কিত হইলেন এবং জৌনপুরের শার্কী সুলতান ইব্রাহিম শাহকে বঙ্গ অভিযানে আমন্ত্রণ করিলেন—মুসলিম বঙ্গদেশকে বিধর্মী কাফেরের কবলমুক্ত করিতে হইবে।[৩] শার্কী সুলতান স্বয়ং অভিযান পরিচালনা না করিলেও জৌনপুরী সৈন্য বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিল—উভয় পক্ষে সন্ধি হইল; রাজা গণেশ তাঁহার পুত্র যদু-সেনকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিতে স্বীকৃত হইলেন। যদুসেন জালালউদ্দীনকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন করা হইল।

জৌনপুরী সৈন্য স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে রাজা গণেশ দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র যদুসেনকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তিনি গৌরবসূচক "দনুজমর্দন" এবং "চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য" উপাধি গ্রহণ করিলেন।[৪]

---

১) নারায়ণ, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৬৭ পৃঃ

২) History of Bengal, Dacca University, Vol. II, P. 126

৩) *Ibid* P. 126

৪) *Ibid* P. 127

পরবর্তিকালে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত রাজ্য-শাসন করেন। তিনি মুসলিম প্রজাবর্গের প্রতি এত সদয় ব্যবহার করিতেন যে, ফেরিস্তা লিখিয়াছেন—তাঁহার মৃত্যুর পর মুসলিমগণ তাঁহাকে সমাধিস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল—এতই ছিলেন তিনি জনপ্রিয়। কেবল পাণ্ডুয়া ও মালদহে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির বিবরণ হইতেই জানা যায় যে, তিনি উদ্ধত ও ক্ষমতাভিলাষী ছিলেন। মোল্লা ও উলেমাগণের প্রতি তিনি কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন।

জনপ্রিয় রাজা গণেশ

স্যার যদুনাথ আরও লিখিয়াছেন যে, রাজা গণেশ সুবর্ণধেনু ব্রতদ্বারা তাঁহার পুত্র যদুসেনকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তখনও শুদ্ধির বিশেষ প্রচলন হয় নাই বলিয়া যদুসেন জালালউদ্দীন প্রকাশ্যে হিন্দু সমাজে স্থানলাভ করেন নাই। এই ক্ষোভেই তিনি সুবর্ণধেনু ব্রতের দান গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ ও হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন।[১]

স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধ বয়সে রাজা গণেশ পরলোক গমন করেন। যদুসেন 'জালাল উদ্দীন' উপাধি গ্রহণ করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (৮২১/১৪১৮ খ্রীঃ)। তিনি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করেন নাই। এই বৎসরই পাণ্ডুয়া ও চাটগাঁ হইতে 'চণ্ডীচরণ পরায়ণ' রাজা মহেন্দ্রদেবের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হয়।[২] এই মুদ্রাগুলি রাজা গণেশের মুদ্রারই অনুরূপ। সম্ভবতঃ এই মহেন্দ্রদেব ছিলেন রাজা গণেশের কনিষ্ঠ পুত্র। মহেন্দ্রদেব তখন মাত্র দ্বাদশবর্ষীয় বালক—তিনি হিন্দু মন্ত্রিবর্গের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন। জালালউদ্দীনের ইসলাম গ্রহণে বিক্ষুব্ধ হিন্দু মন্ত্রিগণ মহেন্দ্রদেবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতোমধ্যে জালালউদ্দীন মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিলেন। ৮২১/১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের পরের মহেন্দ্রদেবের কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু এই হিন্দু-বিরোধিতার প্রচেষ্টায় জালালউদ্দীনের হিন্দু-বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পাইল।[৩] হিন্দুদিগকে তিনি তাঁহার রাজনৈতিক শত্রু বলিয়াই বিবেচনা করিলেন। জালালউদ্দীনের মৃত্যুর পর (৮৩৫/১৪৩২ খ্রীঃ) তাঁহার পুত্র শামসউদ্দীন আহম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া আমীরগণ তাঁহার ক্রীতদাস সাদী খান এবং নাসীর খান দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করাইলেন।[৪]

জালালউদ্দীনের হিন্দু-বিদ্বেষ

স্যার যদুনাথ রাজা গণেশের ইতিহাস রচনায় আবিষ্কৃত মুদ্রার সত্যের উপরই নির্ভর করিয়াছেন; তথাপি সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিলে মনে হয়—এই বিবরণে যেন স্থানে স্থানে অসঙ্গতি রহিয়াছে। তিনি রাজা গণেশ ও পূর্ববঙ্গীয় দনুজমর্দনকে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ইব্রাহিম শাহ শার্কীর বঙ্গ আক্রমণের সংবাদ গ্রহণ করিয়া রাজা গণেশের জীবিতাবস্থায় যদুসেনের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী অভ্রান্ত

স্যার যদুনাথের মতে রাজা গণেশ

---

১) History of Bengal, Dacca University, Vol. II, P. 128

২) N. K. Bhattasali, Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, P. 122

৩) History of Bengal, Dacca University, Vol. II, 128

৪। *Ibid* P. 129

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সেই সময় যদুসেন দ্বাদশবর্ষীয় বালক ছিলেন। ইহার চারি বৎসর পরে (৮১৭-৮২১ হিজরা) পিতার মৃত্যু হইলে ষোড়শ বর্ষ বয়সে তিনি রাজ্যলাভ করেন। যদুসেন সপ্তদশ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন; সুতরাং মৃত্যুসময়ে তাঁহার তেত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল। যদুসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আহম্মদ শাহ রাজ্যলাভ করেন। তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক হইলে উল্লেখ থাকিত; তদ্ব্যতীত সিংহাসনারোহণের পরে তাঁহার অত্যাচার কাহিনী শুনিলে মনে হয় না যে তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। তিনি যদি প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ সিংহাসনারোহণ কালে অষ্টাদশ বর্ষীয় হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার জন্মকালে তাঁহার পিতা জালাল উদ্দীন যদুসেনের বয়স ছিল ১২।১৩ বৎসর; ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

ভার যদুনাথের সিদ্ধান্তে অসঙ্গতি

তারপর, রাজা গণেশ এবং দনুজমর্দন যদি অভিন্ন ব্যক্তি হইয়া থাকেন, তবে রাজা গণেশ ৮২১/১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কারণ, ৮২১/১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডুনগর হইতে মুদ্রিত দনুজমর্দনের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] অথচ ৮১৮/১৪১৫ এবং ৮১৯/১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ায় মুদ্রিত জালালউদ্দীন যদুসেনের মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে।[২] কিন্তু পিতাপুত্র একই স্থানে একই সময়ে রাজত্ব করিতে পারেন না। মুদ্রা-বিচারে রাজা গণেশ এবং তাঁহার পুত্র যদুসেন জালালউদ্দীন একই সময়ে রাজত্ব করেন নাই। কারণ, জালালউদ্দীন ফিরুজের পর জালালউদ্দীন যদুসেনের মুদ্রা অবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তারপর দনুজমর্দন ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অর্থাৎ, দনুজমর্দন যদি রাজা গণেশ হয়েন তাহা হইলে তিনি পুত্রের পরেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। নিজামউদ্দীন প্রভৃতি ইতিহাসকারগণের মতে রাজা গণেশ সাত বৎসর রাজত্ব করেন, অর্থাৎ ৮১৭/১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ঐ সময় (৮১৭/১৪১৪ খ্রীঃ) পর্যন্ত শিহাবউদ্দীনের নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তারপরেই জালালউদ্দীন যদুসেনের মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়। অন্যদিকে রাজা গণেশের মুসলিম প্রীতি যদি সত্য হয়, তবে তিনি ৮২০/১৪১৭ এবং ৮২১/১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় 'চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য' পদ মুদ্রাতে লিখিতে পারেন না; কারণ, তাহা হইলে মুসলিমগণ বিক্ষুব্ধ হইবে; অথচ এই দুই বৎসরই চাটগাঁ, সোনারগাঁ ও পাণ্ডুয়া হইতে 'চণ্ডীচরণ-পরায়ণস্য' দনুজমর্দন—তথা রাজা গণেশের মুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল। জালালউদ্দীনের মুদ্রাও পাণ্ডুয়া নগরেই মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, রাজা গণেশের পাণ্ডুনগর ও জালালউদ্দীনের পাণ্ডুয়া কি এক নহে?

মুদ্রা-প্রমাণ সম্বন্ধী সিদ্ধান্তের সমালো

পাণ্ডুনগর, পাঁড়ুয়া বা পাণ্ডুয়ার সংশোধিত অথবা প্রাচীন নাম। মুদ্রাপ্রমাণ অনুসারে ৮২১/১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডুয়া দনুজমর্দনের অধিকারভুক্ত ছিল। ফিরুজাবাদ পাণ্ডুয়ার নামান্তর। এই ফিরুজাবাদ হইতে ৮১৮, ৮১৯, ৮২২, ৮২৩, ৮২৮ এবং ৮৩৪ হিজরায় জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহের নামে রজতমুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল।[৩] ৮২০ বা

---

১) N. K. Bhattasali, Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, P. 113
২) *Ibid*, P. 113
৩) Catalogue of Coins in the Indian Museum—Calcutta, Vol. II. Pt. 1, P. 61 Coin-Nos. 93-93,9.

৮২১ হিজরায় জালালউদ্দীনের কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ এই সময়ে পাণ্ডুয়া জালালউদ্দীনের অধিকারভুক্ত ছিল না। এই সময়ে সম্ভবতঃ কায়স্থবংশীয় দনুজমর্দন পাণ্ডুয়ায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। রাজা গণেশ ও তাঁহার পুত্র জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহের সহিত দনুজমর্দনদেবের কি সম্বন্ধ ছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ যদু ইসলামধর্ম গ্রহণ করিলে শক্তিউপাসক (চণ্ডীচরণপরায়ণ) কায়স্থ কুলতিলক দনুজমর্দনদেব নবদীক্ষিত মুসলমান রাজার অত্যাচারে প্রাচীন আর্যধর্ম বা সনাতন হিন্দুধর্মের বিলোপ আশঙ্কায় স্বয়ং স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন।[১] ৮১৭ হিজরায় রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জালালউদ্দীন পাণ্ডুয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় রাজ্যাঙ্কেই তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া দনুজমর্দন সিংহাসন অধিকার করেন এবং স্বাধীনতার প্রতীকস্বরূপ স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কণ করেন। ৮২০ ও ৮২১ হিজরায় মুদ্রিত রাজা দনুজমর্দনের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।[২] তবে জালালউদ্দীনের পরাজয় ও পাণ্ডুয়া হইতে বিতাড়নের সংবাদ রিয়াজ-উস-সালাতীনে নাই—সম্ভবতঃ রিয়াজ-উস-সালাতীন রচয়িতা মুসলিম পরাজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন কিংবা স্বেচ্ছায় গোপন করিয়াছেন। রাজা দনুজমর্দনের অধিকার উত্তরবঙ্গের পাণ্ডুয়া হইতে দক্ষিণ অথবা পূর্ববঙ্গেও বিস্তৃত ছিল; কারণ, তাঁহার মুদ্রায় পাণ্ডুয়ার সহিত চাটগাঁ এবং সোনারগাঁয়ের নামও মুদ্রিত আছে।[৩] সম্ভবতঃ ৮২১/১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দেই রাজা দনুজমর্দনের মৃত্যু হইয়াছিল।

হিন্দুধর্ম-নাশের আশঙ্কায় দনুজমর্দনের স্বাধীনতা ঘোষণা

রাখালদাস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাজা গণেশ শিহাবউদ্দীন নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের মতানুসারে গণেশই দনুজমর্দন। তিনি দনুজ শব্দ 'যবন' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং দনুজমর্দন অর্থে মুসলমান নিগ্রহক বুঝিতে হইবে। কিন্তু এই অর্থে বলবন ও তুঘরল বেগের সমসাময়িক দনুজমাধবের নাম ব্যবহার হয় নাই। দনুজমর্দন নামের অর্থ কষ্টকল্পিত ও অপ্রাসঙ্গিক—উহা উপাধি নহে, নাম মাত্র। সুতরাং দনুজমর্দন রাজা গণেশের নাম হওয়া সম্ভবপর নহে।

ঐতিহাসিক রাখালদাসের সিদ্ধান্ত

দনুজমর্দনদেবের পরে মহেন্দ্রদেব পাণ্ডুনগরের এবং সম্ভবতঃ উত্তরবঙ্গের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। মালদহ জিলায় আদিনা মসজিদের নিকট রাজা দনুজমর্দনের মুদ্রার সহিত মহেন্দ্রদেবেরও একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে—এই মুদ্রা ৮২১/১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডুনগরেই মুদ্রিত হইয়াছিল। মহেন্দ্রদেবের রাজ্যাভিষেকের এক বা দুই বৎসর পরেই পাণ্ডুয়া বা ফিরুজাবাদ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল; কারণ, ৮২২-৮২৫ হিজরায় পাণ্ডুয়ায় মুদ্রিত জালালউদ্দীনের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে স্টেপল্টন সাহেবের চেষ্টায় মহেন্দ্রদেবের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে

মালদহ জেলায় দনুজমর্দন ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা আবিষ্কার

---

১) বাঙ্গলার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড—১৭৭ পৃঃ

২) N. K. Bhattasali, Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, P. 113

৩) *Ibid*, P. 113

—এই মুদ্রাগুলিও ১৪১৮-১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। মহেন্দ্রদেবের রাজ্য বা রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কারণ, স্টেপলটন এই মুদ্রাগুলির বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন নাই।[১]

রাজা গণেশ ও যদুসেনের পাণ্ডুয়া এবং মহেন্দ্রদেবের পাণ্ডুনগর

স্যার যদুনাথ বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ মহেন্দ্রদেব রাজা গণেশের হিন্দুস্ত্রীর গর্ভজাত কনিষ্ঠপুত্র এবং যদুসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। জালালউদ্দীন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পৈত্রিক রাজ্য (ভাতুরিয়া) দান করেন। কিন্তু রাজা গণেশের ভদ্রাসন বা পৈত্রিক রাজ্য তো চাটগাঁ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না, অথচ ৮২০/১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা পাণ্ডুয়া ও চাটগাঁ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাণ্ডুয়া হইতে ৮১৮/১৪১৫ এবং ৮১৯/১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে জালালউদ্দীনের মুদ্রাও মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু, তাহা হইলে কি করিয়া পর বৎসরই পাণ্ডুয়া হইতে মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা মুদ্রিত হইতে পারে? সুতরাং রাজা গণেশ ও যদুসেনের পাণ্ডুয়া এবং মহেন্দ্রদেবের পাণ্ডুনগর এক নহে। স্যার যদুনাথের মতে পিতা রাজা গণেশের মৃত্যু সময়ে (৮১৭/১৪১৪ খ্রীঃ) মহেন্দ্রদেব দ্বাদশবর্ষীয় বালক ছিলেন এবং যদুসেন তাঁহার ভ্রাতাকেই পৈত্রিক রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন।[২] অথচ ৮২১/১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দেই চাটগাঁ হইতে মুদ্রিত মহেন্দ্র দেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ষোড়শ বর্ষে অথবা তাহার পূর্বেই মহেন্দ্রদেব চাটগাঁ পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব?

কুলপঞ্জী বিচারে রাজা গণেশ ও দনুজমর্দন

কুলপঞ্জী অনুসারে রাজা গণেশের একমাত্র পুত্রের সংবাদ পাওযা যায়—তিনি যদুসেন জালালউদ্দীন। অন্যদিকে যদুসেন জালালউদ্দীনের হিন্দু স্ত্রী নবকিশোরী ও পুত্র অনুপনারায়ণের সংবাদই পাওয়া যায়—আসমানতারার সহিত নবকিশোরীর পত্রালাপের মধ্যে অন্য কোন ভ্রাতা বা পুত্রের কোন সংবাদ নাই। কুলপঞ্জী অনুসারে দনুজমর্দনের দুই পুত্রের নাম পাওয়া যায়—মহেন্দ্রদেব এবং রমাবল্লভদেব। রমাবল্লভ চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন এবং সম্ভবতঃ মহেন্দ্রবেদের মৃত্যুর পরই তিনি স্বাধীনভাবে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন।[৩] সুতরাং গণেশ ও দনুজমর্দন এক ব্যক্তি নহেন।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের মতে মহেন্দ্রদেব ও জালালউদ্দীন যদুসেন

নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের মতে মহেন্দ্র জালালউদ্দীন যদুসেনের অন্য নাম।[৪] কিন্তু তাহা সম্ভব নহে—কারণ, প্রথমতঃ ৮২১/১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ জালালউদ্দীন কেন "চণ্ডীচরণ পরায়ণ" বিশেষণ যুক্ত মহেন্দ্র নাম গ্রহণ করিবেন? যদি গোলাম হুসেনের মতানুসারে ধর্মের আবেগে জালালউদ্দীন যদুসেন ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অকস্মাৎ সিংহাসনারোহণের তিন-চারি বৎসর পরে হিন্দু নাম—বিশেষতঃ 'চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য' বিশেষণ যুক্ত নাম গ্রহণের কোন যুক্তি বা কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভট্টশালী মহাশয় ৮২১/১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে

১) বাঙ্গলার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ১৮১ পৃঃ

২) History of Bengal, Dacca University, Vol. II, P. 28

৩) বাঙ্গলার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ১৮১ পৃঃ

৪) N. K. Bhattasali, Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal. P. 128

মুদ্রিত যদুসেন জালালউদ্দীন ও মহেন্দ্রদেবের নামাঙ্কিত কয়েকটি মুদ্রার উপর নির্ভর করিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।[১] কারণ, একই বৎসরে পাণ্ডুয়ায় দুইজন বিভিন্ন নরপতি রাজত্ব করিতে পারেন না। যদি রাজনৈতিক কারণে যদুসেন জালালউদ্দীন মহেন্দ্রদেব নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবুও চারি বৎসর পরে কোন কারণেই পৌত্তলিক বিশেষণ যুক্ত 'চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য' উপাধি গ্রহণ করিতে পারেন না। কুলপঞ্জিকার যদি কোনও মূল্য থাকে তবে দনুজমর্দন ছিলেন কায়স্থ বংশীয়—চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।[২] অথচ গণেশ ছিলেন ভাদুরী বংশীয় ব্রাহ্মণ। সুতরাং গণেশ ও দনুজমর্দন একই ব্যক্তি হইতে পারেন না। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ যদুসেন বা মহেন্দ্র যদি চট্টগ্রামে রাজ্য বিস্তার করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই সেই অঞ্চলে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বসতি থাকিত। তার উপর প্রতাপাদিত্যের জামাতা রামচন্দ্র রাজা দনুজমর্দনের দৌহিত্রবংশজাত। প্রতাপাদিত্য যে কায়স্থ ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং দনুজমর্দনও যে কায়স্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাদুরী বংশীয় রাজা গণেশ যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তাহাও নিঃসন্দেহ। অতএব ব্রাহ্মণ রাজা গণেশ কায়স্থ দনুজমর্দন হইতে পারেন না এবং স্যার যদুনাথের মতানুযায়ী মহেন্দ্রদেব রাজা গণেশের পুত্র হইতে পারেন না[৩] এবং ভট্টশালী মহাশয়ের মতানুযায়ী মহেন্দ্রও যদুসেন নহেন।[৪]

ব্রাহ্মণ রাজা গণেশ ও কায়স্থ রাজা দনুজমর্দন বিভিন্ন ব্যক্তি

৮২০/১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দ এবং ৮২১/১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডুয়া, সুবর্ণগ্রাম ও চট্টগ্রাম হইতে দনুজমর্দনের মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় একটি নূতন জটিলতার উদ্ভব হইয়াছে।[৫] মুদ্রাতত্ত্ববিদগণ মুদ্রার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অবশ্য মুদ্রা সম্বলিত প্রমাণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণ নূতন মুদ্রার আবিষ্কারে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইতে পারে। বাঙ্গলাদেশে কুলপঞ্জী এবং কিংবদন্তীর অন্তরালে বহু ইতিহাস আবৃত আছে। অন্য প্রমাণে সন্দেহ উপস্থিত হইলে কুলপঞ্জীর বক্তব্য বিচার ও বিবেচনা করা অপ্রাসঙ্গিক নহে। ঘটকগণের অতিভাষণ, সমাজপতিদের আত্মপ্রশস্তি এবং স্তুতিকারদের বাহুল্যদোষদুষ্ট কুলপঞ্জীকে ইতিহাসের ঘটনার সহিত তুলনা করিতে হইবে। কুলপঞ্জীবিচারে দনুজমর্দন নামক একজন কায়স্থ রাজা পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন। বরিশাল ও বিক্রমপুর অঞ্চলের বহু সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মহেন্দ্রদেব ও রমাবল্লভ দেব নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিলেন।[৬]

পূর্ববঙ্গের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের সহিত দনুজমর্দনের সম্পর্ক

---

১) N. K. Bhattasali, Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, P. 113

২) J.A.S.B., Old Series, Vol. XLII, 1874 Pt. I. P. 207

৩) History of Bengal, Dacca University, P. 128

৪) N. K, Bhattasali, Coins and Chronology of the Early Independent Sultan of Bengal, P. 113

৫) *Ibid* P. 113

৬) বাঙ্গলার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ১৮৫ পৃঃ

যদি দনুজমর্দন রাজা গণেশ হন, তবে রাজা গণেশের তিনটি রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ রাজা গণেশ ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং মুসলিম উৎপীড়ক—সেই সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে জৌনপুরের ইব্রাহিম শার্কী বাঙ্গলাদেশ আক্রমণ করেন। তারপর রাজা গণেশ হইলেন মুসলমানের অনুগ্রাহক বা অনুগ্রহপ্রার্থী—পুত্র যদুসেনকে ইসলামে দীক্ষিত করিলেন। তারপর শার্কী সুলতান ইব্রাহিম শাহের মৃত্যু অথবা শেখ কুতুব-উল-আলমের মৃত্যুর পর পুনরায় মুসলিম নিগ্রাহক। যদি এই অনুমান সত্য হয় এবং রাজা গণেশ যদি অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা হন, তবে কেন তিনি দনুজমর্দন নাম গ্রহণ করিবেন? রাজা গণেশ মুসলিম প্রজানুরঞ্জনের চেষ্টা করিয়া সেই সঙ্গে কাফেরের ভাষায় লিখিত, কাফেরের দেবতার নামযুক্ত বিশেষণ (চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য) কখনই ব্যবহার করিতে পারেন না। ভট্টশালী মহাশয় কখনও গোলাম হুসেনের মত গ্রহণ করিয়াছেন, কখনও মুদ্রা-প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং কখনও ফেরিস্তার মতের পোষকতা করিয়াছেন। রাজা গণেশকে এই মুহূর্তে মুসলিম-বিদ্বেষী ও পর মুহূর্তে মুসলিম-প্রেমিক বলার কোন অর্থ হয় না। তখনকার মানুষ বা রাজা গণেশের প্রজাপুঞ্জ এত নির্বোধ ছিল না যে, তিনি বায়াজিদ নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়া মুসলমানের এবং 'চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য' লিখিয়া হিন্দুর প্রীতি অর্জন করিবেন। ভট্টশালী মহাশয় কায়স্থ দনুজমর্দনকে ব্রাহ্মণ গণেশ নামে রূপান্তরিত করিয়াছেন।

রাজা গণেশ সম্বন্ধে ভট্টশালী মহাশয়ের অভিমত যুক্তিসহ নহে

পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হইল—রাজা দনুজমর্দনের মুদ্রা পাণ্ডুনগর, সোনারগাঁ এবং চাটগাঁ হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল। রাজা গণেশ যে চাটগাঁ বিজয় করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ বা সামান্যতম ইঙ্গিত পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় না। ভাতুরিয়া বা লখ্নৌতি হইতে চাটগাঁয়ের দূরত্ব তখনকার দিনের বিবেচনায় অল্প ছিল না। লখ্নৌতির পারিপার্শ্বিক অবস্থা তখন অত্যন্ত জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ ছিল এবং পথঘাটের অবস্থাও এমন সুবিধাজনক ছিল না যে রাজা গণেশ বিজয়বাহিনী লইয়া চাটগাঁয়ে উপস্থিত হইয়া স্বল্পকালের মধ্যে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে ৮২০/১৪১৭—৮২১/১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে দনুজমর্দনের মুদ্রা কিভাবে পাণ্ডুয়ানগর হইতে মুদ্রিত হওয়া সম্ভব? ৮২০/১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে জালালউদ্দীন যদুসেনের কোন মুদ্রা পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ৮১৭/১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে যদুসেন মুসলমান হওয়াতে দনুজমর্দন তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রসহ বাঙ্গলার রাজধানী আক্রমণ করেন এবং রাজধানী পাণ্ডুয়া বিজয় করিয়া ৮২০/১৪১৭—৮২১/১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে তথা হইতে স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। ৮২১/১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে দনুজমর্দনের মৃত্যু হইলে মহেন্দ্রদেব পাণ্ডুয়া ও চাটগাঁ হইতে মুদ্রা প্রচলন করেন—এই কারণেই একই বৎসরে দুইজনেরই মুদ্রা পাওয়া যায়।[১] ৮২০/১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে বায়াজিদ শাহ (গণেশ) অথবা জালাল-উদ্দীন যদুসেনের কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই, অর্থাৎ সেই বৎসর যদুসেন রাজত্ব করেন নাই। ৮২১/১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে দনুজমর্দন পরলোক গমন করিলে যদুসেন মহেন্দ্রকে

একই বৎসরে দনুজ-মর্দন এবং মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা প্রচলনের পক্ষে যুক্তি

১) N. K. Bhattasali, *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal*, p. 113

বিতাড়িত করেন। সেই সময়ে জালালউদ্দীন গৌড় অধিকার করিয়া পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদ হইতে রাজধানী গৌড়ে পরিবর্তিত করেন[১] এবং চাটগাঁ পর্যন্ত অধিকার করেন। ৮৩৪/১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে চাটগাঁয়ে মুদ্রিত বহু মুদ্রা হইতে এই প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুতরাং এই সকল আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন আজম শাহের মৃত্যুর পরেই রাজা গণেশ রাজ্যের সর্বময় কর্তা হন। সাইফউদ্দীন হামজা শাহ, শিহাবউদ্দীন বায়াজিদ শাহ এবং আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ তাঁহার হস্তে ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন। সাত বৎসরকাল রাজা গণেশ বায়াজিদ ও আলাউদ্দীন ফিরুজকে সম্মুখে রাখিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র যদুসেন রাজ্যলাভ করেন (৮১৮/১৪১৫ বা ৮১৯/১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দ)। যদুসেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাতে চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজমর্দন জালালউদ্দীন যদুসেনকে পাণ্ডুয়া হইতে বিতাড়িত করেন। দনুজমর্দনের রাজ্য পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁ ও চাটগাঁ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এক বৎসর পরে ৮২১/১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে দনুজমর্দনের মৃত্যু হইলে জালালউদ্দীন তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রদেবকে পরাজিত করেন। চন্দ্রদ্বীপেই মহেন্দ্রদেব রাজত্ব করেন। ক্রমে জালালউদ্দীন চাটগাঁ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

জালালউদ্দীন গণেশী

(৮১৮/১৪১৫—৮১৯/১৪১৬ খ্রীঃ ; ৮২১/১৪১৮—৮৩৫/১৪৩১ খ্রীঃ)

জালালউদ্দীন গণেশী রাজা গণেশের পুত্র। জন্মে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দুর সন্তান—ধর্মান্তরে মুসলমান। পিতা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন কিন্তু মুসলমানের উপর বিরূপ ছিলেন না। তবে রাজা গণেশের নিকট রাষ্ট্রের শত্রুই ছিল তাঁহার শত্রু—সেই শত্রু হিন্দুই হউক বা মুসলমানই হউক। কিংবদন্তী অনুসারে যখন বদর-উল-ইসলাম তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে অস্বীকার করেন, তখন তিনি তাঁহাকে শাস্তি দিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। আবার রাজারূপে তিনি তাঁহার মুসলিম প্রজাবর্গকে যথেষ্ট অনুগ্রহও করিতেন—সেই প্রমাণ দিয়াছেন নিজামউদ্দীন, বাদায়ুনী, আবুল ফজল এবং ফেরিস্তা। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুসলমানগণ রাজা গণেশের সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে মুসলিম রীতি অনুসারেই সমাধিস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের সময় হইতে বঙ্গদেশে মুসলিম মোল্লাদের প্রাধান্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খানকা, মসজিদ ও কবরস্থানের সংশ্লিষ্ট (মতওয়াকী) মোল্লাগণ প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতেন—কারণ প্রত্যেকটি মুসলিম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভূমি বা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা ছিল (ওয়াকাফ্, ইনাম বা বকশিস)। মোল্লাগণ মুসলিম বঙ্গে অকস্মাৎ একজন হিন্দু বীরের আবির্ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—রাজা গণেশের আধিপত্যকে তাঁহারা স্বচ্ছন্দমনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহারা রাজা গণেশের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কটূক্তি করিয়াছেন। যদুসেন মুসলমান হইয়াছিলেন ইহা সত্য।

রাজা গণেশের নিকট রাষ্ট্রের শত্রুই ছিল তাহার শত্রু—সে হিন্দুই হউক কিংবা মুসলমানই হউক

১) *Riyas-us-Salatin, English,* Tr. p. 118

তাঁহার ধর্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধেও নানা কিংবদন্তী আছে। যদুসেন জালালউদ্দীন হিন্দুর উপর অত্যাচার করিয়াছেন এবং বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় যদুসেনের ধর্মান্তর গ্রহণকে হিন্দুরা স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। এমন কি তাঁহার হিন্দু পত্নী নবকিশোরীও স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পুত্র অনুপনারায়ণকে লইয়া সাতগড়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমিত হয় যে, যদুসেনের রাজ্য সমগ্র বঙ্গব্যাপী বিস্তৃত ছিল না। কিংবদন্তী অনুসারে যদুসেন জালালউদ্দীনের পুত্র শামসউদ্দীন আহম্মদ শাহ ছিলেন তাঁহার মুসলিম পত্নী আশমানতারার গর্ভজাত সন্তান। যদুসেনের হিন্দু স্ত্রী নবকিশোরীর পুত্র অনুপনারায়ণ ভাতুরিয়াতে রাজত্ব করিতেন। ৮৩৪/১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে জালালউদ্দীন চাটগাঁ পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তার করেন।[১] সেই সময়ে বঙ্গদেশে তিনজন নরপতির উল্লেখ পাওয়া যায়—জালাল-উদ্দীন পাণ্ডুয়ায়, মহেন্দ্রদেব ও রমাবল্লভদেব চন্দ্রদ্বীপে এবং অনুনারায়ণ ভাতুরিয়ায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে জালালউদ্দীনই ছিলেন সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী এবং তাঁহার রাজ্যসীমাই ছিল সর্বাধিক বিস্তৃত।

জালালউদ্দীন যদুসেনের জীবন-কাহিনী অতি বিচিত্র—অতি চমকপ্রদ। কিন্তু তাঁহার কীর্তি বা কার্যাবলীর বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। যদুসেন পিতা গণেশকে হত্যা করিয়াছিলেন কিংবা রাজা গণেশের মৃত্যুর সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব ছিল—ইহার কোন প্রমাণ নাই। যদিও গোলাম হুসেন জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া এই প্রকার আভাসই দিয়াছেন। রাজ্যারম্ভের প্রথমাংশে রাজা দনুজ-মর্দন এবং তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রদেব তাঁহাকে বিপর্যস্ত করিয়াছিলেন এবং রাজধানী পাণ্ডুয়া অধিকার করিয়াছিলেন (৮২০/১৪১৭ খ্রীঃ—৮২১/১৪১৮ খ্রীঃ)। দনুজমর্দনের মৃত্যুর পর মহেন্দ্রদেবের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয়। মহেন্দ্রদেব চন্দ্রদ্বীপে প্রস্থান করেন; জালালউদ্দীন চাটগাঁ পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তার করেন (৮৩৪/১৪৩০ খ্রীঃ)। রিয়াজ-উল-সালাতীন প্রভৃতি মুসলিম গ্রন্থে জালালউদ্দীন কর্তৃক চাটগাঁ অভিযানের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু ৮৩৪/১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে চাটগাঁয় মুদ্রিত একটিমাত্র মুদ্রা হইতেই ইহা অনুমিত হইতেছে। পুত্র অনুপনারায়ণের সহিত তাঁহার কোন বিরোধ বা সংঘর্ষের উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ ভাতুরিয়ায় কোন প্রকার আক্রমণ হয় নাই—তাঁহার স্ত্রী নবকিশোরীও তাঁহার সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখেন নাই।

জালালউদ্দীন গণেশীর রাজত্বের ঘটনাবলী

দিল্লীর সুলতান সৈয়দ খিজির খান এবং মুবারক শাহ বাঙ্গলার ঘটনার সহিত কোনরূপে জড়িত ছিলেন না। জৌনপুরের শার্কীবংশ তখন যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ভারকেন্দ্র সিংহাসনের তুলাদণ্ডে নির্ণীত হইত। দিল্লীর ইতিহাসের সহিত তাইমুরের আক্রমণের অব্যবহিত পরের যুগে বাঙ্গলার ঘটনার কোন উল্লেখযোগ্য সম্বন্ধ নাই।

জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালের কোন শিলালিপি আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। রিয়াজ-উস-সালাতীন অনুসারে তিনি গৌড়ে একটি মসজিদ, দুইটি

জলাশয় ও একটি পান্থশালা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে পাণ্ডুয়া ধনজন পরিপূর্ণ জনপদে পরিণত হইয়াছিল এবং বঙ্গের রাজধানী গৌড় পুনরায় জন-কোলাহলমুখর হইয়া উঠিয়াছিল।[১] গোলাম হুসেন বলেন যে, পাণ্ডুয়ার একলাখী হর্ম্য জালালউদ্দীন, তাঁহার পুত্র আহম্মদ শাহ ও পত্নী আশমানতারার সমাধি। অবশ্য র‍্যাভেনশ-এর মতে ঐ একলাখী হর্ম্য সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন এবং তাঁহার পত্নী ও পুত্রবধূর সমাধি।[২] কানিংহামের মতে 'একলাখী' বাঙ্গলাদেশে পাঠান স্থাপত্যের মনোরম নিদর্শন।[৩] একলাখী সমভুজ চতুষ্কোণ, ইহাতে একটিমাত্র খিলান আছে—ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সাড়ে সাতার হস্ত পরিমিত। এই হর্ম্যের ভিত্তি দেখিলে মনে হয় ইহা কোন হিন্দু মন্দির বা বৌদ্ধ স্তূপ ধ্বংস করিয়া নির্মিত হইয়াছিল; কারণ ইহাতে হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শনযুক্ত বহু প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।[৪] গোলাম হুসেনের মতে জালালউদ্দীন সপ্তদশবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।[৫] তিনি ৮৩৫/১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। জালালউদ্দীন গণেশী যদি ধর্মান্তর গ্রহণ না করিতেন তবে হয়ত বঙ্গের ইতিহাস অন্য রূপ পরিগ্রহ করিত।

একলাখী মসজিদ হিন্দু মন্দিরের রূপান্তর

শামসউদ্দীন আহম্মদ শাহ (৮৩৬/১৪৩২—৮৪৬/১৪৪২ খ্রীঃ)

জালালউদ্দীন গণেশীর পরে তাঁহার পুত্র শামসউদ্দীন আহম্মদ শাহ বাঙ্গলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার সুদীর্ঘ একাদশ বৎসর রাজত্বকাল অত্যাচার ও অনাচারের কাহিনীপূর্ণ। রাজ্যের আমীরগণ তাঁহার অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া শাদী খান ও নাসীর খান নামক আহম্মদ শাহের দুইজন ক্রীতদাসের সাহায্যে তাঁহাকে হত্যা করাইলেন। ৮৩৬/১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত তাঁহার একটিমাত্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৬] রিয়াজ-উস-সালাতীন অনুসারে তিনি ৮৩০/১৪২৭ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হইয়াছিলেন।[৭] কিন্তু মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণ অনুসারে তিনি ৮৩৬/১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন, নতুবা তাঁহার নামে মুদ্রাঙ্কিত হইতে পারে না। সুতরাং রিয়াজ-উস-সালাতীনের মত গ্রহণযোগ্য নহে। শাদী খানকে নিহত করিয়া নাসীর খান গৌড়ের কর্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ক্রীতদাসের আধিপত্য অপমান-জনক বিবেচনা করিয়া সাতদিনের মধ্যেই তাঁহাকে হত্যা করিলেন এবং শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের একজন বংশধর নাসীর খাঁনকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ৮৩৬/১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দে নাসীর খানের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৮] সুতরাং আহম্মদ শাহের রাজত্বের অবসানও সম্ভবতঃ উক্ত বৎসরেই সংঘটিত হইয়াছিল। আহম্মদ শাহের রাজত্বের কোন শিলালিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

শাদী খান ও নাসীর খান

---

১) *Riyas-us-Salatin, Eng.* Tr. p. 118
২) Ravenshaw-*Gour its Ruins and Inscriptions*, p. 58.
৩) *Cunningham's Report of the Archaeological Survey of India*, Vol. xv. Pp. 88-90
৪) Ravenshaw-*Gour its Ruins and Inscriptions*, p. 58
৫) *Riyas-us-Salatin*, Eng. Tr. p. 118
৬) *Marsden's Numismata Orienta*,
৭) *Riyas-us-Salatin*, Eng. Tr. p. 119.
৮) *JASB, Old Series*, Vol. XLII-1873, Pt. 1. P. 269

নবম অধ্যায়

ইলিয়াসশাহী বংশের পুনরভ্যুদয় ও হাবসী শাসন

(৮৪৬/১৪৪২—৮৯০/১৪৮৭ খ্রীঃ)

(৮৯০/১৪৮৭—৮৯৬/১৪৯৩ খ্রীঃ)

সূচনা : গণেশী বংশের পরেই বঙ্গদেশে ইলিয়াসশাহী বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী ইলিয়াসশাহী সুলতানগণ ছিলেন দুর্বলচিত্ত এবং আত্মকলহে বিপর্যস্ত। আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাদের হাবসী দেহরক্ষী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল এবং হাবসীগণই ইলিয়াসশাহী বংশের পতনের কারণ হইয়াছিল। পরবর্তী ইলিয়াসশাহীগণ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (৮৪৬/১৪৪২-৮৯০/১৪৮৭ খ্রীঃ)। ইলিয়াসশাহী বংশের রাজত্ব বঙ্গের এক গৌরবময় অধ্যায়। সেই সংকীর্ণতার যুগেও ইলিয়াসশাহী সুলতানগণ ছিলেন উদার—তাঁহারা শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। পৌনে তিনশত বৎসরের সান্নিধ্যে হিন্দু-মুসলিমগণের পরস্পর বিরোধের তীব্রতা এই সময়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল, বঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন আসিল—সমন্বয়ের সূচনা হইল—বঙ্গদেশে নূতন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষা রূপ পরিগ্রহ করিল।

হিন্দু-মুসলিম বিরোধের তীব্রতা হ্রাস

শেষ ইলিয়াসশাহী সুলতানকে হত্যা করিয়া বরবক শাহ হাবসী বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। চারিজন হাবসী সুলতান সাত বৎসর রাজত্ব করেন (৮৯০/১৪৮৭—৮৯৬/১৪৯৩ খ্রীঃ)। হাবসী রাজত্বে বঙ্গদেশ অত্যাচারে-অনাচারে পরিত্রাহি আর্তনাদ করিয়াছিল। সেই নির্যাতনের অবসান করিলেন বঙ্গে হুসেন-শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন হুশেন শাহ।

ইলিয়াসশাহী বংশের পুনরভ্যুদয়

রাজা গণেশের পৌত্র আহম্মদ শাহকে হিন্দুগণ স্বচ্ছন্দমনে গ্রহণ করেন নাই—কারণ, তাঁহার পিতা জালালউদ্দীন গণেশী ছিলেন ধর্মত্যাগী ; মাতা আশমানতারারও সুখ্যাতি ছিল না। অন্যদিকে মোল্লা সম্প্রদায়ও হিন্দুরাজা গণেশের বংশধরকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া প্রসন্ন হন নাই। তাঁহারা আহম্মদ শাহের ক্রীতদাস শাদী খান ও নাসীর খানকে অত্যাচারী প্রভুকে হত্যার জন্য প্ররোচিত করিলেন, কিন্তু নিজেরা ক্রীতদাসের অধীনতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। কারণ, ক্রীতদাসদের আভিজাত্য ছিল না। তাহার উপর নাসীর খান যখন ষড়যন্ত্র করিয়া শাদী খানকে হত্যা করিলেন, তখন আমীরগণ দেখিলেন যে, নাসীর খান তাঁহার সহকর্মী শাদী খান ও প্রভু আহম্মদ শাহের রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। দুইটি হত্যার মধ্য দিয়া যিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, তিনি যে আরও কতকগুলি হত্যার মধ্য দিয়া সিংহাসন রক্ষা করিবেন তাহা কল্পনা করিতে কাহারও কষ্ট হইল না। অভিজাত সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ করিলেও সামান্য ক্রীতদাসের আধিপত্য অপমানজনক বিবেচনা করিল। অন্যদিকে নাসীরউদ্দীন মামুদের বংশগৌরব ছিল—তাহা ছাড়া তিনি ছিলেন নির্বিরোধ ব্যক্তি—নির্ঝঞ্ঝাটে

আহম্মদ শাহের হত্যা ও নাসীর খানের সিংহাসন লাভ

কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন—কোন রাজনৈতিক কলহ বা ষড়যন্ত্রেও তিনি কখনও লিপ্ত হন নাই। সুতরাং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সর্বদলীয় লোক ইলিয়াস শাহের বংশধর নাসীরউদ্দীন মামুদকে বঙ্গের সিংহাসনে স্থাপন করিল।

নাসীরউদ্দীন আবুল মুজাফর মামুদ

(৮৪৬/১৪৪২—৮৬৪/১৪৫৯)

নাসীরউদ্দীনের সিংহাসনারোহণ

নাসীরউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নূতন নাম গ্রহণ করিলেন—নাসীরউদ্দীন আবুল মুজাফর মামুদ। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ সুলতান। তাঁহার সুশাসনে দেশের লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল—আহম্মদ শাহের রাজত্বের অত্যাচারের বিভীষিকা বিদূরিত হইল।[১]

নাসীরউদ্দীন মামুদের রাজত্বে দিল্লীর সহিত সম্বন্ধ

নাসীরউদ্দীন মামুদ ইলিয়াসীর রাজত্বে বঙ্গদেশ দিল্লীর সহিত কোনপ্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয় নাই। কারণ, দিল্লীর লোদী সুলতানগণ প্রতিবেশী শার্কী জৌনপুরীদের সহিত প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত ছিলেন। বিহারের অধিকাংশ তখন শার্কী সুলতানগণের অধীন ছিল এবং বিহার ছিল বঙ্গ অভিযানের পশ্চিম দ্বারস্বরূপ। বঙ্গের উপরও শার্কী সুলতানগণের লুব্ধ দৃষ্টি পড়িয়াছিল। ইতোমধ্যে দিল্লীর সিংহাসনে দুর্বল সৈয়দগণের পরিবর্তে পাঠান লোদীবংশের প্রতিষ্ঠা হইল, লোদীগণের সহিতও শার্কী সুলতানগণের বংশানুক্রমিক বিরোধ আরম্ভ হইল। কাজেই এই সময়ে শার্কী কিংবা লোদী সুলতানগণের বঙ্গের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের অবসর ছিল না—সুতরাং বঙ্গদেশ সাময়িকভাবে শান্তি উপভোগ করিল।[২]

দক্ষিণবঙ্গ অধিকার

নাসীরউদ্দীন মামুদের সুশাসনে বঙ্গদেশ পুনরায় সামরিক শক্তি অর্জন করিল। ৮৬৩/১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বাগেরহাটের খান জাহান আলীর সমাধিগাত্রে খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, নাসীরউদ্দীন মামুদ অন্ততঃ যশোহর ও খুলনার কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে খানজাহান আলী নামক একজন পীর ঐ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যুও হয়।[৩] তাঁহার কীর্তিকাহিনী স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট চিরন্তন হইয়া আছে। কথিত আছে যে, তিনি দুর্ভিক্ষে ক্ষুধার্তকে অন্নদান করিয়াছেন, দারুণ গ্রীষ্মে দীর্ঘিকা খনন করিয়া তৃষ্ণার্তের জলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, মসজিদ নির্মাণ করিয়া ধর্মের সহায়তা করিয়াছেন এবং মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া শিক্ষার সহায়তা করিয়াছেন। খুলনা জেলায় বাগেরহাট গ্রামে পীর খান জাহান আলীর সমাধি স্থানীয় মুসলমানদের পীঠস্থান। সমাধির শিলালিপিতে তাঁহার মৃত্যুর বৎসর ৮৬৩/১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ তিনি ছিলেন সুলতান নাসীরউদ্দীন ইলিয়াসীর সমসাময়িক। পীর খান জাহান আলীর কাহিনী

---

১) *History of Bengal*—Dacca University, Vol. II, P. 130

২) *Ibid* Vol. II, P. 131

৩) Khulna *Gazeteer*, Pp. 26-27

পীর খান জাহান আলী-পশুপতি চট্টোপাধ্যায় ১০-১২ পৃঃ

হইতে অনুমিত হয় যে, নাসীরউদ্দীনের সময়ে বঙ্গের বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে মুসলিম ধর্ম বা রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হইয়াছিল।

উড়িষ্যা ও বঙ্গ

উড়িষ্যার গঙ্গরাজ্য তখন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। নাসীরউদ্দীন ইলিয়াসীর পূর্ববর্তী কয়েকজন সুলতানের অনিশ্চিত শাসন ও দুর্বলতার সুযোগে গঙ্গবংশ ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। নাসীরউদ্দীন মামুদ ইলিয়াসীর সমসাময়িক উড়িষ্যাধিপতি কপিলেন্দ্রদেব (১৪৩৭-১৪৭০ খ্রীঃ) পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। তিনি 'গৌড়েশ্বর' বিশেষণ ব্যবহার করিতেন এবং উড়িষ্যার ইতিহাসের বর্ণনানুযায়ী তিনি দুইজন তুরস্ক সুলতানকে পরাজিত করিয়াছিলেন।[১] তাঁহার সমকালে শামসউদ্দীন আহম্মদ শাহ, নাসীরউদ্দীন মামুদ শাহ এবং রুকনউদ্দীন বরবক শাহ বাঙ্গলাদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। শামসউদ্দীন আহম্মদ শাহ 'তুরস্ক' বংশজাত ছিলেন না, সুতরাং পরাজিত তুরস্ক সুলতান দ্বারা নাসীরউদ্দীন এবং রুকনউদ্দীন বরবক শাহকেই অনুমান করা যাইতে পারে।

নাসীরউদ্দীন ইলিয়াসীর রাজ্যসীমা

৮৪৬/১৪৪২—৮৬৪/১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নাসীরউদ্দীন মামুদের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার রাজত্বকালের মুদ্রা ও শিলালিপি ভাগলপুর, সাতগাঁ, বাগেরহাট, ফরিদপুর এবং করতোয়া নদীতীরস্থ মুসরতাবাদে (সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত) আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল স্থানগুলি হইতে অনুমিত হয় যে, সুলতান নাসীরউদ্দীন ইলিয়াসীর রাজ্য সুসংবদ্ধ এবং সুবিস্তৃত ছিল। ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ত্রিবেণী লিপি হইতে জানা যায়, সেই সময়ে বর্তমান ২৪ পরগনা সাতগাঁ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কারণ, উক্ত লিপিতে 'লাউবলা' বা 'লোপালা' গ্রামের উল্লেখ আছে। এই গ্রামটি বর্তমান ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত হাবেলী পরগনার অন্তর্ভুক্ত। ৮৬৩/১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মবারকাবাদ নামক সীমান্ত শহরে স্থানীয় শাসনকর্তা খোজা জাহান একটি তোরণ নির্মাণ করিয়াছিলেন।[২] আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের মতানুসারে ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী সরকার বাজুহাতে (শ্রীহট্ট জেলা) এই মবারকাবাদ নগর অবস্থিত ছিল। সুতরাং নাসীরউদ্দীন মামুদ ইলিয়াসীর শিলালিপির সংস্থান হইতে অনুমান করা যায় যে, তাঁহার রাজ্যসীমা পশ্চিমে ভাগলপুর, পূর্বে ফরিদপুর, উত্তরে গৌড় পাণ্ডুয়া এবং দক্ষিণে ত্রিবেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সুলতান নাসীরউদ্দীনের শিল্প-প্রীতি

নাসীরউদ্দীন ইলিয়াসীর রাজত্বকালের ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করিলে মনে হয় সুলতান শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে বহু মসজিদ, খান্‌কা, তোরণ, সেতু, সমাধি ও প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বে দেশে শান্তি বিরাজিত ছিল বলিয়াই তিনি শিল্প-স্থাপত্যের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। নাসীরউদ্দীন ইলিয়াসীর যুগের আবিষ্কৃত স্থাপত্য-নিদর্শন—

(১) গৌড়ের দুর্গ ও প্রাসাদ[৩]

---

১) R. D. Banerjee, *History of Orissa*, Vol. I, Pp. 289-290, 301-302

২) *JASB*, 1910-Series p. 145

৩) *Riyas-us-Salatin*, Eng. Tr. P. 120

(২) গৌড়-নগরপ্রাচীরের দক্ষিণ দিকে সেলামী দরওয়াজা বা কোতোয়ালী দরওয়াজা[১]—ঐগুলি সুলতান নাসীরউদ্দীন ইলিয়াসী কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। এই তোরণদ্বয়ের ধ্বংসাবশেষ মাত্র বিদ্যমান আছে। এই তোরণ-নিম্নস্থ পথ দ্বাদশ হস্ত প্রশস্ত। ক্রেটনের (Creighton) গ্রন্থে এই তোরণের চিত্র রহিয়াছে।[২]

(৩) ৮৪৭/১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলায় সরফরাজ খাঁ কর্তৃক দুইটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায় এই মসজিদদ্বয়ের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উভয় শিলালিপিতে নাসীরউদ্দীন মামুদ শাহের নাম উল্লেখ আছে।[৩]

(৪) ৮৫৯/১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হিলাল কর্তৃক গৌড়ের সন্নিকটে একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল।[৪]

(৫) মুসম্মাৎ বখ্ত বিনৃত নামে একজন মহিলা ঢাকা নগরীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন।[৫] এই মসজিদের শিলালিপিও আবিষ্কৃত হইয়াছে (৮৬১/১৪৫৭ খ্রীঃ)।

(৬) ৮৬১/১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তরবিয়ৎ খান কর্তৃক সপ্তগ্রামে একটি গৃহ নির্মিত হইয়াছিল। এই শিলালিপিটি ত্রিশবিঘা গ্রামে শেখ জামালউদ্দীনের সমাধির পার্শ্বে রহিয়াছে।

(৭) নাসীরউদ্দীন মামুদ ইলিয়াসশাহীর রাজত্বে একটি সেতু নির্মিত হইয়াছিল। কোতোয়ালী দরওয়াজায় সংশ্লিষ্ট শিলালিপি পাঠে এই সেতুর কথা জানা যায়।

(৮) পাণ্ডুয়ার ছোট দরগায় রক্ষিত শিলালিপি অনুসারে জানা যায় যে, ৮৬৩/১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লতিফ খাঁন কর্তৃক জনৈক মুসলমান সাধুর সমাধি নির্মিত হইয়াছিল।[৬]

(৯) ৮৬৩/১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে খুলনা জেলার বাগেরহাটে খান জাহান আলীর সমাধি নির্মিত হইয়াছিল।

(১০) ৮৫০/১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরের মদরোজা মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদ ভাগলপুর রাজকর্মী খুরশেদ্ খান কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।[৭]

এই সকল ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন সুলতান নাসীরউদ্দীন ইলিয়াসীর শিল্প-প্রীতিরই পরিচয় দেয়। মসজিদ নির্মাণকার্যে তাঁহার অফুরন্ত উৎসাহ ছিল। সমাধির উপর ইমারৎ বা সৌধ নির্মাণ পুণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। পাণ্ডুয়ার দরগা, বাগেরহাট গ্রামে খান জাহান আলীর কবর, গৌড়ে হিলালের সমাধি হইতে প্রমাণিত হয় যে, বীরগণ দেশে সমাদৃত হইতেন।

---

১) গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্তী, ২য় খণ্ড, ৮০ পৃঃ
২) *Creighton's Ruins of Gour.* Pt. IV
৩) বাঙ্গলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৭ পৃষ্ঠা (পাদ টীকা)
৪) *JASB, Old Series,* Vol. XLIII, 1874, Pt. I, p. 294
Ravenshaw-*Gour its Ruins and Inscriptions*, p. 72
৫) *JASB-Journal and Proceedings of the ACB—New Series*, Vol. VII, p. 145
৬) Ravenshaw-*Gour its Ruins and Inscriptions*, p. 52
৭) *Epigrapica India*, P. 280.

রুকনউদ্দীন বরবক শাহ ইলিয়াসী

(৮৬৩/১৪৫৯—৮৭৯/১৪৭৪ খ্রীঃ)

নাসীরউদ্দীন মামুদ ইলিয়াসীর মৃত্যুর পর বিনা রক্তপাতে তাঁহার পুত্র রুকনউদ্দীন বরবক শাহ পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বরবক শাহ ইলিয়াসী পিতার রাজত্বকালেই সাতগাঁয়ের শাসনকর্তারূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। যোদ্ধারূপে তাঁহার খ্যাতি ছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই সৈন্যগণ কোন প্রতিবাদ করে নাই এবং শান্তিপ্রিয় প্রজাগণও কোন উষ্মা প্রদর্শন করে নাই।

রুকনউদ্দীনের সিংহাসন লাভ

সুলতান রুকনউদ্দীন ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বে সৈনিক ও নাগরিক সকলকেই নিশ্চিন্ত স্বচ্ছান্দ্যতায় বাস করিত।[১]

বরবক শাহ ইলিয়াসীর রাজত্বের প্রারম্ভে কোন গৃহবিবাদের ইতিহাস নাই, কোন আত্মীয় হত্যা হয় নাই; রাজত্বের মধ্যভাগে দিল্লীর সহিত বিরোধ হয় নাই, রাজত্বের শেষে কোন বিদ্রোহও হয় নাই। অথচ সুলতান বরবক দক্ষিণ-পশ্চিমে মুসলমানদের চিরন্তন প্রতিদ্বন্দ্বী উড়িষ্যার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন এবং উত্তর-পূর্ব কামরূপে দীর্ঘদিনব্যাপী সমরে লিপ্ত ছিলেন। এই দুই যুদ্ধের ভার অর্পিত হইয়াছিল কোরায়েশ বংশীয় একজন আরব সেন্যাধ্যক্ষের উপর। সমসাময়িক গ্রন্থে তিনি মুহম্মদ ইসমাইল গাজী নামে পরিচিত। বাঙ্গলার ইতিহাসে এই আরব যোদ্ধার বিশেষ পরিচয় নাই। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পীর মুহম্মদ শাত্তারী সংকলিত একখানি জীবনচরিত গ্রন্থে মুহম্মদ ইসমাইল গাজীর উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] পুস্তকখানির নাম রিসালাত্-উস্-শুহাদা। মুহম্মদ ইসমাইল ভাগ্যান্বেষণে সুদূর আরবদেশ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। রিসালাত্-উস্-শুহাদা গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, মক্কা নগরী ছিল তাঁহার জন্মভূমি। মুহম্মদ ইসমাইল কোরায়েশ বংশের সন্তান বলিয়া ভারতবর্ষের মুসলমানের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এই কারণেই মুহম্মদ ইসমাইল বঙ্গদেশে বীরের প্রাপ্য শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। ইসমাইল উড়িষ্যার হিন্দুরাজা গজপতি ও কামরূপের হিন্দুরাজা কামেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি গাজী বা 'বিধর্মী হন্তা' পদবাচ্য। ইসমাইলের জীবনীও সেই আদর্শেই রচিত হইয়াছে। রঙ্গপুর জেলার কাঁটাদুয়ার নামক স্থানে ইসমাইল গাজীর সমাধি বর্তমান।

মুহম্মদ ইসমাইল গাজী

বরবক শাহের রাজত্বকালে মুহম্মদ ইসমাইল বঙ্গদেশে আগমন করেন। ইসমাইল প্রথম জীবনে গৌড় নগরের উত্তর দিকে ছুটিয়া-পটিয়া নামক এক বিস্তীর্ণ জলাভূমির উপর সেতু নির্মাণ করিয়া সুনাম অর্জন করেন। এই জলাভূমি প্রতিবৎসর বর্ষায় জলে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত—ইহাতে গৌড়ের অধিবাসিগণ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইত। বহুবার এই জলাভূমির চতুষ্পার্শ্বে আলি (বা আল) নির্মাণ করিয়া জলপ্লাবন প্রতিরোধের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু স্রোতের বেগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই।

ছুটিয়া-পটিয়ার সেতু

---

১) *JASB* 1870, 290. RS 118, Tab. III, p. 267

২) *JASB* 1874, Pp. 216-239

ইসমাইলের চেষ্টায় ছুটিয়া-পটিয়ার উপরে সেতু নির্মিত হইল।[১] ইসমাইল জনগণের নিকট অলৌকিক ক্ষমতাশালী পীর বলিয়া পরিচিত হইলেন।

গড়মন্দারণের যুদ্ধ

মুসলিম বিজয়ের প্রারম্ভ হইতেই গড়মন্দারণ (হুগলী জেলার অন্তর্গত) বঙ্গের মুসলিম রাজ্যের সীমান্ত দুর্গরূপে গৌরব অর্জন করিয়াছিল এবং জাজনগর ও লক্ষৌতির সংগ্রামে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। বরবক শাহের রাজত্বেও গড়-মন্দারণের গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। রিসালা গ্রন্থের বর্ণনানুসারে উড়িষ্যাধিরাজ গজপতি বরবক শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বঙ্গের সীমান্তদুর্গ গড়মন্দারণ অধিকার করিয়াছিলেন। বিধর্মীর এই অগ্রগতি প্রতিরোধের জন্য বরবক শাহ ইলিয়াসী ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। মুহম্মদের সমগোত্রীয়, কোরায়েশ বংশীয় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পীর ইসমাইল গাজী এই ধর্মযুদ্ধের নায়ক নিযুক্ত হইলেন।

ইসমাইল গাজী পরিচালিত ধর্মযুদ্ধের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। রিসালার বর্ণনা অনুসারে গজপতি পরাজিত হইয়াছিলেন এবং গড়মন্দারণ পুনরায় মুসলিমের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এই যুদ্ধ সম্ভবতঃ বরবক শাহ ইলিয়াসীর রাজত্বের প্রারম্ভেই সংঘটিত হইয়াছিল। কারণ, কামরূপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধেরও পরিচালক ছিলেন পীর ইসমাইল গাজী। পীর ইসমাইল কামরূপ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন (১৪৭৪ খ্রীঃ); সুতরাং গড়মন্দারণের যুদ্ধ বরবক শাহ ইলিয়াসীর রাজত্বের প্রথম ভাগেই সংঘটিত হইয়াছিল।[২]

কামরূপের যুদ্ধ

গাজী ইসমাইল অতঃপর কামরূপরাজ কামেশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কামরূপ রাজ্যের সীমা বঙ্গের কুচবিহার হইতে দারঙ্গ এবং আসামের কামরূপ জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। স্টেপলটনের মতানুসারে উত্তর-ময়মনসিংহ এবং ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর ও পূর্বে বহু অংশ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৩] আহোম বংশের অধীন হইবার পূর্বে কামরূপ রাজ্য 'তিব্বত-ব্রহ্ম' গোষ্ঠীয় 'খেন' বংশের অধিকারভুক্ত ছিল। করতোয়া হইতে বড়নদী পর্যন্ত তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল এবং তাঁহাদের রাজধানী ছিল কামতাপুরে। 'খেন'-বংশীয় তিনজন নরপতির মধ্যে একজনের নাম ছিল কামেশ্বর। করতোয়া নদীই ছিল ইলিয়াসশাহী ও খেন রাজ্যের সীমারেখা। করতোয়ার তীরবর্তী ঘোড়াঘাট সীমান্ত ভাগুসী রায় নামক একজন বিচক্ষণ হিন্দু সামন্তের শাসনাধীন ছিল। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কণ্টক দ্বার বা কাঁটাদুয়ারী ছিল গাজী ইসমাইলের বাসস্থান ও কর্মকেন্দ্র।

সম্ভবতঃ সীমান্ত ব্যাপারেই 'খেন' বংশীয় রাজা কামেশ্বরের সহিত বরবক শাহ ইলিয়াসীর কোন গোলযোগ হইয়াছিল। বরবক শাহ ইসমাইল গাজীকে কামেশ্বরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন; কারণ ইতঃপূর্বেই তিনি উড়িষ্যার হিন্দু নরপতি গজপতিকে

---

১) বাঙ্গলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড—২১১ পৃষ্ঠা
JASB, 1873, p. 297

২) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 183

৩) *JASB*, 1910, Pp. 621-22 (Stepleton)

পরাজিত করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত করতোয়ার তীরেই ছিল ইসমাইল গাজীর কর্মক্ষেত্র। সুতরাং হিন্দুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে মুহম্মদের বংশীয় গাজী ইসমাইলই উপযুক্ত বিবেচিত হইলেন।

শাত্তারী রচিত রিসালা-উস্-শুহাদা গ্রন্থে ইসমাইল-কামেশ্বর যুদ্ধের চমৎকার কাহিনী বর্ণিত আছে। প্রথম যুদ্ধ হইল দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত 'মাহিসন্তোষ' নামক স্থানে। কিন্তু কামতারাজ ছিলেন পরম পরাক্রমশালী। সুতরাং গাজী ইসমাইল যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত হইলেন। এই ধর্মযুদ্ধে বহু মুসলিমও নিহত হইল। কিন্তু তারপর মুহম্মদ শাত্তারী লিখিয়াছেন যে, যুদ্ধে পরাজিত হইলেও কামেশ্বর ইসমাইল গাজীর গুণে মুগ্ধ হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া বেহস্তের পথ পরিষ্কার করিলেন। কিন্তু কামেশ্বরের এই ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সত্যতা নির্ণয় করা সুকঠিন।

বিজয়ী কামেশ্বরের স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ যুক্তিহীন

পরবর্তী ঘটনা আলোচনা করিলে মনে হয় বরবক শাহ ইলিয়াসী এই পরাজয়ে ইসমাইল গাজীর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং কামেশ্বরের ইসলাম গ্রহণেও সন্তুষ্ট হন নাই (অবশ্য যদি কামেশ্বর ইসলাম গ্রহণ করিয়া থাকেন)। সম্ভবতঃ কামেশ্বরের উপর ইসমাইল গাজীর প্রভাব তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। শাত্তারী লিখিয়াছেন যে, ঘোড়াঘাটের হিন্দু সামন্ত ভাণ্ডসী রায়ও ইসমাইল গাজীর প্রভাব বৃদ্ধিতে ঈর্ষ্যান্বিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং সুলতান বরবক শাহকে তিনি ইসমাইলের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিলেন। সুলতানের আদেশে ইসমাইলের শির স্কন্ধচ্যুত হইল (৮৭৮/১৪৭৪ খ্রীঃ)[১]। তাঁহার দেহ মন্দারণে এবং শির কাঁটাদুয়ারে সমাহিত আছে।[২] রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দেহের বিভিন্ন অংশ আবিষ্কারে অনুমিত হয় যে, রাজদ্রোহের অপরাধে ইসমাইলকে শাস্তিপ্রদান করা হইয়াছিল এবং রাজদ্রোহের শাস্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ ইসমাইলের দেহ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রদর্শিত হইয়াছিল। শাত্তারী উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভাণ্ডসী রায়ের চক্রান্তে এবং সুলতানের আদেশে ইসমাইল গাজী নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইসমাইল গাজী যে সুলতান বরবক শাহের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই আদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই (৮৭৮/১৪৭৪ খ্রীঃ)।

ফেরিস্তার বর্ণনা অনুসারে বরবক শাহ ইলিয়াসী দাসক্রয়ে মহা উৎসাহী ছিলেন। তিনি আট সহস্র হাবসী ক্রীতদাস ক্রয় করেন এবং তাহাদিগকে সৈন্যবিভাগে ও রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত করেন। হঠাৎ বরবক শাহের এই দাসপ্রীতি কেন জন্মিয়াছিল বলা সুকঠিন। সম্ভবতঃ রাজ্যমধ্যে একটি নিজস্ব দল গঠনের উদ্দেশ্যেই এই বিরাট দাসবাহিনী গঠিত হইয়াছিল।

বরবক শাহ ইলিয়াসীর দাসক্রয়

বরবক শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা ও শিলালিপি হইতে তাঁহার রাজত্ব ও রাজ্যসীমার সন্ধান পাওয়া যায়। বরবক শাহের শেষ নামাঙ্কিত মুদ্রা ৮৭৬/১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত

১) *JASB*—Old series, Vol. XLIII, 1874, pt. I, p. 221
২) প্রবন্ধ—আবদুলওয়ালী

বিধর্মীর দেশ বিজয়ের কাহিনী সকল ক্ষেত্রেই প্রায় একরূপ এবং অলৌকিতার মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছে। ঐ সকল কিংবদন্তী বা কাহিনীতে উল্লিখিত সমসাময়িক পীর বা সুলতানের অস্তিত্ব প্রায়ই পাওয়া যায় না এবং বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে সময় বিচার করিলে এই সকল কাহিনীর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়। সুহৈল ই-ইয়মন নামক একখানি গ্রন্থে মুসলিম কর্তৃক শ্রীহট্ট-বিজয় কাহিনী বর্ণিত আছে—প্রবাদ ও কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।[১]

শ্রীহট্ট বিজয়

শ্রীহট্ট বা সিলেটের টোলটকর নামক মহল্লায় ছিল বুরহানউদ্দীনের বাস। বুরহানউদ্দীন পুত্রকামনায় একটি গোহত্যা "মানস" করেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল—তিনি একটি গোহত্যা করিয়া তাঁহার "মানস" রক্ষা করিলেন। কিন্তু দৈবক্রমে একটি চিলের মুখ হইতে একখণ্ড গোমাংস এক ব্রাহ্মণের গৃহে পতিত হইল। ব্রাহ্মণ এই অনাচারে ক্ষুব্ধ হইয়া শ্রীহট্টাধিপতি গৌর-গোবিন্দের নিকট অভিযোগ করিলেন। গৌরগোবিন্দের আদেশে বুরহানউদ্দীনের পুত্রকে হত্যা করা হইল এবং বুরহানউদ্দীনের দক্ষিণ হস্ত কর্তিত হইল। বুরহানউদ্দীন ক্ষোভে, রোষে গৌড়ে গমন করিয়া সুলতান ইউসুফ শাহকে সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলেন। বিধর্মী হিন্দুর এই ধৃষ্টতায় মুসলিম সুলতানের ক্রোধ হওয়াই স্বাভাবিক। সুলতান ইউসুফ শাহ প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সেকেন্দর শাহকে ব্রহ্মপুত্র ও সুবর্ণগ্রাম অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। শ্রীহট্টের জনপ্রবাদ অনুসারে গৌড়ের সুলতান দ্বিতীয় শামসউদ্দীনের রাজত্বকালে ৭৮৬/১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টের শেষ হিন্দু নরপতি গৌরগোবিন্দ পরাজিত হইয়াছিলেন।[২] ৭৮৬/১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সেকেন্দর শাহ ইলিয়াসী বঙ্গের সুলতান ছিলেন (৭৫৯/১৩৫৮—৭৯২/১৩৮৯ খ্রীঃ)। কিন্তু শামসউদ্দীন ইউসফ শাহের শিলালিপি শ্রীহট্টে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহাই এই অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন আরবী শিলালিপি। সুতরাং অনুমিত হইতে পারে যে, কিংবদন্তীর একশত বৎসর পরে শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহের সময়েই শ্রীহট্ট-বিজয় সম্পূর্ণ হইয়াছিল।[৩] তিনি সম্ভবতঃ পিতার আরব্ধ কর্মই সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

সুহৈল-ই-ইয়মনের বর্ণনানুযায়ী শ্রীহট্ট-বিজয় কাহিনী

সুহৈল-ই-ইয়মনের বিবরণ অনুসারে ইন্দ্রজালবলে শ্রীহট্টাধিপতি গৌর-গোবিন্দ সেকেন্দর শাহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সেকেন্দরের পরাজয়বার্তা শ্রবণ করিয়া গৌড়ের সুলতান সিপাহসালার নাসীরউদ্দীনকে সেকেন্দর শাহের সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। শ্রীহট্টে তখন শাহ জালাল নামক একজন মুসলিম পীর তিনশত ষাটজন দরবেশসহ হিন্দুদের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন। পীর শাহ জালাল তাঁহার অনুগামী দরবেশবৃন্দসহ সেকেন্দর ও নাসীরউদ্দীনের সহিত যোগদান করিলেন। পীর শাহ জালালের পুণ্যবলে গৌর-গোবিন্দের ইন্দ্রজাল পরাজিত হইল। গৌর-গোবিন্দ নানাস্থানে পরাজিত হইয়া শ্রীহট্টের এক সপ্ততল মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

গৌর গোবিন্দের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ

---

১) *JASB—Old Series*, Vol. XLII, 1873, Pt. I, P. 278

২) *Ibid*, P. 279

৩) বাঙ্গলার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা

অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া গৌর-গোবিন্দ মুসলিম পীরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া আত্মরক্ষা করেন এবং পরে অনুচরবর্গসহ এক পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১]

সুহৈল-ই-ইয়মনের বিবরণ অনুসারে শাহ জালাল ছিলেন বঙ্গের সুলতান শামসউদ্দীন ইউসুফের সমসাময়িক (৮৭৮/১৪৭৪—৮৮৬/১৪৮১ খ্রীঃ)। এই গ্রন্থানুসারেই ৫৯১/১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শাহ জালালের মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু তিনি দিল্লীতে পীর নিজামউদ্দীন আউলিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং ৭২৫/১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।[২] সুতরাং সুহৈল-ই-ইয়মনের বিবরণীতে শাহ জালাল, পীর নিজামউদ্দীন এবং শামসউদ্দীন ইউসুফের একত্র সমাবেশের সমস্ত কাহিনীটিই জটিল ও অবিশ্বাস্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর এই ব্যাপার শ্রীহট্ট বিজয়ের বহু পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। ইবন বাত্তুতা সপ্তগ্রাম হইতে শেখ জালালউদ্দীন তাব্রিজি নামক একজন মুসলিম পীরকে দর্শন মানসে শ্রীহট্টে গমন করিয়াছিলেন (৭৪৬/১৩৪৫ খ্রীঃ)।[৩] নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের মতে ৭৪৭/১৩৪৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই শেখ জালালউদ্দীনের মৃত্যু হইয়াছিল।[৪] কিংবদন্তী অনুসারে এই শেখ জালালউদ্দীনই নাকি শ্রীহট্টে ইসলাম প্রচার ও দেশটি জয় করিয়াছিলেন। সুতরাং সুহৈল-ই-ইয়মনে বর্ণিত শ্রীহট্টের পীর শাহ জালাল এবং ইবন বাত্তুতার বর্ণিত শেখ জালালউদ্দীন তাব্রিজি একই ব্যক্তি হইতে পারে না। আবার স্টেপলটন সাহেব শাহ জালালের সমাধিতে প্রাপ্ত অপ্রকাশিত একটি শিলালিপি (ঢাকা চিত্রশালায় রক্ষিত) হইতে বলিয়াছেন যে, ৭০৩/১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুজ শাহের সময়ে (৭০২/১৩০২—৭২২/১৩২২ খ্রীঃ) শ্রীহট্ট বিজিত হইয়াছিল এবং শাহ জালালই ছিলেন শ্রীহট্ট-বিজয়ের নায়ক।[৫] নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় স্টেপলটন সাহেবের মতই গ্রহণ করিয়াছেন এবং তারপর তিনি যে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সুহৈল-ই-ইয়মনের কাহিনীরই অনুরূপ।[৬] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বাঙ্গলার ইতিহাসেও ৭০৩/১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম কর্তৃক শ্রীহট্ট বিজয়ের কাহিনী সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; অবশ্য সেই সিদ্ধান্তও স্টেপলটন সাহেবের মতের ভিত্তিতেই গৃহীত হইয়াছে।[৭] এই সকল আলোচনা হইতে অনুমিত হইতে পারে যে, শ্রীহট্ট-বিজয় পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং শামসউদ্দীন ইউসুফ ইলিয়াসীর সময়ে উহার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল।

পীর শাহ জালাল এবং শেখ জালালউদ্দীন সম্বন্ধীয় কাহিনী বিভ্রান্তিকর

---

১) *JASB*—Old Series, Vol. XLII, 1873, Pt. I, P. 280

২) *Ibid*, P. 281

৩) Lees'-*Ibn Batutah*, P. 195

৪) N. K. Bhattasali, *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal*, P. 150

৫) *Ibid* P. 150

৬) *Ibid*, Pp. 150-151

৭) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II. p. 79

শামসউদ্দীন ইউসুফের রাজত্বের সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য বা উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহার একটিমাত্র মুদ্রায় সোণারগাঁয়ের মুদ্রাশালার নাম উৎকীর্ণ আছে। অন্যান্য সকল মুদ্রাতই খজানা (কোষাগার) শব্দটি মুদ্রিত রহিয়াছে।[১] ৮৮২/১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ার হিন্দু শক্তি বিজিত হইয়াছিল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে (রাঢ়ে) মুসলিম রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইয়াছিল। পাণ্ডুয়ার সূর্যনারায়ণের মন্দির ধ্বংস করিয়া উহার ভিত্তির উপর মসজিদ ও মিনার নির্মাণ করা হয়। ঐ সূর্যমূর্তির পশ্চাদ্ভাগে আরবী অক্ষরে এই বিজয়কাহিনী উৎকীর্ণ আছে।[২] সূর্য মন্দিরের বহু ধ্বংসচিহ্ন ও শিলাস্তম্ভ পাণ্ডুয়ার বাইশ দুয়ারী মসজিদের চতুষ্পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। বোধ হয় মন্দিরটির বাইশটি প্রবেশদ্বার ছিল এবং সেইগুলি ছিল মসজিদেরও প্রবেশপথ। সম্ভবত: সেই জন্যই মসজিদটি 'বাইশ-দুয়ারী' নামে খ্যাত।

শামসউদ্দীন ইউসুফের রাজ্য বিস্তার

৮৮৪/১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডুয়াতে বিখ্যাত মুসলমান সাধু নূর-কুতুব-উল-আলমের সমাধির পার্শ্বে একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল।[৩] ৮৮৪/১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দেই ইউসুফ শাহ গৌড়ের সন্নিকটে মেহদীপুর ও ফিরুজপুর গ্রামদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে দরসবাড়ী (বিদ্যাগৃহ; দরস পাঠ) নামক স্থানেও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদ-গাত্রে খোদিত শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কানিংহাম কর্তৃক প্রকাশিত এই শিলালিপির অনুলিপি কলিকাতার জাদুশালায় রক্ষিত আছে। ৮৮৫/১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে ঢাকার নিকটবর্তী মীরপুরে একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল।[৪] পাণ্ডুয়ার সোনা মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, উক্ত বর্ষে (৮৮৫/১৪৮০ খ্রী:) গৌড়ে একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন গৌড়ের খাকান নামক একজন আমীর।[৫] শ্রীহট্টে শাহ জালালের সমাধির চারিপার্শ্বে চারিটি মসজিদ আছে। তন্মধ্যে একটি মসজিদগাত্রে ইউসুফ শাহের শিলালিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে।[৬] এই শিলালিপিতে উজীর মসলিস-ই-আলা উপাধিধারী আমীরের নাম খোদিত আছে। এই সময় হইতে যেন বঙ্গের সুলতান, আমীর-ওমরাহ সকলেই মসজিদ নির্মাণ—তথা বঙ্গের সাংস্কৃতিক বিজয়ে তৎপর ও উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণ

রিয়াজ-উস সালাতীন, তবকাৎ-ই-আকবরী ও তারিখ-ই-ফেরিস্তা অনুসারে শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ সাড়ে সাত বৎসর রাজত্ব করেন। ৮৮৭/১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।[৭]

---

১) *Catalogue of Coins in Indian Museum*, Cal, Vol. II, Pt. II, P. 169, No. 149

২) বাঙ্গলার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা

৩) *JASB*, Vol XLII, 1873 p. 276. Revenshaw, *Gour*. P. 50

৪) *JASB*, Vol. XLIV. 1875, Pt. I, P. 293

৫) *JASB*, Vol. XLII, 1873, Pt. I, P. 277

৬) *JASB*, *Old Series*. Vol. XLII. 1873, Pt. 1. P. 277

৭) *Reyas-us-Salatin*, Eng. Tr. p. 120

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইউসুফ শাহ ইলিয়াসী বিদ্যোৎসাহী সুলতান ছিলেন। ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে মালাধর বসু তাঁহার শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য সমাপ্ত করেন। ১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খ্রীঃ) মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্দের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করেন এবং ১৪০২ শকে (১৪৮০ খ্রীঃ) উহা সমাপ্ত করেন।

তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥[১]

বিজয় পণ্ডিত ৮৮৫/১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মহাভারতের আদি হইতে অভিষেক পর্ব পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। ৮৯০/১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশাবলী' নামক কুলগ্রন্থে বিজয় পণ্ডিতের পুত্রের কুলক্রিয়ার কাহিনী বর্ণিত আছে। সুতরাং বিজয় পণ্ডিত ৮৯০/১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[২] এই সময় হইতে বাঙ্গলার মুসলিম সুলতান বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে আরম্ভ করেন। ইহার দুইটি কারণ—প্রথমতঃ, সার্ধ দুই শতাব্দিকালের দীর্ঘতায় পারস্পরিক বিরোধের তীব্রতা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ, নানা কারণে দিল্লী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বঙ্গের মুসলিম সুলতান বঙ্গদেশকেই স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন এবং বঙ্গের হিন্দুগণের সহায়তা ও সহানুভূতি লাভের আশায় বঙ্গকবি ও বাংলা কাব্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে থাকেন; সেই সঙ্গে মসজিদ, মাদ্রাসা, ধর্মান্তরীকরণের মধ্য দিয়া মুসলিম সুলতানগণ বঙ্গের সামরিক বিজয়কে সাংস্কৃতিক বিজয়দ্বারা সুসম্পন্ন করিতেও চেষ্টা করেন।

মুসলিম সুলতান কর্তৃক বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার কারণ

সেকেন্দর শাহ ইলিয়াসী (তিন দিবসের সুলতান)
(৮৮৭/১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দ)

ইউসুফ শাহ ইলিয়াসীর পর তাঁহার পুত্র সেকেন্দর শাহ ইলিয়াসী সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু (গোলাম হোসেনের মতে) উন্মাদ বলিয়া তিনদিন পরে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা হয়।[৩] বোধহয় দাসচক্রের আবর্তনে এই পরিবর্তন হয়; কারণ, সেকেন্দর শাহ উন্মাদ হইলে একদিনের জন্যও সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিতেন না। যাহা হউক তাঁহার পদচ্যুতির পর ইলিয়াস বংশীয় জালালউদ্দীন ফতে শাহ রাজ্যলাভ করেন।

জালালউদ্দীন ফতে শাহ (৮৮৭/১৪৮২—৮৯৩/১৪৮৭ খ্রীঃ)

জালালউদ্দীন ইলিয়াসীর পূর্ব নাম হোসেন। 'জালালউদ্দীন' তাঁহার রাজ-উপাধি। গোলাম হোসেনের মতে জালালউদ্দীন ইউসুফ শাহের পুত্র। কিন্তু শিলালিপি বা মুদ্রাবিচারে ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মুদ্রা ও শিলালিপিতে তিনি নিজেকে মামুদের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

জালালউদ্দীন ফতে শাহের পিতৃ-পরিচয়

---

১) বাঙ্গলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ২২১ পৃঃ (পাদটীকা)

২) বাঙ্গলার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ২২১ পৃঃ

৩) *Riyas-us-Salatin*, Eng. Tr., P. 121

ইউসুফ শাহের দাস প্রীতির বিষময় ফল

জালালউদ্দীন ফতে শাহ্ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী শাসকদের ধারাই অনুসরণ করিতেন। কিন্তু রুকনউদ্দীন বরবক শাহ্ ও ইউসুফ শাহের দাসপ্রীতির বিষময় ফল এইবার দেখা দিল। ফতে শাহ্ শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহের জীবদ্দশায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন; কারণ ৮৮৬/১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] তিনি বিদ্রোহী না হইলে ঐ বৎসর তাঁহার নামে মুদ্রাঙ্কিত হইতে পারে না এবং সেই জন্যই সম্ভবতঃ সেকেন্দর শাহ্‌কে সিংহাসন প্রদান করা হইয়াছিল। পরে তিনি বোধহয় দাসগোষ্ঠীর সহায়তাতেই সিংহাসন লাভ করেন। কারণ, বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এই দাসগোষ্ঠীই শাসন-যন্ত্রের প্রধান পদগুলি অধিকার করিয়া ছিল। আমীর-উল-উমারা মালিক আন্দিল হাবসী ক্রীতদাস হইলেও প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং সুলতান শাহজাদা নামক অন্য একজন ক্রীতদাস প্রাসাদরক্ষী সেনাদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ অত্যধিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়া তাহারা ক্ষমতাগর্বে দৃপ্ত ও উদ্ধত হইয়া উঠিল। উহাদের ঔদ্ধত্য সহ্যের সীমা অতিক্রম করিল। ফতে শাহ্ তাহাদের ক্ষমতা খর্ব করিতে মনস্থ করিলেন এবং উদ্ধত দাসদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। ফলে বিরোধী-দল ষড়যন্ত্র করিয়া প্রাসাদরক্ষী (খাজাসরাই) সুলতান শাহজাদাকে দলভুক্ত করিয়া সুযোগের অপেক্ষায় রহিল। ইতোমধ্যে মালিক আন্দিল যুদ্ধযাত্রা করিলেন। রাজসৈন্য অনুপস্থিত, এই সুযোগে প্রাসাদরক্ষী সুলতান শাহজাদা জালালউদ্দীন ফতে শাহ্ ইলিয়াসীকে রাজপ্রাসাদের মধ্যে হত্যা করিয়া ইলিয়াসী বংশ বিলোপ করিলেন। বাঙ্গলায় হাবসী রাজত্ব আরম্ভ হইল (৮৯০/১৪১৭ খ্রীঃ)।

রিয়াজ-উস-সালাতীন অনুসারে ৮৯৬/১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে ফতে শাহ্ নিহত হইয়াছিলেন।[২] কিন্তু রিয়াজ-উস-সালাতীন, তবকাৎ-ই-আকবরী[৩] ও তারিখ-ই-ফেরিস্তা[৪] অনুসারে তিনি সাত বৎসর পাঁচ মাস রাজত্ব করেন; সুতরাং ৮৯২/১৪৮৬খ্রীঃ কিংবা ৮৯৩/১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

ফতে শাহের শেষ শিলালিপি ৮৯২/১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার ঐ বৎসরের আর কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই; সুতরাং সম্ভবতঃ তিনি ঐ শিলালিপি প্রকাশের অব্যবহিত পরেই নিহত হইয়াছিলেন। সাতগাঁ এবং সোনারগাঁয়ে মুদ্রিত ফতে শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল মুদ্রায় শ্রীহট্ট এবং চব্বিশ পরগনার বিজিত স্থানসমূহের নামোল্লেখ আছে। সাতগাঁ শিলা-লিপিতে লাউবলার সহিত সিমলাবাদের উল্লেখ আছে। সিমলাবাদ বর্তমান বর্ধমানের কয়েক মাইল দক্ষিণ-পূর্বে দামোদর নদের তীরে অবস্থিত। এই সকল মুদ্রা ও লিপি-প্রমাণ হইতে অনুমিত হয় যে, ফতে শাহের রাজ্যসীমা পূর্বে শ্রীহট্ট ও দক্ষিণ-পশ্চিমে দামোদর নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ফতে শাহের রাজত্বকালেও বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে

১) *Catalogue of Coins in Indian Museum*, Cal, Vol. II, Pt. II, Pp. 169-170
২) *Riyas-us-Salatin*, Eng. Tr., P. 121
৩) *Tabkat-i-Akbari*, Parsian Origin, Newal Kisore Press, P. 525
৪) *Tarik-i-Ferista*, Vol. VII, P. 299

বহু মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। মসজিদগাত্রে সংলগ্ন শিলালিপি হইতেই ঐ সকল মসজিদ নির্মাণের কাহিনী জানা যায়। এই সকল মসজিদের মধ্যে ঢাকা, সুবর্ণগ্রাম, শ্রীহট্ট ও সপ্তগ্রামের মসজিদ উল্লেখযোগ্য।[১]

ইলিয়াস-শাহী বংশের কৃতিত্ব ও অবদান

ফতে শাহ ইলিয়াসীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে ইলিয়াস শাহী বংশের অবসান হইল। ইলিয়াসী সুলতানগণের অনেকেই সেই সংকীর্ণতার যুগে উদার মতাবলম্বী এবং সুদক্ষ ও বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। তাঁহারা শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। প্রায় সার্ধ শতাব্দীকাল ইলিয়াসীগণ বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন—প্রজাবর্গের অধিকাংশই ছিল বিধর্মী হিন্দু। সুতরাং অষ্টপুরুষ-(আট পুরুষ) ব্যাপী বঙ্গের শাসনযন্ত্র পরিচালনার কৃতিত্ব কম নহে—বিশেষতঃ সেই বিরোধ ও ষড়যন্ত্রের যুগে। ইলিয়াসী বংশ প্রায় ১২০ বৎসর (৭৪৩/১৩৪২—৮৯০/১৪৮৭ খ্রীঃ) বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। ইলিয়াসী বংশের রাজত্বকাল দুইটি ভাগে বিভক্ত—ইলিয়াসী সুলতানগণ প্রথম পর্যায়ে ৭৪ বৎসর (৭৪৩/১৩৪২—৮১৭/১৪১৬ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪৫ বৎসর (৮১৬/১৪৪২—৮৯০/১৪৮৭ খ্রীঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই ইলিয়াসী বংশের শাসনকালের মধ্যভাগে গণেশী বংশের তিনজন নরপতি ২৬ বৎসর কাল (৮১৭/১৪১৬—৮৪৩/১৪৪২ খ্রীঃ) বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনা করে। গণেশী বংশের অবসানে ইলিয়াসী বংশ বঙ্গের সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইল—ইহা তাঁহাদের জনপ্রিয়তা ও কৃতিত্বেরই পরিচায়ক।

ইলিয়াস-শাহী বংশ কর্তৃক প্রায় দেড়শত বৎসর ব্যাপী (আট পুরুষ) বঙ্গের শাসনদণ্ড প'রচালনা

ইলিয়াস-শাহী যুগ বঙ্গের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় যুগ। বঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন যেন এই সময়ে নবরূপ পরিগ্রহ করে। দীর্ঘ পৌনে তিনশত বৎসর (১২০০-১৪৮৭ খ্রীঃ) পরস্পর সান্নিধ্যে বসবাসের ফলে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিরোধের তীব্রতা হ্রাস পায়। ইলিয়াসী সুলতানগণ সাধারণতঃ হিন্দু পণ্ডিত ও কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন, সাহিত্যের সমাদর করিয়াছিলেন। সুতরাং হিন্দু প্রজাগণের মনোভাব ক্রমেই নমনীয় হইয়া আসিয়াছিল। নানা রাজনৈতিক কারণেও বঙ্গের মুসলিম সুলতানগণ তাঁহাদের হিন্দু প্রজাদের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন, সুতরাং ইলিয়াসীযুগে বঙ্গের রাজনৈতিক এবং সামাজিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতেও পরিবর্তন সূচিত হইল।

১২০০ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী বঙ্গদেশ জয় করেন। তাহার পর হইতেই দিল্লীর সুলতানগণ বাঙ্গলাদেশকে তাঁহাদের বিজিত দেশ বলিয়া গণ্য করিতেন। দাস সুলতানগোষ্ঠী, খালজী বংশ এবং তুঘলক বংশ বঙ্গদেশে স্বকীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে কয়েকবার অভিযান করিয়াছিলেন। ইলতুত্‌মিস, ঘিয়াসউদ্দীন বলবন এবং ফিরুজ তুঘলক স্বয়ং বাঙ্গলার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়াছেন। এই সময়ে বঙ্গের মুসলিম নরপতিগণ সুযোগ উপস্থিত হইলেই নিজেদের

বঙ্গদেশ ও দিল্লীর বিভিন্ন সুলতান গোষ্ঠী

---

১) বাঙ্গলার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ২২২-২৩ পৃষ্ঠা

স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিতেন, স্ব স্ব নামে মুদ্রা প্রচলন এবং খোত্‌বা পাঠ করিতেন। খালজী সুলতান জালালউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেও বুঘরা খান বলবনী স্বাধীনভাবে বাঙ্গলাদেশ শাসন করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীনের কর্মক্ষেত্র ছিল দাক্ষিণাত্য, রাজপুতনা ও পশ্চিমভারত—তাঁহার শত্রু ছিল বিধর্মী হিন্দু। বাঙ্গলা দেশ স্বাধীন হইলেও মুসলিম অধিকৃত ছিল; সুতরাং আলাউদ্দীন বঙ্গদেশ জয়ের চেষ্টা করেন নাই। ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া বলবনী বংশ উচ্ছেদ করেন এবং স্বয়ং জাবিতান (শাসনকর্তা) নিযুক্ত করেন (১৩২৫ খ্রীঃ), অবশ্য বলবনী বংশের আত্মকলহই ঘিয়াসউদ্দীনকে বাঙ্গলা আক্রমণের সুযোগ দিয়াছিল।

বঙ্গদেশকে শাসনাধীন রাখার জন্য মুহম্মদ তুঘলকের ব্যর্থ প্রচেষ্টা

মুহম্মদ তুঘলক বাহাদুর শাহ বলবনীকে বাঙ্গলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু বাহাদুর শাহ বলবনী বিদ্রোহী হইলে গাত্রচর্ম উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়। মুহম্মদ তুঘলকের নিযুক্ত জাবিতান মালিক ইউসুফ বাঙ্গলাদেশে আগমনের সময় পথিমধ্যে ইহলীলা সংবরণ করেন। তারপর মুহম্মদ তুঘলকের আর নূতন জাবিতান নিযুক্ত করার সুযোগ হয় নাই। ইহার পর বঙ্গদেশ প্রায় দুইশত বৎসর (১৩৪০-১৫৩৮ খ্রীঃ) পর্যন্ত দিল্লীর অধিকার-সীমার বাহিরে স্বয়ংবৃত্ত রাজ্যরূপে শাসিত হইল। এই দুইশত বৎসরের মধ্যে শতাধিক বৎসর বঙ্গদেশ ইলিয়াসী বংশের শাসনাধীন ছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে এক নূতন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষা রূপ পরিগ্রহ করিল। রাজনৈতিক প্রয়োজনে বঙ্গের মুসলিম সুলতানগণ হিন্দু-মুসলমান উভয় প্রজার উপরই নির্ভরশীল হইলেন। ঘটনাচক্রে সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণও রাজনৈতিক আবর্তে নামিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।

বঙ্গের তুর্ক-আফঘান বিজেতৃগণ বঙ্গদেশের গ্রামাঞ্চলে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করে নাই—কারণ, বঙ্গের নদীবহুলতা, বর্ষার জলপ্লাবন ও দূরত্ব। মুসলিম বিজয়ের প্রারম্ভ যুগে মুসলিম অধিকার বঙ্গের শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমস্ত দেশটিকে সুলতান বা জাবিতানগণ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সাধারণতঃ বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। দেশে বিদ্রোহ না হইলেই তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতেন। মুসলমান মোল্লাগণ মাঝে মাঝে গ্রামাঞ্চলে ধর্মপ্রচারে অভিযান করিতেন এবং অনেক ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ কর্তৃক অবহেলিত ও নিপীড়িত তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত। সুলতান, আমীর এবং মোল্লাগণও দেশের নানাস্থানে মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন এবং মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচারে সচেষ্ট হইয়াছেন। শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে বা আরবী ও পারসী শিক্ষায় উৎসাহ দান ও মুসলিম সংস্কৃতি প্রচারের উদ্দেশ্যে ঘিয়াসউদ্দীন, বরবক শাহ প্রভৃতি সুলতানগণ বহু বৃত্তি ও ইনাম দানের ব্যবস্থা করেন। মুসলমানগণ হিন্দু নারী বিবাহ করিয়াও মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধি করিত।

মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের অভিযান

মুসলমান আমীর ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ নিঃসঙ্কোচে হিন্দুদের উপর রাজস্ব সংগ্রহের ভার অর্পণ করিতেন। মুসলমান আগমনের প্রারম্ভ যুগে বহু হিন্দু ভূস্বামীর উল্লেখ

পাওয়া যায়। সেই সকল ভূস্বামীর মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের সংখ্যাই অধিক। তাঁহারা প্রাচীর ও পরিখাবেষ্টিত প্রাসাদে বাস করিতেন। তাঁহাদের নিজস্ব সৈন্য, অশ্ব, হস্তী ও নৌবাহিনী ছিল। তৎকালীন বৈষ্ণব সাহিত্যে গৌড়ের ব্রাহ্মণ সুবুদ্ধি রায়, সপ্তগ্রামে কায়স্থ হিরণ্য ও গোবর্ধন, ভাতুরিয়ার ব্রাহ্মণ গণেশ, সমুদ্রগড়ের ব্রাহ্মণ নায়ক মুকুট রায় এবং বারেন্দ্রীর বহু ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহারা ভূঁইয়া বা ভৌমিক নামে পরিচিত ছিলেন। মুসলমানগণ বঙ্গের অধীশ্বর হইলেও সকল সময়েই তাঁহাদিগকে গৃহবিবাদে বা আত্মকলহে এত বিব্রত থাকিতে হইত যে, গ্রামাঞ্চলে শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং হিন্দু ভূস্বামীদের উপর তাঁহাদিগকে বহুভাবেই নির্ভর করিতে হইত। এই ভূস্বামিগণ কেবল যুদ্ধ এবং রাজস্ব সংগ্রহ ব্যাপারেই সুলতানের সহায়তা করেন নাই—দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে এবং বঙ্গের সুলতানগণের পরস্পর বিরোধেও তাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন—এমন কি রাজা গণেশের মত হিন্দু জমিদার সমস্ত রাজশক্তি, তথা রাজসিংহাসনও অধিকার করিয়াছেন। তবে তখনও সাধারণ হিন্দু-মুসলমান প্রজা রাজনৈতিক আবর্তে খুব সংশ্লিষ্ট ছিল না—তাঁহারা সাধারণতঃ নির্ঝঞ্ঝাট জীবনই যাপন করিত—যদিও তাহাদের জীবনধারণের মানদণ্ড খুব উচ্চ ছিল না।

বাজলায় মুসলিম রাজত্বকালে হিন্দু জমিদার ও ভূস্বামিগণ

বঙ্গদেশে হাব্সী শাসন (৮৯০/১৪৮৭-৮৯৬/১৪৯৩ খ্রীঃ)

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌড়ে ও বঙ্গে হাবসী ক্রীতদাসগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ওমরাহগণের ক্ষমতা খর্ব করিবার জন্যই সুলতান রুকনউদ্দীন বরবক শাহ আবিসিনিয়া হইতে হাবসী খোজা আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রাসাদ রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ক্রমে গৌড় সুলতানের বিশ্বাস অর্জন করিয়া এই সকল হাবসী ক্রীতদাস রাজ্যের প্রধান প্রধান পদগুলি অধিকার করিয়াছিল এবং সুলতানের অনুগ্রহে ওমরাহপদেও উন্নীত হইয়াছিল। হাবসী খোজাগণকে সুলতানের অনুগ্রহভাজন হইতে দেখিয়া গৌড়মণ্ডলের হিন্দু ও মুসলমান প্রধানগণ কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। আভিজাত্য-গৌরবাভিমানী হিন্দু ও মুসলিম প্রধানগণের পরিবর্তে সুলতানের অনুগ্রহে এই ক্রীতদাসগণ যখন রাজ্যের প্রধান পদগুলি অধিকার করিল, তখন সেই অসন্তোষ, বিদ্বেষ ও বিক্ষোভে পরিণত হইল। হাবসী ক্রীতদাসগণ ওমরাহ পদে উন্নীত হইলে প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান আমীরগণ ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে গৌড়ের প্রাসাদসীমা পরিত্যাগ করিলেন।

হাব্সী ক্রীতদাস ও সম্ভ্রান্ত হিন্দু-মুসলিম প্রধানগণ

অযথা হাবসী প্রীতি ইলিয়াসী বংশের পতনের প্রধান কারণ। সুলতানের অনুগ্রহে রাজ্য ও রাজপ্রাসাদের প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত হইয়া হাবসী ক্রীতদাসগণ বাদশাহ অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী এবং ক্ষমতা গর্বে উদ্ধত হইয়া উঠিল। মুসলমান সমাজে প্রচলিত অবরোধ প্রথার অনুরোধে জগতের সর্বত্র মুসলমান নরপতিগণ অবরোধ রক্ষার জন্য হাবসী খোজা বা ক্লীব ক্রীতদাস নিযুক্ত করিতেন। ইহারা অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিত এবং সেই বিশ্বাসের সুযোগে কখনও কখনও

মুসলিম-সমাজে অবরোধ প্রথা ও হাবসী খোজা নিযুক্তি

প্রভুহত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। অবশ্য পরমুহূর্তেই হয় তো তাঁহার ছিন্নশির সিংহাসনতলে লুণ্ঠিত হইয়াছে। আহম্মদ শাহ গণেশীকে হত্যা করিয়া তাঁহার ক্রীতদাস নাসীর খাঁ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিবামাত্রই আহম্মদ শাহের প্রভুভক্ত সেনানী ও সেনাধ্যক্ষগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া গৌড়-সিংহাসনের কালিমা মোচন করিয়াছিলেন। কিন্তু আহম্মদ শাহের হত্যার অর্ধ শতাব্দী পরে জালালউদ্দীন ফতে শাহ ইলিয়াসী যখন একজন হাবসী ক্রীতদাস কর্তৃক নিহত হইলেন, তখন গৌড়রাজ্যে কেহই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না, বা বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইলেন না। ইহার কারণ বোধ হয় হাবসী ক্রীতদাসগণের শক্তি-বৃদ্ধিতে গৌড়ের হিন্দু ও মুসলমান আমীর, ওমরাহ ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহারা রাজধানী হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন কিংবা দূরে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বরবক শাহ হাবসী (৮৯০/১৪৮৭-৮৯১/১৪৮৭)

জালালউদ্দীন ফতে শাহ ইলিয়াসীর হত্যাকারী সুলতান শাহজাদা 'বরবক শাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দরবারগৃহে তাঁহার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদের দীর্ঘশ্বাস শ্রুত হয় নাই, একটি অঙ্গুলিসংকেতও হয় নাই। সম্ভ্রান্ত, সাধারণ, সকলেই নির্বিবাদে হাবসী ক্রীতদাসের সিংহাসনারোহণকে সহজভাবেই গ্রহণ করিল। কারণ, ফতে শাহের হত্যার পরেই সম্ভাব্য সকল বিরোধী আমীরকেই নির্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। নীচ জাতীয় বহু মুসলিম এবং খোজাকে উচ্চপদ ও অর্থ প্রদানে বশীভূত করা হইল।[১] সন্দেহের ছায়ামাত্র ধারণা হইলেই যে-কোন ব্যক্তিকে পৃথিবী হইতে অপসারণ করা হইল। দেশের লোক ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ফতে শাহের পত্নী শিশুপুত্র সহ রাজধানী হইতে বিতাড়িত হইলেন এবং গৌড়ের অদূরে সামান্য প্রজার ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন।

মালিক আন্দিল ও বরবক শাহ

ফতে শাহের মৃত্যুকালে গৌড়রাজ্যের প্রধান অমাত্য ও সেনাধ্যক্ষ মালিক আন্দিল রাজকার্যোপলক্ষে রাজধানীর বাহিরে গমন করিয়াছিলেন। মালিক আন্দিল বরবকের পরিবর্তে ফতে শাহের শিশুপুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। বরবক প্রথমে মালিক আন্দিলকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু অসমর্থ হইয়া গোপনে তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মালিক আন্দিলও সচেতন ছিলেন। অবশেষে বরবক শাহ মালিক আন্দিলকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের আদেশ প্রদান করিলেন। উদ্দেশ্য মালিক আন্দিল গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহাকে বন্দী করিবেন। মালিক আন্দিল ভাবিলেন— একবার গৌড়ে উপস্থিত হইলে বরবক শাহের বিরোধিদলের মনে আশা ও সাহস সঞ্চার হইবে এবং যথাসময়ে যথাবিহিত করা যাইবে। মালিক আন্দিল একদা সহসা সসৈন্যে রাজধানী গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। বরবক শাহ তাঁহাকে স্পর্শ

১) *History of Bengal*, Dacca University, Vol. II, p. 138

করিতে সাহস করিলেন না। অন্যদিকে মালিক আন্দিলও দেখিলেন যে, ভীত-সন্ত্রস্ত গৌড়বাসিগণ প্রকাশ্য বিদ্রোহে আগ্রহ প্রকাশ করিল না। তখন উভয়েই সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। বরবক শাহ হাবসী প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, মালিক আন্দিল পূর্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। মালিক আন্দিলও কোরান স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে, যতক্ষণ বরবক শাহ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবেন, ততক্ষণ তাঁহার কোন অনিষ্ট করিবেন না—তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিবেন না।[১]

বরবক শাহ হাবসী ও মালিক আন্দিলের মধ্যে পারস্পরিক সন্ধি

বরবক শাহ এবার নিশ্চিন্ত হইলেন। কারণ, রাজ্যের একমাত্র শক্তিমান পুরুষ মালিক আন্দিল বরবককে সুলতান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার অনিষ্ট করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সুতরাং বরবক শাহ হাবসী পুনরায় অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। আনন্দ-উল্লাসে ও বিলাসস্রোতে দরবার পূর্ণ হইয়া উঠিল। মালিক আন্দিল একদা গভীর নিশীথে কয়েকজন পদাতিক ও রক্ষীর সহায়তায় রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। উদ্দেশ্য—একটা বিহিত করিবেন। বরবক শাহ হাবসী মদ্যপানে অচেতন, সিংহাসনোপরি নিদ্রিত। মালিক আন্দিল বরবক শাহ হাবসীকে আঘাত করিতে পারিতেছেন না—কারণ তিনি কোরান স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছেন যে, যতক্ষণ বরবক শাহ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবেন ততক্ষণ আন্দিল তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিবেন না, বা কোন অনিষ্ট করিবেন না।

মালিক আন্দিলের মনে দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সম্মুখে প্রভুহন্তা শত্রু মত্ত অবস্থায় শায়িত—শত্রুবধ ও প্রতিশোধ গ্রহণের এই সুযোগ হয় তো জীবনে আর আসিবে না। অকস্মাৎ মত্ত অবস্থায় দেহ সঞ্চালনে বরবক শাহ সিংহাসনচ্যুত হইয়া ভূপতিত হইলেন। বদ্ধমুষ্টি মুক্তঅসি মালিক আন্দিলকে সম্মুখে দেখিয়াই সুলতান বরবকের সুরার মত্ততা দূর হইয়া গেল। বিনা প্রতিবাদে মৃত্যুবরণ বীরের ধর্ম নহে বিবেচনা করিয়াই যেন সুলতান বরবক মালিক আন্দিলকে আক্রমণ করিলেন। মালিক আন্দিলের পার্শ্বচর ইয়াগ্রিস খানও কয়েকজন হাবসীসহ সুলতান বরবককে আঘাত করিতে লাগিলেন। সুলতান একাধিক শত্রুর আক্রমণে ভূপতিত হইলেন। এই সময়ে অকস্মাৎ গৃহের দীপ নির্বাপিত হইল। মালিক আন্দিল সুলতান বরবককে মৃত মনে করিয়া অনুচরবর্গসহ দরবারগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। বরবক শাহও অন্ধকারের সুযোগে কক্ষান্তরে আত্মগোপন করিলেন। এই সময়ে তাওয়াচী বাশী নামক একজন কর্মচারী সেই কক্ষে আসিয়া দীপ প্রজ্জ্বলিত করিল। সুলতান বরবক তাহাকে রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণকে সংবাদ দিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু বরবক শাহের কর্মচারীও তাঁহার প্রতি বিরূপ হইল। সে সুলতান বরবকের বন্ধুবর্গকে সংবাদ না দিয়া শত্রু মালিক আন্দিলকে সংবাদ দিল যে শত্রু তখনও জীবিত। মালিক আন্দিল পুনরায় দরবারকক্ষে প্রবেশ করিয়া আহত সুলতানকে দ্বিতীয়বার আঘাত করিয়া হত্যা করিলেন।

বরবক শাহের হত্যা

১) বাঙ্গলার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা

গোলাম হোসেন বর্ণিত এই কাহিনীর উপন্যাসভাগ বাদ দিলেও সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ছয় মাস রাজত্বের পর সুলতান বরবক শাহ মালিক আন্দিল কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, অবশ্য সুলতান বরবকের রাজত্বের কোন মুদ্রা বা শিলালিপি আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই।

মালিক আন্দিলের সিংহাসন লাভ

বরবক শাহ হাবসীর হত্যার পর মালিক আন্দিল গৌড়ের প্রধান মন্ত্রী উজীর খান জাহানের সহিত প্রভুপুত্রের নিকট গমন করিলেন ; উদ্দেশ্য—প্রভুপুত্রকে সিংহাসন দান করিবেন। কিন্তু প্রভুপত্নী বুদ্ধিমতী ছিলেন। শিশুপুত্র সিংহাসনে উপবেশন করিলে ষড়যন্ত্র ও গৃহবিবাদ অবশ্যম্ভাবী—তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি উত্তর করিলেন—আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমার স্বামিহন্তার হত্যাকারীই সিংহাসনে উপবেশন করিবেন। সুতরাং এই সিংহাসন বিশ্বস্ত আমীর মালিক আন্দিলেরই প্রাপ্য। মালিক আন্দিল তখন উজীর খান জাহানের অনুরোধে এবং রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণের অনুমতিক্রমে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

সাইফউদ্দীন ফিরুজ শাহ হাবসী বনাম মালিক আন্দিল

(৮৯০/১৪৮৭—৮৯৩/১৪৯০ খ্রীঃ)

উদার ও করুণহৃদয় মালিক আন্দিল

মালিক আন্দিল 'সাইফউদ্দীন ফিরুজ' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। হাবসী বলিয়া কেহ তাঁহার সিংহাসনারোহণে প্রতিবাদ বা প্রতিবন্ধকতা করে নাই ; কারণ, তাঁহার প্রভুভক্তি সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অন্যদিকে জনসাধারণ বরবক শাহের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মালিক আন্দিলকে পরিত্রাতা বলিয়া অভিনন্দিত করিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও কোমলহৃদয় ব্যক্তি। তাঁহার সদ্‌গুণাবলীর জন্য মানুষ তাঁহার জাতি বা বংশকেও বিস্মৃত হইয়াছিল।

সাইফউদ্দীন ফিরুজ শাহ ৮৯৩/১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৮৯২/১৪৮৯-৮৯৩/১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত সাইফউদ্দীন ফিরুজ শাহের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১] অবশ্য রিয়াজ-উস-সালাতীন অনুসারে ৮৯৬/১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফতে শাহের এবং ৮৯৯/১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সাইফউদ্দীন ফিরুজের মৃত্যু হইয়াছিল।[২] ফিরুজের আরও কতকগুলি রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐসকল মুদ্রায় কোষাগার ও ফতেহাবাদ মুদ্রাশালার উল্লেখ আছে।[৩] ফতেহাবাদ মুদ্রাশালার উল্লেখে অনুমিত হয় যে, ফতেহাবাদ তাঁহার রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল।

কয়েকখানি শিলালিপি দ্বারাও তাঁহার রাজত্বের সময় নির্দেশ করা যায়। সাইফউদ্দীন ফিরুজ গৌড়ে একটি মসজিদ, একটি দীঘিকা ও একটি মিনার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। গৌড়ে যে প্রস্তর মিনারটি এখনও বিদ্যমান আছে—উহা সম্ভবতঃ সাইফউদ্দীন ফিরুজ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।[৪] মেজর উইলিয়ম ফ্রাঙ্কলিন

১) *Catalogue of Coins in Indian Museum,* Cal., Vol. II, Pt. II, P. 170. No. 159
২) *Riyas-us-Salatin,* Eng. Tr. P. 121
৩) *Catalogue of Coins in Indian Museum,* Cal. Vol. II, Pt. II, P. 171, 160, 161
৪) *Riyas-us-Salatin,* Eng. Tr. P. 125

(ভাগলপুরের রেগুলেটিং অফিসার ১৮১০-১১ খ্রীঃ) গুয়ামালতীর কুঠিতে একখানি শিলালিপি দেখিয়াছিলেন ; উহাতে ফিরুজ শাহ কর্তৃক একটি মিনার নির্মাণের কথা ছিল।[১] এই লিপিখানি বর্তমানে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ফাগুর্সন অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই মিনার সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন বলবনের পৌত্র বাঙ্গলার স্বাধীন সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুজ শাহ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার অনুমানের পক্ষে কোন যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু মেজর ফ্রাঙ্কলিন গুয়ামালতীর কুঠীতে প্রাপ্ত ফিরুজ শাহের শিলালিপির যে উদ্ধৃত পাঠ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে সাইফউদ্দীন ফিরুজ শাহের নাম উল্লিখিত আছে। ময়মনসিংহ জিলার শেরপুরেও ফিরুজ শাহের একখানি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লিপি আবিষ্কার করিয়াছেন শেরপুরের জমিদার ৺হরেন্দ্র চৌধুরী। এই লিপি অনুসারে ফিরুজ শাহ শেরপুরে একটি গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ওয়েস্টমেকট গুয়ামালতীর কুঠীতে একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন—এই শিলালিপির উক্তি অনুসারে ৮৯৪/১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে উলুঘ মুঘলিস খাঁ একটি মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।[২] ওয়েস্টমেকট পুরাতন মালদহের কাটরাতেও একটি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন —সেই শিলাপিতে উল্লিখিত আছে যে, সাইফউদ্দীন ফিরুজের রাজত্বে মালদহে ও একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। এই সকল মসজিদ ও লিপি তাঁহার রাজ্যসীমা ও রাজত্বের পরোক্ষ নিদর্শন।

শিলালিপি দৃষ্টে সাইফউদ্দীন ফিরুজের রাজত্বকাল ও রাজ্য-সীমা নির্ণয়

প্রভুপত্নীর আদেশানুসারে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রভুভক্ত হাবসী মালিক তিন বৎসর রাজত্বের পর পরলোক গমন করেন। সম্ভবতঃ হাবসী সুলতান-গণের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছিল। অবশ্য রিয়াজ-উস-সালাতীনের বর্ণনানুসারে প্রাসাদরক্ষী সেনাদলের হস্তে তিনি নিহত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় নাসীরউদ্দীন মামুদ হাবসী (৮৯৩/১৪৯০—৮৯৪/১৪৯১ খ্রীঃ)

মুদ্রা ও শিলালিপি হইতে মালিক আন্দিলের মৃত্যুর পর নাসীরউদ্দীন মামুদের নাম পাওয়া যায়। রিয়াজ-উস-সালাতীন অনুসারে নাসীরউদ্দীন মামুদ শাহ সুলতান সাইফউদ্দীন ফিরুজ—তথা মালিক আন্দিলের জ্যেষ্ঠপুত্র।[৩] নিজামউদ্দীনও তাঁহার গ্রন্থ তবকাৎ-ই-আকবরীতে নাসীরউদ্দীন মামুদকে মালিক আন্দিল বা সাইফউদ্দীন ফিরুজের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তৎকালে যে সকল হাবসী ক্রীতদাস ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল তাহারা নপুংসকই ছিল—সুতরাং নাসীরউদ্দীন মামুদকে নপুংসক মালিক আন্দিল বা সুলতান সাইফউদ্দীন ফিরুজের পুত্র বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আরিফ, কান্দাহারী এবং ফেরিস্তা বলেন,—দ্বিতীয় মামুদ জালালউদ্দীন ফতে শাহের পুত্র। অথচ তাঁহার মুদ্রায় পিতৃ পরিচয় নাই। তিনি যদি সুলতানজাদা

দ্বিতীয় নাসীরউদ্দীন মামুদের পিতৃ পরিচয় অন্ধকারাচ্ছন্ন

১) Journal of a route from Rajmahal to Gour, A.D. 1810-11, P. 2

২) *JASB*—Old Series. Vol. XLII, 1873, Pt. I, P. 300

৩) *Riyas-us-Salatin*, *Eng.* Tr., p. 126
Tabqat-i-Akbari, Tr. p. 269

হইতেন, তবে তাঁহার মুদ্রায় নিশ্চয়ই তাঁহার পিতৃপরিচয় থাকিত। জালালউদ্দীন ফতে শাহের মৃত্যুর সময়ে তাঁহার শিশুপুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। মালিক আন্দিল যদি সাড়ে তিন বৎসর রাজত্ব করিয়া থাকেন তবে মালিক আন্দিলের মৃত্যু সময়েও তিনি শিশুই ছিলেন। যে কারণে বরবক শাহ হাবসীর পরে মালিক আন্দিল সুলতান মনোনীত হইয়াছিলেন, সে কারণ তখন ও বিদ্যমান ছিল। সুতরাং দ্বিতীয় মামুদকে যেমন নপুংসক মালিক আন্দিলের পুত্র বলা যায় না, তেমনই তিনি ফতে শাহের পুত্রও হইতে পারেন না।

দ্বিতীয় নাসীরউদ্দীন মামুদের বংশপরিচয় এখনও সঠিক জানা যায় নাই। তবে অনুমান করা যায় যে, দাসগোষ্ঠী তাঁহাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হস্তেই রাখিয়াছিল ; কারণ, সিংহাসনারোহণের সময়ে নাসীরউদ্দীন মামুদ অত্যন্ত অল্পবয়স্ক ছিলেন। এই কারণে ঐতিহাসিক রাখালদাস মুদ্রা-প্রমাণ উপেক্ষা করিয়াই কান্দাহারী এবং ফেরিস্তার মতানুসারে দ্বিতীয় নাসীরউদ্দীনকে ফতে শাহের পুত্র বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।[১] আরিফ কান্দাহারীর বর্ণনানুসারে সাইফউদ্দীন ফিরুজ হাবস খান নামক একজন হাবসীকে বালক দ্বিতীয় নাসীরউদ্দীনের শিক্ষক ও অভিভাবক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই হাবস খানই দ্বিতীয় নাসীরউদ্দীন মামুদের নামে সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ফলে ষড়যন্ত্রের পুনরভিনয় আরম্ভ হইল। সিদিবদর দেওয়ানা নামক অন্য একজন হাবসী ক্রীতদাস প্রাসাদরক্ষী সেনাদলকে হস্তগত করিয়া একদিন রাত্রিতে গোপনে হাবস খান হাবসী ও দ্বিতীয় মামুদকে হত্যা করিলেন। পরদিন প্রভাতে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন—আমীর ওমরাহগণও বিনা প্রতিবাদেই তাঁহাকে সুলতান বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

সিদিবদর কর্তৃক ক্রীতদাস হাবস খান ও দ্বিতীয় মামুদ নিহত

দ্বিতীয় মামুদ শাহের স্বল্প পরিসর রাজত্বের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। তাঁহার মুদ্রা ও শিলালিপিতে ৮৯৩/১৪৯০ এবং ৮৯৪/১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ দেখা যায়। তবকাৎ-ই-আকবরীতেও আছে যে, তিনি এক বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। রিয়াজ-উস-সালাতীন অনুসারে নাসীরউদ্দীন মামুদ ছয় মাসকাল মাত্র গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[২] নাসীর উদীন মামুদের রাজত্বকালেও বিভিন্নস্থানে কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। ঐ সকল মসজিদের মাধ্য গৌড়ের মসজিদ, মুর্শিদাবাদ জেলায় টুনাখালির মসজিদ এবং বর্ধমানে কালনার মসজিদের উল্লেখ তাঁহার শিলালিপিতে পাওয়া যায়। এই সকল মসজিদ নির্মাণ হইতে অনুমিত হয় যে, ঐ সকল অঞ্চল সুলতান দ্বিতীয় মামুদের রাজ্যান্তর্গত ছিল। কালনার শিলালিপিতে দ্বিতীয় মামুদ শাহের নাম উল্লিখিত আছে এবং ৮৯৬ হিজরা তারিখ আছে।[৩] সুতরাং মনে হয় সুলতান দ্বিতীয় মামুদের রাজত্বেও গৌড়ের দক্ষিণাভিমুখে অগ্রগতি বন্ধ হয় নাই।

১) বাঙ্গলার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ২০৭ পৃঃ
২) *Riyaz-us-Salatin, Eng. Tr.*, p. 126
৩) *Annual Report of the Archaeological Sureveyor, Bengal Circle*, 1903-4. p. 4

শামসউদ্দীন মুজাফর বা সিদিবদর হাবসী দিওয়ানা

(৮৯৪/১৪৯১—৮৯৬/১৪৯৩ খ্রীঃ)

দ্বিতীয় মামুদকে হত্যা করিয়া সিদিবদর 'শামসউদ্দীন মুজাফর' উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পর বৎসরই তিনি তাঁহার নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করিলেন (৮৯৫/১৪৯২ খ্রীঃ)।[১] সিদিবদরের দুই বৎসর রাজত্বকাল বাঙ্গলাদেশে অরাজকতার চরম দৃষ্টান্ত। দেশের হিন্দু-মুসলমান কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই তাঁহার অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পান নাই। এই অবস্থার কথা স্মরণ করিয়াই গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন যে, সুলতান ফতে শাহের মৃত্যুর পর যে-কেহ রাজাকে হত্যা করিত সেই-ই দেশের সর্বত্র সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারিরূপে সম্মানিত হইত।[২] ফেরিস্তাও বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, প্রভুহত্যা না করিলে কেহ গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিতে পারিত না।

সিদিবদর ছিলেন অত্যন্ত অর্থলোভী। সুতরাং তিনি সৈন্যদের বেতন হ্রাস করিয়া দিলেন—সৈন্যগণ ক্ষুব্ধ হইল। রাজস্ব সংগ্রহ ব্যাপারে প্রজাবৃন্দ মুজাফর শাহের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

সৈয়দ হোসেন শরীফ মক্কী মুজাফর শাহের উজীর ও প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি ও কর্মকুশলতায় এতদিন কোন গোলযোগ হয় নাই। কিন্তু গৌড়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ না করিলেও অসহযোগ আরম্ভ করিলেন এবং ৮৯৭/১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা গৌড়নগর পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।[৩] উজীর সৈয়দ হোসেনও বিরক্ত হইয়া অসহযোগীদের দলে যোগদান করিলেন এবং নগর পরিত্যাগ করিলেন। উদ্দেশ্য—সুযোগ মত গৌড় আক্রমণ করিবেন। সিদি মুজাফর শাহ পাঁচ সহস্র হাবসী, তিন সহস্র আফঘান এবং বাঙ্গালী সৈন্যসহ গৌড়ের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সৈয়দ হোসেন প্রমুখ প্রধানগণ দুর্গ অবরোধ করিলেন। চারিমাস অবরুদ্ধ থাকিবার পর মুজাফর শাহ অবরোধকারিগণকে আক্রমণ করিলেন। উভয় সৈন্যদলে ভীষণ যুদ্ধ হইল। হাজী মহম্মদ কান্দাহারীর বিবরণ অনুযায়ী গোলাম হোসেন বলেন যে, উভয়পক্ষে চারিমাস ব্যাপী সংঘর্ষ হইয়াছিল এবং এক লক্ষ বিশ সহস্র সৈন্য নিহত হইয়াছিল।[৪] বিদ্রোহিগণ জয়ী হইলেন, সিদিবদর মুজাফর শাহ নিহত হইলেন। নিজামউদ্দীন আহম্মদ বলেন যে, মুজাফর শাহের অত্যাচারে গৌড়ের প্রজাবৃন্দ বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলে একদা নিশাযোগে সৈয়দ হোসেন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন।[৫] সিদিবদর প্রজাবর্গের নিকট "দিওয়ানা" (উন্মাদ) বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার আচরণও উন্মাদের ন্যায়ই ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ অত্যাচারের বিভীষিকা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশে একবিন্দু অশ্রুপাতও হয় নাই।

সিদিবদরের নিধনে বঙ্গদেশ অত্যাচারের বিভীষিকা হইতে মুক্ত হইল

---

১) *Catalogue of Coins in the Indian museum-Cal.*, Vol. II. pt. II. p. 170, No. 163
২) *Riyaz-us-Salatin, Eng.* Tr., p. 124
৩) *Ibid* p. 127
৪) *Ibid* p. 128
৫) *Tabkat-i-Akbari, Persian Origin*, p. 526

মুজাফর শাহের রাজত্বকালের কতিপয় মসজিদগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি এবং তাঁহার মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। রিয়াজ-উস-সালাতীন অনুসারে শামসউদ্দীন মুজফর শাহ তিন বৎসর পাঁচ মাস রাজত্ব করেন। তিনি গৌড়ে একটি মসজিস নির্মাণ করিয়াছিলেন।[১] গৌড়ের নিকটবর্তী গঙ্গারামপুরে আবিষ্কৃত একটি শিলালিপি হইতে জানা যায়, ৮৯৬/১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে মৌলানা আতা বা কুতুব আউলিয়া মখদুম কর্তৃক একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল।[২] পাণ্ডুয়ায় ছোট দরগাগৃহে সৈয়দ নূর কুতুব-উল আলমের সমাধিগৃহও মুজাফর শাহ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল (৮৯৮/১৪৯৩ খ্রীঃ)।[৩] পাণ্ডুয়ায় মৌলানা আতাও এক মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন।[৪] মালদহে ও মুজাফর শাহের রাজত্বকালে একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল।[৫] শামসউদ্দীন মুজাফর শাহের মুদ্রায় বারবোকাবাদ কোষাগার ও টাঁকশালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বারবোকাবাদ মুঘল সাম্রাজ্যের একটি পরগনা এবং বর্তমান মালদহ, রাজসাহী, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার অনেকগুলি পরগনা লইয়া গঠিত ছিল। এই মসজিদ ও মুদ্রা তাঁহার রাজত্ব ও রাজ্যসীমার পরিচয় বহন করে।

বঙ্গদেশে হাবসী রাজত্বের প্রকৃতি ও প্রভাব

হাবসী শাসনকালের ছয় বৎসর বঙ্গদেশে বিভীষিকার রাজত্ব

বঙ্গদেশে হাবসী রাজত্বের স্থায়িত্ব ছয় বৎসর (১৪৮৭—১৪৯৩ খ্রীঃ); সুলতান-সংখ্যা চারিজন। তাঁহাদের মধ্যে বরবক শাহ তাঁহার প্রভু জালালউদ্দীন ফতে শাহকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। বরবক শাহকে হত্যা করিয়াছিলেন মালিক আন্দিল। মালিক আন্দিল ছিলেন প্রভুভক্ত, দানশীল এবং সুদক্ষ যোদ্ধা; কিন্তু তথাপি (মতান্তরে) তিনিও সৈন্যদল কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। তৃতীয় সুলতান দ্বিতীয় নাসীরউদ্দীন মামুদ ছিলেন শিশু—তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া হাবস খান হাবসীই রাজ্য পরিচালনা করেন। নাসীরউদ্দীন মামুদ এবং হাবস খানকে হত্যা করিয়া সিদিবদর হাবসী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিন বৎসরের মধ্যেই সিদিবদরও নিহত হইলেন তাঁহার দাস সৈয়দ হোসেনের হস্তে। সুতরাং দেখা যায় যে, হাবসী রাজত্বের ছয়টি বৎসর গৌড়ের সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে মৃত্যুর বিভীষিকা বিরাজমান ছিল। প্রত্যেক সুলতানই নিহত হইয়াছিলেন এবং মালিক আন্দিল ব্যতীত সকলেই হত্যা-বিলাসী ছিলেন। তাঁহারা রাজ্যের কল্যাণ ও সুশাসন অপেক্ষা প্রজার হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার দ্বারা রাজ্য শাসনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এই দুর্দৈবের প্রধান কারণ—এই হাবসী সুলতানগণ ছিলেন আফ্রিকার আবিসিনিয়া অঞ্চলবাসী। সুতরাং ভারতবর্ষ বা বঙ্গের প্রতি তাঁহাদের কোন মমত্ব-বোধ ছিল না। হাবসীগণ ধর্মে মুসলমান হইলেও বাঙ্গালী, ভারতীয় কিংবা

---

১) *Riyas-us-Sa'atin*, Eng., Tr. p. 128

২) *JASB-Old Series*, Vol. XLII, 1873, Pt. I, p. 290

৩) *Ibid*, Pp. 290-291

৪) *JASB-Old Series*, Vol. XLI, 1872, Pt. I, p. 107

৫) *Proceedings of the Acadamic society of Bengal*-1890, Pt. II, p. 242

এশিয়াবাসী মুসলমানদের সঙ্গে হাবসীদের কোন রক্তসম্বন্ধ বা সাংস্কৃতিক ঐক্য ছিল না। ধর্মের বন্ধনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক বন্ধন ইসলামে বহুকাল পূর্বেই শ্লথ হইয়া গিয়াছিল। হাবসীদের মধ্যে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধও জাগ্রত হয় নাই।

হাবসী সুলতানদের কোন পিতৃবংশ বা পিতৃ-পরিচয়ের গৌরব ছিল না। সুতরাং ব্যক্তিগত গুণাবলী ব্যতীত মানুষ হিসাবে জনসাধারণের শ্রদ্ধা তাঁহারা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ছিলেন ক্রীতদাস—তাঁহাদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল তদনুরূপ।

হাবসীদের অনেকেই ছিলেন নপুংসক। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি বা আত্মীয়গোষ্ঠী ছিল না। সুতরাং ভবিষ্যতের কোন চিন্তা বা পরিকল্পনাও তাঁহাদের ছিল না। ভোগ ও সম্ভোগ ভিন্ন তাঁহাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আদর্শবিহীন জীবনের সহজ পরিণামই তাহাদের জীবনে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।

হাবসী শাসকগণের জীবনের কোন মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না, ভোগ ও সম্ভোগই ছিল একমাত্র লক্ষ্য

হাবসী শাসনের কয়েকটি বৎসর বঙ্গদেশ যেন চরম দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিল। স্বার্থান্বেষণ, ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ, হত্যা, নাতিদীর্ঘ রাজত্ব বাঙ্গলাদেশকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। দিল্লী সাম্রাজ্যের সহিত বঙ্গের সম্বন্ধ বহুকাল ছিন্ন; তৈমুরের আক্রমণের (১৩৯৯ খ্রীঃ) এক শতাব্দীর মধ্যেও তৈমুরের আক্রমণের আঘাতের রক্তক্ষরণ শেষ হয় নাই। দিল্লী সাম্রাজ্য প্রতিবেশী জৌনপুরের সহিত সংগ্রামেই বিব্রত ছিল—সুদূর বঙ্গের প্রতি মনোযোগের বা হস্তক্ষেপের অবকাশ তাঁহাদের ছিল না। যদি দিল্লীর সহিত বঙ্গের সম্বন্ধ ছিন্ন না হইত, তবে হয়তো বাঙ্গলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দিল্লীর সম্রাট হস্তক্ষেপ করিতেন। গৌড়ের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সুযোগে বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান ভৌমিকগণ রাজধানী হইতে দূরবর্তী অঞ্চলে তাঁহাদের অধিকার দৃঢ় করিয়া লইয়াছিলেন। এই রাজনৈতিক বিবর্তনে দিল্লীর প্রভাবের বাহিরে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান একযোগে কার্য করিতে অভ্যস্ত হইল। বাঙ্গলার ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের প্রভাব দুই সম্প্রদায়ের অগোচরেই অনুভূত হইতে লাগিল।

দশম অধ্যায়

হুসেনশাহী বংশের অধীনে বঙ্গদেশ

(নসরৎ শাহ পর্যন্ত)

(৮৯৬/১৪৯৩—৯৩৫/১৫৩২ খ্রীঃ)

হুসেন শাহী শাসনে বাঙ্গলায় শান্তি ও

সূচনা : এই বংশের সুলতান চারিজন—আলাউদ্দীন হুসেন শাহ, নসরৎ শাহ হুসেনী, আলাউদ্দীন হুসেনী এবং ঘিয়াসউদ্দীন মামুদ হুসেনী। ইঁহাদের শাসনকালের দৈর্ঘ্য পঁয়তাল্লিশ বৎসর (৮৯৯/১৪৯৩-৯৪৫/১৫৩৮ খ্রীঃ)—গড়ে সাড়ে এগার বৎসর। ইঁহারা ছিলেন জাতিতে আরব, ধর্মে মুসলমান, সংস্কৃতিতে বাঙালী। এই হুসেনশাহী বংশের সমকালে বাঙ্গলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও প্রসার হইয়াছিল। বাংলাভাষা বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করিয়া জনসাধারণের নিকট ধর্মের নূতন আবেদন সঞ্চারিত করিয়াছিল। এই যুগের বঙ্গের নবজাগরণ ইউরোপীয় রেঁনেসার সঙ্গে ন্যূনাধিক তুলনীয়। হুসেনশাহী সুলতানগণ ছিলেন যুদ্ধে কুশল এবং শাসনে সাধারণতঃ প্রজার কল্যাণকামী। হুসেনশাহী সুলতানগণের সুশাসনে দেশে—শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই বাঙ্গালী প্রতিভার বহুমুখী বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছিল। রাজ্যজয়ের দিক দিয়াও হুসেনশাহী বংশ কৃতিত্ব ও গৌরবে সমুজ্জ্বল। এই সময়ে বঙ্গের রাজ্যসীমা পূর্বে হাজো, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমে ও বিহার শরিফ স্পর্শ করিয়াছিল।

আলাউদ্দীন হুসেন শাহ

(৮৯৯/১৪৯৩—৯২৫/১৫১৯ খ্রীঃ)

আলাউদ্দীন হুসেন শাহের সিংহাসনারোহণ

হাবসী সুলতান মুজাফর শাহের হত্যার সঙ্গে বাঙ্গলার ইতিহাসের একটি দুর্যোগময় অধ্যায়ের অবসান হইল। হাবসী রাজত্বের বিশৃঙ্খলায় বঙ্গের সর্বপ্রকার অগ্রগতির স্রোত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র, হত্যা এবং প্রজাসাধারণের উপর নির্মম অত্যাচার—এই যেন ছিল হাবসী রাজত্বের ধারা; সুতরাং রাষ্ট্রের এই শোচনীয় অবস্থায় প্রয়োজন ছিল একজন যোগ্য বিচক্ষণ কর্ণধারের আবির্ভাব—যিনি কঠোরহস্তে সকল বিশৃঙ্খলার অবসান করিবেন; দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং লোকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবেন। বঙ্গের ভাগ্যক্রমে আরবদেশীয় আলাউদ্দীন হুসেন শরীফ মক্কী হইলেন এই দুর্গত বিপর্যস্ত বঙ্গের ত্রাণকর্তা। হাবসী শাসনের বিশৃঙ্খলায় বিক্ষুব্ধ হইয়াই তিনি বিরোধিদলে যোগদান করিলেন এবং মুজাফর শাহকে পরাজিত করিয়া বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (৮৯৯/১৪৯৩ খ্রীঃ)। বঙ্গে হাবসী শাসনের বিভীষিকা বিদূরিত হইল।

আলাউদ্দীন হুসেন শাহের বংশ-পরিচয়

হুসেন শাহের-বংশ পরিচয় সম্বন্ধে নানাপ্রকার ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক কিংবদন্তীর উল্লেখ আছে। হুসেন শাহের উল্লেখ পাওয়া যায় পর্তুগীজ জো-আও-দ্য ব্যারসের (Joao-de-Barros) দা এশিয়া (Da Asia) নামক গ্রন্থে, ফেরিস্তার

তারিখ-ই-হিন্দুস্তানে, গুরুদাস সরকার সংগৃহীত কিংবদন্তীতে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে।

জো-আও-দ ব্যারসের বিবরণ

পর্তুগীজ জো-আও দা ব্যারসের বিবরণে উল্লিখিত আছে যে, পর্তুগীজগণ বঙ্গদেশে (চট্টগ্রামে) আসিবার একশত বৎসর পূর্বে আদন নিবাসী একজন আরব দুইশত অনুচরসহ চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। প্রথমে তিনি বাণিজ্য আরম্ভ করেন। ক্রমে আরও তিনশত আরব তাঁহার সহিত যোগদান করিল। এই আরবগণ পরবর্তী কালে বঙ্গের সুলতানকে উড়িষ্যা বিজয়ে সাহায্য করিয়াছিল। বঙ্গের সুলতান পুরস্কার স্বরূপ আরব সেনাপতিকে প্রাসাদরক্ষক নিযুক্ত করেন। প্রত্যুপকারে আরব সেনাপতি প্রভুকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন।[১] শামসউদ্দীন মুজাফর শাহ নিহত হইলে গৌড়ীয় প্রধানগণ সৈয়দ হুসেনকে সুলতানরূপে নির্বাচিত করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্লকম্যান অনুমান করেন যে, জো-আও-দ্য-ব্যারসের গ্রন্থে উল্লিখিত এই আরব সেনাপতি হুসেন শাহ বা হুসেন শরীফ মক্কী[২] এবং বাঙ্গলার সুলতান শামসউদ্দীন মুজাফর শাহ (সিদি বদর)।

উল্লিখিত পর্তুগীজ-বিবরণ গ্রহণের পক্ষে একটু অসুবিধা রহিয়াছে। জো-আও দ্য ব্যারসের বিবরণের তারিখ আনুমানিক ১৫৪০ খ্রীঃ।[৩] তাহার একশত বৎসর পূর্বে বঙ্গের কোন সুলতান উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু সিদি বদর বা মুজাফর শাহ উড়িষ্যা জয় করেন নাই এবং হুসেন শাহ প্রাসাদরক্ষীও ছিলেন না।

রিয়াজ-উস-সালাতীনে হুসেন শাহের পরিচয় ও বাল্যজীবন

ফেরিস্তার বিবরণ অনুসরণ করিয়া রিয়াজ-উস-সালাতীন রচয়িতা গোলাম হুসেন লিখিয়াছেন যে, হুসেন শাহের পিতা সৈয়দ আশরফ উল হুসেনী মক্কার শরীফ ছিলেন এবং পরবর্তী কালে তুর্কীস্থানে তরমিজে বাসস্থান পরিবর্তন করিয়াছিলেন।[৪] একটি অজ্ঞাতনামা গ্রন্থের বিবরণের ভিত্তিতে গোলাম হুসেন বলেন যে, পিতা আশরফ উল হুসেন তাঁহার দুই পুত্র ইউসুফ ও হুসেনকে সঙ্গে লইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং রাঢ়ের অন্তর্গত চাঁদপাড়া নামক স্থানে এক কাজীর আশ্রয়ে বাস করেন।[৫] এই চাঁদপাড়া মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত একটি গ্রাম বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। কারণ এখানে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে এবং উহার চতুষ্পার্শে হুসেন শাহের সমকালীন বহু শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আশরফ উল হুসেনের আশ্রয়দাতা কাজী তাঁহার অতিথির বংশগৌরবের কথা জানিয়া এবং তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র হুসেনের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া হুসেনের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন। ইহার পরে হুসেন গৌড়ে মুজাফর শাহের কর্মগ্রহণ করেন।

---

১) *JASB—Old Series*, Vol. XLII, 1873, P. 287

২) *Ibid.*

৩) De Borros' *Accounts of the City of Gour* prior to 1540 "*Da Asia*"—Lisbon Edition of 1778, Vol. VIII, p. 458

৪) *Ferishta*, Vol. II, p. 585

৫) *Riyas-us-Salatin*, Eng. Tr. Pp. 181-82

বুকানন হ্যামিল্টনের মতে হুসেনের পরিচয়

বুকানন হ্যামিল্টন বলেন যে, হুসেনের জন্মস্থান রংপুর জেলার অন্তর্গত দেবনগর গ্রামে। পাণ্ডুয়াতে প্রাপ্ত হস্তলিখিত একটি বিবরণ হইতে তিনি বলিয়াছেন যে, হুসেন ছিলেন গৌড়ের সুলতান ইব্রাহিমের পৌত্র। সুলতান ইব্রাহিম ধর্মান্তরিত হিন্দু জালালউদ্দীন কর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন। এই রাজ্যচ্যুত বিতাড়িত রাজপরিবার কামতাপুর রাজ্যে (রংপুর) আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং ১৬ বৎসর পরে হুসেন তাঁহার পিতৃ-সিংহাসন পুনরধিকার করেন।[১]

মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কিংবদন্তীতে হুসেন

গুরুদাস সরকার সংগৃহীত মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় যে, হুসেন বাল্যকালে চাঁদপাড়া নিবাসী এক ব্রাহ্মণের গৃহে রাখালের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। বালকের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের সম্ভাবনা দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাকে গৌড়ে প্রেরণ করেন। রাজ্যলাভ করিয়া হুসেন কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ চাঁদপাড়া গ্রাম পুরাতন প্রভুকে দান করিলেন—রাজস্ব স্থির হইল বাৎসরিক এক আনা। কারণ মুসলমানের ধর্মরাজ্যে বিধর্মীকে নিস্কর জমি দান করা ধর্মবিরুদ্ধ। তদবধি এই গ্রাম এক-টাকিয়া ভাতুরিয়ার ন্যায় এক-আনী চাঁদপাড়া নামে খ্যাত। এই অঞ্চলের লোকেদের বিশ্বাস যে, হুসেন হিন্দুমাতার সন্তান—বাল্যে পিতৃহীন হইয়া অনাথিনী বিধবার সন্তান গ্রামস্থ ব্রাহ্মণের গৃহে রাখালী কার্যে ব্রতী হয়। এই অঞ্চলের বহু শিল্পনিদর্শন হুসেন শাহের স্মৃতি বহন করিয়া বিদ্যমান; সুতরাং অনুমিত হয় যে, এই স্থান হুসেন শাহের জীবনের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল।[২]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত ও হুসেনের পরিচয়

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে যে, হুসেন প্রথম জীবনে সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকুরী করিতেন। সুবুদ্ধি রায় গৌড়ের দরবারে রাজস্ববিভাগে উচ্চপদের অধিকারী ছিলেন। সুবুদ্ধি রায়ের একটি দীর্ঘিকা খননকালে হুসেন একটি অন্যায় কার্য করিলে সুবুদ্ধি রায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বেত্রাঘাত করেন। হুসেন শাহ এই ঘটনা বিস্মৃত হইলেও তাঁহার স্ত্রী ইহা বিস্মৃত হন নাই। কথিত আছে যে, হুসেন শাহ রাজ্যলাভের পর স্ত্রীর প্ররোচনায় সুবুদ্ধি রায়কে কৌশলে অখাদ্য ভক্ষণ করাইয়া (করোয়ার জল পান করাইয়া) জাতি নষ্ট করেন। পরে বুদ্ধিমান সুবুদ্ধি রায় বুদ্ধিবলে হুসেন শাহের প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া জাতি-চ্যুতির অপমান হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই ঘটনাই কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তিতে বিবৃত হইয়াছে :—

পূর্বে যবে সুবুদ্ধিরায় ছিলা গৌড় অধিকারী
সৈয়দ হোসেন খাঁ করে তাঁহার চাকরী ॥
দীঘি খোদাইতে তাঁরে মনসীব কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল ॥
পাছে যবে হুসেন শা গৌড়ে রাজা হৈলা।
সুবুদ্ধি রায়েরে তেঁহ বহু বাড়াইলা ॥

১) Martin's *Eastern India*, Vol. III, p. 448

২) *JASB—1917* Pp. 149-151

তার স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধি রায়েরে মারিতে কহে রাজা স্থানে ॥
রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাঁহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা ॥
স্ত্রী কহে জাতি লহ প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে জাতি লৈলে ইহোঁ নহি জীবে ॥
স্ত্রী মরিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার পানি তার মুখে দেয়াইলা ॥
তবে তো সুবুদ্ধি রায় সেই ছিদ্র পাঞা।
বারাণসী আইল সব বিষয় ছাড়িয়া ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য খণ্ড ২৫শ পরিচ্ছেদ)

হুসেন শাহ যে আরব ছিলেন এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কারণ, হুসেন শাহ যদি বাঙ্গালা দেশে আগমন করিয়া থাকেন, যদি চট্টগ্রামে বাণিজ্য করিয়া থাকেন, যদি প্রথমে দুইশত এবং পরে তিনশত আরব তাঁহার সহিত যোগদান করিয়া থাকে—এই সমস্ত ব্যাপারই সময় সাপেক্ষ এবং একদিনে সম্ভব হয় নাই। পরবর্তিকালে হুসেন গৌড়ের সুলতানের সহিত যোগদান করিয়া উড়িষ্যা বিজয়ে সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত সুলতানকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। সমস্ত ঘটনা বা কাহিনী বেশ নাটকীয় এবং সুদীর্ঘদিনের সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত কার্যক্রম ব্যতীত ইহা সংঘটিত হইতে পারে না। রাজ্যলাভ করিয়াও হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন—সুতরাং এক জীবনে একজন আরবের পক্ষে এত কার্য এবং সুদূর বঙ্গদেশে ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ব যেন অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

হুসেনশাহের পরিচয় সম্বন্ধীয় কাহিনীর সমালোচনা

তারপর হুসেন শাহ যদি আরব জাতীয় বহিরাগত মুসলমান হন, তবে তাঁহার পক্ষে বাংলা ভাষার প্রতি এত অনুরক্তি একটু অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার বাংলা ভাষা-প্রীতি তাঁহার আশৈশব বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার সহিত পরিচয় সূচনা করে।

হুসেন শাহের জীবনের ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী পর্যালোচনা করিলে অনুমান করা যায় যে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তীর মধ্যে ন্যূনাধিক সত্য বিজড়িত আছে। হুসেন শাহ চাঁদপাড়ায় বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। প্রথম জীবনে তিনি সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পরিচিতদের মধ্যে অন্যতম সুবুদ্ধি রায়। সম্ভবতঃ সুবুদ্ধিরায়ের বুদ্ধিবলে তিনি রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী পদে বরণ করিয়াছিলেন। কারণ, সুবুদ্ধি রায় রাঢ় নিবাসী এবং চাঁদপাড়ার জমিদারগণ এখনও সুবুদ্ধি রায়ের বংশধর বলিয়া দাবি করেন। সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দক্ষিণ রাঢ়ীয় বসু বংশীয় কায়স্থ পুরন্দর খান তাঁহার উজীর

হুসেনশাহের হিন্দু-

ছিলেন।[১] দবীর-ই-খাস (Private Secretary) ছিলেন সনাতন এবং রূপ ছিলেন সাকর মল্লিক (Minister)। তাঁহাদের ভ্রাতা অনুপ তাঁহার মুদ্রাশালার অধ্যক্ষ ছিলেন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের উক্তি অনুসারে কেহ কেহ মনে করেন—হুসেন শাহের হিন্দুপ্রীতি রাজনৈতিক কৌশল মাত্র, প্রয়োজনের অনুরোধ।

বুকানন হ্যামিল্টনের উক্তির মধ্যেও সত্য থাকা সম্ভবপর। কারণ, ৭৬ বৎসর পূর্বে (৮৯৯/১৪৯৩ খ্রীঃ-৮২৩/১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দ = ৭৬ বৎসর) সমসাময়িক কালেই রাজা গণেশের ধর্মান্তরিত পুত্র জালালউদ্দীন গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইলিয়াসশাহী বংশের সন্তান বলিয়াই বাঙ্গলা দেশের সঙ্গে পরিচয় ও বঙ্গভাষা-প্রীতিও তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। বঙ্গদেশবাসী বলিয়াই সম্ভবতঃ সুবুদ্ধি রায়ের সঙ্গে প্রথম জীবনে কর্মসূত্রে পরিচয় এবং পরবর্তী জীবনে তাঁহার সহযোগে রাজকার্য পরিচালনা করা স্বাভাবিক। বিদেশাগত একজন আরববাসীর পক্ষে বঙ্গের দেশীয় অভিজাত বংশের সঙ্গে পরিচয়, সহযোগে রাজকার্য সম্পাদন এবং বাংলাভাষার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি আপাতঃ দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। ইলিয়াসশাহী বংশ রাজ্যচ্যুত হইয়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন আহ্মদ শাহ গণেশীর মৃত্যুর পর জনসাধারণের স্বীকৃতি ও রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার ইলিয়াসশাহী বংশের লোকসমর্থন অসম্ভব নহে—কারণ, ইলিয়াসশাহী বংশ ছিল বঙ্গে অত্যন্ত জনপ্রিয়। রিয়াজ বর্ণিত 'উচ্চবংশ জাত হুসেন' এবং ৮৯৯/১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রায় উল্লিখিত 'উচ্চবংশ' দ্বারা ইলিয়াসশাহী বংশ সূচনা করা অসম্ভব নহে।

হুসেন শাহের ইলিয়াসশাহী বংশের সন্তান হওয়াই স্বাভাবিক

সৈয়দ হুসেন 'আলাউদ্দীন হুসেন শাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (৮৯৯/১৪৯৩ খ্রীঃ); সেই বৎসরই তিনি স্বীয় নামে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেন।[২] পর বৎসর ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মন্দারণ শিলালিপিতে তিনি নিজেকে খলিফাতুল্লাহ বলিয়া উল্লেখ করেন। এইরূপ উপাধি গ্রহণ হইতে মনে হয় তাঁহার কার্যাবলী ও শাসনের অন্তরালে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল।

আলাউদ্দীন হুসেন শাহের রাজত্বের ঘটনাবলী

আলাউদ্দীন হুসেন শাহের ছাব্বিশ বৎসর রাজত্বকাল ঘটনাবহুল ও কর্মময় ছিল। তাঁহার কার্যাবলী তাঁহার যোগ্যতারই পরিচায়ক। তাঁহার রাজত্বের ঘটনাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :

(১) হাবসী অত্যাচার নিরোধ।

(২) একডালায় রাজধানী পরিবর্তন।

(৩) দিল্লীর সুলতানের সহিত সন্ধি।

(৪) রাজ্যবিস্তার—(ক) উত্তর বিহার বিজয় (খ) আসাম অভিযান

১) গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা

২) *Catalogue of coins in Indian Museum-Cal*, Vol. II, Pt. II, p. 172

(গ) উড়িষ্যার যুদ্ধ (ঘ) ত্রিপুরা আক্রমণ (ঙ) আরাকানরাজের সহিত যুদ্ধ।

হাবসী অত্যাচার নিরোধ

বিগত হাবসী রাজত্বে হুসেন শাহ বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। হাবসী গোষ্ঠী দেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা হুসেন শাহের অজ্ঞাত ছিল না। হাবসী গোষ্ঠী সিংহাসনলাভের ব্যাপারে তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। তাহাদের ধারণা ছিল যে, নূতন সুলতান তাহাদের অত্যাচার-অনাচারের প্রতিবাদ করিবেন না। সুতরাং সুলতান হুসেনের রাজ্যলাভের পরেই হাবসীগণ রাজধানী লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। কথিত আছে যে, গৌড় নগরীর সেনানায়ক, অমাত্য ও নাগরিকগণের সঞ্চিত অর্থ তাহাদিগকে প্রদান করা হইবে এই শর্তেই নাকি হাবসীগণ হুসেন শাহকে সাহায্য করিয়াছিল। সুলতান হুসেন শাহ হাবসীগণকে এই লুণ্ঠনকার্য বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু হাবসীগণ তাঁহার আদেশ অমান্য করিল। সুলতান বুঝিতে পারিলেন যে কেবলমাত্র আদেশ প্রচার করিয়া হাবসীদিগকে নিরস্ত করা যাইবে না। সুতরাং সুলতান হুসেন শাহ হাবসীদিগকে হত্যার আদেশ দিলেন। দ্বাদশ সহস্র হাবসী নিহত হইল। একশত নব্বই বৎসর পূর্বে আলাউদ্দীন খালজীও নৃশংসভাবে নও মুসলিম হত্যা করিয়া রাজ্য নিরাপদ করিয়াছিলেন।

প্রাসাদরক্ষীদের নির্বাসন

তারপর আসিল প্রাসাদরক্ষীদের সমস্যা। তাহারাই ছিল বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ (বিশেষতঃ ফতে শাহের হত্যার পর হইতে) রাজপ্রাসাদের সকল ষড়যন্ত্রের জন্য মূলতঃ দায়ী। সুতরাং হুসেন শাহ নির্বিচারে সমস্ত প্রাসাদরক্ষীদের নির্বাসিত করিলেন এবং তাহাদের স্থলে সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলিমগণকে নিযুক্ত করিলেন।[১]

রাজধানী পরিবর্তন

কিন্তু কর্মচারী পরিবর্তন দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। কারণ, রাজধানীর চতুষ্পার্শ্বে এই সকল দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছিল এবং হত্যা ও ষড়যন্ত্রের বিষবাষ্প রাজধানীর আকাশ-বাতাসকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং তিনি রাজধানী হইতে দূরবর্তী স্থানে রাজ্যের কর্মকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়াস পাইলেন। দিনাজপুর জেলার (বর্তমান পাণ্ডুয়া হইতে তেইশ মাইল উত্তর-পূর্বে) একডালায় তিনি নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। তিনি একডালার আঠার মাইল উত্তরে ছোটপুরা নামক স্থানে নূতন রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। মুঘল বিজয়ের পূর্বে বারংবার রাজধানী পরিবর্তনের কারণ সম্ভবতঃ গৌড়ের নিকটবর্তী নদীস্রোতের গতি পরিবর্তন। গৌড়নগরীর পূর্বপার্শ্বেই ছিল ছুটিয়াপুটিয়া নামক জলাভূমি। জলপ্লাবনে প্রতি বৎসরই গৌড় নগরীর বিপুল ক্ষতি সাধিত হইত। নগর রক্ষার্থে ছুটিয়াপুটিয়ার এই পার্শ্বে বাঁধ বাঁধিবার বহু চেষ্টা করা হইয়াছিল—অবশেষে বরবক শাহের রাজত্বকালে পীর ইসমাইল গাজী ছুটিয়াপুটিয়ার উপরে সেতু নির্মাণ করিয়া

---

১) *Riyaz us-Salatin*, Eng. Tr., Pp. 131-32

২) *Martin's Eastern India*, Vol. III, p. 684

খ্যাতি অর্জন করেন।[১] হুসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই পুরাতন অস্বাস্থ্যকর রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন।

রাজ্যে শৃঙ্খলা বিধান

রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য হুসেন শাহের অবলম্বিত ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ জানা যায় না। তবে তিনি প্রতি জেলায় অভিজ্ঞ রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে রাজ্যের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। রাজ্যের কল্যাণই ছিল হুসেন শাহের লক্ষ্য—সুতরাং উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগে তিনি ধর্মকে খুব উচ্চে স্থান দেন নাই। বর্ধমান নিবাসী পুরন্দর বসু, যশোহর নিবাসী রূপ ও সনাতন, তাঁহাদের ভ্রাতা অনুপ এবং সনাতনের শ্যালক উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[২] হিন্দুদিগকে মুসলমানী নাম ও উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল—পুরন্দর বসু ছিলেন পুরন্দর খান। সনাতন হইলেন দবীর-ই-খাস (private secretary) বা ব্যক্তিগত কার্যকরণ। রূপ হইলেন রাজস্ব সচিব (সাকর মল্লিক) এবং অনুপ হইলেন মুদ্রাশালার অধ্যক্ষ (মুদীর-ই-জবব)।

দিল্লীর সহিত সংঘর্ষ ও সন্ধি

রাজ্যে শৃঙ্খলা বিধান করিতে-না-করিতেই হুসেন শাহকে অপ্রত্যাশিত সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। বহুকাল হইতেই বঙ্গ ও দিল্লীর সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছিল। দিল্লী ও বঙ্গরাজ্যের মধ্যে অবস্থিত জৌনপুর রাজ্য যেন দিল্লীর বঙ্গ অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-প্রাচীরস্বরূপ ছিল। দিল্লীর লোদী সুলতান সেকেন্দর জৌনপুরের শার্কী সুলতান হোসেনকে যুদ্ধে পরাজিত করিলে হোসেন সাহ শার্কী বিহার সীমান্তে পলায়ন করিলেন। সেকেন্দর লোদী তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বিহারে উপস্থিত হইলে হোসেন শার্কী ভাগলপুরের অন্তর্গত কহলগাঁয়ে পলায়ন করিলেন এবং বঙ্গের সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন।

জৌনপুর রাজ্য দিল্লীর বিরুদ্ধে বঙ্গের রক্ষা-প্রাচীর

হোসেন শাহ শার্কীর পরাজয়ে দিল্লীর লোদী বংশের রাজ্যসীমা বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হইল—অর্থাৎ বঙ্গের সীমান্ত স্পর্শ করিল। বঙ্গের কোন সুলতানই বোধ হয় এই সীমানা বিস্তারে সন্তুষ্ট ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেন না—হুসেন শাহও দিল্লীর এই রাজ্যবিস্তারকে স্বচ্ছন্দমনে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। দিল্লী ও বঙ্গের মধ্যবর্তী রাজ্য বিধ্বস্ত হওয়ায় দিল্লী ও বাঙ্গলার সমস্যাগুলি প্রকট হইয়া উঠিল। রাজনৈতিক দিক দিয়া এবং রাজ্যের নিরাপত্তা বিবেচনা করিয়া বাঙ্গলার পক্ষে স্বাধীন, শক্তিশালী ও দিল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বী জৌনপুর রাজ্যের অস্তিত্ব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। সুতরাং হুসেন শাহ জৌনপুরের বিতাড়িত সুলতানকে আশ্রয় দান ও তাঁহার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিলেন। হুসেন শাহের উদ্দেশ্য ছিল জৌনপুর হইবে দিল্লী ও বঙ্গদেশের মধ্যে ব্যবধান-প্রাচীর (Buffer State)।

সেকেন্দর লোদী ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইলেন এবং বঙ্গদেশ আক্রমণের সিদ্ধান্ত করিলেন। সেকেন্দরের সৈন্য বাঙ্গলার সীমান্তে বারহ্ (বর্তমান পাটনা

---

১) *JASB. 1874, Pp. 222-23*

২) *গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১০৪-১১ পৃষ্ঠা*

জেলার পূর্বাঞ্চল) নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করেন। সুলতান হুসেন শাহ তাঁহার পুত্র দানিয়েলের অধীনে এক বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। (৯০১/১৪৯৫ খ্রীঃ) সুলতান সেকেন্দর লোদীর সেনাপতি মুহম্মদ লোদী ও মুবারক খান লোহানীর বিরাট বাহিনী বাঙ্গালী সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতিতে আতঙ্কিত বোধ করিল। তাঁহাদের বহুদূরাগত পথশ্রান্ত রণক্লান্ত সৈন্যদ্বারা হুসেন শাহের সেনা-বাহিনীকে পরাজিত করিতে পারিবেন কিনা তাহাতে সন্দেহের অবকাশ ছিল। একমাত্র ঘিয়াসউদ্দীন বলবন ব্যতীত দিল্লীর কোন সুলতান বাঙ্গলার সৈন্যকে সম্মুখ যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত করিতে পারেন নাই। সুতরাং বুদ্ধিমান সেকেন্দর লোদীর পরামর্শে সন্ধির প্রস্তাব করা হইল।[১] অচিরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। পিতার পক্ষে দানিয়েল প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, দিল্লীর সম্রাট সেকেন্দর লোদীর শত্রুকে বাঙ্গলা দেশে আশ্রয় প্রদান করা হইবে না। বাঙ্গলা এবং দিল্লীর সীমান্তরেখা নির্ধারিত হইল। মুঙ্গের ও বিহার শরিফে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে অনুমিত হয় যে, এই সময়ে বাঙ্গলার সীমান্ত দক্ষিণ-বিহারে পাটনার প্রান্তদেশ স্পর্শ করিয়াছিল। সারণে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইহার অনতিকালমধ্যেই হুসেন শাহের রাজ্যসীমা গণ্ডকের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই রাজ্যবিস্তৃতি সেকেন্দর লোদীর সহিত সন্ধির ফলে হইয়াছিল কিংবা স্বতন্ত্র সামরিক অভিযানের ফলে হইয়াছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। সেকেন্দর লোদী আজম হুমায়ুনকে তুঘলকপুরের এবং দরিয়া খানকে বিহারের ইক্‌তাদার বা শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।[২] সেকেন্দর লোদীর সেনাবাহিনী বঙ্গদেশ আক্রমণ না করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিল—হুসেন শার্কীও ভাগলপুরের অদূরে কহলগাঁয়েই তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করিলেন—সন্ধির শর্তে হুসেন শার্কীর কহলগাঁয়ে বসতিতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয় নাই।

সেকেন্দর লোদীর সহিত হুসেন-পুত্র দানিয়েলের সন্ধি

কামরূপ বিজয় ও আসাম অভিযান

সেকেন্দর লোদীর সহিত সন্ধি স্থাপিত হইলে হুসেন শাহ তাঁহার রাজ্যের পশ্চিম-সীমান্ত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। এইবার হুসেন শাহ তাঁহার রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। অহমিয়া ভাষায় লিখিত বুরঞ্জী অনুসারে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের কামতাপুর বিজিত হইয়াছিল এবং ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমানগণ বহুবার আহোম রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল।[৩] শিহাবউদ্দীন তালিশ রচিত তারিখ-ই-ফতে-ই-আসাম, বুরঞ্জী, শিলালিপি, মুদ্রা, কিংবদন্তী ও পরবর্তী ইতিহাসকারগণের রচনার মধ্যে মুসলিম কর্তৃক আসাম অভিযানের কাহিনীর উল্লেখ আছে।

উত্তরবঙ্গ হইতে আসামের সহিত যোগাযোগ স্থাপন অত্যন্ত সহজ ছিল। এই যুগে বাঙ্গলার শাসনকেন্দ্র ছিল গৌড়, পাণ্ডুয়া, একডালা প্রভৃতি স্থান। গৌড়-একডালা

১) *Muntakhab-ul-Tawarikh—English tr.*, Pp. 16-17
২) *Badauni*, vol. I, p. 319
৩) *Gait's History of Assam*, Pp. 87-92

হইতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল অতিক্রম করিয়া আসামের প্রান্তদেশ স্পর্শ করা সহজ ছিল। কিছুকাল পূর্বে বরবক শাহের রাজত্বকালে কামতাপুরের সহিত বঙ্গের সংঘর্ষ হইয়াছিল। যুদ্ধের ফলাফল সঠিক জানা না গেলেও এই সংঘর্ষের ফলে করতোয়া নদীর পূর্ব-তীরবর্তী বিস্তৃত অঞ্চল মুসলমানগণের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। কামতাপুরের খেন বংশীয় তৃতীয় নরপতি নীলাম্বর তাঁহার রাজ্যকে সুসংবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন। পূর্বে বড় নদী পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল। তিনি তাঁহার রাজ্যসীমান্ত সুদৃঢ় করিবার জন্য রাজধানী কামতাপুর হইতে করতোয়া তীরস্থ সীমান্ত দুর্গ ঘোড়াঘাট পর্যন্ত একটি সামরিক পথ নির্মাণ করিলেন। বুকানন হ্যামিল্টন দিনাজপুর ভ্রমণকালে এই পথের চিহ্ন দেখিয়াছিলেন।[১]

খেন নরপতি নীলাম্বর

বিগত কয়েক বৎসরের অরাজকতা ও অনিশ্চয়তার জন্য বঙ্গদেশের সীমান্তবর্তী স্বাধীন ও সামন্ত রাজগণ নিজেদের রাজ্যে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহারা প্রায়ই মুসলিম অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণ করিয়া বিব্রত করিত। হুসেন এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সুতরাং সেকেন্দর লোদীর সহিত সন্ধি স্থাপিত হইলে তিনি আসাম—তথা কামতাপুর রাজ্য আক্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যাপারে হুসেন শাহ কামতাপুরাধিপতি নীলাম্বরের ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পুত্র রাজান্তঃপুরের শুচিতা নষ্ট করিয়াছিলেন; সুতরাং রাজা নীলাম্বর মন্ত্রিপুত্রকে হত্যা করিলেন। সম্ভবতঃ পিতাও এই বিষয়ে অপরাধী পুত্রকে সমর্থন করিয়াছিলেন—এই অপরাধে রাজা নীলাম্বর মন্ত্রিপুত্রকে হত্যা করিয়া মন্ত্রীকে পুত্রের মাংস ভক্ষণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। মন্ত্রী ব্রাহ্মণ—রাজা নীলাম্বর ব্রহ্মহত্যার পাপ করিলেন। তার উপর পিতাকে পুত্রের মাংস ভক্ষণ করিতে বাধ্য করা নিষ্ঠুর নৃশংসতার কাজ। ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ মন্ত্রী প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিলেন এবং সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন। মন্ত্রী পাপক্ষালনের জন্য গঙ্গাস্নানের ছলে গৌড়ে আগমন করিয়া হুসেন শাহের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। হুসেন শাহ কামতাপুরের মন্ত্রীকে আশ্রয় প্রদান করিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শক্রমে কামতাপুর আক্রমণের সিদ্ধান্ত করিলেন।[২]

নীলাম্বরের মন্ত্রীর প্ররোচনায় হুসেন শাহের কামতাপুর আক্রমণ

হুসেন শাহ কামতাপুর-মন্ত্রীর নিকট হইতে রাজ্যের পথ-ঘাট, যান-বাহন, সৈন্য, দুর্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে সকল তথ্য অবগত হইয়া কামতাপুর আক্রমণ করেন। কিংবদন্তী অনুসারে ইসমাইল গাজী ছিলেন এই অভিযানের নায়ক। তিনি তখন সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত রাজধানী কামতাপুর অবরোধ করিলেন।[৩] কিংবদন্তী আছে যে, ইসমাইল গাজী দ্বাদশ বৎসরকাল রাজধানী অবরোধ করিয়া ছিলেন এবং বাঙ্গালী সৈন্য অবশেষে কৌশলে দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিল। দীর্ঘদিন অবরোধের পরও বিশেষ কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া বিফল মনোরথ হুসেন গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিবেন বলিয়া প্রচার করিলেন এবং রাজা নীলাম্বরের নিকট সন্ধির

১) *Gait's-History of Assam*, p. 45
২) *Ibid* p. 41
৩) *Ibid* p. 43

প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। কামতাপুর ত্যাগের পূর্বে হুসেন শাহের মহিষী কামতাপুর-রাজমহিষীর সহিত সাক্ষাতে অভিলাষিণী—এই অনুরোধবার্তা প্রেরণ করিলেন। সাধারণ ভদ্রতার নিয়ম অনুযায়ী কামতাপুররাজ হুসেন-মহিষীর অভিলাষ পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। হুসেন শাহের মহিষী রাজোচিত মর্যাদায় অভ্যর্থিতা হইলেন। কিন্তু হুসেন-মহিষী অভ্যর্থনার মর্যাদা রক্ষা করেন নাই। হুসেন মহিষী ও তাঁহার পরিচারিকাবৃন্দের পরিবর্তে ছদ্মবেশী মুসলিম সৈন্য কৌশলে বস্ত্রাবৃত ডুলিতে কামতাপুর রাজধানীতে প্রবেশ করিল। মুসলিম সৈন্য অতর্কিতে রাজধানী আক্রমণ করিল—রাজা নীলাম্বর এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না—তিনি বন্দী হইলেন—তাঁহাকে গৌড়ে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু তিনি গৌড়ের পথ হইতেই পলায়ন করিলেন।[১] কামতাপুর নগর বিধ্বস্ত হইল। 'হাজো' পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল মুসলিম অধিকারভুক্ত হইল। কামরূপে একটি আফঘান উপনিবেশ স্থাপিত হইল—তাহারা হিন্দু ভূস্বামিগণকে অধিকারচ্যুত করিয়া বিচার ও সামরিক ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিল। হুসেন শাহের পুত্র এই অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন।[২] বুরঞ্জীতে এই শাহজাদাকে দুলাল গাজী নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ "দুলাল গাজী" "দানিয়েল" নামেরই বিকৃত রূপ। ১৪৯৮-১৫০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কামতাপুর অভিযান 'আরম্ভ ও সমাপ্ত' হইয়াছিল। কারণ, ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে দানিয়েল ছিলেন মুঙ্গেরে[৩] এবং ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ মালদহের একটি শিলালিপিতে এই বিজয় কাহিনী বর্ণিত আছে। সুতরাং ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই এই বিজয় সংঘটিত হইয়াছিল।

আসাম অভিযান

কামতাপুর বিজয়ের পর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। এই অভিযানের পরিচালকের নাম সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। শিহাবউদ্দীন তালিসের বিবরণ অনুসারে জানা যায় যে, হুসেন শাহ চব্বিশ সহস্র সৈন্য ও একটি বিরাট নৌবহর সহ আসাম অভিযান করেন। আহোম নরপতি মুসলিম সৈন্যের গতিরোধ না করিয়া পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন—সমতলভূমি মুসলিম সৈন্য কর্তৃক বিজিত হইল। হুসেন শাহ সমভূমি অঞ্চল অধিকার করিয়া পুত্র দানিয়েলকে আসামে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন।[৪] এই সময়ে সুহুঙ্গ মুঙ্গ আসামের নরপতি ছিলেন।[৫] বুরঞ্জীর উল্লেখ অনুসারে তাঁহার রাজত্বকালেই আসাম রাজ্য মুসলিম কর্তৃক প্রথম আক্রান্ত হইয়াছিল এবং মুসলিম সেনাপতির নাম ছিল 'বড়-উজীর'।[৬] রিয়াজ-উস-সালাতীন ও তারিখ-ই-ফতে-ই-আসাম গ্রন্থের বিবরণ

---

১) *B. Homilton*, Vol. II, Pp. 458-59

২) *Riyas-us-Salatin, Eng. tr.*, p. 134

৩) *JASB*,—1874, 79, p. 335

৪) *JASB-Old Series*, 1872, pt. I, p. 79

৫) *Gait's History of Assam*, p. 88

৬) *Ibid*, p. 87

অনুসারে দানিয়েল বর্ষাগমের পূর্ব পর্যন্ত সমতলভূমির অধিকারী ছিলেন। বর্ষাগমে আসামরাজ পার্বত্য অঞ্চল হইতে অবতরণ করিয়া মুসলিম সৈন্যকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া তাহাদের পথরোধ করিলেন। নির্বিচারে মুসলিম সৈন্য হত্যা করা হইল। আহোম সেনাপতি বুরাই নদীতীর পযন্ত মুসলিম সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চল্লিশটি অশ্ব ও বিশটি কামান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

মুসলিম কর্তৃক আসাম বিজয়ের প্রকৃতি

মুসলিম কর্তৃক আসাম অভিযান ও বিজয় বিশেষ কোন একজন মুসলমান কর্তৃক সাধিত হয় নাই। বিভিন্ন সময়ে বাঙ্গলা দেশ হইতে বিভিন্ন সুলতান কর্তৃক আসাম আক্রান্ত হইয়াছিল—সাময়িকভাবে বিজিতও হইয়াছিল। সাধারণতঃ বর্ষাগমের পূর্বেই আসামে অভিযান প্রেরিত হইত। বর্ষাকালে নদীর জল অথবা বন্যার জলে দেশ প্লাবিত হইলে আহোম জাতি আক্রমণকারী মুসলমানদের খাদ্য চলাচল বন্ধ করিয়া দিত, প্রত্যাবর্তনের পথে পশ্চাদ্দিক হইতে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া মুসলমানদিগকে বিব্রত করিত এবং অনেক সময় শত্রুকে সমূলে বিনাশ করিত। এই জন্যই লৌকিক কিংবদন্তী অনুসারে আসাম বিজয়ের পরস্পর বিরোধী বিবরণেব উল্লেখ করা যায়। তারপর কখনও বা উত্তরবঙ্গের পথে, কখনও ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী পথ অনুসরণ করিয়া কিংবা দক্ষিণে শ্রীহট্টের পথেও আসাম আক্রান্ত হইয়াছিল।

মুসলমান বাদশাহ বা সেনাপতি দেশত্যাগ করিলেও অনেক সময়ে দুই-চারিজন মোল্লা বা ফকীর সেই দেশেই বসবাস করিতেন, এই সমস্ত মুসলিম ফকীর বা মোল্লা বঙ্গদেশীয় মুসলমানদের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করিতেন এবং মুসলিম আক্রমণে উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেন।

অভিযানের কারণ

আসাম অভিযানের কারণ সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে যে, আসাম অভিযান হুসেন শাহের খেয়াল বা দিগ্বিজয় আকাঙ্ক্ষাই নহে। মুসলিম কর্তৃক আসাম বিজয়ের বারংবার প্রচেষ্টা, সাময়িক জয় এবং সর্বশেষে বিফলতা প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল। আসাম-রাজও অনেক সময় মুসলিম অধিকৃত স্থান আক্রমণ করিয়া মুসলমানদিগকে বিপযস্ত ও বিব্রত করিতেন। বরবক শাহের সময়ে করতোয়ার তীরবর্তী অঞ্চল হইতে কামতারাজ মুসলিমদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কাহিনীই হুসেন শাহ সম্যক অবগত ছিলেন—সুতরাং বাঙ্গলার সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হইয়া হুসেন শাহের বিফল আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রচেষ্টা অতি স্বাভাবিক। সুলতান হুসেন শাহ কামতারাজ নীলাম্বর ও তাঁহার মন্ত্রীর বিরোধের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলিম ধর্ম প্রচারকগণও এই পুণ্য প্রচেষ্টায় মুসলিম সুলতানগণকে উৎসাহিত করিতেন—ইসমাইল গাজী নামক পীর মুসলিম কর্তৃক আসাম বিজয় কাহিনীর নায়করূপে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

আসাম অভিযানের সময় বা কাল

হুসেন শাহের রাজত্বকাল (৮৯৯/১৪৯৩ হইতে ৯২২/১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ) ছাব্বিশ বৎসর। এই সময়েই কামতাপুর আক্রান্ত হইয়াছিল। ৯০০/১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শার্কী সুলতান হুসেন শাহের সহিত দিল্লীর সম্রাট সেকেন্দর শাহের যুদ্ধ হইয়াছিল—সেই যুদ্ধে

বঙ্গের সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহও জড়িত হইয়া পড়েন। তিনি ৯০১/১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সুলতানজাদা দানিয়েলকে দিল্লীর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। দানিয়েল ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিহারে ছিলেন—ইহা মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত শাহনফা নামক ফকীরের দরগায় আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায়। সুতরাং কামতাপুর আক্রমণ ৯০৩/১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে হয় নাই। অহমিয়া ভাষায় লিখিত বুরঞ্জী হইতে জানা যায় যে, ৯০৩/১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কামতাপুর বিজিত হইয়াছিল এবং দানিয়েল আসামেও পিতার প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। মালদহে আবিষ্কৃত ৯০৭/১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপি এই বিষয়টি সমর্থন করে। উক্ত শিলালিপিতে বর্ণিত আছে যে, ৯০৭/১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহ কামরূপ ও কামতাপুর আক্রমণ করিয়াছিলেন। অন্য একটি অহমিয়া বুরঞ্জীর উল্লেখ অনুসারে স্যার এডওয়ার্ড গেইট তাঁহার বিখ্যাত 'আসামের ইতিহাসে' উল্লেখ করিয়াছেন যে, কামতাপুর ধ্বংসের বিশ বৎসর পরে অর্থাৎ ৯২৭/১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহ আহোম রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ৯২৭/১৫২২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই হুসেন শাহের মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং কামতাপুর ধ্বংসের বিশ বৎসর পরে হুসেন আহোমরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন—এই উক্তি নির্ভুল নহে। হুসেন শাহ আসাম আক্রমণ করিয়াছিলেন সত্য, তবে এই আক্রমণের তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে।

কামতাপুর আক্রমণের তারিখ সম্পর্কে মতানৈক্য

বিভিন্ন সময়ে আসাম মুসলিম কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই বিভিন্ন বিবরণে বিভিন্ন সময় উল্লিখিত হইয়াছে। সমস্ত প্রমাণগুলি একত্র আলোচনা করিলে মনে হয়, ৯০৩/১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কামতাপুর অভিযান আরম্ভ হয় এবং কামতাপুর সাময়িকভাবে বিজিত হয়। অতঃপর হুসেন শাহ আহোম রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। আহোম-রাজ তাহাকে বাধাপ্রদান না করিয়া পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হুসেন শাহ তাঁহার পুত্র দানিয়েলকে তথায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। দানিয়েল সুলতানের প্রতিনিধিস্বরূপ আহোম রাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। বর্ষাগমে হিন্দুগণ মুসলিম বাহিনীকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু মুসলমানগণ এই পরাজয় এবং বিপর্যয় সত্ত্বেও বারংবার আসাম আক্রমণ করে। সুতরাং কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আসাম অভিযান সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চলিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন কামতাপুরের রাজধানীর অবরোধ চৌদ্দ বৎসরব্যাপী দীর্ঘ হইয়াছিল; তবে আসাম অভিযান সম্পূর্ণ নিরর্থক হয় নাই। অধিকৃত অঞ্চলে বহু মুসলিম মোল্লা ও সৈন্য স্থায়িভাবে বাস করিয়া ঐ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

আসাম অভিযানের সার্থকতা

হুসেন শাহের উড়িষ্যা অভিযান

উড়িষ্যার সীমানা বাঙ্গলার সীমান্তকে স্পর্শ করিত এবং সময়ে সময়ে বঙ্গের সুলতানগণের দুর্বলতার সুযোগে উড়িষ্যাধিপতি বঙ্গের অভ্যন্তরভাগেও রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার সুলতানগণও বিভিন্ন সময়ে উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন—সাময়িকভাবে কয়েকবার জয়ীও হইয়াছিলেন, পরাজিতও হইয়াছিলেন।

উড়িষ্যা অভিযানের উদ্দেশ্য

এই উড়িষ্যা অভিযান ছিল আসাম অভিযানের মতই এক বংশানুক্রমিক কার্যক্রম। তার উপর উড়িষ্যা ছিল মন্দিরের দেশ, হিন্দুধর্মের দেশ। মন্দির ধ্বংস করিয়া দেববিগ্রহ ভগ্ন এবং মূর্তিপূজকদিগকে বিধ্বস্ত করা পুণ্য কর্ম বলিয়া মুসলমানগণ বহুবার উড়িষ্যায় অভিযান করিয়াছে। মন্দিরে সঞ্চিত ধনরত্নের প্রতিও সৈন্যদের লোভ ছিল। সুতরাং হুসেন শাহের উড়িষ্যা অভিযানের পশ্চাতে ছিল মুসলমানের রাজ্যবিস্তার আকাঙ্ক্ষা, ধর্মপ্রচারের স্পৃহা এবং হিন্দুমন্দির ধ্বংসের উন্মাদনা।

রিয়াজ-উস-সালাতীনের উল্লেখ অনুসারে হুসেন শাহ গৌড় হইতে উড়িষ্যা পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ জয় করিয়াছিলেন এবং ঐ অঞ্চলের সমস্ত নরপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন।[১] রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার 'গৌড়ের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, হুসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াও বিশেষ ক্ষতি করিতে পারেন নাই।[২] চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত আছে যে, মুসলমান সেনাদল বহু দেবমন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করিয়াছিল। নিম্নে উদ্ধৃত 'চৈতন্য ভাগবতের' দুইটি পংক্তি হইতেই উড়িষ্যায় মুসলিম সৈন্যের কীর্তিকাহিনী অনুমান করা যায়—

কে হুসেন শাহা সর্ব উড়িষ্যার দেশে।
দেবমূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥

(চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, ৪২৬ পৃঃ)

উড়িষ্যা আক্রমণ ও পুরীধাম ধ্বংস

মুসলিম সৈন্য কর্তৃক উড়িষ্যা বিজয়ের কাহিনী উড়িষ্যার কোন গ্রন্থ বা লিপিপ্রমাণে উল্লিখিত নাই। উড়িষ্যার জগন্নাথ মন্দিরের ঘটনা-বিবরণের তালিকায় বা মাদলা পঞ্জিকায় লিখিত আছে যে, ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা গৌড়ীয় মুসলিম সেনা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। এই অভিযানের নায়ক ছিলেন ইসমাইল গাজী। মুসলিম সেনাপতি ইসমাইল গাজী উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া পুরীর পুণ্যধাম ধ্বংস করিয়াছিলেন। এই আক্রমণে মুসলিম সৈন্যের হিন্দুমন্দির ধ্বংস ও অপবিত্র করার প্রচেষ্টা আংশিক ফলবতী হইয়াছিল।

অবশ্য এই সফলতার কারণ উড়িষ্যাধিপতি প্রতাপরুদ্রদেবের অনুপস্থিতি। তিনি কার্যোপলক্ষে রাজ্যের দক্ষিণাংশে গমন করিয়াছিলেন। কারণ তৈলঙ্গের অধিকারকে কেন্দ্র করিয়া তিনি কখনও বিজয়নগর এবং কখনও গোলকোণ্ডার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। মুসলিম আক্রমণ ও পুরীধাম লুণ্ঠনের সংবাদ পাইয়া প্রতাপরুদ্র ইসমাইল গাজীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ইসমাইল গাজী গড়মান্দারণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রতাপরুদ্র গড়মান্দারণ অবরোধ করিয়া মুসলিমগণকে বিপর্যস্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার কর্মচারী গোবিন্দ বিদ্যাধরের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রতাপরুদ্র গড়মান্দারণের অবরোধ উত্তোলন করিতে বাধ্য হইলেন। মুসলমানগণ নিশ্চিন্ত হইল।[৩]

---

১) *Riyaz-us-Salatin.* Eng. Tr. p. 132

২) রজনীকান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১০৯ পৃঃ

৩) *JASB, Old Series* LXIX. 1900. Pt. I, p. 186.

হুসেন শাহের উড়িষ্যা অভিযানের তারিখ বা ফলাফল সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা যায় না। গোলাম হুসেন বলেন যে, গৌড় হইতে উড়িষ্যা পর্যন্ত অঞ্চল বিজিত হইয়াছিল। বিজিত হউক বা না হউক মুসলিম সৈন্যের গতি অপ্রতিহত হইয়াছিল ইহা নিশ্চিত এবং হিন্দু জমিদারবর্গ বা স্থানীয় রাজন্যবর্গ মুসলিম সৈন্যকে বাধাপ্রদান করে নাই—কারণ, বোধ হয় তাহারা তাহাদের অধিনায়ক প্রতাপরুদ্রদেবের অনুপস্থিতিতে মুসলিম সৈন্যের গতিরোধ করিতে সাহস করে নাই। পরে অবশ্য মুসলিমগণ প্রতাপরুদ্রদেবের আগমনে গড়মান্দারণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। হুসেন শাহ সম্ভবতঃ স্থায়িভাবে উড়িষ্যার কোন অংশ জয় করিতে পারেন নাই।

মাদলা পঞ্জিকা অনুসারে মুসলিম সৈন্য ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা আক্রমণ ও পুরীধাম লুণ্ঠন করিয়াছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের ভ্রমণপঞ্জী হইতে জানা যায় যে, ১৫০৯ হইতে ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি পুরী বা নীলাচলে গমন করেন। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।[১] মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার 'অমিয় নিমাইচরিতে' লিখিয়াছেন যে, মহাপ্রভুর নীলাচলে গমনের সময়ে দুই রাজ্যের সীমান্তে বিরোধ চলিতেছিল এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সীমান্ত কর্মচারী রামচন্দ্র খানের সাহায্যে ছত্রভোগে গঙ্গা অতিক্রম করেন।[২] শিশিরকুমার আরও লিখিয়াছেন, ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু যখন বঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন তখনও সীমান্ত রুদ্ধ ছিল এবং সীমান্তে প্রচণ্ড গোলমাল চলিতেছিল।[৩] এই অনিশ্চিত অবস্থা ও গোলযোগের কথা চিন্তা করিয়াই শান্তিপুরের ভক্তবৃন্দ এবং ছত্রভোগের গ্রামপ্রতি রামচন্দ্র খান মহাপ্রভুকে তখন নীলাচল গমনে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।[৪] মুদ্রা-প্রমাণ অনুসারে ৯১০/১৫০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দেই হুসেন শাহ কামরূপ-কামতা এবং জাজনগর-উড়িষ্যা বিজয় করিয়াছিলেন।[৫] কিন্তু এই মুদ্রা-প্রমাণ গ্রহণ করা কঠিন; কারণ একসঙ্গে তিনটি অভিযান পরিচালনা ও বিজয় অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তবে সকল তারিখগুলি একত্র বিবেচনা করিলে মনে হয় হুসেন শাহের আসাম ও উড়িষ্যা অভিযান দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল।

ত্রিপুরার যুদ্ধ

ত্রিপুরা রাজ্যের সহিত মুসলমানদের প্রীতির সম্বন্ধ ছিল না। হুসেন শাহের সিংহাসনারোহণের পূর্ব হইতেই ত্রিপুরা রাজ্যের সহিত গৌড়ের মুসলমান সুলতানের বিরোধ চলিতেছিল। হুসেন শাহ রাজত্বের প্রথমভাগে দিল্লী, আসাম ও উড়িষ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় ত্রিপুরার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। কারণ

---

১) চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা—১৩শ পরিচ্ছেদ, ৫৯ পৃষ্ঠা
২) অমিয় নিমাইচরিত, ৩য় খণ্ড—৭৭-৭৯ পৃঃ
৩) অমিয় নিমাইচরিত, ৪র্থ খণ্ড—২৩৩-৩৭ পৃঃ
৪) চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ২য় অধ্যায়, ৬৮১-৮৭ পৃঃ
৫) A. W. Botham, *Catalogue of Coin Cabinet-Assam*, P. 170, No. 18.

তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, যখন-ইচ্ছা ত্রিপুরা জয় করিতে পারিবেন কিংবা ত্রিপুরা বিজয় খুব কষ্টসাধ্য হইবে না। রাজমালা বা 'ত্রিপুরার ইতিহাস' অনুসারে হুসেন শাহ চারিবার ত্রিপুরা বিজয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্যমাণিক্য এবং সেনাপতি রায় চয়বাগের যত্নে ও কৌশলে বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন।

হুসেন শাহ রাজত্বের প্রথমভাগে রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় ধন্যমাণিক্য নিজেকে নিরাপদ মনে করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট ছিলেন। এই সুযোগে মুসলিমগণ ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া ৯১৯/১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই ত্রিপুরার কোন অংশ জয় করিয়াছিল। সোনারগাঁও অঞ্চলে আবিষ্কৃত একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ৯১৯/১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে খাওয়াস খান ত্রিপুরার সর-ই-লস্কর (সৈন্যাধ্যক্ষ) এবং ইকলিস মুয়াজ্জমাবাদের উজীর ছিলেন।[১] রাজ্যের অংশবিশেষও সাময়িকভাবে বিজিত না হইলে কোন উজীরের নাম উল্লিখিত হইত না। মুসলমানগণ প্রথম অভিযানে গোমতী নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল এবং অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। অভিযান অসম্পূর্ণ রাখিয়াই মুসলিম সৈন্য গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইল।

প্রথম অভিযান

হুসেন শাহ এই পরাজয়ে নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি গৌর মল্লিক নামক একজন বিচক্ষণ সেনাপতির অধীনে ত্রিপুরায় দ্বিতীয় অভিযান প্রেরণ করিলেন। মুসলিম সৈন্য দ্বিগুণ উৎসাহে মিহিরকুল নদীর তীর অনুসরণ করিয়া ত্রিপুরাভিমুখে অগ্রসর হইল। মিহিরকুল মেঘনা নদীর একটি শাখা—এই নদীর তীরে ত্রিপুরাধিপতির একটি দুর্গ ছিল। মুসলিম সৈন্য বিনাবাধায় মিহিরকুলতীরস্থ দুর্গ অধিকার করিল। ত্রিপুরা-সেনাপতি চয়বাগ মুসলিম সৈন্যের গতিরোধের কোন চেষ্টা করিলেন না কিম্বা মুসলিম সৈন্যের যথেচ্ছ অগ্রসরে বাধাপ্রদান করিলেন না। ত্রিপুরার সৈন্য চয়বাগের অধীনে সোনামাটিয়া দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গৌর মল্লিক মহা উৎসাহে ত্রিপুরার রাজধানী রাঙ্গামাটি অভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। রায় চয়বাগ পশ্চাৎ দিকে গোমতী নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া জলস্রোত আবদ্ধ করিয়াছিলেন। মুসলিম সৈন্য গোমতী নদী শুষ্ক মনে করিয়া অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী রায় চয়বাগ গোমতীর বাঁধ খুলিয়া দিলেন। রুদ্ধ জলস্রোত তীব্রবেগে সমস্ত নদী প্লাবিত করিয়া দিল। মুসলিম সৈন্য স্রোতে ভাসিয়া গেল। অতি সামান্য সংখ্যক মুসলিম কোনমতে প্রাণ রক্ষা করিয়া নিকটস্থ চণ্ডীগড় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ত্রিপুরার সৈন্যগণ সেখানেও মুসলমানদের স্বস্তি দিল না। তাহারা গভীর নিশীথে চণ্ডীগড়ে প্রবেশ করিয়া মুসলিম সৈন্য প্রায় নিশ্চিহ্ন করিল। সামান্য কয়েকজন মাত্র পলায়ন করিয়া হুসেন শাহের নিকট পরাজয়ের সংবাদ দিতে চলিল। রায় চয়বাগ পলায়মান সৈন্যদের অনুসরণ করিয়া চট্টগ্রামের অংশবিশেষ অধিকার করিলেন।

দ্বিতীয় অভিযান

১) *JASB*-Old Series. Vol. XLI, 1872, Pp. 333-334

হুসেন শাহ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হাতিয়ান খান নামক একজন দুঃসাহসী সৈন্যাধ্যক্ষকে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। হাতিয়ান খান পুনরায় গোমতী নদীর তীর অনুসরণ করিয়া চলিলেন। চয়বাগ কুমিল্লার নিকট যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন কিন্তু তাঁহারই কৌশলে হাতিয়ান খানের সৈন্যদল পুনরায় গোমতীর জলে সমাধি লাভ করিয়া (ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদের) পুণ্য অর্জন করিল। হুসেন শাহ পরাজয়ের অপমানে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। হাতিয়ান খান পদচ্যুত হইলেন।

তৃতীয় অভিযান

হুসেন শাহ বিরাট সেনাবাহিনী লইয়া স্বয়ং ত্রিপুরা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। চতুর্থ অভিযানের ফল কি হইয়াছিল তাহার পূর্ণ বিবরণ 'রাজমালা'তে উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ হুসেন শাহ তাঁহার পূর্ববর্তী হাতিয়ান খান কিংবা গৌর মল্লিকের মত বিপর্যস্ত হন নাই। কৈলাগড়ে উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল।[১] ধন্যমাণিক্যও স্বয়ং এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের ফলে ত্রিপুরার একাংশ গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল এবং ঐ অঞ্চলের শাসনের জন্য একজন কর্মচারীও নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[২] এই সময়ে চট্টগ্রামও পুনরায় হুসেন শাহের হস্তগত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের সময়ে আরাকান-নরপতি চট্টগ্রাম আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং আরাকানরাজের আক্রমণে উহা হুসেন শাহের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ আরাকানরাজের আক্রমণের জন্যই হুসেন শাহ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে সমস্ত সৈন্য সমাবেশ করিতে পারেন নাই।

চতুর্থ অভিযান

ত্রিপুরা ও আরাকান যুদ্ধ একই সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল কি না, কিংবা ত্রিপুরা যুদ্ধের পরে আরাকানের যুদ্ধ হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে সমসাময়িক ইতিহাস নীরব। যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধেও বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। রাজমালার বর্ণনানুসারে হুসেন শাহের ত্রিপুরা-যুদ্ধে ব্যস্ততার (লিপ্ততার) সুযোগ গ্রহণ করিয়া আরাকানরাজ চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন এবং অধিকার করেন।[৩] আরাকানরাজের অগ্রগতি প্রতিহত করিবার জন্যই সুলতানজাদা নসরৎ খানের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী এই অভিযানকাহিনী উল্লেখ করিয়াছেন। এই অভিযানেই পরাগল খান ও তাঁহার পুত্র ছুটী খানের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিংবদন্তী অনুসারে সুলতানজাদা নসরৎ শাহই প্রথমে চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম পুনরধিকার ব্যাপারে আলকা হোসেনী নামক একজন আরব বণিক কয়েকখানি জাহাজ এবং অর্থের দ্বারা গৌড়ের সুলতানকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং বঙ্গে বিপুল প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন[৪]। নসরৎ খানের প্রত্যাবর্তনের পর পরাগল খান চট্টগ্রামের সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ফেনী নদীর তীরে শিবির সংস্থাপন করিয়া পরাগল খান ও তাঁহার পুত্র ছুটী খান আরাকান সৈন্যের গতি প্রতিরোধ

১) রাজমালা—পৃ: ৪৯-৫০, *Tripura Gazetteer*, P. 13
২) *JASB*, 1873, P. 333
৩) রাজমালা, ৫৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা
৪) Hamidullah, *Ahadis-ul-Khwanin*, P. 17-18

করেন এবং ত্রিপুরারাজ্যের প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। নসরৎ শাহ কিংবা পরাগল খান ও ছুটী খান কর্তৃক চট্টগ্রাম অভিযানের তারিখ সঠিক জানা যায় না। পর্তুগীজ দূত জাওয়ো-দা-সিলভারি (Joas-De-Silverio) ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। তাঁহার উক্তি অনুসারে জানা যায় যে, হুসেন শাহ ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন—কিন্তু ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখেন যে, উক্ত বন্দরটি তখন বঙ্গরাজের অধীনে ছিল। ড্য ব্যারস (De Barros) বলিয়াছেন যে, আরাকানরাজও বঙ্গরাজের অধীন সামন্ত ছিলেন।

হুসেন শাহের মৃত্যু

হুসেন শাহ তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বে কামতাপুরের খেন রাজ্য ধ্বংস করেন, উড়িষ্যা ও ত্রিপুরারাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করেন, শার্কী সুলতানগণের অধীন মগধরাজ্যও তিনি জয় করেন। একমাত্র আহোমরাজ্য অভিযানেই তাঁহাকে ব্যর্থতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্য সুসংবদ্ধ ছিল এবং তাঁহার সুশাসনে রাজ্যে কখনও ব্যাপক প্রজাবিদ্রোহ হয় নাই। রিয়াজ-উস-সালাতীনের মতে হুসেন শাহ দীর্ঘ সপ্তবিংশ কিংবা উনত্রিংশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। গোলাম হুসেনের মতানুসারে ৯২৭/১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহের মৃত্যু হইয়াছিল।[১] কিন্তু ৯২৫/১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে ফতেহাবাদ ও হোসেনাবাদ মুদ্রাশালায় মুদ্রিত হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে—সুতরাং এই মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণের উপর সিদ্ধান্ত করিয়াই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, উক্ত বর্ষেই হুসেন শাহের মৃত্যু হইয়াছিল।[২]

রিয়াজ-উস-সালাতীনের উল্লেখ অনুযায়ী হুসেন শাহের আঠারোটি পুত্র ছিল।[৩] তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র দানিয়াল আহোম যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। ডাঃ হবিবুল্লা বলেন যে, ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহ তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করিয়া মুদ্রাঙ্কনের অনুমতি দিয়াছিলেন। এই নসরৎ শাহের মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু ডাঃ হবিবুল্লার উক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে—পিতা বর্তমানে পুত্রকে সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী মনোনয়নের প্রথা ইসলামে পাওয়া যায় কিন্তু মুদ্রাঙ্কনের অধিকার দিলে যে স্বাধীনতার সমতুল হইয়া যায়। এই অধিকার প্রদান রাজনীতির বিরোধী। হুসেন শাহের মত বিচক্ষণ ব্যক্তি যে সাম্রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য সহজে নষ্ট করিবেন তাহা মনে হয় না। সুতরাং ফতেহাবাদ ও হোসেনাবাদের মুদ্রাশালা হইতে ৯২৫/১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে নসরৎ শাহ কর্তৃক মুদ্রা প্রচলন প্রমাণ করে যে, তিনি পিতার জীবদ্দশায় বিদ্রোহী হইয়া স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পিতার বশ্যতাই স্বীকার করিয়াছিলেন। গৌড়ে এবং সুবর্ণগ্রামে[৪] আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ৯২৫/১৫১৯

---

১) *Riyaz-us-Salatin*, Eng. Tr. P. 133

২) বাঙ্গলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ২৫৩ পৃঃ

৩) *Riyaz-us-Salatin*, Eng. Tr., p. 134

৪) *JASB*, 1871, p. 256. *JASB*, 1873, p. 295

(অগস্ট) খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহের রাজত্বকালে ঐ দুই স্থানে মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল ; সুতরাং ৯২৫/১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহের মৃত্যু হইতে পারে না। হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহ ও ঘিয়াসউদ্দীন সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।

হুসেন শাহের রাজ্যসীমা

হুসেন শাহের রাজ্যসীমা সুবিস্তৃত ছিল এবং রাজ্য সুসংবদ্ধ ছিল। তাঁহার রাজ্যসীমা উত্তর-পশ্চিমে সরণ ও বিহার (মুঙ্গের ও বিহার শরীফ), দক্ষিণ-পশ্চিমে মন্দারণ ও চব্বিশ পরগনা, উত্তর-পূর্বে আসামের হাজো এবং দক্ষিণ-পূর্বে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম স্পর্শ করিয়াছিল।

হুসেন শাহের কৃতি

হুসেন শাহের জীবন বিচিত্র ঘটনার সমষ্টি। তিনি শাহজাদা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই—নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এবং নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যে তিনি গৌড় দরবারে কার্য লাভ করেন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে গৌড় সিংহাসনের অতি নিকটে উপস্থিত হন। বাঙ্গলার সিংহাসনের জন্য যুদ্ধবিগ্রহের প্রত্যক্ষদর্শী রূপে তিনি বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি হাবসী রাজত্বে সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। হাবসী অত্যাচারে যে তাঁহার কোন হাত ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে হাবসী সমর্থন লাভের জন্য তিনি নিশ্চয়ই হাবসী সৈন্যাধ্যক্ষ ও প্রাসাদরক্ষীদের সহায়তা করিয়াছিলেন ; নচেৎ হাবসীগণ তাঁহাকে সাহায্য করিত না। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোন উপায় বা সুযোগ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নাই বা ব্যর্থ হইতে দেন নাই। সিংহাসন লাভ করিয়া তিনি সহস্র সহস্র হাবসী সৈন্যকে নিঃসংকোচে নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, প্রাসাদরক্ষিদিগকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার দূরদৃষ্টি ও দৃঢ়চিত্ততা প্রকাশ পায়। হিন্দু-মুসলিম সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণের সহিত সহযোগিতা করার প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। জনসাধারণ বহুকাল যুদ্ধবিগ্রহ, অত্যাচার ও অনাচারে অতিষ্ঠ হইয়া স্বস্তি ও শান্তির জন্য আকুল হইয়াছিল। ইংলণ্ডে দীর্ঘব্যাপী গোলাপের যুদ্ধের বিভীষিকায় অতিষ্ঠ হইয়া ইংলণ্ডবাসী যেমন সপ্তম হেনরীর কঠোর শাসন সমর্থন করিয়াছিল, বঙ্গদেশও তেমনি পরবর্তী ইলিয়াসী বংশের দুর্বল শাসন ও হাবসী অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া হুসেন শাহের দৃঢ় শাসনের সমর্থন ও সহযোগিতা করিয়াছিল।

রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াই হুসেন শাহ এক নূতন বৈদেশিক নীতির সূচনা করেন। বাঙ্গলার চতুষ্পার্শ্বে—আসাম, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যগুলি ছিল অমুসলমান রাজ্য—সুতরাং হুসেন শাহ এই সকল বিধর্মী রাজ্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া পুণ্যার্জনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ১৪৯৪-১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্রমাগত একুশ বৎসরকাল তিনি বিভিন্ন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং আসাম-যুদ্ধ ব্যতীত কোথাও তিনি পরাজিত হন নাই।

যোদ্ধারূপে হুসেন শাহ বরবক শাহ হাবসীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সিদি বদরকে হত্যা করিয়া দুঃসাহসিকতার পরিচয় প্রদান করেন। যুদ্ধ

পরিচালনার কৃতিত্ব তাঁহার ছিল। তিনি দিল্লীর সুলতান সেকেন্দর লোদীর বিরুদ্ধে জৌনপুরের শার্কী সুলতানকে আশ্রয় প্রদান করিয়া রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। আসাম যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য তাঁহার দায়িত্ব ছিল না। উড়িষ্যা যুদ্ধের উদ্দেশ্য আংশিক সফল হইয়াছিল। ত্রিপুরা যুদ্ধে বারংবার বিধ্বস্ত হইয়াও তিনি নিরুৎসাহ হন নাই—শেষ পর্যন্ত স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন—তখন তাঁহার বয়স ষাটের উর্ধ্বে।

রাজ্যজয় রাজার কর্তব্য বিবেচনা করিলেও হুসেন শাহ শাসন ব্যাপারেও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি রাজকর্মচারী নিয়োগে ধর্ম অপেক্ষা যোগ্যতার সম্মান দিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যের উজীর ছিলেন পুরন্দর খান বা পুরন্দর বসু, গৌর মল্লিক ছিলেন তাঁহার সেনাপতি; রূপ ও সনাতন দুই ভাই ছিলেন তাঁহার রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ। তাঁহাদের মধ্যে সনাতন ছিলেন ব্যক্তিগত কর্মাধ্যক্ষ (দবীর সনা খাস), রূপ ছিলেন রাজস্ব সচিব (সাকর মল্লিক)। মুকুন্দ দাস ছিলেন তাঁহার প্রধান চিকিৎসক, তাঁহার দেহরক্ষী ছিলেন কেশবছত্রী, অনুপ ছিলেন মুদ্রাশালার অধ্যক্ষ। হিন্দু কর্মচারী নিয়োগের অন্তরালে হুসেন শাহের হিন্দু মেধা ও কর্মদক্ষতার উপর বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাতে মনে হয় শৈশবকাল হইতেই তিনি হিন্দুর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন—আরব দেশ হইতে এই দেশে আসেন নাই। কোন আরববাসীর পক্ষে হঠাৎ সুদূর বঙ্গদেশে আসিয়া অতখানি উদারতা অসম্ভব।

হিন্দু কর্মচারীর প্রতি হুসেন শাহের আস্থা

হুসেন শাহের এই হিন্দু-নিয়োগ নীতির পশ্চাতে হিন্দুপ্রীতি অপেক্ষা রাষ্ট্র রক্ষার প্রয়োজনই অধিকতর অনুভূত হইয়াছিল। হিন্দুগণ মুসলমান সুলতানের বিরুদ্ধে সিংহাসনের ষড়যন্ত্রে যোগ দিত না—তাহারা স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকিত। তাঁহারা সাধারণতঃ আহত হইলেও আঘাত করিত না। হুসেন শাহ হিন্দুর শান্তিপ্রিয় মনোভাবের সঙ্গে সম্যক পরিচিত ছিলেন বলিয়া তাহাদের নমনীয় মনোবৃত্তিকে রাষ্ট্রের কল্যাণে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাছাড়া রাজদরবারে কার্যহেতু এই হিন্দু রাজকর্মচারী গোষ্ঠী দরবারী রীতিনীতি গ্রহণ করিল এবং মুসলিম ভাবধারাও অলক্ষিতে তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিল।

হুসেন শাহ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগ করিয়া সুশাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরাগল খান ও তাঁহার পুত্র ছুটী খান চট্টগ্রাম অঞ্চলের সামরিক শাসনকর্তা ও সেনানায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ত্রিহুত অঞ্চলে হুসেন শাহের শ্যালক আলাউদ্দীন এবং মকদুম-ই-আলম শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাবরের আত্ম-জীবনীর বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় যে, হুসেন শাহ এবং নসরৎ শাহের রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগীয় ব্যয়ের জন্য অথবা প্রত্যেক পদের জন্য একটি বিশেষ ভূখণ্ডের রাজস্ব নির্ধারিত ছিল। রাজার ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্যও ভূমিরাজস্ব নির্ধারিত ছিল। পরবর্তী মুঘলযুগেও এইরূপ প্রথা প্রবর্তিত ছিল। প্রত্যেক রাজকুমার বা রাজকুমারীর ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের স্বত্ব নির্দিষ্ট ছিল—এমন কি বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের জন্য বিভিন্ন পরগনার রাজস্ব নির্দিষ্ট ছিল।

হুসেন শাহের রাজত্বে ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থা

হুসেন শাহ নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন—তাঁহার রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বহু নূতন মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। বাঙ্গলায় আবিষ্কৃত মসজিদের সমসাময়িক তালিকা হইতে অনুমান করা যায় যে, বিগত দুইশত বৎসরে বঙ্গদেশে যত মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক মসজিদ হুসেন শাহের ছাব্বিশ বৎসর রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল। হুসেন শাহ মালদহে বিরাট মাদ্রাসা নির্মাণ করেন এবং পাণ্ডুয়াতে কুতুব-উল-আলমের সমাধিতে বহু সম্পত্তি ও অর্থ দান করেন এবং তথায় একটি মসজিদও নির্মাণ করেন। তিনি প্রতি বৎসর একডালা হইতে পদব্রজে তীর্থদর্শন করিতেন। বহু মসজিদ ও মাদ্রাসাতে তাঁহার দান ছিল। হুসেন শাহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কূপও নির্মাণ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বাঙ্গলার ইতিহাস' গ্রন্থে (২য় খণ্ড-২৫৩-২৬১ পৃঃ) বঙ্গ, বিহার ও মগধের নানাস্থানে হুসেন শাহ কর্তৃক নির্মিত মসজিদ, মিনার, মাদ্রাসা ও কূপের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[১] এই সকল মসজিদ, মিনার, মাদ্রাসা হুসেন শাহের ইসলামে নিষ্ঠা ও স্থাপত্য-প্রীতির পরিচয় দেয়।

হুসেন শাহের ইসলামে নিষ্ঠা ও স্থাপত্য-প্রীতি

হুসেন শাহ ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আনুষ্ঠানিক-ভাবে কোন অত্যাচার করেন নাই। হিন্দুগণ হুসেন শাহকে 'নৃপতি-তিলক' বলিয়া সম্মান করিত।

ছায়া শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সনাতন হুসেন শাহ নৃপতি তিলক॥[২]

তাঁহার শাসনে যে হিন্দুগণ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল, তাহার প্রমাণ হিন্দুগণ হুসেন শাহকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছে। 'কৃষ্ণের অবতার' বিশেষণের পশ্চাতে অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণের ইঙ্গিত আছে। বোধ হয় তাঁহার পূর্বে হিন্দুগণ আরও অত্যাচারিত হইত এবং তাঁহার পূর্ববর্তী সুলতানগণ হিন্দুদের প্রতি এই অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু হুসেন শাহ হিন্দুদিগকে এই অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া 'কৃষ্ণের অবতার' রূপে বিশেষিত হইয়াছিলেন।

"নৃপতি হুসেন শাহ হয় মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্রশস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হবু যেন কৃষ্ণ অবতার॥[৩]

অবশ্য সমসাময়িক হিন্দুগ্রন্থে হুসেন শাহের সমকালে বা রাজত্বকালে কাজী ও মোল্লাদের অত্যাচারের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃন্দাবন দাস রচিত চৈতন্যভাগবতে উড়িষ্যার হিন্দুমন্দির ধ্বংসের সংবাদ পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতের নানাস্থানে

১) বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ২৫৩-২৬১ পৃঃ
২) Dinesh Ch. Sen, *Hist. of Bengali language and literature*, p. 279 (Note)
৩) *Ibid*, p. 202 (Note)

কাজীর অত্যাচারের বর্ণনা আছে। মাদ্‌লা পঞ্জিকায় পুরীধাম ধ্বংসের কথা আছে। উড়িষ্যা ও কামরূপ অভিযানের সময় হিন্দুর উপর অত্যাচার দর্শনে রূপ ও সনাতনের মত প্রভুভক্ত এবং রাজভক্ত কর্মচারীও হুসেন শাহের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। ইসমাইল গাজীর মুসলিম অধিনায়কতার মধ্যে তদানীন্তন মুসলিম মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। হুসেন শাহ সনাতনের মনোভাব পরিবর্তনের অপরাধে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কারাধ্যক্ষকে উৎকোচপ্রদানে বশীভূত করিয়া পলায়ন করেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হন। রূপ ও রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

হুসেন শাহের প্রতি রূপ ও সনাতনের বীতশ্রদ্ধা

হুসেন শাহ আরবী ও পারসিক সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে রচিত গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিজয়গুপ্ত, মালাধর বসু, বিপ্রদাস ও যশোরাজ খান পরম শ্রদ্ধায় তাঁহার নাম স্মরণ করিয়াছেন। ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্ভুক্ত ফুল্লশ্রী গ্রাম নিবাসী বিজয় গুপ্ত ১৪০৬ শকে (১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের আদিপর্ব হইতে স্ত্রীপর্ব পর্যন্ত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান হক সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি॥
লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া॥
পুত্র-পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি॥[১]

কুলীনগ্রাম-নিবাসী মালাধর বসু ১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে) ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্দ বাংলায় অনুবাদ আরম্ভ করেন এবং ১৪০২ শকে (১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার অনুবাদকার্য শেষ করেন। এই সাহিত্য চর্চার জন্য হুসেন শাহ মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।[২] মালাধর বসুর কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'।

১৪১৭ শকে (১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) বিপ্রদাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণ 'মনসামঙ্গল' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থের পুষ্পিকায় হুসেন শাহের নাম আছে।

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহি শক পরিমাণ
নৃপতি হুসেন সা গৌড়ে সুলক্ষণ॥[৩]

১) D. C. Sen—*Hist. of Bengali Language and literature*, p. 202 (Note)
২) *Ibid* P. 222
৩) *JASB—New series*, Vol. V. P. 253

যশোরাজ খান রচিত একটি গীতে হুসেন শাহের নাম উল্লিখিত আছে—

শ্রীযুত হুসন, জগতভূষণ,
সেই এহি রস জান !![1]

হুসেন শাহ মধ্যযুগীয় বঙ্গ নৃপতিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ না হইলেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আবুলফজলের মত তাঁহার কোন কবিবন্ধু বা অমাত্য ছিলেন না—যিনি তাঁহার কীর্তিকাহিনীকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় করিয়া রাখিতে পারিতেন। হুসেন শাহ 'বঙ্গের আকবর' বলিয়া অভিনন্দিত হইবার মত যোগ্যতা ও গুণাবলীর অধিকারী হইলেও তাঁহার কৃতিত্ব ও গুণাবলীর কোন ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ বিবরণ রচিত হয় নাই। কিন্তু তথাপি অদ্যাপি হুসেন শাহের যশ উড়িষ্যা হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে।

'বঙ্গের আকবর' হুসেন শাহ

নসরৎ শাহ বা নসীব শাহ (১৫১৯—১৫৩২ খ্রীঃ)

হুসেন শাহের জীবদ্দশায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দানিয়েল আসাম যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। নসরৎ শাহ পিতা কর্তৃক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত হইয়াছিলেন। সুতরাং হুসেন শাহের মৃত্যুর পর নসরৎ শাহ 'নাসিরউদ্দীন আবুল মুজাফর নসরৎ শাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।[2] পিতার জীবিতকালে নসরৎ শাহ বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভ্রাতৃহত্যা করেন নাই—যদিও মুসলমান রাজত্বে ভ্রাতৃহত্যা একটা নিয়মে পর্যবসিত হইয়াছিল। নসরৎ শাহ ভ্রাতাদিগকে সম্মানিত রাজপদ প্রদান করিয়া তাঁহাদের বৃত্তির পরিমাণ বর্ধিত করিয়াছিলেন। ডাঃ হবিবউল্লা বলেন যে, পিতার জীবিতকালে নসরৎ খান যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। অবশ্য এক বৎসরের একটি মুদ্রা ভিন্ন ইহার অন্য কোন সমর্থন নাই।

নসরৎ শাহ পিতার সকল সদ্‌-গুণাবলীর অধিকারী হইয়াছিলেন। আত্মীয়-পরিজনের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট স্নেহ-মমতা ছিল। সুদীর্ঘকাল শাসনকার্যে এবং সামরিক অভিযানে লিপ্ত থাকায় তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করেন। তাহা ছাড়া তাঁহার নিজেরও গভীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল।

নসরৎ শাহের চৌদ্দ বৎসর রাজত্বকালকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—প্রথম সাত বৎসর (১৫১৯—১৫২৫ খ্রীঃ) এবং পরবর্তী সাত বৎসর (১৫২৫—১৫৩২ খ্রীঃ)। নসরৎ শাহের রাজত্বের প্রথমার্ধে বিশেষ কোন যুদ্ধবিগ্রহের সংবাদ পাওয়া যায় না। দিল্লীর লোদী বংশের সঙ্গে সন্ধির শর্ত কোনও পক্ষ হইতে ভঙ্গ হয় নাই। সুতরাং সাহিত্যও শিল্প সাধনায় বাঙ্গালীর অবসর নিয়োজিত হইয়াছিল।

---

১) D. C. Sen, *Hist. of Bengali language & literature*, P. 12. (note 3.)

২) পারস্ত ভাষায় রচিত ইতিহাস অনুসারে নসরৎ শাহের অপর নাম নসীব শাহ।

পিতা হুসেন শাহের রাজ্যশাসন-ব্যবস্থার সহিত নসরৎ শাহ সংযুক্ত ছিলেন। সুতরাং পিতার দৃষ্টান্ত অনুকরণে তিনি রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং পূর্বাঞ্চলের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য উৎসুক ছিলেন।

নসরৎ শাহের পররাষ্ট্রনীতি

নসরৎ শাহের রাজ্যারম্ভের তিন বৎসরের মধ্যে (১৫২২ খ্রীঃ) বিহারের লোদী শাসনকর্তা দরিয়া খান লোহানী দিল্লীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দরিয়া খান লোহানীর রাজ্যসীমা পাটনা হইতে জৌনপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হুসেন শাহের সময়ে জৌনপুরের শার্কী বংশের সঙ্গে বন্ধুত্ব বাঙ্গলার পররাষ্ট্রনীতির প্রধান অঙ্গ ছিল। সেকেন্দর লোদীর সময়ে দিল্লীর আক্রমণে শার্কী রাজ্য নষ্ট হইয়া গেলে হুসেন শাহ বাধ্য হইয়া লোদী রাজবংশের সঙ্গে পরস্পর যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। দরিয়া খান লোহানীকে সেকেন্দর বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দরিয়া খান লোহানী (১৫২২ খ্রীঃ) স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে নসরৎ শাহ অনেকখানি নিরুদ্বেগ হইলেন। দরিয়া খান লোহানীর দৃষ্টি ছিল পশ্চিমাভিমুখী; সুতরাং নসরৎ শাহ তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন।[১] শোন নদীর উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত বঙ্গের সীমানা বিস্তৃত হইল। নসরৎ শাহ ত্রিহুতও জয় করিলেন এবং তাঁহার শ্যালক মকদুম-ই-আলমকে এই অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।[২] মকদুম-ই-আলম গঙ্গা-গণ্ডক নদীর সঙ্গমস্থল হাজীপুরে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া পশ্চিমদিক হইতে বাঙ্গলা আক্রমণের পথ নিষ্কণ্টক করিলেন। হাজীপুরের ভৌগোলিক গুরুত্ব ছিল এবং হাজীপুর নদীপথে বিহারে প্রবেশের সকল পথগুলি নিয়ন্ত্রিত করিত। হাজীপুরে অবস্থানহেতু মকদুম-ই-আলম গোগরা নদীর উভয় তীরে সরণ ও আজমগড় পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিলেন।[৩]

নসরৎ শাহ ও বিহার

এই সময়ে দিল্লীর লোদী সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল। পূর্বদিকে লোহানীরাজ্য স্থাপন, পশ্চিমদিক দৌলত খান লোদীর বিদ্রোহ, ১৫২২—১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাবুলাধিপতি চাঘতাই মুঘল সন্তান বাবরের বারংবার আক্রমণে লোদীরাজ্য ধ্বংসায়মান। বাবর পাণিপথ এবং ফতেপুর সিক্রির যুদ্ধে বিজয়ী হইলেন। নসরৎ শাহ মুঘল অগ্রগতি প্রতিরোধের জন্য বিহারের সীমান্তে শিবির সংস্থাপনের আয়োজন করিলেন। বাবর-পুত্র হুমায়ুন মুঘল বিজয়বাহিনী লইয়া জৌনপুর আক্রমণের জন্য উৎসুক। মা'রুফ খান এবং নাসির খান লোহানী কনৌজ ও জৌনপুর হইতে বিতাড়িত হইলেন। বাবর গঙ্গাতীর হইতে গোগরা নদীর উত্তরাংশ পর্যন্ত অধিকার করিলেন (অগস্ট, ১৫২৬ খ্রীঃ)।[৪]

বাবর গৌড়বঙ্গের অধিপতি নসরৎ শাহের নিকট মহজব নামক একজন দূত প্রেরণ করিয়া বশ্যতা দাবি করিলেন। নসরৎ শাহ এক বৎসরকাল পর্যন্ত মুঘলনীতির বিষয়ে

---

১) *Habibullah*, P. 153

২) *Riyas-us-Salatin*, Eng. Tr. P. 136

৩) *History of Bengal, D. U.*, Vol. II. p. 153. (Foot note I)

৪) গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা

কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই এবং নিরপেক্ষতা নীতিই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ, তিনি আফঘান সর্দারদের অনিশ্চিত সাহায্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন নাই এবং মুঘলশক্তির পূর্ণরূপও তখন প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু মোল্লা মহজবের প্রত্যাবর্তনে অত্যধিক বিলম্ব দেখিয়া বাবরের সন্দেহ উপস্থিত হইল; তিনি বাঙ্গলা আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া নসরৎ শাহ মোল্লা মহজবের সঙ্গে ইসমাইলকে বহু উপঢৌকন সহ বাবরের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং আনুগত্য স্বীকারের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন। বাবর সন্তুষ্ট হইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ না করার সিদ্ধান্ত করিলেন।

নসরৎ শাহ কর্তৃক বাবরের আনুগত্য স্বীকার

নসরৎ শাহ কৌশলে তাঁহার মনোভাব গোপন করিলেন মাত্র। কিন্তু দুর্ধর্ষ আফঘান বীর মুহম্মদ ফারমুলী, বাহার খান লোহানী প্রভৃতি আফঘান নায়কগণ নবাগত মুঘল প্রতিপত্তি স্বচ্ছন্দমনে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা নসরৎ শাহের প্রত্যক্ষ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি না পাইয়াও বাবরের বিরোধিতা করিলেন। এই সময়ে (১৫২৯ খ্রীঃ) বিহারের শাসনকর্তা বাহার লোহানীর মৃত্যুতে আফঘান-বিরোধিতার ভিত্তি শিথিল হইয়া গেল। অন্যদিকে সাসারামের জায়গিরদার হাসান শূরের পুত্র শের খান শূর বাবরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া দক্ষিণ-বিহারে জায়গির গ্রহণ করিলেন। জৌনপুরের সুলতান জামাল খানও তখন শের খানের পৃষ্ঠপোষক। বিহারের শাসনভার বাহার খান লোহানীর শিশুপুত্র জালাল খান লোহানীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। শিশু জালাল খানের পক্ষে বাবরের বিরোধিতার নায়কত্ব করা সম্ভবপর ছিল না, সুতরাং সে দায়িত্ব আসিয়া পড়িল নসরৎ শাহের উপর; কিন্তু মুঘলের সহিত বন্ধুত্বের মুখোশও তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

পূর্বাঞ্চলের নায়কত্ব লইয়া বিভিন্ন আফঘান সর্দারের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হইল। মুহম্মদ শাহ ফারমুলী, জালাল খান লোহানী, শের খান শূর, নসরৎ শাহ প্রভৃতি নায়কগণ তখনও সর্বসম্মতিক্রমে একজন অধিনায়কের অধীনে মুঘলশক্তির অগ্রগতি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সময়ে ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মামুদ লোদীর আগমনে পূর্বাঞ্চলে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। মামুদ লোদীর বংশ মর্যাদায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নেতৃত্বে বহু আফঘান বাবরের বিরুদ্ধে একত্রিত হইল। বিহার-সুলতান জালালখানের দুর্বলতার সুযোগে মামুদ লোদী বিহারের একাংশে আধিপত্য বিস্তার করিলেন। লোহানী সর্দারগণ মামুদের এই আচরণে অসন্তুষ্ট হইলেন। জালাল তাঁহার অনুচরবর্গসহ পিতৃবন্ধু নসরৎ শাহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শিশু জালাল খান লোহানী হাজীপুরে মকদুম-ই-আলমের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইবার মুঘল প্রতিরোধের মেরুদণ্ড হইলেন নসরৎ শাহ।

মামুদ লোদীর সঙ্গে নসরৎ শাহ, শের খান, সর্দার বিওয়ান খান, বায়াজিদ খান, কুতুব খান, হিন্দু জমিদার বসন্ত রায় বাবরের বিরুদ্ধে যোগ দিলেন। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে মহা উৎসাহে সৈন্য চলাচল আরম্ভ হইল। গঙ্গা নদীর উভয় তীর অনুসরণ

করিয়া মামুদ লোদী এবং শের খান চুনার হইতে বারাণসী অভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করিলেন। বিওয়ান ও বায়াজিদ গোগরা অতিক্রম করিয়া গোরক্ষপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।[১] নসরৎ শাহের আদেশে গৌড়ীয় সেনাপতি কুতুব খান বাহ্‌রাইচ অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন—উদ্দেশ্য লক্ষ্ণৌ অধিকার।[২] বাবরও সসৈন্যে বিহার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

বিরোধিদলের ঐক্য নষ্ট: বাবরের বঙ্গাভিমুখে অগ্রসর

কিন্তু দুইমাসের মধ্যেই মামুদ লোদীর অকর্মণ্যতা এবং চরিত্রের শ্লথতায় সকলে বিরক্ত হইয়া উঠিল। মামুদ লোদী বাবরের আগমনের সংবাদ পাইয়াই যুদ্ধ না করিয়া মাহোবার দিকে পলায়ন করিলেন[৩]—বিরোধিদলের ঐক্য নষ্ট হইয়া গেল। শেরখান বারাণসী অধিকার করিলেও একমাসের মধ্যেই বাবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। জালালখান লোহানীও বক্সারের নিকট বাবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।[৪] বাবর তীরভুক্তি অধিকার করিয়া গঙ্গা ও গণ্ডকীর সঙ্গমস্থলে বিওয়ান এবং বায়াজিদের অধীন আফঘানদিগকে পরাজিত করিলেন।[৫] অতঃপর বাবর বঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নসরৎ শাহের সমকর্মী বন্ধুগণ ক্রমান্বয়ে সকলেই মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিলেন—১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে বাবর তাঁহার বক্সারের শিবির হইতে নসরৎ শাহের দূত ইসমাইলের সঙ্গে আর একজন দূত প্রেরণ করিয়া নসরৎ শাহের সৈন্যবাহিনীকে গোগরা নদীর তীর ত্যাগের আদেশ দিলেন। যুদ্ধ করা ব্যতীত নসরৎ শাহের আর কোন উপায় ছিল না; তথাপি নসরৎ শাহ উত্তর প্রদানে বিলম্ব করিতে লাগিলেন; উদ্দেশ্য—বিওয়ান এবং বায়াজিদের বাহিনীকে গোগরা তীরে উপস্থিতির সময় দান। ইতোমধ্যে তিনি মকদুমকে গোগরা-গঙ্গার সঙ্গমস্থলে সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করিতে নির্দেশ দিলেন। বাবর একমাসকাল নসরৎ শাহের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিলেন, অবশেষে তিনি গোগরা নদীর তীর হইতে বঙ্গসৈন্যের অপসারণ দাবি করিয়া ইসমাইল মিতা নামক আর একজন দূত প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। তিন দিবসব্যাপী যুদ্ধ চলিল—বাঙ্গালী পদাতিক, অশ্বারোহী ও নৌবাহিনী যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও মুঘল রণকৌশলের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। বীর বসন্ত রায় এই যুদ্ধে নিহত হইলেন।[৬] জালাল খান লোহানী স্বয়ং বাবরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কর প্রদানের শর্তে বিহারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন; শের শাহ বাবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন; নসরৎ শাহের সৈন্যদল গোগরা নদীর তীর পরিত্যাগ করিল—গণ্ডক নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল মুঘল অধীনে চলিয়া গেল। স্থির হইল, বঙ্গের সুলতান মামুদ লোদীকে কোনপ্রকার সহায়তা করিবেন না।[৭]

---

১) *Babar*, Vol. III, P. 652
২) *Riyaz-us-Salatin*, P. 138
৩) Elphinstone, *History of India*, 9th Edn., P. 245
৪) *Babar*, Vol. III, Pp. 659-676
৫) গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা
৬) *Babar*, Vol. III, Pp. 669-74
৭) গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা

নসরৎ শাহের কূটবুদ্ধির ফলে মুঘল সৈন্য বঙ্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাই। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হইল—নসরৎ শাহ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে মামুদ লোদী পুনরায় মুঘল সৈন্যের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিওয়ান খান, বায়াজিদ খান এবং শের খান একযোগে জৌনপুর হইতে মুঘলসৈন্য বিতাড়িত করিলেন। লক্ষ্ণৌ আক্রান্ত হইল। নসরৎ এই অভিযানে কতখানি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কোনও সঠিক বিবরণ জানা যায় না। তবে মামুদ লোদী বঙ্গদেশ হইতে প্রচুর সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হুমায়ুনের সহিত মামুদ লোদীর দাদরা নামক স্থানে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে বিওয়ান খান এবং বায়াজিদ খান নিহত হইলেন। শেরখান ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া হুমায়ুনের বশ্যতা স্বীকার করিয়া দিল্লীর অধীনে চুনারে জায়গির গ্রহণ করিলেন। মামুদ লোদী পরাজিত হইয়া রাজ্যত্যাগ করেন এবং অবশেষে পাটনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় ৯৪৯/১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।[১] হুমায়ুন তখন বঙ্গদেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন।

হুমায়ুনের নিকট শের খান ও মামুদ লোদীর পরাজয়

নসরৎ শাহ গত্যন্তর না দেখিয়া হুমায়ুনের শত্রু গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য খোজা মালিক মরজানকে প্রেরণ করিলেন। বাহাদুর হুমায়ুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। হুমায়ুন এই সংবাদ পাইয়া বঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযান না করিয়া গুজরাট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নসরৎ শাহের এই কূটনীতি সাময়িকভাবে বাঙ্গলাকে যুদ্ধের আবর্ত হইতে রক্ষা করিল, কিন্তু নসরৎ শাহের আকস্মিক মৃত্যুতে বাঙ্গলা-গুজরাটের মৈত্রীপ্রস্তাব পরিপূর্ণরূপে কার্যকরী হইতে পারিল না।

আহোম যুদ্ধ

নসরৎ শাহ বাঙ্গলাদেশকে স্বস্তি দিতে ইচ্ছা করিলেও ঘটনাচক্রে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণভাবে শান্তি উপভোগ করিতে পারে নাই। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের সহিত সন্ধি হইলেও ঐ বৎসর হইতেই আহোমগণের সহিত দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম আরম্ভ হইল। আহোমগণ হুসেন শাহের আক্রমণের ক্ষতচিহ্ন বিস্মৃত হয় নাই। আহোম রাজ্যের সীমান্তবর্তী স্থানে মুসলিম ও আহোম জাতির যুদ্ধ সংক্রামক ব্যধিতে পরিণত হইয়াছিল। আসাম বুরঞ্জী অনুসারে প্রায় প্রতি বৎসরই মুসলিমদের সহিত যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে সংবাদগুলি ধারাবাহিক নহে—অনেক সময়ে বৃহৎ ঘটনার উল্লেখ ইঙ্গিত মাত্রেই শেষ হইয়াছে—কখনও সামান্য ঘটনার সংবাদ অত্যন্ত দীর্ঘ করা হইয়াছে। ঘটনার কাল ও পারম্পর্য অনেকস্থানে অসংলগ্ন—মুসলিম ইতিহাসকারগণ নিজেদের পরাজয়ের সংবাদ দিতে কার্পণ্য করিয়াছেন।

১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন নসরৎ শাহ ও বাবরের বিরোধ চরমে উঠিয়াছিল, তখন অকস্মাৎ আহোমরাজ সুহুঙ্গ-মুঙ্গ ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিয়া মুসলিম অধিকৃত হাজো

১) Elliot, *History of India*, Vol. IV, Pp. 349-50

অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কোন সংঘর্ষের সংবাদ জানা যায় না। আহোমগণ কর্তৃক ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে নারায়ণপুরে একটি সেনানিবাস স্থাপিত হইয়াছিল—উদ্দেশ্য মুসলিম নগরী হাজো আক্রমণ। দুই বৎসর পরে মুসলিমগণ পদাতিক, অশ্বারোহী ও নৌবাহিনীসহ দারাঙ অঞ্চলের আহোমরাজ্য আক্রমণ করিল (১৫৩১ খ্রীঃ)। তেমানী বা ত্রিমোহনীর জলযুদ্ধে বাঙ্গলার মুসলিম সেনাবাহিনী পরাজিত হইয়া কামরূপে আশ্রয় গ্রহণ করিল। আহোম নরপতি সুহুঙ্গ মুঙ্গ ভবিষ্যতে মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে সলায় ও দক্ষিণে সিংগীরীতে দুইটি দুর্গ নির্মাণ করিলেন। সেই বৎসরই মুসলিম সেনাপতি বিটমালিক বা মিত মালিকের অধীনে) সুলতানের সৈন্য সিংগীরীর আহোম দুর্গ আক্রমণ করিল। আহোম সেনাপতি বরপাত্র গোহাই বিটমালিককে নিহত করেন; মুসলিমদের পরাজিত করিয়া তাঁহাদের পঞ্চাশটি অশ্ব ও বহু বন্দুক হস্তগত করেন এবং মুসলিম সেনাবাহিনীকে খাগারিজান (নওগাঁ) পর্যন্ত বিতাড়িত করেন।[১]

নসরৎ শাহের মৃত্যু

ক্রমাগত পরাজয় ও বিফলতায় নসরৎ শাহের মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিল। সলিম গোলাম হোসেন বলেন—"শেষ বয়সে তাঁহার চরিত্রে নানা প্রকার দোষ সংক্রামিত হইল।" একদা নসরৎ শাহ গৌড়ের অপরপ্রান্তে পিতা হুসেন শাহের সমাধি দর্শনে গিয়াছিলেন। পথে তাঁহার সহচর একজন খোজাকে অন্যায় ব্যবহারের জন্য শাস্তি প্রদান করেন। খোজার অপরাধ সঠিক জানা যায় না। এই শাস্তিতে খোজা সম্প্রদায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করিল। প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলে ঐ খোজার প্ররোচনায় অন্যান্য খোজাগণ নসরৎ শাহকে হত্যা করিয়া অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। রিয়াজ-উস-সালাতীন অনুসারে নসরৎ শাহ ষোড়শ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৯৪৩/১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।[২]

নসরৎ শাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব

নসরৎ শাহ যৌবনে পিতার সহকর্মী ছিলেন। বোধহয় সিংহাসন লাভের আকাঙ্ক্ষায় তিনি পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফতেহাবাদ হইতে তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। পরে পিতার সঙ্গে তাঁহার মিলন হয়। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি ভ্রাতৃহত্যা করেন নাই।

পিতার অনুকরণে নসরৎ শাহ পররাষ্ট্র ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল পূর্বভারতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রাধান্য লাভ এবং মুঘল রাজ্যবিস্তারের প্রচেষ্টার প্রতিরোধ করা। কিন্তু পিতার মত সফলকাম তিনি হইতে পারেন নাই। জীবনের শেষ ছয় বৎসর (১৫২৬—১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) তাঁহার বিশেষ কর্মব্যস্ততার মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। লোদী রাজত্বের অবসানে এবং মুঘল আগমনে বাঙ্গলাদেশে একটা জটিল সমস্যার উদ্ভব হইল। মামুদ লোদীর অকর্মণ্যতা,

১) Gait's *History of Assam*, Pp. 87—90

২) *Riyaz-us Salatin*, Eng. Tr. P. 136

আফঘান সর্দারদের অস্থিরবুদ্ধি ও শের খানের কূট স্বার্থবুদ্ধি বাঙ্গলার সুলতানকে বিব্রত করিয়াছিল। তবু তাঁহার কূটবুদ্ধি দ্বারা বাঙ্গলাদেশ উপকৃত হইয়াছিল। আহোম যুদ্ধের জন্য তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব ছিল না। বঙ্গ-আহোম সংঘাত বহুকাল-পুঞ্জীভূত বিরোধের ফল। জীবনের শেষ সময়ে নসরৎ শাহের বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছিল।

নসরৎ শাহের নানা দোষ সত্ত্বেও তিনি বাঙ্গলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ ছিলেন না। তাঁহার রাজত্বকালে পরাগল খানের পুত্র ছুটী খানের আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন।[১] নসরৎ খানের আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের কিয়দংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতে উল্লেখ আছে—

নসরত খান।
রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিদান ॥[২]

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নসরৎ শাহের নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল ফতেয়াবাদে।

নসরৎ শাহ স্থাপত্য নির্মাণে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহের রাজত্ব কালের বহু শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গৌড়ের অন্যতম প্রধান তোরণ 'দাখিল দরওয়াজা'র সন্নিকটে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনিও একটি তোরণ নির্মাণ করাইয়াছিলেন (৯১৬/১৫১৯-২০ খ্রীঃ)।[৩] ৯৩১/১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ে নসরৎ শাহ কর্তৃক শেখ আখি সিরাজ উদ্দীনের সমাধি-তোরণ নির্মিত হইয়াছিল।[৪] ৯৩২/১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে নসরৎ শাহ গৌড়ের প্রসিদ্ধ বারদুয়ারী বা সোনা মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।[৫] মহম্মদের পদচিহ্ন রক্ষার জন্য তিনি গৌড়ের প্রসিদ্ধ কদম রসুল মসজিদের বেদী নির্মাণ করাইয়াছিলেন (৯৩৭/১৫৩০ খ্রীঃ)।[৬] নসরৎ শাহ একলক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে গৌড়ের নিকটে পিতার সমাধি নির্মাণ করেন। এই স্থানটি এক-লাখা নামে এবং সমাধিটি বাদশাহ কা মজাব বা কবর নামে পরিচিত হয়। ইহার প্রবেশদ্বার প্রস্তরনির্মিত এবং প্রাচীর নীল ও শ্বেত 'চীনা টালি' দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। চারিকোণে চারিটি মিনার ছিল; প্রতিটি মিনারে প্রস্তরখচিত পদ্ম ছিল। সমাধিক্ষেত্রে হুসেন শাহ ও তাঁহার পরিবারের অনেক মৃত সন্তান শায়িত ছিল। নসরৎ শাহ দেশের নানাস্থানে কূপ খনন করিয়া জলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; মালদহে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। নসরৎ শাহ ব্যতীত অন্যান্য আমীর-ওমরাহগণও তোরণ ও কূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

নসরৎ শাহের স্থাপত্য প্রীতি

---

১) D. C. Sen—*History of Bengali Language and literature* p. 204
২) *Ibid*, p. 202
৩) *Epigraphic Indo-moslemica* 1911-12, Pp. 5-7
৪) *JASB, Old series*, 1873, p. 296
৫) Ravenshaw, *Gour-its ruins and inscriptions*, p. 15
৬) *JASB, Old Series*, 1872, p. 338

আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ
(১৫৩২—১৫৩৩ খ্রীঃ)

নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর আবার বাঙ্গলার সিংহাসন লইয়া রক্তস্রোত বহিয়া গেল। ৯৩৩/১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত আবদুল বদরের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে অনুমান করা যায় যে, নসরৎ শাহের জীবিতকালেই তাঁহার ভ্রাতা আবদুল বদর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু আবদুল বদরের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরুজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। আলাউদ্দীনকে দরবারের যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত আমীর সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিহারের অন্তর্গত হাজীপুরের শাসনকর্তা মকদুম-ই-আলমের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রিয়াজ-উস-সালাতীন অনুসারে আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ মাত্র তিন মাস রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।[১] আলাউদ্দীন হুসেন শাহের অপর পুত্র ঘিয়াসউদ্দীন মামুদ ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীনের স্বল্প পরিসর রাজত্বের দুইটিমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায়। আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহের নামাঙ্কিত কতিপয় রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে—এই সমস্ত মুদ্রা ৯৩৯/১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল।[২] শ্রীধর কর্তৃক রচিত বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানেও আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। যৌবনে আলাউদ্দীন বাংলা ভাষায় যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের রচয়িতা আলাউদ্দীন ফিরুজের প্রশস্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

ঘিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহ
(১৫৩৩—১৫৩৮ খ্রীঃ)

ভ্রাতুষ্পুত্রের রক্তে রঞ্জিত হস্তে আবদুল বদর রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন—তাঁহার রাজ-উপাধি হইল 'ঘিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহ'। কিন্তু হাজীপুরের মকদুম-ই-আলম ছিলেন প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী—তিনি মামুদ শাহের প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন না। ফিরুজ শাহের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন;[৩] তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন বিহারের নায়েব মালিক বা সহকারী শাসনকর্তা। বাঙ্গলার দুর্ভাগ্যের পুনরাবর্তন আরম্ভ হইল।

মামুদ শাহের রাজত্ব-কালে ভারত-রঙ্গমঞ্চের অন্যান্য নায়কগণ

ঘিয়াসউদ্দীন মামুদশাহের স্বল্প পরিসর শাসনকাল (পাঁচ বৎসর, ১৫৩৩—১৫৩৮ খ্রীঃ) ভারতবর্ষের—তথা বাঙ্গলার ভাগ্য পরিবর্তনের যুগ। তাঁহার রাজত্বে ভারতের রঙ্গমঞ্চে বহু ঘটনা সংঘটিত হইল। এই নাটকের নায়ক হইতেছেন—

দিল্লীর সিংহাসনে হুমায়ুন—মুঘলরাজত্বের প্রারম্ভ যুগ।

বাঙ্গলার সিংহাসনে ঘিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহ—অধঃপতনের যুগ।

---

১) *Riyas-us-Salitin, Eng.* Tr., p. 137

২) *Catalogue of Coins in the Indian museum-Cal.* Vol. II, P. 179

৩) *Riyas-us-Salatin, Eng. Tr*, P. 138

বিহারের সিংহাসনে জালাল লোহানী—শিশু নায়কত্বের দুর্বলতা।
সাসারামের জায়গিরদার শের খান—আফঘান বংশের পুনরুত্থানের যুগ।
গুজরাটের সিংহাসনে বাহাদুর শাহ—নিরপেক্ষ দর্শক।

এই উত্থান-পতনের জটিল আবর্তনে বিহারের লোহানীবংশ, বাঙ্গলার হুসেন শাহী বংশ, দিল্লীর চাঘতাই বংশ চলচ্চিত্রের ছবির মতন ভারতের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিল—আফঘান শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল—সুদূর পূর্বভারতীয় আফঘান নায়ক সমস্ত উত্তর ভারত জয় করিলেন, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। পশ্চিমে বাহাদুর শাহ ছিলেন এই রাষ্ট্রলীলার সাক্ষী-স্বরূপ। বাঙ্গলার ঘটনাবর্তে তিনি সাময়িকভাবে জড়িত হইয়াছিলেন মাত্র।

ঘিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহই এই রাষ্ট্রলীলা নাটকের সূত্রধর ছিলেন। কিন্তু এই রাষ্ট্রলীলার জটিল গ্রন্থি ও গতি নিরীক্ষণ ও পরিচালনা করিবার মত সূক্ষ্মবুদ্ধি তাঁহার ছিল না। সুতরাং কোন্ অভিজ্ঞতাকে কোন্ দৃশ্যে নিয়োজিত করিতে হইবে তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—সম্ভাব্য শত্রু ও মিত্রের গুরুত্ব ও ক্ষেত্র নির্ণয় কবিতে পারেন নাই।

বিদেশাগত মুঘল বিজেতাকে ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান কেহই যে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে নাই—তাহা ঘিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহ বুঝিতে পারেন নাই। লোহানী বংশ এবং শেরখান হুমায়ুনের বশ্যতা স্বীকার করিলেও যে মনেপ্রাণে মুঘলদের বিরুদ্ধাচারী ছিলেন, তাহা বুঝিবার মত সূক্ষ্মদৃষ্টি তাঁহার ছিল না। সুদূর গুজরাটের বাহাদুর শাহের সঙ্গে নসরৎ শাহের সখ্যস্থাপনের প্রয়াস যে কত দূরদৃষ্টির পরিচায়ক সে দিক দিয়া তিনি চিন্তাই করেন নাই। সমস্ত ঘটনাগুলিকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা না করিয়া ঘিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহ জালাল খান লোহানীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়া আপাতঃ শত্রু হাজীপুরের শাসনকর্তা মকদুম-ই-আলমের বিরুদ্ধে অভিযানই তাঁহার রাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য ছিল। শের খান ও মুঘলদের বিরুদ্ধে যে একটি সমবেত প্রচেষ্টা সম্ভব, তাহা ঘিয়াসউদ্দীন অনুধাবন করিতে পারেন নাই। বরং তিনি শের খানকেই শত্রু বিবেচনা করিলেন। লোহানীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া তিনি একটিমাত্র লোষ্ট্র নিক্ষেপে দুই শত্রু—মকদুম ও শেরখানকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিলেন।

মামুদ শাহের দূরদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম-বুদ্ধির অভাব

প্রথমেই ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘিয়াসউদ্দীন মুঙ্গেরের শাসনকর্তা কতুবখানকে মকদুম-ই-আলমের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।[১] মকদুম ছিলেন শের খানের মিত্র; সুতরাং মকদুমের পরাজয়ে শের খানের পরাজয় হইবে বলিয়া ঘিয়াসউদ্দীন ধারণা করিয়াছিলেন। জালাল খান লোহানীরও এই অভিযানে সমর্থন ছিল। ফলে পূর্বাঞ্চলে দুইটি দল সৃষ্টি হইল—একদিকে ঘিয়াসউদ্দীন ও জালাল খান এবং অন্যদিকে মকদুম ও শের খান। আব্বাস খান সরওয়ানী রচিত তারিখ-ই-শেরশাহী অনুসারে শের খান দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া বিহারে প্রত্যাবর্তন করিলে গৌড়রাজের অধীনস্থ কর্মচারী হাজীপুরের সরলস্কর বা শাসনকর্তা মকদুমের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব

---

১) *Riyas-us-Salatin, Eng. Tr.*, p. 138

হইয়াছিল।[১] তারিখ-ই-শেরশাহী অনুসারে মামুদ শাহ বিহার বা মগধ প্রদেশ আফঘানদের নিকট হইতে জয় করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন।[২] রিয়াজ-উস-সালাতীন ও তারিখ-ই-শেরশাহী অনুসারে শের খান মামুদ শাহের সহিত মকতুম-ই-আলমের সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।[৩] হুমায়ুনের পক্ষে এই দুইটি দলের সৃষ্টি শুভ হইয়াছিল। দূরদর্শী শের খান ঘিয়াসউদ্দীন মামুদকে মকতুমের বিরুদ্ধাচরণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন—কিন্তু মামুদ কুতুব খানের সৈন্যকে হাজীপুর আক্রমণ হইতে প্রতিহত করেন নাই—ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হইল। শেরখানের সহিত কুতুব খানের যুদ্ধ হইল—যুদ্ধে কুতুব খান নিহত হইলেন।

কুতুব খানের পরাজয় এবং মৃত্যুতে বাঙ্গলার সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। জালাল খান লোহানীও শের খানের বিজয়ে অপমান বোধ করলেন--কারণ শেরখান তখনও বিহারের অধীন একজন সামান্য জায়গিরদার মাত্র। জালাল খানের উদ্দেশ্য শেরখানের বিনাশ এবং ঘিয়াসউদ্দীনের লক্ষ্য মকতুম-ই-আলমের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ। মামুদ শাহ মকতুমের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করিলেন—লোহানী-সুলতান শেরখানের সৈন্যদলকে হাজীপুরে গমনের পথে বাধা দিলেন। কারণ শের খান কুতুব খানের পরাজয়ে লুণ্ঠিত বিপুল ধনরত্নের কপর্দকও লোহানী সুলতানকে প্রদান করেন নাই। শের খান ইসমু খান নামক একজন বিশ্বস্ত সেনাপতিকে হাজীপুরে প্রেরণ করিলেন। মকতুম তাঁহার সমস্ত ধনসম্পদ ইসমু খানের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। যুদ্ধে মকতুম-ই-আলম নিহত হইলেন।[৪] মামুদ শাহের প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ হইল। ইসমু খান মকতুমের গচ্ছিত ধনসম্পদ শের খানের হস্তে সমর্পণ করিলেন—ভবিষ্যতে এই অর্থ লোহানীদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল।

মকতুম-ই-আলম নিহত : তাঁহার ধনসম্পদ শেরখানের হস্তগত

লোহানীগণ মকতুমের পরাজয়ে এবং শের খানের অর্থপ্রাপ্তির সংবাদে বিচলিত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিলেন—কিন্তু বিফল হইলেন। জালাল খান উপায়ান্তর না দেখিয়া গৌড়ের সুলতানের আশ্রয় যাচ্ঞা করিলেন এবং যুদ্ধের ছলে সসৈন্যে বঙ্গে প্রবেশ করিয়া জালাল খান লোহানী মুঙ্গেরে মামুদ শাহের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। এইবার মামুদ শাহ জীবনের ও সম্মানের শীর্ষস্থানে উন্নীত হইলেন—শত্রু মকতুম নিহত, হুমায়ুন বাহাদুর শাহের সহিত ভারতের পশ্চিম প্রান্তে যুদ্ধে ব্যাপৃত, লোহানী বংশ তাঁহার বশংবদ, বিহার গৌড়ের আশ্রিত, বিহারের উদ্ধত জায়গিরদার শের খানও আইনতঃ তাঁহার অধীন। কিন্তু মামুদ শাহের ভাগ্যাকাশে একখণ্ড মেঘ তখনও চঞ্চলগতিতে আবর্তন করিতেছিল। কারণ,

---

১) *Elliot, Hist. of India* Vol. IV, P. 333

২) *Ibid*

৩) *Elliot, Vol. IV*, P. 133. *Riyas-us-Salitin, Eng. Tr.* P. 138

৪) *Riyas-us-Salitin, Eng. Tr.* P. 138
Elliot, Vol. IV, P. 134

জালাল খান রাজ্যত্যাগ করিয়া বাঙলায় আশ্রয় গ্রহণ করায় বিহারের শূন্য সিংহাসন বিনাযুদ্ধে শের খানের হস্তগত হইল।

মামুদ শাহের সেনাপতি কুতুব খানের পুত্র ইব্রাহিম এবং জালাল খান লোহানী বহু অশ্ব, পদাতিক, কামান সঙ্গে লইয়া মুঙ্গের হইতে জায়গিরদার শের খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন (১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগ)। শের খানও কালবিলম্ব না করিয়া গৌড়রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইলেন। শের খান চতুর্দিকে মৃন্ময় প্রাচীর নির্মাণ করিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। গৌড়-সেনাপতি ইব্রাহিম খান শের খানের শিবির অবরোধ করিয়া গৌড়েশ্বরকে আরও সৈন্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ করিলেন। শের খান কৌশল অবলম্বন করিলেন—তিনি দূতমুখে ইব্রাহিম খানকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, পরদিন প্রভাতে তিনি শিবির হইতে বহির্গত হইয়া যুদ্ধ করিবেন। রাত্রিশেষে শের খান অল্প সংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য শিবিরে রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যসহ উচ্চভূমির অন্তরালে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রভাতে গৌড়ীয় সেনা শিবির আক্রমণ করিলে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শের খানের সৈন্য একবারমাত্র শর নিক্ষেপ করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। আফঘানগণ পলায়ন করিতেছে মনে করিয়া গৌড়ীয় সেনা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। শের খান গুপ্তস্থান হইতে লুক্কায়িত সেনাদল সহ বহির্গত হইয়া গৌড়ীয় সেনা আক্রমণ করিলেন। গৌড়ীয় সেনা রণে ভঙ্গ না দিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল—ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সুরজগড়ের যুদ্ধে ইব্রাহিম খান নিহত হইলেন। সেনাপতি নিহত হইলে গৌড়ীয় সেনা পরাজিত হইল এবং গৌড়েশ্বরের কোষাগার, সমস্ত হস্তী ও তোপ শের খান কর্তৃক অধিকৃত হইল।[১] জালাল খান পলায়ন করিয়া মামুদ শাহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মামুদ শাহের ভাগ্যাকাশের মেঘখণ্ড ঘনীভূত হইয়া উঠিল। মামুদ শাহের অপরাজেয় শক্তি আহত হইল—শেরখানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চতুর্দিক হইতে ভাগ্যান্বেষী আফঘানগণ সুরজগড়-বিজেতা শেরখানের দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করিল—কারণ, আফঘানগণ বিজয়ীর নিকট মস্তক অবনত করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করে না। "অস্তায়মান সূর্যের আলো অচিরে লুপ্ত হইয়া যায়"—এই প্রবাদবাক্য আফঘানগণ অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করে এবং অনুসরণ করে।

সুরজগড়ের যুদ্ধ: কূটবুদ্ধি শেরখানের জয়—ইব্রাহিমখান নিহত

মামুদ শাহ এবং শের খান উভয়েই বুঝিতে পারিলেন যে, শেষ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলে একজনই অবশিষ্ট থাকিবেন। মামুদ শাহের মনে শের খানের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপেক্ষা ঘৃণার ভাবই অধিক ছিল—বাঙলার সুলতানের দম্ভ আহত হইয়াছিল, তাঁহার রাজসম্মান ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই পুনরাক্রমণের ক্ষমতা আর তাঁহার ছিল না। মামুদ শাহ পর্তুগীজ সাহায্যে বিরাট বাহিনী রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শের খানও অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু হুমায়ুনের গতিবিধি লক্ষ্য না করিয়া শের খান অর্বাচীনের ন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন না।

১) *Elliot* Vol. IV, Pp. 338-339

১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে হুমায়ুন সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন—শের খান নিশ্চিন্ত হইলেন। এবার তিনি স্বয়ং গৌড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন (১৫৩৬ খ্রীঃ)। তখনও বর্ষা আরম্ভ হয় নাই।

তেলিয়াগড গিরিবর্ত্ম তখনকার দিনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ বলিয়া পরিগণিত ছিল। তেলিয়াগডের উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে রাজমহল—তথা সাহেবগঞ্জ পর্বতমালা, মধ্যভাগে তিনক্রোশ পরিমিত উন্মুক্ত পথ। বঙ্গে প্রবেশের এই সংকীর্ণ গিরিপথ ভিন্ন আর কোন পথ নাই। জলপথে বঙ্গে প্রবেশ করা যাইত, কিন্তু সে পথ ছিল বিপদসংকুল। ঝাড়খণ্ডের পার্বত্য পথ অপরিচিত—বন্য পশু সমাকুল, কোথাও নিবিড় ঘন অরণ্য কোথাও বা খরস্রোতা স্রোতস্বতী। বনপথে বা পার্বত্যপথে একক মানুষ পদব্রজে চলিতে পারে, কিন্তু খাদ্য, রসদ ও যুদ্ধোপকরণ সঙ্গে লইয়া পর্বত অতিক্রম করা ছিল নিতান্তই বিপজ্জনক ও কষ্টকর। অতএব তেলিয়াগড়ের গিরিপথের আশ্রয় ব্যতিরেকে কেহ বাঙ্গলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার কল্পনা করিতে পারিত না। ঘিয়াসউদ্দীন বলবন, ফিরুজ তুঘলক প্রভৃতি অভিযানকারীরা তেলিয়াগড় অতিক্রম করিয়া বাঙ্গলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন; সঙ্গে অনুসরণকারিগণ কেহবা নৌকাযোগে গঙ্গা অতিক্রম করিয়াছিল। মামুদ শাহ তেলিয়াগড়ের গিরিবর্ত্ম সুরক্ষিত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন।

তেলিয়াগড়ের গুরুত্ব

শের খান প্রথমে তেলিয়াগডের পথে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মামুদ শাহের সৈন্যগণ সে পথে অগ্রসর হইতে বাধাপ্রদান করিল। শের খান পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি কার্যক্ষেত্রে নূতন উপায় নির্বাচন করিলেন। তাঁহার পুত্র জালাল খানকে একদল সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া তেলিয়াগডের প্রত্যন্ত-দেশে অবস্থান করিতে নির্দেশ দিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে গৌড়ের সৈন্যদলকে ব্যাপৃত রাখিবেন—যেন কোন সন্দেহের উদ্রেক না হয়। স্বয়ং শের খান ঝাড়খণ্ডের পার্বত্য পথে বহু সৈন্য-রসদ নষ্ট করিয়া গৌড়ের প্রান্তে উপস্থিত হইলেন।[১] অবশ্য ঝাড়খণ্ডের রাজার হস্তিবাহিনীর সাহায্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন। মামুদ শাহ স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, কোন সৈন্যবাহিনী ঝাড়খণ্ডের পথে তেলিয়াগড়কে পশ্চাতে রাখিয়া গৌড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। দুঃসাহসী শের খান জীবনসংগ্রামে সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীবন পণ করিয়াছেন। মামুদ শাহ শত্রুসৈন্যের অতর্কিতও আকস্মিক উপস্থিতিতে চকিত, ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। নিজেকে নিরুপায় বিবেচনা করিয়া তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজীও এই অপ্রত্যাশিত পথেই বঙ্গে প্রবেশ করিয়া তদানীন্তন বঙ্গ-নরপতি লক্ষ্মণসেনকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন—মামুদ শাহ সন্ধি স্থাপন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। প্রায় তিন শত চল্লিশ বৎসর পরে আবার ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিল।

ঝাড়খণ্ডের পথে শেরখানের গৌড়-সীমান্তে উপস্থিতি

১) Ahmad Yadger, *op. cit.* 183. *Quanango*, Pp. 120-124

ঘিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহের পর্তুগীজ বন্ধুগণ এই সন্ধির প্রস্তাব সমর্থন করিলেন না। তাঁহারা আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধ করিয়া কালক্ষেপ করিতে পরামর্শ দিলেন। কারণ, বর্ষাকাল পর্যন্ত যদি শের খানকে গৌড়ের প্রান্তে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখা যায়, তবে ঘন বর্ষায় বাঙ্গলার নদীপথ প্লাবিত হইয়া যাইবে; শের খানের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা থাকিবে না—অনায়াসে শত্রুকে বিনাশ করা যাইবে। বাঙ্গলার নদনদী বহুবার বাঙালীকে দিল্লীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে। আসামের নদনদী বহুবার আসামকে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু মামুদ শাহ অতীত স্মৃতি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি অনিশ্চিত বর্ষার জন্য অপেক্ষা করিতে ভরসা পাইলেন না। শের খান যে বঙ্গে তাহার এই ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক অসুবিধার বিষয় অবহিত ছিলেন না তাহা নহে। সুতরাং তিনি মামুদ শাহের সন্ধির প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করিলেন। পর্তুগীজ বিবরণ অনুসারে তের লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে শের খান গৌড় আক্রমণ না করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন।[১] তেলিয়াগড়ের গিরিপথ শের খানের অধিকারভুক্ত হইল।

শেরখান কর্তৃক চুণার দুর্গ অধিকার

এই সময়ে শের খান কৌশলে চুণার দুর্গ অধিকার করিলেন; ইহা একটি নাটকীয় ব্যাপার। সুলতান ইব্রাহিম লোদীর রাজত্বকালে বৃদ্ধ তাজ খান চুণার দুর্গের কিল্লাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে লাদ মালিকা নাম্নী এক রূপসী তরুণীর রূপমুগ্ধ হইয়া তাজ খান তাঁহাকে বিবাহ করিলেন; ফলে তাজ খানের প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রগণ লাদ মালিকার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হন। তাজ খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র লাদ মালিকাকে অপমান করেন। পিতা তাজ খান ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে হত্যা করিতে উদ্যত হন। পিতা-পুত্রের বিবাদে পিতা নিহত হইলেন। লাদ মালিকা অতিশয় বুদ্ধিমতী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন। তিনি অর্থ দ্বারা সৈন্যদের বশীভূত করিয়া চুণার দুর্গের অধিকার অব্যাহত রাখিলেন। শের খান এই সংবাদ পাইয়া লাদ মালিকাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন—অবশ্য লাদ মালিকারও সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। শের খানের সাহায্য লাদ মালিকাকে রক্ষা করিল। লাদ মালিকা শের খানকে বিবাহ করিয়া নিজের স্বার্থ সুদৃঢ় করিলেন—প্রভূত অর্থ ও চুণার দুর্গ শের খানের হস্তগত হইল।

তেলিয়াগড়ের পথে শেরখানের গৌড়াভিযান

ঘিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহ পুনরায় শের খানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিলেন। মামুদ শাহ শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে পর্তুগীজগণকে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিলেন। পর্তুগীজগণ এক বৎসর পরে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল।[২] শের খান পর্তুগীজ প্রতিশ্রুতি এবং মামুদ শাহের প্রস্তুতির সংবাদ অবগত হইয়া সময় নষ্ট না করিয়া তেলিয়াগড়ের পথে গৌড়ে অভিযান প্রেরণ করিলেন—কারণ দেখাইলেন—মামুদ শাহ প্রতিশ্রুত কর প্রদান করেন নাই।

অন্যদিকে শের খানের এই ঔদ্ধত্য এবং সামরিক অভিযানে ধৈর্যচ্যুত হইয়া হুমায়ুন পূর্বাঞ্চলে অগ্রসর হইলেন। শের খানের পক্ষে পূর্বে বঙ্গ-সীমান্তে এবং পশ্চিমে বিহার-

১) *History of Bengal*, D. U., Vol. II, P. 168
২) *Campos*, p. 40

সীমান্তে যুগপৎ যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অত্যন্ত সংকটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হইল।

শের খানের কৌশল ও রণনীতি

শের খান তাঁহার পুত্র জালাল খান এবং অভিজ্ঞ সেনাপতি খাওয়াস খানকে গৌড় অবরোধের আদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং হুমায়ুনের অগ্রগতি প্রতিহত করিবার উদ্দেশে পশ্চিমে সৈন্য পরিচালনা করিলেন। হুমায়ুন সোজাসুজি বঙ্গাভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করিলে মামুদ শাহ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতেন; কিন্তু, শের খান কৌশলে হুমায়ুনকে অর্ধপথে চুণার অবরোধ করিতে বাধ্য করিলেন। উদ্দেশ্য—হুমায়ুনকে যত দিন বেশী সম্ভব চুণারে ব্যাপৃত রাখিবেন। ইতোমধ্যে জালাল খান ও খাওয়াস খান গৌড় বিজয় সম্পন্ন করিবেন।

শের খানের কৌশল ও রণনীতি সফল হইল। হুমায়ুন চুণার যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিলেন। ইতোমধ্যে মামুদ শাহের রাজধানী গৌড়ে খাদ্যাভাব উপস্থিত হইল। মামুদ শাহ যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। যুদ্ধে আহত হইয়া মামুদ খান কোনমতে উত্তর-বিহারে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। বিজয়ী জালাল খান গৌড় নগরী অধিকার করিলেন (৯৪৪/১৫৩৮, ৬ই এপ্রিল)। মামুদ শাহের দুই পুত্র বন্দী হইলেন।[১]

চুণার অবরোধের জন্য শের খান প্রস্তুত ছিলেন এবং সেইভাবে দুর্গরক্ষার্থ আয়োজন করিয়াছিলেন। হুমায়ুন চুণার দুর্গ অধিকার করিয়া গৌড়াভিমুখে অগ্রসর হইলে শেষ পর্যন্ত শের খান সন্ধির প্রস্তাব করিলেন; শর্ত হইল—শের খানের বঙ্গে অধিকৃত স্থানের উপর শের খানের অধিকার স্বীকৃত হইবে বিহারে অধিকৃত অঞ্চল দিল্লীর অধীন থাকিবে—শের খান তাঁহাকে কর প্রদান করিবেন।

এইবার মামুদ শাহ কিঞ্চিৎ বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি শের খানের বিরুদ্ধে হুমায়ুনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং শের খানের সঙ্গে সন্ধি ভঙ্গ করিতে পরামর্শ দিলেন।[২] দিল্লী ও গৌড়ের সম্মিলিত সৈন্য সহযোগে শের খানকে আক্রমণ করিলে আফঘান ধ্বংস সম্ভব বলিয়া নিবেদন করিলেন। হুমায়ুন এই পরামর্শ গ্রহণ-যোগ্য বিবেচনা করিয়া শের খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পথে মুঙ্গেরে মামুদ শাহ হুমায়ুনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। হুমায়ুন কিন্তু মামুদ শাহকে রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন বা অভ্যর্থনা করেন নাই।[৩] মামুদ শাহের সৈন্যগণ হুমায়ুনের সেনা-বাহিনীর সহিত তেলিয়াগড়ের পথে অগ্রসর হইল। জালাল খান ও খাওয়াস খান তেলিয়াগড়ের গিরিপথে এক মাসকাল হুমায়ুনের গতিরোধ করিয়াছিলেন।[৪] তেলিয়া-গড় অধিকৃত হইলে হুমায়ুন পুনরায় গৌড়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে ভাগল-পুরের নিকট কহলগ্রামে হতভাগ্য সুলতান মামুদ শাহ সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার দুই পুত্র গৌড়ে বন্দী হইয়াছিলেন—তাঁহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে। নিদারুণ মনস্তাপে,

শের খানের বিরুদ্ধে দিল্লী-গৌড়ের মিলিত অভিযান

---

১) *Elliot*, Vol. IV, P. 360
Riyaz-us-Salatin, *Eng.* Tr., Pp. 139-140

২) *Elliot*, Vol. IV. Pp. 362-63

৩) *Ibid*, p. 364

৪) *Ibid*, p. 367

অসহ্য শোকে, নিষ্ফল আক্রোশে গৌড়াধিপতি হুমায়ুনের শিবিরেই ইহলীলা সংবরণ করিলেন (৯৪৪/১৫৩৮ খ্রীঃ)।[১]

ঘিয়াসউদ্দীন মামুদের চরিত্র ও কৃতিত্ব

মামুদ শাহের রাজত্বকাল অত্যন্ত ঘটনাবহুল। পাঁচ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে অতি অল্পদিনই তিনি নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করিতে পারিয়াছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের রক্তে রঞ্জিত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন বটে, কিন্তু সে সিংহাসন তাঁহার পক্ষে কণ্টকশয্যাই হইয়াছিল। তাঁহার অধীন মালিক মকদুম-ই-আলম প্রথম দিন হইতেই শত্রুতা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং আমরণ মামুদ শাহকে বিব্রত রাখিয়াছিলেন। মৃত্যু দিনে তাঁহার সমস্ত ধনসম্পদ দুর্ধর্ষ শত্রু শের খানের হস্তে সমর্পণ করিয়া শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বুদ্ধির দোষে মামুদ শাহ গুজরাট সুলতান বাহাদুর শাহের সহিত মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করিতে পারেন নাই; শের খানের সহিত যোগদান করিয়া হুমায়ুনকে বিব্রত করেন নাই। জালাল খান লোহানী ছিলেন সমসাময়িক সুলতানদের মধ্যে দুর্বলতম, তাঁহার আফঘান সর্দারগণ ছিলেন চঞ্চলবুদ্ধি। মামুদ শাহ দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিলেন; নিজের অগোচরে শের খানকে করিলেন শত্রু। অন্যদিকে তাঁহার চরম দুর্ভাগ্য যে, শের খানের মত কূটবুদ্ধি, সুকৌশলী, বিচক্ষণ সেনানায়কের সঙ্গে তাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইয়াছিল। অবশ্য লোহানীর সঙ্গে যোগ না দিয়া শের খানের মত বিশ্বাসঘাতকের সহিত বন্ধুত্ব করিলেও শেষ পর্যন্ত মামুদ শাহ বাঙ্গলা দেশ রক্ষা করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক দিয়াও মামুদ শাহ ছিলেন অস্থিরবুদ্ধি, ভীরু, কাপুরুষ, অদূরদর্শী এবং ইন্দ্রিয়াসক্ত। তাঁহার হারেমে 'দশ সহস্র' নারী ছিল। পর্তুগীজ ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, সংখ্যায় দশ সহস্র না হইলেও অসংখ্য নারী তাঁহার অন্তঃপুরে আবদ্ধ ছিল—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মামুদ পিতা বা ভ্রাতার কোন গুণের অধিকারী ছিলেন না—ঘটনাচক্রে তাঁহাকে পশ্চিমে হুমায়ুন এবং পূর্বে শের খানের ন্যায় শত্রুর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইয়াছিল—কিন্তু তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যোগ্যতা তাঁহার ছিল না।

৪) *Riyaz-us-Salatin*, *Eng.* Tr. Pp. 141-142

শেষ অনুচ্ছেদ

হুসেনশাহী বংশ প্রকৃতপক্ষে বঙ্গের যথার্থ মুসলিম রাজবংশ। হুসেন শাহ বাঙ্গালী—একথা তিনি বিস্মৃত হন নাই। তিনি বাঙ্গলাকে দিল্লীর রাজ্যাংশরূপে কল্পনা করেন নাই। তাঁহার রাজত্বকালে বঙ্গের সীমা পূর্বে কামরূপ, দক্ষিণে ত্রিপুরা এবং পশ্চিমে আজমগড়ের পশ্চিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি সিকন্দর লোদীকে বাঙ্গলার সহিত সম্মানজনক শর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহ দিল্লীর বাদশাহ বাবরকে সম্মানজনক শর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এমন কি চতুর-চূড়ামণি শের খান পর্যন্ত মামুদ শাহের সঙ্গে দীর্ঘকাল যাবৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সম্মুখীন হইতে সাহস করেন নাই। হুমায়ুন যদি চুণারে বিলম্ব না করিয়া বঙ্গদেশে উপস্থিত হইতেন এবং মামুদ শাহের সঙ্গে যোগদান করিতেন, তবে সম্ভবতঃ মুঘল ইতিহাসের প্রারম্ভ অন্যরূপে রচিত হইত এবং শূর বংশের উদ্ভব নাও হইতে পারিত। মামুদ শাহকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া কলঙ্কিত করা হয় বটে, কিন্তু একদিকে শের খান, অন্যদিকে হুমায়ুন এবং মধ্যস্থলে অনিশ্চিত, অশান্ত, অনমনীয় আফঘান জায়গিরদারদের উপর নির্ভর করিয়া মামুদ শাহের পক্ষে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল। যাহা হউক, হুসেনশাহী বংশের সময়ে বাঙ্গলার গৌরব যেমন সমস্ত উত্তর-ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল, তেমনই এই বংশের সময়েই স্বাধীন বাঙ্গলার অস্তিত্ব চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছিল। মাত্র কয়েক বৎসরের জন্য শূর বংশ ও কররানী বংশ বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিল—তারপর বঙ্গদেশ দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি সুবা বা প্রদেশে পরিণত হইল।

হুসেনশাহী বংশ আরব হউক আর বাঙালী হউক কর্মে ও চিন্তায় মুসলমানের সহজাত ধর্মের বিলাস বাদ দিয়া বিচার করিলে বঙ্গদেশের হিতাকাঙ্ক্ষিরূপে গৌরবের আসন তাঁহাদেরই প্রাপ্য। তাঁহাদের মনে কোন বহির্ভারতীয় প্রেম ছিল না। তাঁহারা বাঙ্গলা দেশকে ভালবাসিয়াছেন, বাঙ্গলার কল্যাণকামনা করিয়াছেন, বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহারা হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছেন, হিন্দুদের বিশ্বাস করিয়া সচিবপদে উন্নীত করিয়াছেন, সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। হিন্দু কবিদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহারা উপাধি দান করিয়াছেন। হিন্দু রাজা ও জমিদারগণ দিল্লীর বাদশাহ বা বিহারের সুলতানের বিরুদ্ধে বাঙ্গলার সুলতানের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন—ইহাও হুসেনশাহী বংশের কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

(ক) মসজিদ, কবর, দরগা—বঙ্গদেশে মুসলিম অধিকার বিস্তারের নিদর্শন।

(খ) তুর্ক-আফঘান যুগে বঙ্গদেশে টাঁকশাল ও টাঁকশাল নগরী বঙ্গদেশে মুসলিম অধিকার বিস্তারের নিদর্শন।

(গ) তুর্ক-আফঘান যুগে বঙ্গদেশের শাসন ও রাজস্ব বিভাগ বঙ্গদেশে মুসলিম অধিকার বিস্তারের নিদর্শন।

(ঘ) তুর্ক-আফঘান যুগে বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারের ধারা, উপায় ও পদ্ধতি—হিন্দু-মুসলিম বিবাহ।

(ঙ) তুর্ক-আফঘান যুগে বঙ্গদেশে মুসলিম শাসনের সার্থকতা—তুর্ক-আফঘান যুগে হিন্দুর জ্ঞান ও জ্ঞানানুশীলন।

মসজিদ, কবর, দরগা—বঙ্গদেশে মুসলিম অধিকার বিস্তারের নিদর্শন

ভুমিকাঃ মুসলিমগণ যুদ্ধ জয়ের পরে মসজিদ নির্মাণ করিয়া রাজ্যজয়ের সমাপ্তি ঘোষণা করিত। মুসলিমের পক্ষে যুদ্ধজয়ের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল আল্লার নিকট জয়ের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য বিশ্বাসী মুসলিমগণ সমবেত-ভাবে প্রার্থনা করিত। মুসলিম সৈন্যের যুদ্ধ জয় ছিল আল্লার জয়। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া মুসলিমগণ যুদ্ধে অগ্রসর হইত। প্রার্থনার জন্য তাহারা মসজিদ বা প্রার্থনাগৃহ নির্মাণ করিত। মুসলমানের পক্ষে প্রতিদিন পাঁচবার নমাজ আবশ্যিক; সমবেত প্রার্থনা বা জুম্মা নমাজ ছিল ইচ্ছাধীন। অন্ততঃ সপ্তাহে একটি দিন (শুক্রবারে) মুসলিমগণ প্রার্থনাগৃহে (মসজিদে) সমবেত হইয়া আল্লার নিকট প্রার্থনা করিত। এইজন্য শুক্রবারকে মুসলিমগণ "জুম্মা রোজ" অথবা পুণ্য দিবস মনে করে।

মসজিদ ছিল ধর্মের প্রয়োজনে প্রার্থনাগৃহ, কিন্তু রাজনীতির প্রয়োজনে সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্র এবং খলিফার নাম ঘোষণা ও আগামী দিনের কার্যক্রমের নির্দেশদানের স্থান। নমাজের পরে মসজিদে ইমাম উপদেশ প্রদান করিতেন। সুতরাং দেশ জয় করা মাত্রই মুসলিম বিজেতা ধর্মগোষ্ঠীর প্রয়োজনে মসজিদ নির্মাণ করিতেন এবং মুসলিম গোষ্ঠীকে সমবেত করিয়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার নির্দেশ দিতেন— মুসলিমগণ আল্লার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিত।

বাস্তবিক পক্ষে মসজিদ ছিল মুসলিম ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির মুখ্য কেন্দ্র। এই মসজিদ-সংস্থা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা।

ভারতে মসজিদ নির্মাণে মুসলমানের কোন অসুবিধা হয় নাই; কারণ, হিন্দুর ছিল মন্দির ও দেবালয়, বৌদ্ধদের ছিল চৈত্য ও বিহার। মন্দির ও বিহারকে ধ্বংস করিয়া অথবা পরিবর্তিত করিয়া মুসলিমগণ তাহাদের মসজিদ নির্মাণ আরম্ভ করিল। একদিকে বিধর্মীর ধর্মালয় চূর্ণ করিয়া, অন্যদিকে ইসলামের ধর্মস্থান নির্মাণ করিয়া মুসলিম বিজেতৃগণ সহজে পুণ্য সঞ্চয় করিত।

হিন্দুর মন্দিরকে মুসলিমগণ অনেকস্থলে কবরস্থানেও পরিণত করিত; বৌদ্ধ বিহার ও দেবমন্দিরের গর্ভগৃহ পীর, গাজী ও সুলতানের সমাধিব জন্য ব্যবহৃত হইত। এই কবরকে কেন্দ্র করিয়া অনেক সময় দরগা গড়িয়া উঠিত; ঐ দরগা ও কবরগুলি বৎসরের বিশেষ দিনে বিশেষ প্রার্থনার জন্য ব্যবহৃত হইত।

বাঙ্গলাদেশের মসজিদ, কবর ও দরগাগুলির স্থান, কাল, পাত্র আলোচনা করিলে মুসলিম অধিকার বিস্তারের অতি মূল্যবান চিত্র পাওয়া যায়। এই সমস্ত

মসজিদগাত্রে অনেক সময় নির্মাতার নাম, সমসাময়িক সুলতানের নাম এবং কবরের মধ্যে সমাহিত সুলতান, গাজী, ফকীর অথবা পীরের নাম উল্লিখিত থাকিত।

অবশ্য অনেকগুলি স্মৃতি যত্নের অভাবে এবং কালের প্রভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হিন্দু অথবা মুসলিম কেহই মুসলিমের কবর, মসজিদ বা দরগার অপমান করে নাই। মুসলিমগণ হিন্দুর মন্দির নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু হিন্দুগণ মুসলিমের মসজিদ বা কবর নষ্ট করে নাই।

নিম্নে বর্ণ-ক্রম অনুসারে বঙ্গদেশে তুর্ক-আফঘান যুগের কয়েকটি মসজিদ, কবর ও দরগার নিদর্শন বিবৃত করা হইল। বাঙ্গলায় মুসলিম অধিকার বিস্তারের আলেখ্য রচনায় এইগুলি নির্ভরযোগ্য উপাদান।

খুলনা

বর্তমান খুলনা জেলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল খলিফতাবাদ নামে পরিচিত ছিল। পীর খান জাহান আলী দিল্লী হইতে সানুচর বর্তমান বাগেরহাট অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। তিনি এইখানে একটি মহল বা সরকার গঠন করেন। খলিফতাবাদ বর্তমান যশোহর ও পশ্চিম বাখরগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কাজী মসজিদ ঃ খুলনা জেলার সেনের বাজার একটি বিখ্যাত গঞ্জ ছিল। এইখানে কাজী মসজিদ নামে একটি মসজিদ আছে ; উহা হুসেনশাহের সময় চতুরঙ্গ খান নামে একজন ধর্মান্তরিত হিন্দু কর্তৃক নির্মিত হয়। এই 'চতুরঙ্গ' নাম হিন্দু সংস্পর্শ প্রমাণ করে।

যখন কোন হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করিত বা করিতে বাধ্য হইত, তাহাকে মুসলমান নারী বিবাহ করিয়া ধর্মান্তর অনুষ্ঠানকে সুসম্পন্ন করিতে হইত।

চতুরঙ্গ খানের মুসলিম পত্নীর গর্ভজাত দুই পুত্র সুবী খান এবং সুচী খান সেনের বাজারের কাজী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। এক কালে এই পরিবার হিন্দু ব্রাহ্মণ বংশজাত বলিয়া গর্ববোধ করিত।

ষাটগম্বুজ মসজিদ ও পীর খান জাহান আলীর দরগা ঃ এই মসজিদ এবং দরগা খুলনা, তথা পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে মুসলিম অধিকার প্রমাণ করে। ষাটগম্বুজ মসজিদে অবশ্য সাতাত্তরটি গম্বুজ আছে।

চাঁদখালি মসজিদ ঃ মসজিদকুড় গ্রামে এই অতি প্রাচীন চাঁদখালি মসজিদটি অবস্থিত। এই মসজিদের তিন সারিতে নয়টি গম্বুজ অদ্যাপি অম্লান। এই মসজিদে চারিটি মিনার আছে। বাঙ্গলায় মুসলিম বিজয়ের দ্বিতীয় শতকে (চতুর্দশ শতাব্দীতে) এই মসজিদটি নির্মিত হয়।

লাবসা মসজিদ ঃ সাতক্ষীরার দুই মাইল দূরে এই মসজিদটি অবস্থিত। এখানে বিখ্যাত মাই চম্পার দরগা (চম্পাবতী) রহিয়াছে। বোধ হয় এই চম্পাবতী

আদি চম্পা নহে, এটি কল্পিত ধর্মস্থান। চম্পাবতী আত্মসম্মান রক্ষার জন্য জলমগ্ন হইয়া আত্মবিসর্জন করেন। এই চম্পাবতীর নামে 'মাই চম্পার দরগা' প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্ববঙ্গে 'সাতভাই চম্পা'র কাহিনী প্রচলিত।

পূর্ব বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে চম্পাবতীর কাহিনী নানাভাবে গাঁথা, গান ও ছড়ার মধ্যে ছড়াইয়া আছে। কারণ, চম্পাবতী হরণ বা বিসর্জনের সঙ্গে মুসলিমদের কীর্তি বা অ-কীর্তি জড়াইয়া আছে। বহু মুসলিম গাজী হিন্দু নারী হরণ করিয়া বিবাহ করিত এবং হিন্দু পত্নীকে চম্পাবতী আখ্যা দিয়া গৌরব বোধ করিত। সতীত্বগৌরবের জন্য চম্পাবতী সমসাময়িক ছড়া, গাঁথা ও কিংবদন্তীতে বঙ্গদেশে অমর হইয়া রহিয়াছেন।

মালদহ

বর্তমান মালদহ জেলা বাঙ্গলাদেশে মুসলমান অধিকার বিস্তারের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল। বাঙ্গলার প্রায় তিনশত বৎসরের মুসলিম ইতিহাসের সহিত মালদহের ঐতিহ্য বিজড়িত। গৌড় ও পাণ্ডুয়া দীর্ঘকালব্যাপী মুসলমানদের রাজধানী ছিল। একক বিচারে অদ্যাপি মালদহ জেলায় অবস্থিত মসজিদ, কবর, দরগা, সমগ্র বাঙ্গলাদেশের মিলিত মসজিদ, কবর ও দরগা অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। গৌড়ের প্রায় প্রত্যেকটি প্রাসাদ, গৃহবাটিকা, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, রাজপথ, প্রাচীর, মসজিদ, কবর, দরগা, মাদ্রাসার সঙ্গে ইসলাম বিস্তারের স্পর্শ অনুভব করা যায়। গৌড়, পাণ্ডুয়া ও মালদহের এই সমস্ত স্মৃতিচিহ্নের বিষয়ে অতি ক্ষুদ্র বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল :

বড় দরগা : ১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দে আলী মুবারক শাহ্ পীর জালালউদ্দীন মকবুল শাহের দরগার জন্য একটি বিরাট দরজা নির্মাণ করেন। এই দরগার পার্শ্বে একটি মসজিদ আছে, উহার নাম বড় দরগা। এই বড় দরগার ভিত্তি ছিল একটি বিরাট হিন্দু মন্দির।

আদিনা মসজিদ : ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আদিনা মসজিদ সুলতান সিকন্দর শাহ কর্তৃক নির্মিত হয়। এই মসজিদটি পূর্বে ছিল হিন্দুর দেবতা আদিনাথ বা শিবের মন্দির। এই আদিনা মসজিদ আয়তনে বাঙ্গলাদেশে বৃহত্তম মসজিদ—দশ সহস্র মুসলমান একসঙ্গে এখানে নমাজ পড়িতে পারে। ইহার দৈর্ঘ্য ৫০৭ ফুট এবং বিস্তার ২৮০ ফুট। সুলতান সিকন্দর শাহ স্বয়ং আদিনা মসজিদে নমাজ পড়িতেন। তাঁহার আসনটি অদ্যাপি সগৌরবে সিকন্দর শাহের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। এই আসনের নাম 'বাদশা কা তক্‌ত'। এই মসজিদে ৩৭৮টি গম্বুজ আছে।

আদিনা মসজিদের প্রবেশদ্বারে একটি বৌদ্ধ মূর্তির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই মসজিদটি ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দর শাহ কর্তৃক আরম্ভ হইলেও পরবর্তী অনেক সুলতান ইহার সঙ্গে নূতন নূতন অংশ সংযুক্ত করেন। আদিনা মসজিদের উত্তর দিকে **সিকন্দর শাহের কবর** অবস্থিত রহিয়াছে।

আদিনা মসজিদের অদূরে এবং অতিদূরে বহু দেবদেবীর বিগ্রহের ভগ্ন ও অর্ধভগ্ন অংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মুসলমানগণ প্রথমে এই সমস্ত বিগ্রহ বিপরীত দিকে স্থাপন করিয়া মসজিদ নির্মাণ করিত, কখনও জুম্মা মসজিদের শিলাতলে প্রোথিত করিত। উদ্দেশ্য—আল্লার ধর্মপ্রাণ বান্দা কাফেরের দেবতা-বিগ্রহ পদদলিত করিয়া পুণ্য অর্জন করিবে ও আল্লার বিজয় ঘোষণা করিবে। প্রকাশ্য বাজারে মুসলমান কসাইগণ গোমাংস বিক্রয়ের জন্য এই সমস্ত বিগ্রহ বা বিগ্রহের ভগ্নাংশ ওজন বা বাটখারা রূপে ব্যবহার করিত। এই বিগ্রহগুলির ভগ্ন অংশগুলি সংযুক্ত করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহাদের অধিকাংশই কৃষ্ণ, বলরাম, কার্তিক, গণেশ এবং দুর্গার মূর্তি।

একলাখী মসজিদ ঃ ১৪১৮-১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা গণেশের পুত্র যদুমল্ল বা জালালউদ্দীন বিখ্যাত একলাখী মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদটি বাস্তবিকপক্ষে একটি কবর। একলাখী মসজিদ আটটি স্তম্ভের উপরে স্থাপিত। এই মসজিদে একটিমাত্র গম্বুজ আছে। কবরের অভ্যন্তরভাগ হিন্দু স্থাপত্যরীতি অনুসারে অলংকৃত। সম্ভবতঃ একলাখী মসজিদ জালালউদ্দীনের পিতা রাজা গণেশের প্রতিষ্ঠিত একলক্ষ্মী দেবীর মন্দিরের রূপান্তর। যদুসেন বা জালালউদ্দীন শেখ কুতুবউল আলম কর্তৃক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কুতুবউল আলমের সম্মানার্থে একলাখী মসজিদ পরিকল্পিত হইয়াছিল। কাহারো কাহারো মতে এই মসজিদ নির্মাণে একলক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল, সেই জন্য এই মসজিদের নাম একলাখী মসজিদ। ক্যানিংহাম-এর মতে এই মসজিদের অভ্যন্তরে জালালউদ্দীন শায়িত আছেন। র‍্যাভেনশ' বলেন, এই কবরটি সুলতান ঘিয়াসউদ্দীনের সমাধি।

ছোট দরগা অথবা **নুর কুতুবউল আলম** কা **দরগা ঃ** কুতুবউল আলম রাজা গণেশের সমসাময়িক। তিনি বাঙ্গলায় ইসলাম ধর্ম প্রচারের অন্যতম উদ্যোক্তা। নাসিরউদ্দীন মামুদ শাহের সময় (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রীঃ) লতিফ খান নামক একজন মুসলিম আমীর কুতুবউল আলমের সম্মানার্থে এই দরগাটি নির্মাণ করেন।

এই মসজিদের দরগা **ভালেশ্বরী** নামে পরিচিত। একটি মন্দির ধ্বংস করিয়া ছোট দরগা নির্মিত হয়। ভালেশ্বরী এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। ভালেশ্বরী দেবীর নামে উৎসর্গীকৃত একটি তালুক আছে। ছোট দরগার নামে ভালেশ্বরী তালুকের আয় ব্যয়িত হয়।

ছোট দরগার পার্শ্বে একটি কুমীরের বিরাট প্রস্তরমূর্তি রহিয়াছে। এই কুমীরের মুখের মধ্য দিয়া জল নিষ্কাষিত হইয়া থাকে। মুসলমানগণ এই কুমীরের মূর্তিটি ধ্বংস করে নাই। মুসলমানের মতে শূকরের মতন কুমীরও ছিল অস্পৃশ্য বা 'হারাম'। সুতরাং মুসলমান এই কুমীরের প্রস্তরমূর্তিটি ধ্বংসের জন্যও স্পর্শ করে নাই।

ইউসুফ শাহের সময়ে (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রীঃ) নির্মিত **চামকাটি মসজিদ** (১৪৭৫ খ্রীঃ), **লোটন মসজিদ** (১৪৭৫ খ্রীঃ), **তাঁতীপাড়া মসজিদ** (১৪৮০ খ্রীঃ) প্রভৃতি এখনও গৌড়ের মুসলিম গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

চামকাটি মসজিদ ঃ এই মসজিদটি একজন ফকিরের নামে উৎসর্গিত। এই ফকির প্রতি বৎসর বকর ঈদের পুণ্যদিনে স্বীয় গাত্রচর্ম উৎপাটিত করিয়া আল্লার নামে উৎসর্গ করিতেন। সেই পুণ্যকর্ম দর্শনের জন্য বহু মুসলমান এই ফকিরের আস্তানায় সমবেত হইত। সুলতান ইউসুফ শাহ্ (১৪৭৫ খ্রীঃ) এই ফকিরের সম্মানার্থে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এই মসজিদের নাম হইল চামকাটি মসজিদ।

লোটন মসজিদ ঃ সুলতান ইউসুফ শাহের সময় ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মসজিদটি একজন নর্তকী কর্তৃক নিমিত হয়। এই নর্তকী হিন্দু সন্তান—তাহার নাম ছিল মীরাবাঈ। ইউসুফ শাহ মীরাবাঈ-এর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন এবং তাহাকে বিরাট একটি ভূমিখণ্ড দান করেন। এই ভূমিখণ্ড 'মীরা তালুক' নামে পরিচিত হইল। এই নর্তকীর মুসলমানী নাম 'লোটন বিবি' বা 'নতুন বিবি'।

লোটন বিবির নামানুসারে এই মসজিদটি লোটন মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদের ভিত্তি ও প্রস্তরগাত্র হইতে অনুমিত হয় যে, ইহা একটি হিন্দু মন্দির ছিল। এই মসজিদটি গঠন নৈপুণ্যে অনবদ্য, কারুকার্যে অপূর্ব, মণ্ডনে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। মেজর ফ্রাঙ্কলিন বলেন, উত্তর ভারতে লোটন মসজিদের কারুশৈলী অতুলনীয়।

এই লোটন মসজিদের পূর্বদিকে একটি বিরাট সরোবর রহিয়াছে। পূর্ণিমা রাত্রিতে চন্দ্রালোকে মসজিদের প্রাচীরের সবুজ, নীল, পীত ও শ্বেত এই চারিটি বর্ণ সরোবরের সলিলে প্রতিফলিত হইয়া শিল্প-রসিকের নয়নে অপূর্ব কল্পলোক সৃষ্টি করে।

তাঁতীপাড়া মসজিদ ঃ সমস্ত গৌড়ের মধ্যে এই মসজিদটি সৌন্দর্যে অনুপম। এই মসজিদের স্থপতি ওমর গাজীর কবর মসজিদের প্রাঙ্গণে একটি প্রস্তর ফলকের দ্বারা চিহ্নিত রহিয়াছে।

গুণবন্ত মসজিদ ঃ পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে গৌড়ের বিখ্যাত গুণবন্ত মসজিদ ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে ফতে শাহ্ কর্তৃক নির্মিত হয়। এই মসজিদের 'গুণবন্ত' নাম ও কিংবদন্তী হইতে জানা যায়—ভাগীরথীর তীরে গুণবন্ত নামে কোন ব্রাহ্মণ কর্তৃক একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছিল এবং এই মন্দিরটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। এই মন্দিরটি সম্পূর্ণ প্রস্তর দ্বারা নির্মিত, কেবলমাত্র খিলান এবং গম্বুজটি পরবর্তী কালে ইষ্টক দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদটি এখনও বকর ঈদের দিনে নমাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।

বড় সোনা মসজিদ ঃ হুসেন শাহ্ এই মসজিদটির নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন ; তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহ্ উহার নির্মাণ সমাপ্ত করেন (১৫২৭ খ্রীঃ)। যদিও এই মসজিদের নাম 'বড় সোনা মসজিদ'—ইহার মধ্যে কিন্তু সোনার চিহ্নও নাই। বোধ হয় এই মসজিদ নির্মাণে ব্যয়িত অর্থ স্বর্ণ-মানে নিরূপিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহার নাম সোনা মসজিদ। এই মসজিদে অতি বৃহৎ বারটি দরওয়াজা ছিল, অদ্যাপি এগারটি দরওয়াজা এবং চুয়াল্লিশটি গম্বুজ শোভা পাইতেছে। এই মসজিদের নির্মাণ-শৈলী

দিল্লীর লোদী স্থাপত্যরীতি অনুসারে পরিকল্পিত। এই মসজিদে এবং অঙ্গনে দশ-সহস্র মুসলিম একসঙ্গে নমাজ পড়িতে পারে।

বড় সোনা মসজিদ হুসেন শাহী বংশের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। আসাম বিজয়ের স্মারক রূপে হুসেন শাহ বড় সোনা মসজিদের ভিত্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন।

ছোট সোনা মসজিদ ঃ কথিত আছে, ছোট সোনা মসজিদের গম্বুজটি সোনার আস্তরণে আবৃত ছিল। এই মসজিদটি আকারে ক্ষুদ্র; সুতরাং ইহার নাম ছোট সোনা মসজিদ। এই মসজিদের শিল্পী ছিল ওয়ালী মুহম্মদ। তাঁহার কবরটি এই মসজিদের পার্শ্বেই বিদ্যমান।

ছোট সোনা মসজিদে ব্যবহৃত প্রস্তরখণ্ডগুলি হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত। ইহার প্রাচীরের প্রস্তরখণ্ডগুলির মধ্যে হিন্দুর দেব-দেবীর মূর্তি বিপরীত ভাবে স্থাপিত রহিয়াছে।

রাজ বিবির মসজিদ ঃ স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় যে, এই মসজিদটি পূর্বে একজন হিন্দু রাজ্ঞী কর্তৃক মন্দিররূপে স্থাপিত হইয়াছিল।

মন্দিরটি মসজিদে রূপান্তরিত করিয়া ইহার নূতন নামকরণ হয় 'রাজ বিবির মসজিদ'। ইহার উপরে একটি গম্বুজ সংযোজিত করা হইয়াছিল। এই গম্বুজের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান।

বেগ মুহম্মদ মসজিদ ঃ গুণবন্ত মসজিদের অতি নিকটে এই মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদটির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা সম্পূর্ণ রঙীন ইষ্টক দ্বারা নির্মিত।

আখী সিরাজউদ্দীন মসজিদ ঃ একজন সম্মানিত ফকিরের সমাধির উপর এই মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর আখী সিরাজউদ্দীনের মৃত্যু-দিবসে পুণ্যলোভী মুসলমানগণ এই মসজিদে ফকিরের আশীর্বাদ লাভের জন্য সমবেত ভাবে নমাজ পড়ে। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহ এই মসজিদটির নির্মাণ সমাপ্ত করেন।

দরসবারী মসজিদ ঃ হুসেন শাহ ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে 'দরসবারী' নামে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন; উহার পার্শ্বে ছিল একটি মসজিদ। দরস শব্দে ফার্সী ভাষায় 'পাঠ' বুঝায়; সুতরাং দরসবারী শব্দের অর্থ হইল পাঠগৃহ। কামতাপুর বিজয়ের পরে ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহ এই 'দরসবারী' স্থাপন করেন। মসজিদগাত্রে একটি শিলালিপিতে আরবী ভাষায় দরসবারী নির্মাণের কাহিনী উল্লিখিত আছে।

পাণ্ডুয়া ঃ বর্তমান মালদহ শহরের আটক্রোশ দূরে পাণ্ডুয়া নগরী অবস্থিত ছিল। গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মধ্যে সংযোগসূচক বহু রাজপথ ছিল। মালদহের দক্ষিণে সাত মাইল পথ অতিক্রম করিলে পাণ্ডুয়া নগরের ধ্বংসাবশেষ আরম্ভ হয়। পাণ্ডুয়ার প্রাসাদ, মসজিদ, প্রাচীর প্রভৃতি বর্তমানে অতীতের চিহ্ন বহন করিয়া বিদ্যমান। প্রত্যেকটি ধ্বংসাবশেষের মধ্যে হিন্দু দেব-দেবীর ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। মসজিদগুলি প্রায় সর্বত্রই হিন্দুমন্দিরের রূপান্তর মাত্র। হিন্দুর প্রাসাদগুলিও মুসলিমের রাজভবনে পরিবর্তিত হইয়াছিল।

পাণ্ডুয়ার প্রবেশপথে প্রথমে পথিককে সেলামী দরওয়াজা অতিক্রম করিতে হয়। শাহ জালাল নামক বিখ্যাত ফকির পাণ্ডুয়া নগরের প্রবেশপথে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করেন। এখানে একটি দ্বার নির্মিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে প্রত্যেক মুসলমানকে এই প্রস্তরখণ্ডের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া শাহ জালালকে সেলাম বা অভিবাদন করিতে হইত। ইহারই নাম সেলামী দরওয়াজা। এই দ্বারের উপরে আরবী ভাষায় লিখিত ছিল 'ইয়া আল্লা, ইয়া-শাহ জালাল'।

কদম রসুল (মুহম্মদের পদচিহ্ন) ঃ মুহম্মদের পদচিহ্নের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নসরৎ শাহ কর্তৃক এই মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল (১৫৩০ খ্রীঃ)। এই মসজিদের পুরোভাগে মুহম্মদের পদচিহ্ন সম্বলিত একখণ্ড প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন মসজিদে এইরূপ মুহম্মদের পদচিহ্ন-স্মারক প্রস্তরখণ্ড রহিয়াছে। সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক এই কদমরসুল মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হয় এবং পরবর্তী কালে মীরজাফর ইহাকে গৌড়ে প্রেরণ করিয়া পুণ্য অর্জন করেন।

গৌড়ের মসজিদসমূহের পর্যালোচনা করিলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র বঙ্গদেশে যতগুলি মসজিদ আছে, তাহা একত্রিত করিলেও সংখ্যায় গৌড়ের মসজিদের সমান হয় না। স্থাপত্যসৌন্দর্যে, পরিকল্পনায় এবং ঐশ্বর্যে গৌড়ের এই মসজিদগুলি অনবদ্য। কবর ও দরগাগুলি মুসলমানের বঙ্গদেশে অধিকার স্থাপন ও আধিপত্য বিস্তারের নির্ভুল প্রমাণ।

পীর বদরের মসজিদ ঃ এই মসজিদটি চট্টগ্রামের উপকূলে বাঙ্গলায় মুসলিম উপস্থিতির প্রাচীনতম নিদর্শন। ইসলাম ধর্ম প্রচারের আদিপর্বে আরব বণিকগণ জাহাজযোগে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া চট্টগ্রামের উপকূলে পদার্পণ করে। পীর বদরের মসজিদ অদ্যাপি সগৌরবে দুর্ধর্ষ আরব জাতির দুস্তর নদী অতিক্রমণ ও ইসলাম প্রচারের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। পূর্ববঙ্গে নাবিক ও মাঝি-মাল্লারা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত পীর বদরের নাম স্মরণ করে এবং নৌকায় যাত্রা আরম্ভের পূর্বে 'পীর বদরের' নামে শিরনি বা অর্ঘ্য প্রদান করে। শিরনির অভাবে পীর বদরের নাম উচ্চারণ করিয়া জল দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিয়া নৌকা যাত্রা আরম্ভ করে।

মুবারক শাহী মসজিদঃ ফকরুদ্দীন মুবারক শাহ আরাকানরাজ মজাই-এর নিকট হইতে চট্টগ্রাম জয় করেন এবং তাঁহার জয়ের চিহ্নস্বরূপ কর্ণফুলী নদীর তীরে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। মরক্কোর পর্যটক ইবন বাত্‌তুতা তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে এই মসজিদের উল্লেখ করিয়াছেন সিলেট যাত্রার পথে তিনি এই মসজিদে নমাজ পড়িয়াছিলেন (১৩৪৬ খ্রীঃ)।

রাস্তিখান মসজিদ ঃ মুক্ত লাহোছান কাব্যে উল্লেখ আছে যে, রাস্তিখান নামক একজন মুসলিম যোদ্ধা চট্টগ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন (১৪৬৩ খ্রীঃ)।

চট্টগ্রাম শহরের অদূরে পাহাড়তলী নামক পর্বতের সানুদেশে **বায়াজিদ বস্তামীর কবর** এবং **দরগা** রহিয়াছে। উহার নির্মাণকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী ; কিন্তু এই কবরগাত্রের শিলালিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই।

চট্টগ্রাম হইতে মুসলিমগণ সমীপবর্তী দ্বীপময় অঞ্চলে 'ইসলাম' প্রচার করিয়াছিল। আরাকানী, মগ ও হিন্দুদের মধ্যে এই দ্বীপগুলিকে কেন্দ্র করিয়া দীর্ঘকাল সংগ্রাম চলিয়াছিল। এই সমস্ত দ্বীপের অধিবাসীদের শতকরা আশি-পঁচাশি ভাগই মুসলমান।

জলপাইগুড়ি

হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে মুসলিম আগমনের আদি পর্বে নির্মিত কোন মসজিদের চিহ্ন নাই। এই অঞ্চলে হিমালয়-পথে কিংবা তিব্বতের পথে বখতিয়ার খালজী প্রথমে একজন মেচ্ সর্দারকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেন এবং তাঁহার নামকরণ করেন আলী মেচ। এই ধর্মান্তরীকরণের স্থান সম্বন্ধে কোন সু-নিশ্চিত বা সুনির্দিষ্ট নিদর্শন নাই এবং অনেকগুলি স্থানে এই ধর্মান্তর উৎসব অনুষ্ঠিত হইত।

ঢাকা

পাঁচ পীরের দরগা ঃ সোনার গাঁ ছিল ঢাকা জেলার কেন্দ্র ; ঢাকা পরবর্তী নাম। সোনার গাঁয়ে ঘিয়াসউদ্দীন আজমশাহের (১৪১০ খ্রীঃ) একটি কবর আছে। এই কবরের অতি নিকটে পাঁচটি দরগা এবং পাঁচটি মসজিদ আছে। এইগুলি 'পাঁচ পীরের দরগা' নামে বিখ্যাত। বোধ হয় এই পাঁচ জন পীর ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে আগমন করেন এবং এখানেই নিহত হন অথবা তাঁহাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। এই কবরগুলি একই সময়ের। সুতরাং তাঁহাদের যুগপৎ মৃত্যু বা যুগপৎ নিধনের পক্ষে ইহা একটি সহজ অনুমান।

সোনার গাঁ মসজিদ ঃ সোনার গাঁয়ের সর্বপ্রাচীন মসজিদ হুসেন শাহের *সমসাময়িক (১৫১৯ খ্রীঃ)। ইহার তিনটি গম্বুজ নীল টালি খচিত।*

ঢাকা শহরে বর্তমানে প্রাচীনতম মসজিদ **বিনত বিবির মসজিদ** নামে পরিচিত। উহা নারিন্দা মহল্লায় নির্মিত হইয়াছিল (১৪৫৬ খ্রীঃ)।

বাবা আদমের মসজিদ ঃ ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রামপালের চার ক্রোশ দূরে কাজী কসবা গ্রামে এই মসজিদটি নির্মিত হয়। এই মসজিদটি হিন্দু-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত। রামপাল ছিল প্রাচীন পাল বংশের রাজধানী। এখানে বহু হিন্দু মন্দির ছিল। মুসলমানগণ সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দিরটি ধ্বংস করিয়া উহার উপরে 'বাবা আদমের মসজিদ' নির্মাণ করেন। পরবর্তী কালে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে এই অঞ্চলে বার ভুঁইঞার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। বার ভুঁইঞার কোন মসজিদ এখানে নাই। বোধ হয় পদ্মার স্রোতে মসজিদ ও প্রাসাদগুলি সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া গিয়াছে।

দিনাজপুর

দমদমার মসজিদ ঃ দিনাজপুরের নিকটবর্তী গঙ্গারামপুরে এই মসজিদটি অবস্থিত। দমদমা ছিল বঙ্গদেশে মুসলমানদের প্রাচীনতম সেনানিবাস। দমদমার মসজিদ বখতিয়ার খালজীর সময় নির্মিত হইয়াছিল। দমদমা দুর্গ ছিল উত্তরবঙ্গে মুসলমানদের প্রান্তীয় দুর্গ।

দার্জ্জিলিং

শুকনা মসজিদ ঃ মুসলমানদের মধ্যে বখতিয়ার খালজি প্রথমে হিমালয় ও তিব্বত অঞ্চলে অভিযান করিয়াছিলেন। সেই অভিযানের কোন চিহ্ন নাই। ইলিয়াস শাহ স্থায়িভাবে এই পার্বত্য অঞ্চল জয়ের চেষ্টা করেন। দাৰ্জলিং পাহাড়ের পাদদেশে 'শুকনা' এবং 'সোনাদার' মধ্যস্থলে কার্ট রোডের উপরে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। ইহার নাম 'শুকনা মসজিদ'। বর্তমানে ইহা একটি প্রস্তরস্তূপ মাত্র। বোধ:হয় এই স্তূপটি একটি বৌদ্ধ চৈত্য ছিল। সেই চৈত্য ধ্বংস করিয়া মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল।

নোয়াখালি

বজরা মসজিদ ঃ নোয়াখালি জেলা ছিল মুসলিম যুগের 'ভুলুয়া' এবং হিন্দু যুগের 'সমতট'। মুহম্মদ তুঘলকের সময় আমীর শাহ নামক একজন পীর মেঘনার মোহনায় অবতরণ করেন। তিনি বজরা (এক প্রকার সমুদ্রগ্রামী নৌকা) যোগে আসিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার অবতরণের স্থানকে লোকে 'বজরা' আখ্যা দিয়াছিল। এই বজরা গ্রামে একটি প্রাচীন মুসলমান পরিবার রহিয়াছে। তাঁহাদের নির্মিত পারিবারিক মসজিদ হইতেছে এই 'বজরা মসজিদ'। সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহা নির্মিত হইয়াছিল।

রোহিণী মসজিদ ঃ বঙ্গোপসাগরের মধ্যে সন্দীপ একটি দ্বীপপুঞ্জ। এখানে বারজন আউলিয়া ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আগমন করিয়াছিলেন এবং রোহিণী নামক গ্রামে এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহা অদ্যাপি বিদ্যমান। সন্দীপ ছিল মগ, আরাকান ও পর্তুগীজশক্তির সমরক্ষেত্র। ইহারা কেহই মুসলমানের মসজিদ সহ্য করিতে পারিত না—সুতরাং এখানে রোহিণী ভিন্ন অন্য কোথাও প্রাচীন মসজিদের চিহ্ন বিদ্যমান নাই।

কাজী মসজিদ ঃ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কয়েকটি মসজিদ নদীয়া জেলায় এখনও বিদ্যমান। বর্তমান শান্তিপুরের 'তোপখানা মসজিদ' বোধ হয় চৈতন্য যুগের 'কাজী মসজিদ'।

আওরঙ্গজেবের সময় মুহম্মদইয়ার খান 'কাজী মসজিদ'টিকে সংস্কার করেন। এই মসজিদের পার্শ্বে একটি তোপখানা ছিল; সুতরাং ইহা **তোপখানা মসজিদ** নামেও পরিচিত।

ইখতিয়ারউদ্দীন বখতিয়ার খালজী নদীয়া জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নদীয়া নগরে বাস করেন নাই; তিনি বর্তমান বগুড়ার নিকটবর্তী দেবকোটে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে গৌড়ে মুসলিম রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। সমসাময়িক চৈতন্যসাহিত্যে মুসলমান পীর, কাজী ও মোল্লাদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত আছে। চৈতন্যদেব অহিংসা নীতি গ্রহণ করিয়া মুসলমানদের অত্যাচারের বিরোধিতা করেন। ইহাই ভারতে প্রথম অহিংস আন্দোলন।

নদীয়াতে কোন পুরাতন মসজিদ নাই। কারণ, জলপ্লাবনের ভয়ে মুসলমানগণ নদীয়াতে বাস করিত না। রাজনৈতিক প্রয়োজনে তুর্ক-মুসলমানগণ দেবকোট, দমদমা ও গৌড়ে বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিল।

পাবনা

বার-আউলিয়ার মসজিদ: পাবনা জিলার সাহাজাদপুরে এই মসজিদটি অবস্থিত। বিখ্যাত বারজন আউলিয়া পীর মগদ্দিল শাহুল্লার সঙ্গে ইয়ামন হইতে বাঙ্গলাদেশে আগমন করেন এবং পাবনার অদূরে 'হুর সাগরে' অবতরণ করেন। হুর সাগর অঞ্চলে ৭১২ বিঘা নিষ্কর ভূমি পীর মগদ্দিলের মসজিদের জন্য দান করা হইয়াছিল। পীর মগদ্দিলের কবরের পার্শ্বে এক সারিতে পনরটি কবর রহিয়াছে। ইহার মধ্যে তিনটি কবরে পীর মগদ্দিলের তিনটি ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃতদেহ শায়িত রহিয়াছে; পার্শ্বে বার আউলিয়ার কবর রহিয়াছে। কবরের অবস্থান দেখিয়া মনে হয় ইহারা সকলেই হিন্দুর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইয়াছিল।

চাটমহর মসজিদ: পাবনা জেলায় এই মসজিদটি সবিশেষ বিখ্যাত। কাকশাল বংশীয় কোন পাঠান আমীর ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইহা নির্মাণ করেন। ইহার গায়ে একটি শিলালিপি রহিয়াছে। মসজিদের গাত্রে বহু হিন্দুদেবতার মূর্তি সংলগ্ন আছে। সুতরাং মনে হয় চাটমহর মসজিদ হিন্দু-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হইয়াছিল।

ফরিদপুর

ফরিদ খান মসজিদ: মুসলিম পীর ফরিদ খানের নাম হইতে 'ফরিদ খান মসজিদের' উৎপত্তি। বর্তমান ফরিদপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে এই মসজিদটি অবস্থিত। পীর ফরিদ খান সুলতান ইউসুফ খানের গুরু। স্থানীয় বহু কিংবদন্তী পীর ফরিদ খানের অলৌকিক কার্যাবলীকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে।

ফরিদপুরের চারিপার্শ্বেই নদী। তীরভূমি নদীর স্রোতে প্রায়ই বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ফলে, এখানে কোন স্থায়ী প্রাচীন মসজিদের চিহ্ন নাই।

বর্ধমান

হিন্দুযুগের প্রাচীন নগর সোমিলকপুর এবং চম্পা বর্তমানে বর্ধমান নামে পরিচিত। চম্পা নগর পাঠানযুগে সরকার মন্দারণের অধীন ছিল। বর্ধমান শহরে মুঘল যুগের পূর্ববর্তী কোন মসজিদের অস্তিত্ব নাই। এখানে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর-মহিষী মেহেরউন্নিসার স্বামী **শের আফগানের কবর ও মসজিদ** বিদ্যমান আছে।

কালনা কাছারীর অদূরে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার পার্শ্বে দুইটি পুরাতন কবর আছে, **বদর সাহেব** ও **মজলিস সাহেবের কবর**। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সেই কবরে ফুল, ফল, শিরনি প্রভৃতি অর্ঘ্য প্রদান করে এবং খেল্‌না-ঘোড়া পীরের কবরে স্থাপন করিয়া সম্মান প্রদর্শন করে। মনে হয় এই দুই জনই অশ্বারোহী ছিলেন এবং অন্ততঃ একজন প্রথমে হিন্দু ছিলেন। স্থানীয় ছড়ায় তাহাদের উল্লেখ আছে।

বর্তমান কাটোয়া মহকুমা হইতে পাঁচ মাইল দূরে **মঙ্গলকোটে** কয়েকজন ফকিরের কবর ও একটি অতি প্রাচীন মসজিদ আছে। মসজিদের ভিত্তি হিন্দু মন্দিরের অনুরূপ অষ্টকোণবিশিষ্ট। বোধ হয় মুসলিম বিজয়ের আদিপর্বে হিন্দু মন্দিরের উপর ঐ মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল।

বগুড়া

খালজী মসজিদ : বর্তমান বগুড়া শহরের চারি ক্রোশ দূরে ছিল বঙ্গদেশের প্রথম মুসলিম উপনিবেশ—দেবকোট। দেবকোট হিন্দুনাম। মুসলিমগণ ঐ নাম পরিবর্তন করে নাই। ইখতিয়ারউদ্দীন বখতিয়ার খালজী দেবকোটে সর্বপ্রথম একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ইহাই খালজী মসজিদ। এখানে ইসলাম ধর্ম প্রচারক প্রথম বার জন আউলিয়ার অন্যতম শাহ্ সুলতানের কবর রহিয়াছে। এই কবরের প্রাচীরে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সংলগ্ন আছে। এই প্রস্তরখণ্ড ছিল একটি বুদ্ধমূর্তি। উহাকে বিপরীতমুখী করিয়া কবরের গাত্রে সংলগ্ন করা হয়। এই প্রস্তরখণ্ড মুসলিমের ভাষায় 'খোদার পাথর' নামে সম্মানিত।

শাহ্ সুলতানের কবরের পার্শ্বে একটি মসজিদ আছে। উহার গাত্রে একখানি প্রস্তরে ক্ষোদিত আছে—'বাদশাহ ফররুখশিয়ার'। বাদশাহ ফররুখশিয়ার উহা সংস্কার করেন।

শেরপুর খানকা : বগুড়ায় নিকটবর্তী শেরপুরে একটি অতি প্রাচীন মসজিদ বা খানকা আছে। আবুল ফজলের আকবরনামায় একটি খানকার উল্লেখ আছে। বাদশাহজাদা মুরাদ ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ইহাই শেরপুর খান্‌কা নামে পরিচিত।

বগুড়া শহরে পীর তুরকান সাহেবের দেহ দুইটি বিভিন্ন কবরের মধ্যে প্রোথিত আছে—একটিতে পীরের শির, অন্যটিতে তাঁহার দেহ। কথিত আছে, বল্লালসেনের

বিরুদ্ধে যুদ্ধে পীর তুরকান সাহেবের শির ছিন্ন হইয়াছিল। পরবর্তী কালে তাঁহার শির এক কবরে এবং দেহ অন্য কবরে সমাধিস্থ করা হয়।

বগুড়ার অনতিদূরে শেরপুরে **গাজী মিঁয়ার কবর** রহিয়াছে। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় রবিবারে এখানে গাজী মিঁয়ার বিবাহ উৎসব অতিশয় আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। অনুমান করা যায় যে, এই উৎসবানুষ্ঠানের অন্তরালে মুসলিম বীরের সহিত হিন্দুনারীর বিবাহ-অনুষ্ঠান প্রচার করা হইত। এই অনুষ্ঠান মুসলমানের পক্ষে অত্যন্ত সম্মানজনক ছিল, অন্যদিকে হিন্দুর পক্ষে ছিল কলঙ্ক স্বরূপ। প্রকারান্তরে এই 'গাজী মিয়ঁার বিয়া' ইসলামের বিজয় ঘোষণা করে।

গাজীর গানের মধ্যে গাজী মিয়ঁার বিবাহ সম্বন্ধে অনেক ছড়া রহিয়াছে। বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন উৎসবে 'গাজীর গান' গীত হয় এবং 'গাজীর পট' প্রদর্শিত হয়। 'গাজী' শব্দটি মুসলিমদের মধ্যে অত্যন্ত প্রিয়। গাজী শব্দের অর্থ বিধর্মী-হন্তা বা শত্রুহন্তা। বাঙ্গলার মুসলিম সমাজে 'গাজী' শব্দটি অত্যন্ত সম্মানজনক।

বাখরগঞ্জ (বরিশাল, চন্দ্রদ্বীপ)

বাখরগঞ্জ (বরিশাল, চন্দ্রদ্বীপ) ঃ ইহার চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ জলরাশি। বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গ বর্ষায় অনতিক্রমণীয়। সুতরাং মুসলিম বিজয়ের আদিপর্বে এই অঞ্চলে মুসলিম অনুপ্রবেশ সম্ভব হয় নাই। সুলতান বলবনের সময়ে তুঘরিল খান খুলনার সীমা অতিক্রম করেন নাই। খালজী আক্রমণের প্রথম ত্রিশ বৎসর লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ এখানে রাজত্ব করিত। তারপর আসিল ইলিয়াসশাহী বংশ। তাহারা সতত-বন্যা-বিধ্বস্ত এই ভূখণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। রাজা গণেশ ও দনুজমর্দনের বংশধরগণ ১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ১৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান পটুয়াখালির নিকট **মসজিদবাড়ী** গ্রামে প্রথম মুসলিম মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। হয়ত' আরও কয়েকটি মসজিদও ছিল ; কিন্তু মগ, আরাকানী, টিপরা ও পর্তুগীজদের দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের সময় সেই সমস্ত মসজিদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া ছিল প্রাচীন মল্লভূমি। বাঁকুড়া অঞ্চলে কোন মসজিদ নাই ; কারণ দুর্ধর্ষ মল্লরাজগণ কোন মুসলিমকে তাহাদের রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই ; সময় ও সুযোগ বিশেষে পাঠানগণ মল্লরাজ্যের সীমান্তে উপদ্রব করিত মাত্র। মুঘল যুগে আকবরের সময় গড়মন্দারণে মহারাজ মানসিংহ মুঘল অধিকার বিস্তার করেন।

বীরভূম

বীরভূম বিজয়, মুসলিম বিজয়ের প্রথম পর্বের ঘটনা। এখানে তুর্ক-আফঘানদের ক্ষুদ্র একটি দফ্‌তর ছিল। সেই দফ্‌তর ছিল মসজিদের অভ্যন্তরে। কারণ, প্রথম পর্বে মুসলিমের মসী অপেক্ষা অসিরই ছিল প্রাধান্য। সেই দফতরের স্থান ছিল রাজনগর বা নগর। রাজনগরে একটি মসজিদ ছিল বলিয়া সমসাময়িক ইতিহাসে উল্লেখ আছে; বর্তমানে এই মসজিদের একটি জীর্ণ ধ্বংসাবশেষ মাত্র দেখা যায়।

ময়মনসিং

তুর্ক-আফঘান যুগে মুসলমানেরা ময়মনসিং অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু এখানে কোন প্রাচীন মসজিদের চিহ্ন নাই। টাঙ্গাইল মহকুমার করতোয়া গ্রামে পনি-আফঘানদের একটি পুরাতন পারিবারিক মসজিদ রহিয়াছে মাত্র।

মেদিনীপুর

বর্তমান মেদিনীপুর শহরের মধ্যস্থলে একটি মুসলিম দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। ইহার নাম **আব্বাস গড়**। এখানে গাজী শাহ মস্তান আলীর আবাসস্থল রহিয়াছে। পীর মুরশীদ আলী খান কাসাবী বোধ হয় অতি প্রাচীন একটি মন্দিরকে মুসলিম দরগায় পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। কংসাবতী নদীর তীরে হজরত পীর লোহানীর একটি প্রাচীন খানকা ও কবর রহিয়াছে।

মুর্শিদাবাদ

মারাঠা অভিযানের সময় বর্গীরা মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে মুসলমানের সমস্ত প্রাচীন মসজিদ ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল—

পীর তুরকান আলীর মসজিদ ঃ মসজিদটি এই অঞ্চলের সর্ব প্রাচীন মসজিদ। ইহা মহারাজ শশাঙ্কের রাজধানী রাঙামাটির অদূরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে উহা ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে।

আজীমগঞ্জের পাঁচ মাইল দূরে **গয়াসাবাদ দরগা** রহিয়াছে। এই দরগার মধ্যে কয়েকটি প্রস্তর সংযোজিত আছে। এই প্রস্তরগুলি মহাস্থানগড়ের বৌদ্ধ স্তূপ হইতে অপসারিত হইয়াছিল। অনুমান করা যায় যে, গয়াসাবাদের দরগা মুসলমান আগমনের প্রথম পর্বে নির্মিত হয়। কতিপয় হিন্দু মন্দির বা বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ মুসলিম আগমনের আদি পর্বেই মসজিদ নির্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

মণিগ্রাম মসজিদ ঃ হুসেন শাহ শৈশবে মণিগ্রামে সুবুদ্ধি রায় নামক একজন হিন্দুর গৃহে বালকভৃত্য ছিলেন। সেইখানে এক কাজীর গৃহে তিনি প্রতিপালিত হন এবং পরে কাজীর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং মণিগ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদটি অদ্যাপি বিদ্যমান।

মুরতাজা মসজিদ ঃ জঙ্গীপুরে একটি প্রাচীন মসজিদ রহিয়াছে। সৈয়দ মুরতাজা নামক একজন ফকিরের কন্যা উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাই বিখ্যাত 'মুরতাজা মসজিদ'। এই মুরতাজা ছিলেন একজন হিন্দু। এই পিতা ও কন্যার সম্বন্ধে অনেক কাহিনী এখনও জনপ্রিয়।

যশোহর

গরীব শাহের কবর ও বাহরাম শাহের কবর ঃ বর্তমান যশোহরের অদূরে মুরলী কসবা গ্রামে এই দুইটি কবর রহিয়াছে। দুইজনই ছিলেন পীর খান জাহান আলীর মুরীদ বা শিষ্য। বোধ হয় খান জাহান আলী ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশে আগমন করেন। সুতরাং গরীব শাহ এবং বাহরাম শাহের কবর পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই নির্মিত হইয়াছিল। এই কবর দুইটির পার্শ্বে একটি ভগ্ন মন্দির ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে।

বড়বাজার মসজিদ ঃ যশোহর শহরের দশ মাইল দূরে এই বিখ্যাত মসজিদটি অবস্থিত। সপ্তগ্রাম-বিজেতা জাফরখানের পুত্র বরখান গাজী কর্তৃক ইহা নির্মিত হইয়াছিল। বরখান গাজীর বীরত্বের কাহিনী স্থানীয় মুসলমানদিগের নিকট অতি প্রিয় এবং 'গাজী মিয়াঁর বিয়া' নামে প্রচলিত। এই 'গাজী মিয়াঁর বিয়া' নামক কেচ্ছা-কাহিনী বা উপকথার মাধ্যমে মুসলমান গাজীদের সহিত হিন্দু কুমারীর বিবাহের ঘটনা বর্ণিত আছে। 'সাত ভাই চম্পা'র কাহিনী বস্তুতঃপক্ষে মুকুট রায়ের সপ্তপুত্র এবং তাহাদের ভগ্নী চম্পার করুণ আত্মহত্যার চরম কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়। বরখান গাজীর ভ্রাতা কালু গাজীর কামনা-কলুষ হস্ত হইতে নারীত্বের সম্মান রক্ষার জন্য চম্পাবতী আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

এই যুগের অনেক গাজী সুন্দরবন অঞ্চলের (যশোহর-খুলনার) গ্রামে গ্রামে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হিন্দুনারী হরণ করিত। এখনও সুন্দরবন অঞ্চলে গাজীর সম্মানার্থে মুসলমানেরা শিরনি বা অর্ঘ্য প্রদান করে এবং গাজীদের অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনী গান ও ছড়ার মধ্য দিয়া প্রচার করে। অনেক স্থলে হিন্দুরাও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন গাজীর কবরে শিরনি প্রদান করে।

গয়েস কাজীর মসজিদ ঃ ঝিনাইদহ মহকুমার কেন্দ্রস্থলে এই বিখ্যাত মসজিদটি অবস্থিত। মুকুট রায় এই অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। তাহার সৈন্যের কিছু অংশ ছিল পাঠান। কথিত আছে, এক নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে হিন্দুগণ ভুলক্রমে একজন পাঠানকে চামুণ্ডা দেবীর সম্মুখে নরবলি প্রদান করে। ইহার ফলে অন্যান্য পাঠান সৈন্য মুকুট রায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মুকুট রায় পরাজিত হন। তাঁহার কন্যা চম্পাবতী প্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি পুষ্করিণীতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করে। এই পুষ্করিণীর নাম 'কন্যাদহ'। চম্পাবতীর সম্বন্ধে অজস্র কাহিনী বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রিয়। এই কাহিনী হইতে অনুমান করা যায় যে, মুসলমানগণ বাঙ্গলার অভ্যন্তরে

গভীর বন-অঞ্চলে এবং নদীতীরেও প্রবেশ করিয়াছিল। অনেক সময় স্থানীয় হিন্দু রাজার অধীনে বহু পাঠান বেতনভুক্ সৈন্যরূপে কার্য করিত। এখনও ঝিনাইদহ অঞ্চলে কয়েকটি পাঠান পরিবার গয়েস কাজীর বংশধর বলিয়া গর্ব অনুভব করে।

রাজশাহী

শাহী মসজিদ ঃ রাজশাহী-দিনাজপুর জেলার ভাতুরিয়া গ্রাম ছিল জমিদার রাজা গণেশের লীলাভূমি। রাজশাহী জেলার বিখ্যাত মসজিদটি **শাহী মসজিদ** নামে পরিচিত। ১৪৫৯ হইতে ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বরবক শাহ এই মসজিদ নির্মাণ করেন। বর্তমান রাজশাহী কলেজের দক্ষিণ কোণে একটি অতি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। ইহার পার্শ্বে **পীর মকদুম শাহের দরগা** অবস্থিত। মকদুম শাহ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গলাদেশে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

পাঁচ বিবির মসজিদ ঃ পাহাড়পুরের নিকটে এই মসজিদটি রহিয়াছে। বোধ হয় কোন ফকীরের সহিত পাঁচজন হিন্দুনারীর সম্মিলিত ভাবে বিবাহ হইয়াছিল এবং হিন্দু স্ত্রীগণ বিবি নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবতঃ সেই ফকীরই হিন্দু নারী-হরণ স্মরণার্থ এই মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিল।

নিমাই শাহের দরগা ঃ ইহা একটি অতি প্রাচীন মুসলিম দরগা। নিমাই শাহ ছিলেন একজন হিন্দু সন্ন্যাসী। তাঁহাকে ধর্মান্তরিত করা হইলেও তাঁহার নাম পরিবর্তিত হয় নাই। বরেন্দ্র গবেষণা সমিতি উল্লেখ করিয়াছে যে, নিমাই শাহের দরগা একটি প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপের উপর নির্মিত হইয়াছিল।

ইসমাইল গাজী মসজিদ ঃ রাজশাহী জেলার নসরতাবাদে নসরৎ শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজী কাঁটাদুয়ারের রাজা নীলাম্বরকে পরাজিত করেন। সেই জয়ের স্মারক রূপে নসরৎ শাহ একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়া সেনাপতির নামানুসারে ইহার নামকরণ করেন। নসরৎ শাহ নামটি বাঙ্গলাদেশে অতি জনপ্রিয়। আসাম বিজেতা ইসমাইল শাহ বরবক শাহের সেনাপতি নহেন।

রংপুর

পাঙ্গাপীরের মসজিদ ঃ রংপুর জেলার ডোমর গ্রামে এই মসজিদটি রহিয়াছে। এই পাঙ্গাপীর প্রথমে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী ছিলেন এবং তাঁহার নাম ছিল পঞ্চাজ। তাঁহার পশুপ্রীতি ছিল স্থানীয় কিংবদন্তী। ডোমরে তাঁহার মৃত্যু-বার্ষিকীতে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে একটি পশু-মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বহু ফকীর পাঙ্গা পীরের মসজিদে আসিয়া নমাজ পড়ে। বাঙ্গলাদেশে অনেক স্থলে মুসলিম দরগা ও কবরের পার্শ্বে পশুর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা কবরের অভ্যন্তরে শায়িত মানুষটির পশুপ্রীতি স্মরণ করাইয়া দেয়।

জাফর খানের মসজিদ ঃ জাফর খান সপ্তগ্রাম জয় করিয়া ত্রিবেণীর তীরে একটি বিরাট মসজিদ নির্মাণ করেন। উহা ছিল একটি প্রাচীন হিন্দু-মন্দিরের গর্ভগৃহ।

জাফর খানের মৃতদেহ এই মসজিদের অভ্যন্তরে শায়িত আছে। এই মসজিদ-গাত্রে একটি শিলালিপি আছে। এই শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, সপ্তগ্রাম ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজিত হইয়াছিল। ভারতীয় জাদুশালায় সংরক্ষিত শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, সৈয়দ জামালউদ্দীন নামক এক ব্যক্তি ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই শিলালিপিটি উৎকীর্ণ করেন।

হুগলী

বাইশ দরওয়াজা মসজিদ ঃ পাণ্ডুয়া (হুগলী) ছিল হিন্দুদের প্রাচীন তীর্থস্থান। শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহের সময় (১৪৭৬-৮৩ খ্রীঃ) এখানকার বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়। একটি হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর এই মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল।

'বাইশ দরওয়াজা' মসজিদের বিখ্যাত মিনার শাহ সফিউদ্দীন নামক একজন বিখ্যাত পীর কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা ছিল প্রাচীন 'গড়মান্দারণ'। গড়মান্দারণে **শাহ ইসমাইল গাজীর কবর** রহিয়াছে। রুকুনউদ্দীন বরবক শাহের সেনাপতি ছিলেন শাহ ইসমাইল গাজী; তাঁহার জন্মস্থান আরব দেশ। শাহ ইসমাইল গাজীর জীবনী 'রিসালা-উস-শাহোদা' গ্রন্থে বাণত রহিয়াছে। (Asiatic Society Journal, Vol. XXXVIII)। শাহ ইসমাইল গাজী গড়মান্দারণের রাজা গণপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেন কিন্তু শাহ ইসমাইলের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ ছিল। সুতরাং বরবক শাহ তাঁহাকে হত্যা করেন (১৪১৪ খ্রীঃ)। পীর শাহ ইসমাইলের শির 'কাঁটা দুয়ারে' তাঁহার দেহ 'গড়মন্দারণে' প্রোথিত করা হয়। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহ এই আরব সেনাপতির সম্মানার্থে একটি মসজিদ, কবর এবং মিনার নির্মাণ করেন। এই কবরটির না **ছোট আস্তানা**। এই কবরের পার্শ্বে দুইটি স্তূপ রহিয়াছে। এই স্তূপ দুইটি কালেখান এবং ফতেখান নামক দুইজন মুসলিম যোদ্ধার কবর। এই দুইজন যোদ্ধাই পীর ইসমাইল গাজীর মৃতদেহ ও ছিন্নশির মন্দারণে সমাহিত করিবার জন্য আনয়ন করিয়াছিল। কালেখান এবং ফতেখানের কবর দেখিলে মনে হয় এই কবর দুইটি পূর্বে বৌদ্ধস্তূপ ছিল এবং ঐ স্তূপের মধ্যেই মুসলিমদিগকে কবর দেওয়া হইয়াছিল।

কালেখানের কবরের উপর **গঞ্জ শাহী** কবর নামক আর একটি কবর আছে। ইহাও একটি মুসলিম শহীদের কবর।

সিলেট

ফকরউদ্দীন মুবারক শাহ ১৩৩৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে সিলেট অভিযান করেন। তাঁহার সঙ্গে শাহ জালাল নামক একজন মুসলিম ফকীর ইসলাম প্রচার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। তাঁহার অনুচরবর্গ সিলেটে একটি বিরাট মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিল। এই

মসজিদের পার্শ্বে **পীর শাহ জালালের কবর** ও একটি দরগা রহিয়াছে। পূর্ববঙ্গের বহু মুসলমান এই মসজিদ, কবর এবং দরগায় তীর্থযাত্রা করেন।

সিলেটের চারিপার্শ্বে ৩৬০টি কবর রহিয়াছে। কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় যে, ৩৬০ জন পীর বা ফকির ইসলাম প্রচার উদ্দেশ্যে পীর শাহজালালের অনুগমন করিয়াছিল।

পীর শাহ জালালের কবরের পার্শ্বে রহিয়াছে **পীর আলীর কবর**। পীর আলী ছিলেন আরবের একজন শেখের পুত্র।

ইবন বাত্‌তুতার ভ্রমণকাহিনীতে উল্লিখিত আছে যে, পীর **শাহজালাল-এর দরগায়** তিনি নমাজ পড়িয়াছিলেন। ১৩৪৬ খ্রীঃ)।

মুহম্মদ তুঘলকের সময় পীর শাহ জালাল সিলেটে আগমন করেন এবং ধর্মপ্রচার করেন।

সুন্দরবন ঃ চব্বিশপরগণা *

গোরাচাঁদের মসজিদ ঃ বর্তমান কলিকাতার এগার মাইল দূরে হাড়োয়া গ্রামে গোরাচাঁদের বিখ্যাত মসজিদ আছে। গোরাচাঁদ ছিলেন একজন হিন্দু বৈষ্ণব। তাঁহাকে ধর্মান্তরিত করা হইলেও তিনি পূর্ব নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পূজা-বেদী (আস্তানা) এখনও হিন্দু-মুসলমান ভক্তদের তীর্থস্থান।

শালিক মসজিদ ঃ কলিকাতার পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে এই মসজিদটি রহিয়াছে। ১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে উলুঘ খান নামে একজন আমীর এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।

ফুরফুরা মসজিদ ও দরগা ঃ কলিকাতার পঁচিশ মাইল দূরে শিয়াখোলা গ্রামে এই বিখ্যাত মসজিদ ও দরগা বিদ্যমান। হুসেন শাহের সময়ে ইহা নির্মিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ শতকে একজন ফকীর এই মসজিদটিকে নূতন করিয়া নির্মাণ করেন। এই দরগার পীরের নাম ফুরফুরার পীর।

আজমীর মসজিদ ঃ কলিকাতার আটচল্লিশ মাইল দূরে তারাপুকুর গ্রামে আজমীর মসজিদ নামে একটি মসজিদ আছে। এখানে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই তারাপুকুর মসজিদের কেন্দ্রস্থল আজমীর; এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চিস্তী পীর মইনউদ্দীনের শিষ্য। মইনউদ্দীন চিস্তী ছিলেন তুর্ক-আফঘান যুগের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সুফী পীর। সুতরাং ইহা অনুমান করা যায় যে, তারাপুকুরের পীর বাঙ্গলায় মুসলিম আগমনের প্রথম ভাগেই এই অঞ্চলে বসবাস করিয়াছিলেন।

---

* বর্তমান চব্বিশপরগনা জেলার ব্রিটিশ যুগের ভৌগোলিক সীমারেখা—এই জেলার মধ্যে হাওড়া, হুগলী, যশোহর, খুলনা, নদীয়া এবং সুন্দরবনের কতকাংশ রহিয়াছে।

সুন্দরবন অঞ্চলে ঘুটিয়ারী সরীফে পীর গাজী মুবারক আলীর দরগা ও কবর অবস্থিত। স্থানীয় বহু কেচ্ছা-কহানীর নায়ক ছিলেন এ মুবারক আলী। কেচ্ছার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, তিনি সর্ব প্রথমে সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। ঘুটিয়ারীর মসজিদটি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের তীর্থস্থান। প্রতি বৎসর আষাঢ় ও ভাদ্র মাসে ঘুটিয়ারী শরীফে দুইটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতাপাদিত্যের কাহিনীতে ঘুটিয়ারী শরীফের দরগা ও মসজিদের উল্লেখ আছে।

ফকীর আবদুল্লা আতাসের মসজিদঃ কলিকাতার চৌদ্দ মাইল দূরে মল্লিকপুরে এই মসজিদটি অবস্থিত। নাখোদা সম্প্রদায়ের সুফী ধর্ম প্রচারক আবদুল্লা আতাসের মাধ্যমে ইহার নির্মাণ সম্ভব হইয়াছিল।

পুরন্দর খান অথবা **গোপীনাথ বসুর মসজিদ**ঃ মল্লিকপুরের বিপরীত দিকে মাইনগরে হুসেন শাহের উজীর পুরন্দর খানের নামে প্রতিষ্ঠিত এই মসজিদটি বিদ্যমান।

বরখান গাজীর দরগাঃ সুন্দরবনের দক্ষিণা রায় ব্যাঘ্র-দেবতা। মুনসী জৈনউদ্দীন রচিত পুঁথির মধ্যে এবং 'বন বিবির জহুরানামা' নামক কহানীর মধ্যে দক্ষিণা রায়ের কীর্তিকলাপ চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে। দক্ষিণা রায় ছিলেন একজন হিন্দু সেনাপতি। কিন্তু বন বিবির জহুরানামায় দক্ষিণা রায়কে গাজী উপাধী প্রদান করা হইয়াছে। ধবধবি গ্রামে একটি দেবস্থান বা বেদী রহিয়াছে; এই বেদীর উপর সামরিক পরিচ্ছদে ভূষিত দক্ষিণা রায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। প্রতি শুক্রবারে মুসলমানগণ এখানে হিন্দুর দেবতা দক্ষিণা রায়ের সম্মুখে নমাজ পড়ে।

অন্যদিকে হিন্দুগণ গণেশের মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণা রায়কে পূজা করে। গণেশ মন্ত্রে পূজা ছাড়া দক্ষিণা রায়ের অন্য কোন পূজাপদ্ধতি নাই। প্রতি মঙ্গল ও শনিবারে বাতের রোগীরা এই ধবধবির মেলায় সমবেত হইয়া ঔষধ প্রার্থনা করে। দরগার মাটি বাতক্লিষ্ট স্থানে প্রলেপ দিলে বাতরোগ নিরাময় হয়—এই বিশ্বাস স্থানীয় লোকের মধ্যে প্রবল।

মাঘ মাসের ১লা তারিখে দক্ষিণা রায়ের সম্মুখে হিন্দু-মুসলমান সমন্বিত একটি পুণ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই বিখ্যাত ধবধবি মেলা। বিগত চারিশত বৎসর ধরিয়া ধবধবিতে এই মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

মনিবিবির কবরঃ সুন্দরবনে লক্ষ্মীকান্তপুরে 'মনিবিবির কবর' নামক একটি ক্ষুদ্র মসজিদ ও একটি কবর রহিয়াছে। মনি বিবি বোধ হয় হিন্দুনারী ছিলেন। নামই ইহার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই মসজিদটি একটি হিন্দু মন্দিরেরই রূপান্তর বলিয়া স্থানীয় লোকের ধারণা।

বারাসতে **পীর একদিল সাহেবের আস্তানা** ও একটি মসজিদ আছে। কথিত আছে, পীর একদিল শাহ প্রথমে হিংস্র শ্বাপদ-সমাকীর্ণ সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। ইনি নির্ভয়ে এই অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতেন; সুতরাং সাধারণ লোক তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতায় আকৃষ্ট হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল এবং বহু

কেচ্ছা-কাহিনী রচনা করিল। কিংবদন্তী আছে যে, পীর একদিল শাহ আদেশ করিলে ছাগ-গরু-হরিণ-ব্যাঘ্র একই সঙ্গে একই জলাশয়ে জলপান করিত।

ওলাবিবির দরগা ঃ 'ওলা' বা লৌকিক বিসূচিকা শব্দটি বিশুদ্ধ হিন্দু শব্দ। এই বিসূচিকার দেবতা ওলাদেবী। মুসলমানরা ওলাওঠাকে ভীষণ ভয় করিত এবং তাহারাও ভয়ে ওলা দেবীকে পূজা করিতে লাগিল এবং নামকরণ করিল 'ওলা বিবি'। গোবরডাঙ্গাতে **ওলাবিবির স্থান** একটি বিখ্যাত পীঠস্থান।

মুসলমান আগমনের আদিপর্বে অনেক হিন্দু নানা কারণে ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। এই ধর্মান্তর সত্ত্বেও তাহারা প্রাচীন আচার-বিচার ও লৌকিক প্রথা পরিত্যাগ করে নাই। প্রাচীন মন্দির ও বিহারকে তাহারা মুসলমানের তীর্থস্থানে পরিণত করিল। এই যুগের পুঁথি, কেচ্ছা-কাহিনী ও পাঁচালীর মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর আদান প্রদানের বহু চিহ্ন বিদ্যমান।

পীর ঠাকুরবরের আস্তানা গোবরডাঙ্গায় অবস্থিত। 'পীর' শব্দটি মুসলিম, 'ঠাকুর বর' শব্দটি হিন্দু। ঠাকুরবরের মৃত্যুর পরে মুসলমান কবর-রক্ষী (মতোয়ালী) ফল-ফুল-বিল্বপত্রের দ্বারা প্রতি সন্ধ্যায় ঠাকুরবরের অর্চনা করিত এবং দ্বি-প্রহরে পীর ঠাকুর বরের মসজিদে নমাজ পড়িত। কথিত আছে, পীর ঠাকুরবর ছিলেন মুকুট রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। বরখান গাজীর সঙ্গে যুদ্ধে মুকুট রায় পরাজিত হইলে তাঁহার পুত্র রামদেব গোবরডাঙ্গার নিকটবর্তী 'চারঘাটে' আশ্রয় গ্রহণ করেন। শেষ পযন্ত রামদেব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া 'পীর ঠাকুরবর' নামে পরিচিত হইলেন। তিনি ছিলেন জাফর খানের সমসাময়িক ; চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

বাঙ্গলা দেশের মসজিদগুলির ইতিহাস, রূপ ও রেখা আরও বিষদভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ বাঙ্গলায় মুসলিম অধিকার বিস্তারের চমৎকার ও নির্ভরযোগ্য উপাদান মসজিদ, কবর ও দরগার মধ্যেই নিহিত আছে।

পরিশিষ্ট (খ)

তুর্ক আফঘান যুগের টাঁকশাল ও টাঁকশাল-নগরী
বঙ্গে মুসলিম অধিকার বিস্তারের নিদর্শন

পৃথিবীর সকল মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলেই খলিফা, সুলতান, আমীর বা শাসক ক্ষমতা অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন উপায়ে স্বকীয় ক্ষমতালাভের সংবাদ ঘোষণা করিতেন। এই উপায়গুলির মধ্যে প্রধান ছিল উপাধি গ্রহণ, মসজিদে নমাজের সময় সুলতানের নামে প্রকাশ্যে খুতবা পাঠ এবং স্বীয় নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন। মুদ্রার পৃষ্ঠে অঙ্কিত থাকিত ক্ষমতালাভ বা সিংহাসনারোহণের বৎসর অথবা সিংহাসনে উপবেশনের তারিখ (সন-ই-জলুস)। শাসকের নাম (পিতার নামোল্লেখসহ অথবা পিতৃনাম উল্লেখহীন), কখনওবা ইসলামের খলিফার নাম মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে অঙ্কিত থাকিত।

অনেক সময়ে মুদ্রার গাত্রে টাঁকশালের নামও উৎকীর্ণ থাকিত। মুদ্রাগুলি শাসকের শাসনাধীন স্থানেই মুদ্রিত হইত এই অনুমান নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায়। স্বকীয় ক্ষমতার সীমার বহির্ভূত কোন অঞ্চলে কোন সুলতান বা নরপতির মুদ্রা মুদ্রিত হইতে পারে না। মুদ্রার পৃষ্ঠে টাঁকশালের নামোল্লেখ নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করে যে, মুদ্রা ঘোষকের অধিকার টাঁকশালের স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তুর্ক-আফঘান যুগে প্রচারিত মুদ্রাসমূহ পাঠ ও বিশ্লেষণ করিয়া বঙ্গদেশে এক-বিংশতিটি টাঁকশালের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং উহাদের বর্তমান অবস্থিতিও নির্দেশ করা যায়।

টাঁকশাল ও টাঁকশাল-নগরী

টাঁকশালের নাম	বর্তমান অবস্থিতি
(১) লখ্‌নৌতি	গৌড়
(২) ফিরুজাবাদ	পাণ্ডুয়া
(৩) সাতগাঁ	সপ্তগ্রাম
(৪) সোনারগাঁ	সুবর্ণগ্রাম
(৫) মুয়াজুমাবাদ	(সম্ভবতঃ) ময়মনসিংহ
(৬) বহর-ই-মৌ	গৌড়ের উপকণ্ঠস্থ গঙ্গা-তীরবর্তী শহর
(৭) গয়েস পুর	ময়মনসিংহের উপকণ্ঠ
(৮) ফতেহাবাদ	ফরিদপুর

টাঁকশাল ও টাঁকশাল নগরী

টাঁকশালের নাম	বর্তমান অবস্থিতি
(৯) হুসেনাবাদ	গৌড়ের নূতন নাম
(১০) খলিফতাবাদ	বাগেরহাট
(১১) মুজাফরাবাদ	পাণ্ডুয়ার উপকণ্ঠ
(১২) মামুদাবাদ	গৌড়
(১৩) চাটগাঁ	চট্টগ্রাম
(১৪) মুহম্মদাবাদ	গৌড়
(১৫) আরকান	আরাকান
(১৬) তান্ডা	গৌড়ের উপকণ্ঠ
(১৭) রোহতাস পুর	নদীয়ার উপকণ্ঠ
(১৮) জিন্নতাবাদ	গৌড়
(১৯) নসরতাবাদ	গৌড়
(২০) বরবকাবাদ	দিনাজপুর-রাজসাহী অঞ্চল
(২১) চৌলীস্থান	কামরূপ

এই সকল টাঁকশাল-নগরীগুলির অবস্থান নির্দেশ করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তুর্ক-আফঘান যুগের অধিকাংশ সময়েই গৌড় মুসলিম শাসনের কেন্দ্র ছিল এবং মুসলিম অধিকার পশ্চিমে গৌড় এবং পূর্বে চট্টগ্রাম ও আরকান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তুর্ক-আফঘান যুগে হুসেন শাহের সময়ে বঙ্গদেশে মুসলিম অধিকার সর্বাধিক বিস্তৃত হইয়াছিল।

পরিশিষ্ট (গ)

তুর্ক-আফঘান যুগে বঙ্গদেশের শাসন ও রাজস্ব বিভাগ

নদীয়া এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিজয়ের অব্যবহিত পরেই ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খালজী তাঁহার সহকর্মী আমীরবর্গের মধ্যে বিজিত ভূখণ্ড বণ্টন করিয়া দিলেন। আমীর শব্দের ধাতুগত অর্থ 'কর্মকর্তা' অথবা রাজকার্যের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। কিন্তু কার্যতঃ আমীর ছিলেন একজন সৈন্য পরিচালক বা সৈন্যাধ্যক্ষ। অন্যদিকে আমীর ছিলেন একজন খলিফা বা সামন্ত—ভূম্যধিকারী। কখনও তিনি ছিলেন ফৌজদার (সৈন্যাধ্যক্ষ) অথবা শাসন বিভাগীয় কর্মচারী, আবার কখনও আমীর ছিলেন জাবিতান বা শাসনকর্তা (শাসকের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত রাজকর্মচারী)। প্রত্যেক আমীরের অধীনে এক বা একাধিক সৈন্যবাহিনী থাকিত। কখনও আমীর ছিলেন 'খান'—সমর নায়ক।

আমীরগণের অধীনস্থ ভূখণ্ড প্রায়ই সুনির্দিষ্ট থাকিত। সেই ভূখণ্ডের কেন্দ্রস্থলে কিংবা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সেনানিবাস (দমদমা) সন্নিবেশিত থাকিত। এই ব্যবস্থার অন্তর্গত ভূখণ্ডকে ফৌজদারি নামে অভিহিত করা হইত। 'ফৌজদারি' নাম ও সংজ্ঞা হইতে অনুমিত হয় যে, এই শাসন-ব্যবস্থা ছিল সামরিক।

রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে বঙ্গের মুসলিম বিজেতাকে বিশেষ কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। কারণ, তাঁহাদিগকে কোন নূতন সংস্কার সৃষ্টি করিতে হয় নাই। তাঁহারা সাধারণভাবে পূর্ববর্তী পাল এবং সেন যুগের সংস্কারই অনুবর্তন করিয়াছিলেন। রাজস্ববিভাগে রাজস্ব নির্ধারণ, রাজস্ব সংগ্রহ পুরাতন হিন্দু রাজকর্মচারীর মাধ্যমে ব্যবস্থিত হইত। অবশ্য প্রারম্ভযুগে তুর্ক-আফঘানগণের মধ্যে আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না—প্রয়োজনও ছিল না। কারণ, অর্জিত ধনসম্পদ ছিল সুলতানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ফৌজদার ছিলেন সৈন্যাধ্যক্ষ, কোথাও বা শাসক; কিন্তু রাজস্ব ব্যাপারে তিনি ছিলেন ধনসম্পত্তির রক্ষক মাত্র।

আমীর বা সুলতানকে বিচার ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য কাজী নিযুক্ত হইতেন। কাজী শব্দের ধাতুগত অর্থ তুলাদণ্ড ধারী (কাজী—তুলাদণ্ড বা পরিমাপ দণ্ড)। কাজী অর্থে সমতা রক্ষাকারী বিচারক। কাজীর বিচারসীমানা ফৌজদারের বা আমীরের অধিকৃত অঞ্চলের সমান্তরাল ছিল। ফৌজদারের শাসনাধিকারে এক বা একাধিক কাজী থাকিতেন।

রাজস্ব বিষয়ে সুলতান পত্রধারী নামক কর্মচারীর মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহাদের কার্য ছিল পত্র সংরক্ষণ, পত্রবহন অথবা পত্রধারণ। পত্রধারী বা 'পাটওয়ারী' জিজিয়া বা অন্যান্য রাজস্বের নির্দেশপত্র প্রজাবর্গের নিকট বহন

করিতেন এবং জিজিয়া ও রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। চতুর্ধারিন নামক এক শ্রেণীর কর্মচারী সাধারণভাবে চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। তাঁহারাই পরবর্তিকালে 'চৌধুরী' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

তুর্ক-আফঘান যুগে রাজস্ববিভাগ প্রধানতঃ প্রাচীন হিন্দুযুগের অনুরূপ ছিল এবং বঙ্গের প্রাচীন রাজস্ববিভাগগুলি অক্ষুণ্ণই ছিল। মুসলিম শাসক প্রাচীন নামগুলির পরিবর্তন করেন নাই। অবশ্য কালক্রমে লক্ষ্মণাবতী, গৌড়, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি হিন্দুনাম পরিবর্তিত হইয়া মুসলিম নামে রূপান্তরিত হইল, যথা—মামুদাবাদ, বরবকাবাদ, খলিফতাবাদ ইত্যাদি।

তুর্ক-আফঘান যুগের অন্তভাগে বিদ্যমান রাজস্ব-বিভাগগুলির সুনির্দিষ্ট উল্লেখ আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ঐ সকল সরকার বা রাজস্ব-বিভাগ ছিল সংখ্যায় উনবিংশতিটি এবং উহাদের মধ্যে *দশটি* হিন্দুনামে এবং *নয়টি* মুসলিম নামে অভিহিত ছিল। এই উনবিংশতিটি সরকার আবার ছয়শত বাহান্নটি মহলে বিভক্ত ছিল এবং মহলগুলির অধিকাংশই হিন্দুনামে পরিচিত ছিল। আরও ক্ষুদ্র রাজস্ব বিভাগগুলি পরগনা, কসবা, দেহাৎ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত এবং এই সকল বিভাগ প্রায়ই অপরিবর্তিত হিন্দুনামে পরিচিত ছিল। সরকার এবং মহলগুলির হিন্দুনাম হিন্দুসংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্পর্শের ইঙ্গিত বহন করে। কখনও হিন্দুনামের সহিত মুসলমান নাম বা শব্দ সংযোজিত হইত যথা—মুহম্মদপুর (আরবী মুহম্মদ + হিন্দু পুর), রামগঞ্জ (হিন্দু রাম + মুসলিম গঞ্জ) রাজশাহী (হিন্দু রাজ + মুসলিম শাহী), অথবা সম্পূর্ণ মুসলিম নামও ব্যবহৃত হইত, যথা—ফিরুজাবাদ ফতেহাবাদ, নসরৎশাহী ইত্যাদি।

তুর্ক-আফঘান যুগে বঙ্গে মুসলিম অধিকার বিস্তার সম্পর্কে আইন-ই-আকবরী হফত্ ইকলিম নামক গ্রন্থে বর্ণিত রাজস্ব বিভাগ হইতে ধারণা করা যায়। রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার প্রামাণ্য গ্রন্থ 'গৌড়ের ইতিহাস' নামক পুস্তকে এই রাজস্ব বিভাগগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা বৃটিশযুগের রাজস্ববিভাগীয় দলিলপত্র ও জরিপ সংক্রান্ত কাগজপত্র অনুসন্ধানে দেখিয়াছি যে, রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের সীমা নির্ধারণ ও নামকরণগুলি প্রায়ই নির্ভুল। নিম্নে এই রাজস্ব-বিভাগগুলির একটি তালিকা উদ্ধৃত হইল। এই তালিকায় উল্লিখিত সরকারগুলি হিন্দু-মুসলিম নামানুসারে বর্ণিত হইল এবং মহলের সংখ্যাও উল্লিখিত হইল।

হিন্দু নামযুক্ত সরকার

(১)	সরকার লক্ষ্মণাবতী	মহল সংখ্যা	৬৬
(২)	„ পূর্ণিয়া	„	৯
(৩)	„ তাজপুর	„	২৯
(৪)	„ শ্রীহট্ট (সিলহট্ বা সিলেট)		৮

(৫)	সরকার	সোনারগাঁ	মহল সংখ্যা	৫২
(৬)	„	চাটগাঁ	„	৭
(৭)	„	সাতগাঁ	„	৫৩
(৮)	„	মন্দারণ	„	১৬
(৯)	„	তান্ডা	„	৫২
(১০)	„	ঘোড়াঘাট	„	৮৮

মোট মহলসংখ্যা—৬৮০

মুসলিম নামযুক্ত সরকার

(১)	সরকার	বরবকাবাদ	মহল সংখ্যা	[illegible]২
(২)	„	মামুদাবাদ	„	৮৮
(৩)	„	খলিফতাবাদ	„	৩৫
(৪)	„	ইসলামপুর (বাক্‌লা)	„	৪
(৫)	„	সুলেমানাবাদ বা সলীমাবাদ	„	৩১
(৬)	„	সরিফাবাদ	„	২৬
(৭)	„	নসরৎশাহী	„	০২
(৮)	„	পিঁজরা	„	২১
(৯)	„	ফতেহাবাদ	„	৩

মোট মহলসংখ্যা—২৭২

হিন্দু নামযুক্ত সরকার

(১) **সরকার লক্ষ্মণাবতী (লখ্‌নৌতি)ঃ** রাজমহলের নিকটবর্তী তেলিয়াগড় হইতে গঙ্গার তীরবর্তী বর্তমান ভাগল পুর, মালদহ এবং পূর্ণিয়ার কতকাংশ এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। লক্ষ্মণাবতী সরকারের অন্তর্ভুক্ত মহলের সংখ্যা ছিল ৬৬।

(২) **সরকার পূর্ণিয়াঃ** বর্তমান পূর্ণিয়া জেলার কতকাংশ এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহানন্দা নদীর পশ্চিম তীর ব্যাপিয়া এই সরকার বিস্তৃত ছিল। পূর্ণিয়া ছিল মুসলিম রাজ্যের সর্বোত্তর সীমা। এই সরকারের উত্তর সীমান্তে জালাল গড় নামে একটি দুর্গ ছিল। পূর্ণিয়া সরকারের অধীনে ৯টি মহল ছিল।

(৩) **সরকার তাজপুরঃ** বর্তমান দিনাজপুরের পশ্চিমাংশ এবং পূর্ণিয়ার কতকাংশ ব্যাপিয়া তাজপুর সরকার বিস্তৃত ছিল। মহানন্দা নদীর তীরভূমি তাজপুর সরকারের সীমা চিহ্নিত করিত। তাজপুর সরকারের অন্তর্ভুক্ত মহল-সংখ্যা ছিল ২৯টি।

(৪) **সরকার শ্রীহট্ট বা সিলেট (সিলহট) :** সিলেট তুর্ক-আফঘান যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকার ছিল। ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমে ত্রিপুরা এবং উত্তর-পূর্বে আসাম ইহার সীমা স্পর্শ করিয়া বিদ্যমান ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে সিলেট অঞ্চলে মুসলিম অধিকার বিস্তৃত হয়। শাহ জালাল এবং তিনশত আউলিয়া এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। সিলেট সরকারের অধীন ৮টি মহল ছিল।

(৫) **সরকার সোনারগাঁ :** ব্রহ্মপুত্র নদ এবং মেঘনা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল সরকার সোনারগাঁ নামে পরিচিত। কালীগঙ্গা নামে বিখ্যাত শাখানদী সোনারগাঁ সরকারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। ত্রিপুরার পশ্চিমাংশ এবং নোয়াখালী জেলা সোনারগাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিক্রমপুর ছিল সরকার সোনারগাঁয়ের বিখ্যাত মহল। সোনারগাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত ৫২টি মহাল ছিল।

(৬) **সরকার চাটিগাঁ :** সরকার চাটিগাঁ বা চট্টগ্রাম ছিল প্রধানতঃ পার্বত্য অঞ্চল। কর্ণফুলি এবং ফেণী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের অত্যুচ্চ শৈলশ্রেণী সমগ্র অঞ্চল ব্যাপিয়া বিস্তৃত হয় নাই। পূর্বে আরাকানের মগ, বঙ্গোপসাগরের অন্তর্বর্তী সন্দীপের পর্তুগীজ এবং স্থানীয় খাসেরগণ মুসলিম অধিকারকে সর্বদা বিপর্যস্ত করিত। চাটিগাঁ সরকারের অধীনে ৭টি মহল ছিল।

(৭) **সরকার সাতগাঁ :** হুগলী ও সরস্বতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ব্যাপিয়া সরকার সাতগাঁ বিস্তৃত ছিল। এই মহলেই অবস্থিত ছিল প্রাচীন হিন্দুযুগের বিখ্যাত সমুদ্রবন্দর সপ্তগ্রাম। বর্তমান চব্বিশ পরগনার অন্তর্ভুক্ত কপোতাক্ষী নদীর তীর পর্যন্ত এই সরকার বিস্তৃত ছিল। নদীয়ার পশ্চিমাংশ এবং সমুদ্রমুখী ডায়মণ্ডহারবার ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার সাতগাঁয়ের উন্নতি সম্পূর্ণভাবে সমুদ্রনির্ভর ছিল। হুগলী নদীর জলধারা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে পর্তুগীজ বণিকগণকে সপ্তগ্রামে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তখনও তুর্ক-আফঘান শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে নাই।

(৮) **সরকার মন্দারণ :** বীরভূমের পশ্চিমে দামোদর নদের তীর হইতে রাণীগঞ্জ অতিক্রম করিয়া মন্দারণের সীমা রূপনারায়ণ নদ স্পর্শ করিত। নগর (রাজনগর), শেরগড় (রাণীগঞ্জ) চম্পানগর (বর্ধমান) এবং মণ্ডলঘাট সরকার মন্দারণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই মন্দারণই মোঘল-পাঠান যুদ্ধের লীলাক্ষেত্র ছিল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে গড়মন্দারণ অবিস্মরণীয় হইয়া আছে। বর্তমান ঝাড়গ্রাম ও সাঁওতাল পরগনার কিয়দংশ গড়মন্দারণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে এবং আকবর-নামা গ্রন্থে গড়মন্দারণ ঝাড়খণ্ড নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

(৯) সরকার তান্ডা : তান্ডা অর্থে (লৌকিক ভাষায়) 'তাড়ি'। তাল-খর্জুর বৃক্ষনিঃসৃত নির্যাস 'তাড়ি' নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে তালবৃক্ষ ছিল প্রচুর। মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমের কতকাংশ লইয়া সরকার তান্ডা গঠিত হইয়াছিল। বঙ্গের পশ্চিম সীমা এই সরকার তান্ডা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সরকার তান্ডার অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ নগরী ছিল রাজমহল বা পরবর্তিকালের আকমহল বা আকবর মহল। সরকার তান্ডার অন্তর্ভুক্ত মহলের সংখ্যা ছিল ৫২টি।

(১০) সরকার ঘোড়াঘাট : বর্তমান দিনাজপুর, রঙ্গপুর এবং বগুড়া জেলার অধিকাংশ ঘোড়াঘাট সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমান বিহারের হাজিপুর পর্যন্ত এই সরকার বিস্তৃত ছিল। ইহার একদিকের সীমা ছিল ব্রহ্মপুত্র—অন্যদিকের সীমা ছিল করতোয়া নদী। তিব্বত হইতে আনীত টাঙন অশ্ব হাজিপুরে ফেরীর সাহায্যে গণ্ডক অতিক্রম করিত—সেই জন্যই এই পরগনার নাম ঘোড়াঘাট। বর্তমান কোচবিহার এবং কোচ-হাজু এই ঘোড়াঘাট সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাস্তবিক পক্ষে সরকার ঘোড়াঘাটই ছিল বঙ্গদেশের তুর্কী অধিকারের শেষ সীমা। এই সীমান্ত রক্ষার জন্য এই অঞ্চলে অনেক পাঠান আমীরকে জায়গীর প্রদান করা হইয়াছিল। এই সমস্ত জায়গীরদারগণ বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেন।

মুসলিম নামযুক্ত সরকার

(১) সরকার বরবকাবাদ : বরবক শাহের নাম অনুসারে (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীঃ) এই সরকারের নামকরণ হইয়াছে। এই সরকার লক্ষ্মণাবতী সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া পদ্মানদীর তীর অনুসরণ করিয়া বগুড়া পর্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে। মালদহ জেলার দক্ষিণাংশ, দিনাজপুরের দক্ষিণাংশ সহ রাজশাহী ও বগুড়া জেলার কতকাংশ সরকার বরবকাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(২) সরকার মামুদাবাদ : মামুদ শাহ নামে তুর্ক-আফঘান যুগে বঙ্গদেশে তিনজন সুলতান ছিলেন। সুতরাং এই মামুদাবাদ সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মামুদ শাহের পরিচয় সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। নদীয়ার উত্তরাংশ; যশোহরের উত্তরাংশ এবং ফরিদপুরের পশ্চিমাংশ এই সরকারে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(৩) সরকার খলিফতাবাদ : খলিফা নামের সংযোগ হইতে অনুমিত হয় যে, খলিফতাবাদ (খলিফার নগর) দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। পীর খান জাহান আলী দিল্লী হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া বর্তমান খুলনা জেলার বাগেরহাট অঞ্চলে খলিফার নামে একটি শহর স্থাপন করেন। খান জাহান ছিলেন দিল্লীর সুলতানের বশংবদ। বঙ্গদেশে আগমনের পরেও তিনি দিল্লীর সুলতানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন নাই; বরং এই নামকরণের মধ্যে দিল্লীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক ও আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। খলিফতাবাদ একটি শহর, একটি রাজধানী, একটি মহল ও একটি সরকার। সুতরাং এই নামের মধ্যে নানাদিক

হইতে ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। খান জাহান আলীর পরিবার খলিফতাবাদে ২০ বৎসর শাসন পরিচালনা করিয়াছিলেন। দক্ষিণ যশোহর এবং বাখরগঞ্জের বিস্তীর্ণ অঞ্চল খলিফতাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার খলিফতাবাদের অন্তর্ভুক্ত মহলের সংখ্যা ছিল ৩৫টি।

(৪) **সরকার ইসমাইলপুর** (বাকলা): সরকার বাকলা বর্তমান বাখরগঞ্জ এবং ঢাকার অতি অল্প অংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল। সরকার বাকলার মহলসংখ্যা ছিল মাত্র ৪টি।

(৫) **সরকার সলীমাবাদ** (সুলেমানাবাদ): দক্ষিণ নদীয়ার কয়েকটি পরগনা, হুগলীর উত্তর ভাগ এবং বর্ধমানের কতকাংশ ব্যাপিয়া সুলেমানাবাদ অবস্থিত ছিল। এই ভূখণ্ড অত্যন্ত উর্বর ছিল এবং এই স্থানের উৎপন্ন শস্য রাজান্তঃপুরের ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত ছিল। সুতরাং এই সরকার 'হাবেলী' নামে পরিচিত ছিল (হাবেলী অর্থে অন্তঃপুর)। দামোদর নদ পর্যন্ত সরকার হাবেলী বিস্তৃত ছিল।

(৬) **সরকার সরিফাবাদ**: 'সরিফ' শব্দের অর্থ হইতে অনুমিত হয় যে, এখানে 'সরিফ' অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত লোকের বাস ছিল। বীরভূমের কতকাংশ এবং বর্ধমানের বৃহত্তর অংশ সরকার সরিফাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার সরিফাবাদের মধ্যে বরবক শাহ এবং ফতে শাহ নামক দুইটি মহল ছিল। সুতরাং মনে হয়— এই সরকার ইলিয়াসশাহী বংশের সময়ে ব্যবস্থিত হইয়াছিল।

(৭) **সরকার নসরৎশাহী**: হুসেনশাহী বংশের সুলতান নসরৎ শাহের নামানুসারে এই সরকারের নামকরণ হইয়াছে। আয়তনে এই সরকারের বিশালতা স্বল্প ছিল না। নদীয়া হইতে সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা এবং ময়মনসিংহ জেলার বহু অংশ এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নসরৎশাহী সরকারের একটি পরগনার নাম ছিল ঢাকা। এখানে একটি সামরিক ঘাটি বা মোরচা ছিল—উহার নাম মমিনশাহী। সম-সাময়িক ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, নসরৎশাহীর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে একটি লৌহখনি ছিল।

৮) **সরকার পিঁজরা**: ইহার অন্য নাম হাবেলী পিঁজরা। হাবেলী নাম হইতে মনে হয় যে, এই মহলের আয় হইতে অন্তঃপুরিকাদের ব্যয় নির্বাহ হইত। এই সরকারটি বর্তমান দিনাজপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত মহলের সংখ্যা ছিল ২১টি।

(৯) **সরকার ফতেহাবাদ**: সুলতান ফতে শাহের নামানুসারে এই সরকারের নামকরণ হইয়াছিল (১৪৮২—১৪৮৭ খ্রীঃ)। যশোহর, ফরিদপুর,

ঢাকার কতকাংশ এবং দক্ষিণ শাহবাজপুর ও সন্দীপ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মগ, আরাকান এবং মুসলিমগণের মধ্যে এই স্থানে বহুবার যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

উপরিউক্ত সরকারের সীমা উল্লেখ হইতে অনুমান করা যায় যে, তুর্ক-আফঘান যুগে বঙ্গদেশে মুসলিম অধিকারের সীমা পশ্চিমে বর্তমান বিহারের তেলিয়াগড় (শকরীগলি) গিরিবর্ত্ম হইতে পূর্বে চট্টগ্রামের শৈলশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তরে কোচবিহার হইতে দক্ষিণে মেদিনীপুর এই সীমার অন্তর্গত ছিল। সময় বিশেষে বঙ্গদেশের সীমানা বর্তমান বিহারের সারণ, দ্বারভাঙ্গা, পাটনা এবং পুর্ণিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। একবার বঙ্গদেশীয় একজন সুলতান জৌনপুর পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। হাজী ইলিয়াস শাহ হাজীপুর নগর স্থাপন করেন।

ইখতিয়ারউদ্দীন বিন বখতিয়ার খালজী দক্ষিণ বিহার জয় করেন। তুঘলক সুলতানগণ রাজকার্যের সুবিধা এবং বিদ্রোহ নিবারণের উদ্দেশ্যে বিহারে একজন "জাবিতান" বা শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তারপর লোদী শাসনকালে জৌনপুরের শার্কী সুলতান কর্তৃক উত্তর বিহার বিজিত হয়। ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান হুসেন শাহ দক্ষিণ বিহার পুনরধিকার করেন। কিন্তু অচিরে তিনি ঐ বিজিত অঞ্চল ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহ বিহারের অন্তর্গত সারণ (ত্রিহুত) হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুক্তপ্রদেশের আজমগড় পর্যন্ত জয় করেন। তিনি গণ্ডক নদীর তীরে সিকন্দরপুর গ্রামে তাঁহার বিজয়ের স্মারকস্বরূপ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। কিন্তু সাওতাল পরগনার অন্তর্গত কহলগাঁও (ভাগলপুর জেলার কল্গ্রাম বা বিক্রমশীলা) হইতে বরাকর পঞ্চকোট, বিষ্ণুপুর অঞ্চলে তুর্ক-আফঘান অধিকার বিস্তৃত হয় নাই। মুঘল আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ঝাড়খণ্ড স্বাধীন ছিল।

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, বঙ্গদেশে তুর্ক-আফঘান অধিকার নগর এবং হিন্দু-প্রধান অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। তুর্ক-আফঘানগণ কেল্লা বা দুর্গ নির্মাণ করিতেন, কিল্লাদার বা দুর্গাধিপতি নিযুক্ত করিতেন। আমীরের উপর বিস্তৃত ভূখণ্ডের শাসনভার অর্পিত হইত। আমীরগণ ফৌজদারগণের ঊর্ধ্বতন কর্মচারী ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম হইতে আগত তুর্ক-আফঘান মামলুক বা দাসগণ সাধারণতঃ সৈন্যবিভাগে যোগদান করিত। ধর্মান্তরিত মুসলিমগণ তাহাদের পূর্বজীবনের বৃত্তি অনুসরণ করিত। সুলতান গোত্রীয় অর্থাৎ মুসলিমগণ সংখ্যা-লঘিষ্ঠ ছিল। সুতরাং তাহারা দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে স্থায়িভাবে প্রবেশ বা বসবাস করে নাই; ফলে হিন্দুর জীবনধারা ও সমাজ-ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে ব্যাহত হয় নাই। অবশ্য মোল্লা এবং কাজীগণ অনেক সময় নিরীহ হিন্দুর উপর দৌরাত্ম্যও করিয়াছে। হিন্দুগণ সাধারণতঃ মুসলমানের সংস্পর্শ ও সংঘাত পরিহার করিয়া চলিত। রাজ-

নীতি ক্ষেত্রে সুলতানবর্গ সৈন্য, অস্ত্র, অশ্ব, নৌযান এবং মানুষ ও পশুর খাদ্যের জন্য হিন্দু জমিদার, বণিক ও কৃষকের উপর নির্ভর করিতেন এবং তাঁহারা সততই দিল্লীর সুলতানের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন। বঙ্গদেশে মুসলমানের রাজস্ব ও শাসন বিভাগ দিল্লী ও পঞ্জাবের শাসন-ব্যবস্থা হইতে পৃথক ছিল, কারণ, পাল ও সেনযুগের শাসন-ব্যবস্থার প্রচ্ছদপটে তুর্ক-আফঘানগণ বাঙ্গলার শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিত।

বঙ্গদেশ তুর্ক-আফঘান যুগে ন্যূনাধিক নিরাপদ ছিল। বহিরাগত মোঙ্গল জাতির প্রধান লক্ষ্য ছিল দিল্লী। মোঙ্গল অভিযানকারিদল বেনারসের পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে চাহিত না। বেনারসের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত মুঘলসরাই ছিল মুঘল আক্রমণের শেষ সীমা। বঙ্গদেশীয় তুর্ক-আফঘানগণের দৃষ্টিতে জৌনপুর হইতে পশ্চিম অঞ্চল ছিল 'দূরবর্তী দেশ'। তুর্ক-আফঘান যুগে বঙ্গদেশের পূর্ব সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কোন বিদেশী জাতি বঙ্গদেশ আক্রমণ করে নাই। মোঙ্গলীয় জাতিও আসামের পার্বত্য অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল।

(ঘ) তুর্ক-আফঘান যুগে বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারের ধারা. উপায় ও পদ্ধতি—হিন্দু-মুসলিম বিবাহ।

বঙ্গদেশে ইস্‌লামধর্ম বহিরাগত। বঙ্গদেশে মুসলিম রাজ্য বিস্তার বঙ্গদেশের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়। এই অধ্যায়ের দুইটি পর্ব। প্রথম পর্ব তুর্ক-আফঘান যুগ (১২০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ) এবং দ্বিতীয় পর্ব মুঘল যুগ (১৫২৬-১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ)। বাজ্য বিস্তার ও ধর্মপ্রচাব ইসলামের ইতিহাসে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মুসলমানগণ মনে কবিত যে বাজ্য জয় কবিলেই কর্তব্য শেষ হয় না। রাজ্যেব অধিবাসিদিগকে ইসলামে দীক্ষিত কবিতে পাবিলে বাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়—ইহকালের স্বার্থ এবং পবকালের পবমার্থ লাভ হয়। এই মূলনীতি অনুসবণ কবিয়া বঙ্গদেশে মুসলমানগণ রাজ্যবিস্তারেব সঙ্গে ধর্ম প্রচাবকে অচ্ছেদ্যভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। বঙ্গে মুসলিম অধিকাব বিস্তাবের ইতিহাসেব সঙ্গে বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের আলোচনা অপরিহার্য। মুসলিম গোষ্ঠী নানাভাবে বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচাব করিযাছিল—

সামরিক উপায়—যুদ্ধ ও তরবারি : যুদ্ধ ও তরবারি ছিল ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের একটি প্রধান উপায়। আল্লার রসুল মুহম্মদেব সময় হইতে অস্ত্র ও তরবারি ইসলাম ধর্মের একটি মৌলিক অঙ্গরূপে বিবেচিত হইত। মুহম্মদ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মপ্রবর্তক আত্মরক্ষা এবং আঘাত-প্রত্যাঘাতের জন্য প্রত্যক্ষ যুদ্ধের অনুমোদন করেন নাই অথবা ধর্মপ্রচারের উপায় স্বরূপ তরবারিব সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। আরব জাতির জীবনে যুদ্ধ অনুমোদন এবং শস্ত্র ব্যবহার অতি আগ্রহের সহিত নীতিগতভাবে গৃহীত হইয়াছিল। যদিও ইসলাম ধর্মের ধাতুগত অর্থ শান্তি,

তথাপি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক এবং ইসলামের আদি ধর্মগুরুগণ এই ধর্মকে "আরবায়িত" (Arabianised) অথবা যোদ্ধার ধর্মরূপে রূপায়িত করিয়াছিল। ইসলামের প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি সামরিক স্পর্শ ও গন্ধ অনুভব করা যায়। নমাজের সময়ে বিশ্বাসী মুসলিমগণ সামরিক পদ্ধতিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকে ; প্রথম পংক্তিতে ইমাম একক দণ্ডায়মান হইয়া আদেশ দান করেন ; তিনি কর্ণ স্পর্শ করিলে সমগ্র অনুচরবর্গ কর্ণ স্পর্শ করে ; ইমাম নতজানু হইলে অনুচরবর্গ নতজানু হয়—মনে হয় যেন যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি নির্দেশ প্রদান করিতেছেন, সৈনিকগণ পালন করিতেছে। এ যেন সমস্তই সামরিক প্রথা—নমাজে, মসজিদে প্রার্থনার সময়ে কোন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কোন মুসলিমের নাই—অথচ সমস্তই সুশৃঙ্খল সুনিয়ন্ত্রিত। ফরাসী সম্রাট মুহম্মদকে যথার্থ প্রশংসা করিয়াছেন যে, ধর্মের সঙ্গে শৃঙ্খলার এমন সামঞ্জস্য আর কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে নাই।

ধর্মস্থাপনের উপরেই আরবজাতি ইসলামের সামরিক দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছিল ; সামরিক রীতিনীতি ও মনোভাব সর্বদিকেই ইসলামকে সার্থক করিয়াছিল। ইসলামের ধাতুগত অর্থ শান্তি ; কিন্তু ইসলামের সেই শান্তির অগ্রদূত হইল তরবারি এবং পৃথিবীর বহু অঞ্চলে তরবারি দ্বারাই আরবজাতি কর্তৃক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অবশ্য ভারতবর্ষের অতি সামান্য অংশই আরবগণ জয় করিয়াছিল। ইসলাম প্রবর্তনের পাঁচ শত বৎসর পরে তুর্ক-আফঘানগণ উত্তর ভারত জয় করিয়াছিল। তাহারাও ছিল যোদ্ধ জাতি। তুর্ক-আফঘান জাতি ক্ষীয়মাণ ইসলামের অভ্যন্তরে নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। এই তুর্ক-আফঘান জাতির একটি দুর্ধর্ষ সন্তান গরমশীর হইতে ভাগ্যান্বেষণে প্রথমে গজনী, তারপর দিল্লী, বদায়ুন, অযোধ্যা ও বিহার অতিক্রম করিয়া বঙ্গের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ইবন বখতিয়ার প্রতিষ্ঠিত মুসলিম শাসন প্রায় সুদীর্ঘ পৌণে ছয় শত বৎসরকাল স্থায়ী হইয়াছিল (১২০০-১৭৬৫ খ্রীঃ)। উহার মধ্যে মুঘল বাদশাহ হুমায়ুন কর্তৃক বঙ্গবিজয় পর্যন্ত তিনশত আটত্রিশ বৎসর কাল বঙ্গদেশে নিরঙ্কুশ তুর্ক-আফঘান শাসন চলিয়াছিল—মধ্যে বিরতি বা ছেদচিহ্ন ছিল মাত্র বত্রিশ বৎসরের (১৪১০-১৪৪২ খ্রীঃ)। এই ছেদচিহ্ন রচিত হইয়াছিল রাজা গণেশের নায়কত্বে হিন্দুশক্তির অভ্যুদয়ে। বঙ্গে মুসলিম অধিকার বিস্তারের আদিপর্বে ইবন বখতিয়ার খালজীর ব্যর্থ তিব্বত অভিযান স্মরণীয়। কিন্তু বঙ্গের প্রত্যন্তভাগে উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, কামরূপ, বাঙ্ (পূর্ববঙ্গ) এবং চাটগাঁ তুর্ক-আফঘানগণ অধিকার করিয়াছিল।

মুসলমানগণ রাজ্য জয় করিয়াই একটি কিল্লা বা দুর্গ নির্মাণ করিত এবং ঘন বসতিপূর্ণ হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে সৈন্য বা ফৌজ সমাবেশ করিত। এই ফৌজের অধিনায়ক ছিলেন ফৌজদার। সৈন্য পরিচালনা ব্যতীত ফৌজদার শাসনকার্যও পরিচালনা করিতেন। প্রত্যেক কিল্লা বা দুর্গের সংশ্লিষ্ট একটি মসজিদ নির্মিত হইত।

এই মসজিদের কর্মকর্তা ছিলেন ইমাম। আদিপর্বে বাঙ্গলার শাসন-ব্যবস্থা ছিল সামরিক। এই সেনাবাহিনী ছিল সম্পূর্ণ মুসলিম। কিন্তু প্রয়োজনবোধে মুসলমানগণ তাহাদের ধর্মরাজ্য রক্ষার্থে হিন্দুসৈন্য নিযুক্ত করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। রাজস্ববিভাগে সাধারণতঃ হিন্দুকর্মচারী নিযুক্ত হইত; কারণ, লেখনী চালনায় মুসলিম বিজেতার শস্ত্র পরিচালনার অনুরূপ উৎসাহ বা সামর্থ্য ছিল না। এই হিন্দু সহযোগিতার ফলে মুসলমান সুলতানবর্গ বহু হিন্দু বিধি-ব্যবস্থা, সামাজিক আচার-ব্যবহার, সম্পত্তি বণ্টন ইত্যাদি ব্যবস্থার অনুমোদন করিতেন। যদিও অনেকগুলি হিন্দু সামাজিক প্রথা ও ধর্মীয় আচরণ ইসলামের ধর্মীয় আচারের পরিপন্থী ছিল (যথা হিন্দুর মন্দিরে প্রকাশ্যে পূজার্চনা ও বলি, বিগ্রহ ও মূর্তির শোভাযাত্রা, রাজপথে কীর্তন-সঙ্গীত অনুষ্ঠান, প্রকাশ্যে মৃতদেহ সৎকার, সতীদাহ, মদ্য বিক্রয়, কচ্ছপ ও শূকরের মাংস ভক্ষণ) তথাপি মুসলিম সুলতানগণ সেই সকল আচার-অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেন নাই।

মুসলিম উপনিবেশ স্থাপন: বঙ্গদেশে মুসলিম অধিকার বিস্তারের দ্বিতীয় উপায় ছিল মুসলিম উপনিবেশ স্থাপন। ইহা অবিসংবাদিতভাবে সত্য যে, বঙ্গদেশে মুসলমানগণ ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ, তাহারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুকে শাসন করিয়াছিল। পরবর্তিকালে মুসলমানগণ নানা উপায়ে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল। বঙ্গদেশে মুসলিম ঔপনিবেশিকগণ তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। (১) বহিরাগত তুর্ক-আফঘান-মুঘল ঔপনিবেশিক—তাহারা ছিল অভারতীয় (২) স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান—তাহারা বঙ্গদেশেরই সন্তান (৩) মিশ্র মুসলমান অর্থাৎ হিন্দু মাতা এবং মুসলিম পিতার সন্তান।

(১) **বহিরাগত মুসলিম:** প্রথম যুগে আরব বণিক, ধর্মপ্রচারক বাঙ্গলা দেশের উপকূলভাগে আগমণ করিয়াছিল। তাহাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে তুর্ক-আফঘান বণিকগণ শীত ঋতুতে বঙ্গদেশে আগমন করিত। পশমী বস্ত্র ও অশ্ব ছিল তাহাদের প্রধান পণ্য। কখন ও বা তাহারা স্থানীয় রাজা বা ভৌমিকদের অধীনে বেতনভোগী সৈন্যরূপে কার্য করিত; কিন্তু সুযোগ উপস্থিত হইলে স্বয়ং লুণ্ঠন করিত। পাল নরপতি গোবিন্দ পালের সময়ে বঙ্গের সীমান্তে তুরস্কদণ্ড নামে একটি কর নির্ধারিত ছিল। এই করের দুইটি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে– এই কর সম্ভবতঃ তুরস্ক জাতীয় লোকের উপর ধার্য ছিল অথবা এই কর জনসাধারণের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইত এবং তুরস্কজাতীয় লুণ্ঠনকারীদের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য এই সংগৃহীত অর্থ প্রদান করা হইত। বাস্তবিকপক্ষে তুরস্ক শব্দের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তুরস্ক জাতীয় লোক বঙ্গদেশের প্রত্যন্তভাগে আগমন অথবা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খালজীর পূর্বে বঙ্গের সীমান্তে মুসলমানেরা আগমন করিয়াছিল। অনেকের ধারণা যে, ইবন বখতিয়ার নদীয়া আক্রমণের পূর্বে এই সকল মুসলমানগণের মাধ্যমে রায় লখমনিয়ার অমাত্যদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহারা

হিন্দুরাজার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্য এই সকল মন্তব্য অনুমান সাপেক্ষ, কিন্তু যুক্তিবহ (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ইবন বখতিয়ার খালজীর সময় হইতে বঙ্গদেশে প্রথম মুসলিম উপনিবেশ আরম্ভ হইয়াছিল এবং তুর্ক-আফঘান জাতি প্রথম বঙ্গদেশে স্থায়িভাবে বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল।

তুর্ক-আফঘান যুগে বহু দণ্ডপ্রাপ্ত বা নির্বাসিত অপরাধী দিল্লী হইতে বঙ্গদেশে বিতাড়িত হইয়াছিল। সুলতান ইলতুতমিস বহু রাজদ্রোহী অথবা সন্দেহভাজন অপরাধীকে নৌকাযোগে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ ছিল মশা, ম্যালেরিয়া, জলপ্লাবন এবং ঘনবর্ষার দেশ; যদিও এখানে খাদ্য ছিল প্রচুর তথাপি তাহারা এই দেশকে আখ্যা দিয়াছিল "দোজক-ই-পুর-নিয়ামত" বা আশীর্বাদপূত নরক। সুতরাং দিল্লীর সুলতানগণ অপরাধী ব্যক্তিকে বাঙ্গলার নরককুণ্ডে প্রেরণ করিয়া শাস্তি প্রদান করিতেন। জালালউদ্দীন খালজী সহস্র সহস্র অনমনীয় দস্যুকে বঙ্গদেশে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। তাহারা পরবর্তী কালে ঠগী দস্যুর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

(২) **ধর্মান্তরিত মুসলিম**: ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং প্রবর্তন মুসলমানের জীবনের একটি অবশ্য-করণীয় কর্তব্য। আলামা ওয়ার্দী তাঁহার সিয়াসৎ নামা গ্রন্থে (৩১-৩২ পৃঃ) নির্দেশ দিয়াছেন যে, মুসলিম খলিফার অষ্ট কর্তব্যের মধ্যে বিধর্মীকে ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণ একটি প্রধান কর্তব্য। মুসলমানের পক্ষে বিধর্মীকে ধর্মান্তরিতকরণ স্বর্গের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। এই সংস্কার ও সহজবিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া বঙ্গদেশের কোন কোন সুলতান হিন্দুকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ জানিত যে, দেশের অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করিলে মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে, সুতরাং যে-কোন উপায়ে তাহারা ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করিত। বঙ্গদেশে ধর্মান্তরিত মুসলিমের সংখ্যাই ছিল অধিক।

(৩) **মিশ্র মুসলিম**: বঙ্গদেশে মিশ্র মুসলিমের সংখ্যা বেশী নহে। মিশ্র মুসলিম অর্থে হিন্দুনারীর গর্ভজাত এবং মুসলিম পিতার ঔরসজাত সন্তান বুঝায়। সেই সময়ে হিন্দু-মুসলমান হইতে পারিত, কিন্তু মুসলমান হিন্দু হইতে পারিত না। সুতরাং অতি সহজভাবে, অতি সামান্ত দোষে অথবা কল্পিত দোষে হিন্দুগণ মুসলমান হইয়া যাইত। দৃষ্টি দোষ, স্পর্শ দোষ, খাদ্য দোষ, ঘ্রাণ দোষ হিন্দুর পক্ষে মারাত্মক ছিল। মুসলমানগণ হিন্দুদের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উপায়: বঙ্গদেশে বিধর্মী হিন্দুর সংখ্যা ছিল অত্যন্ত বেশী এবং মুসলমান সম্প্রদায় ছিল মুষ্টিমেয়। সুতরাং ইসলামের রীতি অনুসারে তরবারি দ্বারা বঙ্গদেশের সমস্ত বিধর্মীকে ধর্মান্তরিত করা সহজ ছিল না। সুতরাং বঙ্গের মুসলিম সুলতানগণ বঙ্গের অধিবাসিগণকে ধর্মান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধাতিরিক্ত তিনটি উপায় গ্রহণ করিয়াছিলেন—

(ক) অর্থনৈতিক উপায়—জিজিয়াকর, স্নানকর, তীর্থকর, কেশমুণ্ডন কর স্থাপন করিয়া মুসলিম সুলতান ধর্মান্তর গ্রহণে হিন্দুগণকে প্ররোচিত করিতেন।

(খ) রাজনৈতিক উপায়—সুলতান এবং মুসলিম কর্মচারিগণ বলপ্রয়োগ করিয়া হিন্দুদিগকে ধর্মান্তরিত করিতেন এবং ধর্মান্তরিত হিন্দুগণকে মুসলিম নারীর সহিত বিবাহ প্রদান করিতেন; ধর্মান্তরিত হিন্দুদিগকে রাজকার্যে নিযুক্ত করিতেন—বিশেষতঃ রাজস্ব বিভাগে। বিবাহ দ্বারা হিন্দুর ধর্মান্তর গ্রহণ নিবিড় হইত।

(গ) ধর্মীয় উপায়—কাজী, মোল্লা প্রভৃতি অতি-উৎসাহী মুসলিমগণ প্রত্যক্ষ-ভাবে নানা উপায়ে হিন্দুদিগকে ধর্মান্তরিত করিতেন। হিন্দুগণও ছিল অত্যন্ত অস্পৃশ্যতা বাতিকগ্রস্থ। কোন হিন্দু-গৃহে পক্ষীকর্তৃক গোমাংস নিক্ষিপ্ত হইলেও সেই হিন্দু জাতিচ্যুত হইত। হিন্দুর গৃহাভ্যন্তরে মুসলিম প্রবেশ করিলেও হিন্দুর জাতি নষ্ট হইত। ব্রাহ্মণগণ হিন্দুর জাতি রক্ষার জন্য কতকগুলি কঠোর বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করিয়াছিল। কিন্তু সেই রক্ষণমূলক ব্যবস্থা কালক্রমে আঘাত-মূলক হইয়া উঠিয়াছিল এবং উহার প্রতিক্রিয়া হিন্দুর জাতিনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া পরোক্ষে মুসলিমেব রাজ্যবিস্তার সুগম করিয়াছিল। সেই সুযোগে গাজী, কাজী, ফকির, পীর প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিমগণের হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। কারণ, কোরানে বর্ণিত আছে —"হে বিশ্বাসী, তুমি আল্লার যে বাণী লাভ করিয়াছ, তাহা তুমি সমস্ত বিশ্বে প্রচার কর—ইহা তোমার পুণ্যকর্ম।"

পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মে যাজক, পুরোহিত প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্মপ্রচারক রহিয়াছেন; যেমন—ইহুদী ধর্মে রাবাই, খ্রীষ্ট ধর্মে পাদ্রী, হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ধর্মে শ্রমণ ইত্যাদি। কিন্তু ইসলাম ধর্মে কোন যাজক বা পুরোহিত নাই। ইসলাম ধর্মে সকল বিশ্বাসী মুসলমানই ধর্মপ্রচারক। যে-কোন চারিজন মুসলমান একত্রিত হইয়া "জিহাদ" (ধর্মযুদ্ধ) ঘোষণা করিতে পারে। প্রথমে জিহাদ শব্দটির অর্থ ছিল "আল্লার পথে চেষ্টা"। পরবর্তী কালে 'জিহাদ' শব্দ সামরিক গন্ধ ও স্পর্শ লাভ করিল। পরিশেষে 'জিহাদ' শব্দের দ্বারা কাফেরের বিরুদ্ধে মুসল-মানের যুদ্ধ সূচিত হইল এবং জিহাদ ইসলামের বিহিস্ত বা স্বর্গলাভের পন্থারূপে গৃহীত হইল। অত্যন্ত সদিচ্ছাপূর্ণ মুসলমান ফকীর, পীর, মুসলিম সৈন্যের অনুসরণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেন এবং যুদ্ধান্তে তাঁহারা পরাজিত বন্দীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া পুণ্যলাভ করিতেন এবং দার উল-হারবকে (যুদ্ধভূমি) দার-উল-ইসলামের পুণ্যভূমিতে পরিণত করিতেন। এই পুণ্যকার্যে যেসমস্ত মুসলমান নিহত হইত, তাহারা ছিল "শহীদ", যাহারা শত্রুদের নিধন করিত তাহারা হইত "গাজী"—উভয়ের জন্যই স্বর্গের পথ উন্মুক্ত থাকিত। যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাহারা ইহলোকে এবং যুদ্ধে নিহত হইয়া পরলোকে সুখভোগ করিত। এই বিশ্বাস ও সংস্কার ছিল মুসলমানদের পক্ষে ধর্মপ্রচারের অন্যতম প্রেরণা।

আবু ইউসুফ বলিয়াছেন, মুসলমান খলিফার পক্ষে ন্যায়বিচার অবশ্য কর্তব্য (কিতাব-উল-খারাজ পৃঃ ১৬)। সুতরাং রাজ্য জয় করিয়াই সুলতানগণ বিচার ব্যবস্থা করিতেন—আদালত (আদল = ন্যায় ; আদালত = ন্যায়ের স্থান) স্থাপন করিতেন ও কাজী (বিচারক) নিযুক্ত করিতেন। সুলতানও স্বয়ং বিচার করিতেন। বিচারের ভিত্তি ছিল কোরান (আল্লার বাণী—Words of Allah)। হাদিস মুহম্মদের বাণী ও কর্ম—(Traditions of the Prophet) ফোকা (ইমাম বর্ণিত আইন – Jurisprudence) এবং ফতোয়া (উলেমা প্রদত্ত নির্দেশ – Injunctions) - এই নীতি অনুসারে কাজী বিচার করিতেন। ইসলামের পুণ্যভূমিতে হিন্দু বিধি-ব্যবস্থার কোন স্থান ছিল না। মুসলিম আইন হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য সর্বক্ষেত্রে অনুসৃত হইত। মুসলমান আইনের কার্যকারিতা প্রমাণ করিবার জন্য কাজী যে-কোন উপায় অবলম্বন করিতেন। কাজী মুসলিম আইনের প্রচ্ছদপটে হিন্দু অপরাধীকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করাইয়া হিন্দুজন্মের পাপস্খালন করিতে অনুমতি দিতেন। ইসলামের গৌরব প্রচার করিবার জন্য কাজী হিন্দুদিগকে যদৃচ্ছা অপমান করিতেন।

পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে—

"ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুক
কারো পৈতা ছিঁড়ে ফেলে, মুখে দেয় থুথু ॥"

চৈতন্যমঙ্গলে উল্লেখ আছে—

পিরুল্যা গ্রামেতে বসে যতেক যবন,
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥
কপালে তিলক, যজ্ঞসূত্র কাঁধে।
ঘর-দ্বার লোটে আর লৌহ পাশে বাঁধে ॥

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এইরূপ অসংখ্য উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, কাজী বঙ্গদেশে ইসলামধর্ম প্রচারে বিরাট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

ফকীর এবং পীরগণও ইসলাম ধর্ম প্রচারে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। মুসলিম সমাজে ফকীর ও পীরগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। কারণ, তাঁহারা আনুষ্ঠানিক ভাবে আল্লার পথে বিচরণ করিতেন। পীর ও ফকীরগণ প্রত্যেকে মুহম্মদের এক-একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলিয়া সম্মানিত হইতেন। ইসলামে কোন পুরোহিত বা যাজক ছিল না বলিয়াই ফকীর, পীর ও কাজী ইসলামের সেই অভাব পূর্ণ করিতেন। পীর, ফকীর, গাজী, কাজী ও মোল্লা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করিতেন। ইহা ভিন্ন নীরবে নিঃশব্দে ইসলাম প্রচারের কয়েকটি পরোক্ষ উপায় ছিল ; যথা—

(১) মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন।

(২) ইয়াতিম খানা বা অনাথালয় স্থাপন—পিতৃমাতৃহীন কিংবা দুর্ভিক্ষ-

প্রপীড়িত আশ্রয়হীনকে ইয়াতিম খানাতে আশ্রয় প্রদান করা হইত এবং তাহাদের খাদ্যবস্ত্রের ব্যবস্থা করা হইত। সাধারণতঃ ইয়াতিম খানার আশ্রিতগণ মুসলমান বলিয়া গৃহীত হইত।

(৩) জনহিতকর কার্যাবলীর প্রচেষ্টা—পথ নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি। জাতিভেদ প্রপীড়িত হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য জাতি ব্রাহ্মণ কিংবা উচ্চবর্ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জলাশয়ের জল স্পর্শ করিতে পারিত না। কিন্তু মুসলিম কর্তৃক খনিত এবং প্রতিষ্ঠিত জলাশয় ব্যবহারে সকলেরই সমান অধিকার ছিল। সুতরাং সহজভাবেই পিপাসিত, তৃষ্ণার্ত, অবহেলিত হিন্দু কোন কোন স্থলে ইসলামের উদারতায় আকৃষ্ট হইত।

(৪) পীর এবং ফকীরগণের অলৌকিক কার্যাবলীর বিবরণ এবং কিংবদন্তী সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করিত। নিম্নে ইসলাম প্রচারের নীরব পন্থাগুলির বিশদ আলোচনা করা হইল। এই আলোচনার মাধ্যমে পাঠক ইসলাম প্রচারের অন্তরালে ইসলাম রাজ্য বিস্তারের রূপের পরিচয় লাভ করিবেন।

(১) ইসলাম প্রচারে মসজিদ ও মাদ্রাসার স্থান : ইসলামে মসজিদের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া ইসলামেব সমাজ নিয়ন্ত্রিত হইত। মসজিদ ইসলামের জনসভা বা পার্লামেণ্ট বা আলোচনা সভা। ইহার মধ্যে কোন ধারাবাহিক নিয়ম বা নীতি নাই। কিন্তু মুহম্মদের সময় হইতে মসজিদ পরিচালনায় একটি পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। সেই পদ্ধতির অন্য কোন প্রবর্তক নাই। কিন্তু সকল মুসলিমই উহার অনুবর্তক। একজন ইমাম মসজিদে মুসলিম সমাজের মুখপাত্র রূপে কায পরিচালনা করেন। তাঁহার সিদ্ধান্তই মুসলিম সমাজের সাধারণ সিদ্ধান্ত। ইমাম মুসলিম সমাজের অবৈতনিক নিযুক্তিবিহীন নেতা। মুসলিম জনসাধারণ এবং সুলতানের মধ্যে ইমাম' যোগসূত্র। মসজিদ সেই যোগসূত্রের কেন্দ্রস্থল। মসজিদ পবিত্র স্থান। সুলতানের পক্ষে এবং মুসলিম জনসাধারণের পক্ষে মসজিদের পবিত্রতা অবশ্য-রক্ষণীয়। মসজিদের রক্ষক বা মতওয়ালী অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। মসজিদে হত্যাকাণ্ড অননুমোদিত। মুসলমান প্রাসাদ আক্রমণ করিতে পারে, ধ্বংস করিতে পারে কিন্তু মসজিদ আক্রমণ-সীমার বহির্ভূত। নূতন মসজিদ নির্মাণ এবং সংরক্ষণ-ব্যবস্থা সুলতান এবং বিশ্বাসীর পক্ষে অবশ্য-কর্তব্য।

পরবর্তী কালে মুসলিম অধিকৃত বহু অঞ্চল হিন্দু কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। এমন কি মুসলমানও মুসলমানের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান কেহই মসজিদ ধ্বংস করে নাই। মুসলিমগণ বহু হিন্দু-মন্দির ধ্বংস করিয়াছিল অথচ হিন্দুগণ মসজিদ ধ্বংস করিয়াছে এইরূপ প্রমাণ বিরল।

প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য মসজিদের সঙ্গে একটি মাদ্রাসা সংলগ্ন থাকে। এই মাদ্রাসা, ইমাম, আলীম এবং মৌলভীর প্রভাব স্থানীয় জনসাধারণের উপর

অপরিসীম। আলীম কিংবা মৌলভী মুসলিম সমাজে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। ইসলাম প্রচারে মৌলভীও যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

মসজিদের পার্শ্বে প্রায়ই মুসলমান জনসাধারণের কবর সংলগ্ন থাকে—প্রায় প্রত্যেক পরিবারের পারিবারিক কবরখানা থাকে। সেইযুগে পীর-ফকীরের মৃত্যু-দিবসে কবরে মুসলমানগণ কোরান পাঠ করিত; মিলাদ-শরীফ (মুহম্মদের জন্মদিবস) অনুষ্ঠান পালন করিত, পীর-ফকীরের কবরে ধূপধুনা দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিত; অনেক সময় দরিদ্রভোজনের ব্যবস্থা বা খয়রাত করিত এবং উৎসবের আয়োজন করিত। বাঙ্গালী জাতি উৎসবপ্রিয়। উৎসবের সুযোগ পাইলে তাহারা ধর্মাধর্ম বিচার করিত না। উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা মিলনক্ষেত্র রচনা করিত (পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য)।

(২) **ইয়াতিমখানা বা অনাথালয়ঃ** অনেক সময়ে মসজিদের সংলগ্ন ইয়াতিমখানা থাকিত এবং কখনও কখনও মসজিদের সঙ্গে অতিথিশালাও (মেহমান-খানা) সংশ্লিষ্ট থাকিত। রীতিমত চিকিৎসালয় না থাকিলেও মসজিদে রুগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসারও ব্যবস্থা করা হইত। দুর্ভিক্ষের সময় অতি দুঃস্থ পিতামাতা খাদ্যাভাবে সন্তান বিক্রয় করিত, কিংবা সন্তানের প্রাণ রক্ষার্থে ইয়াতিমখানায় পুত্রকন্যাকে দান করিত; মুসলমান খাদ্যস্পর্শে আশ্রিত বালক-বালিকাগণ সহজভাবে মুসলমান হইয়া যাইত। পিতামাতার মৃত্যু হইলে অভিভাবকহীন শিশু ইয়াতিমখানাতে আশ্রয়লাভ করিত। দুভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন দেশে অনেক সময়ে দেখা দিত—সেই সময়ে দুঃস্থ অনাথগণ ইয়াতিমখানাতে আশ্রয়লাভ করিত।

(৩) **মুসলমান পীর, ফকীর, কাজী, গাজী কর্তৃক অনুষ্ঠিত জনহিতকর কার্যাবলীঃ** খান সাহেব আলী আহম্মদ পীর খান জাহান আলী শীর্ষক জীবন চরিতের মুখবন্ধে (পশুপতি চট্টোপাধ্যায়) উল্লেখ করিয়াছেন যে, খান জাহান আলী পুষ্করিণী খনন করিয়া খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চলের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন। বহু হিন্দু পীর খান জাহান আলীর গুণমুগ্ধ হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কথিত আছে পীর খান জাহান আলী নিযুক্ত তিনশত ষাটজন খান্‌জালী (খান্‌জাল —কোদাল) খান্‌জাল স্কন্ধে সর্বদা বিভিন্ন গ্রামে জলকষ্ট নিবারণের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিত। খলিফতাবাদ পরগনায় বারাকপুর গ্রামে (খুলনা বাগেরহাট) খান জাহান আলী খনিত একটি বিরাট দীঘি আছে (১৪০০´×৯০০´)। এই দীঘির নাম ঘোড়াদীঘি। কেহ বলেন খান জাহান আলীর অশ্ববাহিনীর স্নানের জন্য এই দীঘি খনন করা হইয়াছিল। কেহ বলেন এই দীঘির আকৃতি ঘোড়ার খুরের ন্যায়—সুতরাং ইহা ঘোড়াদীঘি নামে পরিচিত। বাস্তবিক পক্ষে ইহা সম-দ্বিভুজাকৃতি একটি পুষ্করিণী। এই ঘোড়াদীঘির পার্শ্বে খান জাহান আলীর ষাট গম্বুজ মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। খান জাহান আলীর নামে পরিচিত একটি দরগা আছে—উহার পার্শ্বে একটি দীঘি রহিয়াছে। সেই দীঘির নাম ঠাকুর-দীঘি। কথিত হয় যে,

ঐ দীঘি একজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক খনিত হইয়াছিল—কিন্তু খান জাহান আলী এই দীঘি অধিকার করিয়াছিলেন এবং এই দীঘির তীরে খান জাহান আলীর কবরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইদানীং খান জাহান আলীকে ইসলামের একজন মহাপুরুষ এবং ধর্ম প্রবর্তক-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে, যেন তিনি বঙ্গদেশে দ্বিতীয় মুহম্মদ। কিন্তু বঙ্গদেশে পীর খান জাহান আলীর জীবনী বিশ্লেষণ করিলে সমালোচকের ধারণা অন্যরূপ হয়। ইহা সত্য যে পীর খান জাহান আলীর অধীনে তিন শত ষাট জন খান্‌জালী কোদাল হস্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিত এবং দেশের লোকের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করিত। প্রয়োজন হইলে তাহারা লুণ্ঠন করিত। বাস্তবিক পক্ষে এই খান্‌জালী দল ছিল বঙ্গদেশে ইসলামের সদাপ্রস্তুত প্রহরী। অন্যদিকে এই খান্‌জালীদল ছিল দুর্ধর্ষ—বিনা কর্মে থাকিলে তাহারা সুলতান অথবা পীর খান জাহান আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারে সুতরাং পথ নির্মাণ এবং পুষ্করিণী খনন কার্যে নিযুক্ত করিয়া পীর সাহেব এই দলটিকে কর্মব্যস্ত রাখিতেন। অন্যদিকে তাহারা আপাতদৃষ্টিতে স্থানীয় লোকের উপকার করিয়া ইসলামের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করিত। বঙ্গদেশ ছিল নদীবহুল, সুতরাং বঙ্গদেশের সর্বত্র নূতন পুষ্করিণী খননের প্রয়োজন খুব বেশী ছিল না। অনেক স্থলে হিন্দুর পুরাতন দীঘি বা পুষ্করিণী গুলিকে সংস্কার করিয়া দীঘির তীরে মসজিদ স্থাপন ও উহাদের নূতন নামকরণ করা হইত। খুলনা জেলায় বেদকালী গ্রামে কালীকালাস দীঘি, গৌড়ের মীরাবাঈ দীঘি (লোটন দীঘি), পাণ্ডুয়ায় আদিনা মসজিদের পার্শ্বে একলাখী দীঘিগুলি পুরাতন হিন্দু দীঘিরই মুসলিম সংস্করণ।

এই প্রসঙ্গে অনেকেরই ধারণা যে, ইসলাম ধর্মের উদারতা অস্পৃশ্যতা দোষদুষ্ট নিপীড়িত অবহেলিত হিন্দু সমাজে ইসলাম ধর্ম প্রচারে পরোক্ষ সহায়তা করিয়াছিল। ইসলাম গ্রহণ মাত্র সমস্ত মুসলমান একই সামাজিক অধিকার লাভ করিত, ফলে বর্ণভেদহীন মুসলমান সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াও নিপীড়িত হিন্দুগণ সহজেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত। আপাতদৃষ্টিতে ইসলাম ধর্ম প্রচারের এই যুক্তি অসন্দিগ্ধ পাঠক সহজে গ্রহণ করেন। খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া হিন্দু সমাজকে আঘাত করিতেন এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পক্ষে যুক্তি প্রচার করিতেন—ইসলাম ধর্ম প্রচারের কারণ-স্বরূপ তাঁহারা হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা, বর্ণভেদ ও কুসংস্কার ইত্যাদির নিদর্শন প্রদান করিতেন।

কিন্তু ইসলাম ধর্ম প্রচারের প্রারম্ভ যুগের ঘটনা বিশ্লেষণ করিলে, কিংবা সুলতান, বাদশাহ ও আমীরদের জীবনচরিত পাঠ করিলে অথবা পীর ফকীরদের মকতুবাত (চিঠিপত্র), ধর্মোপদেশ ও বাণী পাঠ করিলে এ বিষয়ে কোন প্রকার ইঙ্গিত পাওয়া

যায় না। মুসলিমগণ ধর্ম প্রচারের জন্য কোথাও হিন্দু সমাজের দোষ আলোচনা করে নাই—হিন্দুকে উদ্ধারের জন্য কোথাও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে নাই। বিধর্মীকে পুণ্য ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া মুসলিমগণ পুণ্য অর্জন করিবে, স্বর্গলাভ করিবে—এই ছিল মুসলমানের 'জিহাদ' ঘোষণার প্রেরণা। আল্লার মহিমা প্রচার ছিল মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং হিন্দুর উদ্ধার অপেক্ষা মুসলিমের সংখ্যা-বৃদ্ধি ও আল্লার মহিমা প্রচার করিয়া মুসলিমের স্বর্গলাভ ছিল ইসলামের প্রত্যক্ষ আবেদন।

পাঁচশত বৎসর মুসলিমগণ বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিল; কিন্তু অনুন্নত হিন্দু সমাজে ধর্মান্তরীকরণের চেষ্টা সকল সুলতান করেন নাই। তুর্ক-আফঘান সুলতান ও আমীরগণ ছিলেন অত্যন্ত গর্বিত। তাঁহারা উচ্চবর্ণের হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং বিবাহ করিলে ব্রাহ্মণ-কন্যাই বিবাহ করিয়াছেন কিংবা ব্রাহ্মণ-সন্তানের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ প্রদান করিয়াছেন; যথা—ব্রাহ্মণ-কন্যা ফুলমতীর সহিত ইলিয়াস শাহের বিবাহ, হুসেন শাহের একাদশ কন্যার সহিত বারেন্দ্রী ভাদুরী বংশীয় ব্রাহ্মণ কুমারগণের বিবাহ, পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ কালাপাহাড়ের সহিত কররানী সুলতানজাদীর বিবাহ।* এই সমস্ত বিবাহ হইতে অনুমান করা যায় যে, মুসলিমগণ মানুষে মানুষে ঐক্য নীতিগতভাবে গ্রহণ করিলেও বাস্তবক্ষেত্রে সামাজিক পার্থক্য স্বীকার করিয়াছে। ধর্মান্তর গ্রহণ মাত্রই ক্ষৌরকার, রজক, তন্তুবায়, চণ্ডাল প্রভৃতি নীচজাতীয় হিন্দুগণ মুসলিম সমাজে উচ্চাধিকার লাভ করে নাই। ধর্মান্তরিত নব মুসলমানগণ তাহাদের বংশানুক্রমিক বৃত্তি ও ব্যবসায় গ্রহণ করিত। হিন্দু ক্ষৌরকার বা নাপিত মুসলমান হইয়া নূতন উপাধি গ্রহণ করিল হজ্জাম, রজক হইল গাসসাল, তন্তুবায় হইল জোলহা বা তাঁতী, চণ্ডাল হইল কসাই। তাহারা একই মসজিদে নমাজ পড়িত, কিন্তু তাহারা মুসলিম সমাজে কোন উচ্চাসন বা সম্ভ্রম লাভ করে নাই। ভারতীয়—তথা বঙ্গদেশীয় মুসলিম সমাজে হিন্দুসমাজের ন্যায়ই জাতিভেদ বা বর্ণভেদ বিদ্যমান। সুতরাং সামাজিক অবিচার বা নির্যাতনের ভিত্তিতে মুসলিমগণ বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচার করে নাই। যুদ্ধজয়ের উন্মাদনা, বিহিস্ত লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং আত্মতৃপ্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা প্রধানতঃ বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচার করিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম অধিকারও বিস্তার করিয়াছিল।

---

* দিল্লীর সুলতান ফিরুজ তুঘলকের মাতা ছিলেন দীপাল পুরের রাজকন্যা নীলাদেবী, আলাউদ্দীন বিবাহ করিয়াছিলেন গুজরাটের রাজমহিষী কমলাদেবীকে এবং খিজির খানের পত্নী ছিলেন গুজরাটের রাজকুমারী দেবলাদেবী। আকবর হইতে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত মুঘল পরিবারের সহিত অনেক রাজকন্যার বিবাহ হইয়াছিল এবং তাঁহারা ছিলেন অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া—অম্বর, বিকানীর ও যোধপুর-রাজকন্যা। মুঘল রাজবংশীয়গণ রাজ-পরিবারেই বিবাহ করিয়াছেন—নিম্নবর্ণের হিন্দুনারী বিবাহ করেন নাই।

ইসলাম গ্রহণ সত্ত্বেও নব দীক্ষিত স্থানীয় হিন্দুগণ তাঁহাদের বংশানুগত রীতি-নীতি এবং ভাবধারা বর্জন করে নাই। কারণ নিরক্ষর, অশিক্ষিত জনসাধারণ প্রাচীন সংস্কার ও বংশানুক্রমিক জীবনধারা সহজে বর্জন করে না। সুতরাং ধর্মের আবেদনে কিংবা সামাজিক ঐক্যের আগ্রহে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ ইসলামধর্ম গ্রহণ করে নাই। যেখানে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, সেখানে তাহারা প্রাচীন সংস্কার এবং চিন্তাধারা বর্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অনেক স্থলে হিন্দু সমাজপতি ব্রাহ্মণ কিংবা সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহাদের অনুচরবর্গও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা আদর্শ বিচার করে নাই— প্রভু ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং অনুচরবর্গও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

রাজনৈতিক উপদ্রবে, তরবারির ভয়ে এবং অর্থনৈতিক কারণে অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। যুদ্ধে পরাজিত বন্দীকে হত্যা করা কিংবা দাসবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা ছিল ইসলামের সাধারণ যুদ্ধোত্তর নীতি। মৃত্যুভয় এবং দাসজীবন হইতে মুক্তিলাভের জন্য অনেক যুদ্ধবন্দী হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল; রাজস্ব-ভার হইতে মুক্তিলাভের জন্য ও জিজিয়া কর হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য অনেক সময় দরিদ্র হিন্দু প্রজা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

মুসলিম আগমনের অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গদেশের সমাজে বৌদ্ধ এবং হিন্দু দুইটি ধর্মীয় শ্রেণী ছিল। ওদন্তপুরে বা নালন্দায় বৌদ্ধ বিহার এবং বৌদ্ধ শ্রমণের উপর মুসলিম অত্যাচারের ফলে বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বঙ্গদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সেন-রাজসভায় তাহাদের কোন প্রতিপত্তি ছিল না। এই হিন্দু-বৌদ্ধ মতান্তর এবং মনান্তরের সুযোগ ইখতিয়ারউদ্দীন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাহাদের সাহায্যেই ইখতিয়ারউদ্দীন বঙ্গদেশে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন।

(৪) **পীর ও ফকীরগণের অলৌকিক কার্যাবলী**ঃ পীর এবং ফকীরগণের অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুগণকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ফকীর ও পীরগণ দরগায় বাস করিয়া সাধারণ মানুষকে রোগে ঔষধ এবং বিপদে মন্ত্রপাঠ করিয়া অথবা তাবিজের ব্যবস্থা করিয়া আর্যদিগকে ইসলামের প্রতি আর্কষণ করিতেন। মুসলিম ফকীরগণের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করা হইল:

(ক) পীর শাহ জালাল প্রতিদিন প্রভাতে প্রভাতী নমাজ পড়িবার জন্য মক্কায় গমন করিতেন এবং দ্বিপ্রহরের নমাজের জন্য সিলেটে তাঁহার খানকায় প্রত্যাবর্তন করিতেন। শাহ জালাল বৎসরে চল্লিশ দিন একাদিক্রমে নিরম্বু উপবাস করিয়া 'রোজা' পালন করিতেন। তিনি ১৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন।[১]

---

১) ইবন-বাতুতা, রিহালা, ২৩৮—৪০ পৃঃ

(খ) কথিত আছে যে, চট্টগ্রামের ফকীর পীর বদর আরব সাগর হইতে মৎস্যপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কর্ণফুলি নদীর মোহনায় অবতরণ করেন। সুতরাং তিনি 'মাহী-সওয়ার' (মৎস্যারোহী) নামে পরিচিত। চট্টগ্রামের উপকূলে অবতরণ করিয়া তিনি স্থানীয় রাজার নিকট একচটি ভূমি প্রার্থনা করেন। একটি প্রদীপের আলোকে উদ্ভাসিত ভূখণ্ড ছিল তাঁহার প্রার্থনীয় (চটি—আলো)। এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ড তাঁহাকে প্রদান করা হইল। এই "চটি" বা আলো উদ্ভাসিত গ্রামের নাম "চটিগাঁও" বা চট্টগ্রাম। কিন্তু প্রদীপটি প্রজ্জ্বলিত করিলে দেখা গেল যে, বহু দূর পর্যন্ত ভূখণ্ড আলোকিত হইয়াছে। এই অলৌকিক কার্যের দ্বারা পীর বদর সমস্ত চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার করেন। এই অলৌকিক কাহিনী অবশ্য উপমা— "মাহী সওয়ার"-এর অর্থ এই যে, পীর বদর মৎস্যের মত অতি সহজে সুদূর সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং প্রদীপের অর্থ ইসলামের আলো। এখনও পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমান মাঝিমাল্লারা পীর বদরের নামে সিন্নি বা জল প্রদান করে (বদরগাজীর গীত ২৬-২৭ পৃঃ)।

(গ) ঘুটিয়ারী শরীফের (সুন্দরবন) পীর সম্বন্ধেও অনেক অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ আছে। তিনিই ব্যাঘ্রসংকুল সুন্দরবন অঞ্চলে প্রথম মুসলিম বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহায় ছিল তীক্ষ্ণ তীর এবং অব্যর্থ লক্ষ্য। কথিত আছে যে, পীর মোবারক আলী একটি ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সমগ্র সুন্দরবনে বিচরণ করিতেন। তাঁহার ভয়ে হিংস্র পশুও দূরে পলায়ন করিত। সুলতান সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "মদনমল" পরগনার জায়গির প্রদান করেন। জনসাধারণ গাজীর সাহস এবং শক্তি দর্শনে আশ্চর্য হইয়া তাঁহার প্রতি অলৌকিক শক্তি আরোপ করিল। তাঁহার ভ্রাতা কালু গাজীও বীর ছিলেন। অদ্যাপি হিন্দু-মুসলমান তাঁহাদের সম্মানার্থে সিন্নি প্রদান করে। প্রতি বৎসর ঘুটিয়ারী শরীফে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয় ; তথায় মোবারক আলীর বীরত্বগাথা এবং অলৌকিক কাহিনী গীত হয়।

(ঘ) সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদেবতা গাজী দক্ষিণারায়ের আলৌকিক কাহিনীও ঐ অঞ্চলে অতি জনপ্রিয়। 'গাজী' শব্দের অর্থ বিধর্মীহন্তা। "দক্ষিণারায়" এই হিন্দুনামের সঙ্গে গাজী শব্দের মিশ্রণ কৌতুকাবহ। দক্ষিণারায় দেবতারূপে সুন্দরবন অঞ্চলে পূজিত হন। তাঁহার মূর্তি একটি মসজিদে স্থাপিত আছে। সেই মূর্তিটি ব্যাঘ্র অধ্যুষিত সুন্দরবন অঞ্চলে কয়েকটি মন্দিরেও প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি ছিলেন একজন রাজা, একজন যোদ্ধা, একজন শিকারী। তাঁহার পরিচ্ছদ হইতে ইহা অনুমান করা কঠিন নহে যে, তিনি হিংস্র পশু নিধন করিয়াছেন। হিংস্র পশু হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই শত্রু। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানও এই হিংস্র পশুবধে তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিল। "বনবিবির জহুরা নামা" নামক গ্রন্থে (মুন্সী জৈন-উদ্দীন সংস্করণ) দক্ষিণারায়ের সঙ্গে তাতাল খান এবং খোসাল খানের বীরত্ব-কাহিনী মিশ্রিত রহিয়াছে।

মুসলিম কিংবদন্তী কালু গাজী ও চম্পাবতীর কাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, মুকুটরায় ছিলেন ব্রাহ্মণ নগরের অধিপতি এবং দক্ষিণারায় ছিলেন তাঁহার সেনাপতি। দক্ষিণারায় কালু গাজী কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। পরিশেষে এক সন্ধির ফলে রাজা মুকুট রায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু সেনাপতি দক্ষিণারায়কে মুসলমানগণ বনদেবতার আসন প্রদান করিয়া গাজী পদে উন্নীত করে। এই কাহিনীর শেষে বর্ণিত আছে যে, মুকুট রায়ের কন্যা চম্পাবতীকে কালু গাজীর হস্তে সমর্পণ করা হয়। কৃষ্ণদাসের 'রায় মঙ্গলে' এইরূপ কাহিনীর উল্লেখ আছে। এই কাহিনী বিশ্লেষণ করিলে তিনটি ঐতিহাসিক সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—(১) হিন্দু যুদ্ধে পরাজিত হইলে ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত, (২) হিন্দু রাজার কন্যাকে বিজয়ী মুসলিমের হস্তে সমর্পণ করিতে হইত এবং (৩) স্থানীয় মুসলমানগণ হিন্দুর দেবতাকে অর্ঘ্য প্রদান করিত (অবশ্য এই হিন্দু দেবতা মুসলিমরূপে রূপায়িত হইতেন)। কালু গাজী ও চম্পাবতীর কাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, বিহস্ত (স্বর্গ) হইতে একমাত্র ফেরিস্তা (দেবদূত) কালু গাজীই ইসলাম প্রচারের সহায়তার জন্য প্রেরিত হন নাই— হিন্দুর দেবতা মহাদেব, চণ্ডী ও গঙ্গা এবং স্থলে ব্যাঘ্র ও জলে কুম্ভীরও কালু গাজীর সহয়তার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।

(ঙ) শাহ জালাল বুখারী রংপুরে মাহীগঞ্জ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে--এই পীর শাহ জালাল মৎস্যপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং এই অঞ্চলকে 'মাহীগঞ্জ' বা মৎস্যের অঞ্চল বলিয়া অভিহিত করেন। পাণ্ডুয়ার দরগায় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পীর শাহ জালাল বুখারীর একটি জীবনী সংরক্ষিত আছে। তাঁহার মধ্যে বহু অলৌকিক কাহিনীও বর্ণিত আছে।

(চ) ঢাকা জেলায় মীরপুর গ্রামে বাগদাদের আউলিয়া হজরৎ শাহের নামে উৎসর্গিত একটি দরগা রহিয়াছে। কথিত আছে যে, ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি একাদিক্রমে চারিশত চল্লিশ দিবস উপবাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নির্দেশানুসারে তাঁহার মৃতদেহ একটি উষ্ণ রক্তপূর্ণ পাত্রে এই দরগায় সমাহিত করা হয়। এই কাহিনীটিও রূপক। উষ্ণ রক্তপূর্ণ পাত্রের সমাধির দ্বারা সূচিত হয় যে যুদ্ধ, তরবারি ও রক্তের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করিতে হইবে।

(ছ) মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি গ্রামে (মহারাজ শশাঙ্কের রাজধানী) পীর তুরকান শাহের একটি কবর আছে। স্থানীয় কিংবদন্তীতে উল্লেখ আছে যে, এইস্থানে একটি পুষ্করিণীর তীরে একটি রাক্ষসী বাস করিত। সেই রাক্ষসী ছিল বিদুষী এবং ধর্মশাস্ত্রে পরিদর্শিনী। প্রতি বৎসর রাজার আদেশে একজন পণ্ডিত তাহার সহিত ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে বিতর্ক করিতেন। এই পণ্ডিত বিতর্কে

পরাজিত হইলে রাক্ষসী পণ্ডিতকে ভক্ষণ করিত। পরিশেষে পীর তুরকান গাজী এই রাক্ষসীকে তর্কে পরাজিত করিয়া হত্যা করেন। এই কাহিনীটিও রূপক। ইহার মধ্যে ইসলামের বিজয় এবং হিন্দুর পরাজয় সূচিত হয়।

উপরে উল্লিখিত কাহিনীগুলি নানাভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ইহাতে সত্য, অর্ধসত্য বা মিথ্যার সহিত কল্পনা সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। কাহিনীগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ল. সা. গু হইতে নির্ধারণ করা যায় যে, কাহিনীগুলির পশ্চাতে আলোচনার বস্তু রহিয়াছে। তত্ত্বান্বেষী স্বয়ং এই কাহিনীগুলি বিশ্লেষণ করিয়া বঙ্গদেশে মুসলিম অধিকার বিস্তারের অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

মুসলিম ধর্ম বিস্তারের সঙ্গে রাজ্যবিস্তার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ, মুসলমান শাসক ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ। শাসিত সংখ্যাগুরু অমুসলমান ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিত—বিশেষ করিয়া একবার মুসলিম সমাজে প্রবেশ করিলে হিন্দুর পক্ষে স্বীয় সমাজে প্রত্যাবর্তনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইত। সুতরাং মুসলিম রাজ্য বিস্তারে ধর্মান্তরীকরণ একটি উৎকৃষ্ট উপায় ছিল।

তুর্ক-আফঘান যুগে হিন্দু-মুসলিম বিবাহ

মুসলিম আক্রমণের প্রথম ভাগে তুর্ক-আফঘান যোদ্ধা বঙ্গদেশে সস্ত্রীক আগমন করে নাই। পথ ছিল দীর্ঘ, ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চিত—সুতরাং পথে নারী ছিল একটি সমস্যা। অথচ সুস্থদেহ, দুর্ধর্ষ তুর্ক-আফঘান যোদ্ধা সন্ন্যাসী ছিল না, দেহ সম্ভোগ ছিল তাহাদের জীবনের অন্যতম তৃপ্তি ও বিলাস। সুতরাং দেহের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির জন্য যে-কোন নারী তাহাদের পক্ষে গ্রহণীয় ছিল। বিবাহিতা বা বিবাহাতি-রিক্তার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। ইসলাম ধর্মে বিবাহ অবশ্য-কর্তব্য—একাধিক বিবাহ বিধি-সম্মত। "মুসলিম ১, ২, ৩, ৪ টি বিবাহ করিতে পারে"; ইসলামে ১+২+৩+৪ যোগ করিয়া দশটি বিবাহ ধর্মানুমোদিত। তবে একসঙ্গে চারিটির অধিক নহে। তার উপর রক্ষিতার স্থান মুসলিম সমাজে যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল। পরাজিত শত্রুর স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নী, আত্মীয়া—সকল নারীই ছিল মুসলিম বিজেতার জয় লব্ধাংশ (গণিমা)। যুদ্ধজয়ের পরে সন্ধির শর্তের মধ্যে নারী একটি প্রধান অংশ ছিল।

জৈব প্রয়োজন ব্যতীতও মুসলমানের পক্ষে হিন্দু নারীর প্রতি একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। হিন্দুনারীর মানসিক প্রস্তুতি ছিল মুসলমানের পক্ষে একটি অভিনব ব্যাপার। হিন্দুনারী সংস্কার অনুযায়ী স্বামীকে দেবতার অংশরূপে বিবেচনা করিত, বিবাহ হিন্দু নারীর পক্ষে অবিচ্ছেদ্য অনুষ্ঠান—'একদিন স্বামী চিরদিন স্বামী', জীবনেও স্বামী, মরণেও স্বামী—স্বামীর ধর্ম স্ত্রীর ধর্ম; হিন্দু নারী স্বামীর সহধর্মিণী। হিন্দু নারী কখনও বিবাহ-বিচ্ছেদ কল্পনা করিতে পারিত না। মুসলিম নারী স্বামীর মৃত্যু হইলে পুনরায় বিবাহ করিতে পারিত, জীবিতকালেও বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে পারিত।

ধর্মের বিচারে সকল মুসলমান এক হইলেও মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ আছে। শিয়া এবং সুন্নীর মধ্যে এই ভেদ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাহার উপর মুসলমানের মধ্যে কৌলিন্য বোধ আছে। সুতরাং মুসলমান নারী অনেক সময় স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ কল্পনা করিত এবং ব্যবস্থা করিত। হিন্দু নারীর পক্ষে অন্য পতি গ্রহণ বা সেরূপ চিন্তাও পাপ। সুতরাং মুসলিম বিজেতা অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুনারী কামনা করিত এবং বিবাহ করিত। অনেক সময় মুসলিম বিজেতা পরাজয়ের চিহ্নস্বরূপ পরাজিত হিন্দুকে মুসলমানের নিকট কন্যাদান করিতে বাধ্য করিত। অথবা ইসলাম গ্রহণের স্বীকৃতি স্বরূপ পরাজিত হিন্দুকে মুসলিম নারী বিবাহ করিতে বাধ্য করিত। মুসলিম নারী বিবাহ করিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব নষ্ট হইত, অথচ হিন্দু নারী বিবাহ দ্বারা মুসলিমের মুসলিমত্ব নষ্ট হইত না। মুসলিম পিতা বা মাতার সন্তান মুসলিম হইত অথচ হিন্দু পিতামাতার সন্তান মুসলিম সংস্পর্শে হিন্দু থাকিত না। সুতরাং পিতৃ-মাতৃ উভয় দিক হইতে মুসলিমের লাভ ছিল।

তুর্ক-আফঘান যুগের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হিন্দু-মুসলিম বিবাহ—

(১) ইলিয়াস শাহ ফুলমতী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। ফুলমতী ছিলেন বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রাম নিবাসিনী।

(২) রাজা গণেশ সুলতান আজম শাহের বিধবা স্ত্রী ফুলজানিকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

(৩) যদুসেন (জয়মল্ল, জালালউদ্দীন) আজম শাহের কন্যা আশমানতারাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

(৪) হুসেন শাহের কন্যা ভাতুরিয়ার ব্রাহ্মণ মদন ভাদুরীর পুত্র কন্দর্পদেবের পুত্রকে বিবাহ করেন। হুসেন শাহ তাঁহার একাদশ কন্যাকে মদন ভাদুরীর একাদশ পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

(৫) হুসেন শাহের উজীর চতুরঙ্গ খান ইসলাম গ্রহণ করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণ সার্থক করিবার জন্য একজন মুসলিম নারী বিবাহ করেন। চতুরঙ্গ খানের মুসলিম স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্র সুবি খান ও সুচি খান খুলনা জেলায় সেনের বাজারের কাজীর পদ লাভ করেন। সেনের বাজারের কাজী পরিবার অদ্যাপি হিন্দু পিতার বংশজাত বলিয়া গর্ব করেন।

(৬) খুলনার পীরালী ব্রাহ্মণগণ তাহের আলী খানের বংশজাত। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যপাদে পীর খান জাহান আলী তাহের আলীকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। পীর তাহের আলীর হিন্দু স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণ পীরালী ব্রাহ্মণ এবং মুসলিম স্ত্রীর সন্তানগণ তাহেরিয়া নামে পরিচিত। পীর খান জাহান আলীরও একজন হিন্দু স্ত্রী ছিলেন, তাহার নাম ছিল সোনামণি—ইসলাম গ্রহণের পর তাঁহার নাম হইল সোনা বিবি। খান জাহান আলীর মৃত্যুর পর সোনা বিবি ঘোড়া

দীঘিতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন। খান জাহান আলীর মুসলিম স্ত্রী বাঘী বিবির কবর ঘোড়াদীঘির পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

(৭) সাতক্ষীরার মাইচম্পা ছিলেন হিন্দুরাজা মুকুট রায়ের কন্যা। কথিত আছে—একজন ফকীর এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করিতে আসিয়া মুকুট রায়ের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধে হিন্দুরাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার কন্যা চম্পাবতী ফকীরকে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। চম্পাবতী অত্যন্ত ধর্মশীলা রমণী ছিলেন। তাঁহার সমাধি সাতক্ষীরার সাত মাইল দূরে অবস্থিত। অদ্যাপি হিন্দু-মুসলমান জনতা তাঁহার কবরকে তীর্থরূপে শ্রদ্ধা করে। মাইচম্পার বিবাহ সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী আছে।

(৮) ইউসুফ শাহ একটি হিন্দু নর্তকী বিবাহ করিয়াছিলেন—তাঁহার হিন্দু নাম মীরা—মুসলিম নাম লোটন বিবি। গৌড়ের হিন্দু মন্দিরকে তিনি মসজিদে পরিণত করেন। এই মসজিদের নাম লোটন মসজিদ এবং পার্শ্বস্থিত দীঘির নাম লোটন দীঘি।

(৯) মুর্শিদাবাদের মর্তুজা খান আনন্দময়ী নাম্নী এক হিন্দু নারী বিবাহ করেন। মর্তুজার কবরের পার্শ্বে তাঁহার কবর অবস্থিত। আনন্দময়ী ছিলেন পরম বৈষ্ণব। অথচ স্বামীর প্রতি তাঁহার ভক্তি স্থানীয় বহু ছড়াগানে অমর হইয়া আছে।

সুন্দরবন অঞ্চলে "গাজী মিঞার বিয়া" অত্যন্ত জনপ্রিয় উৎসব। "কালু গাজী ও চম্পাবতীর বিয়া" নামক কিচ্ছার মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক কাহিনী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সমাজের সাধারণ পর্যায়ে এই বিবাহগুলি অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা ও জাতিচ্যুতি হইতে হিন্দু-মুসলমানের বিবাহ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

হিন্দু নারী মুসলিমকে বিবাহ করিলেও তাহাদের প্রাচীন আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নাই—করিতে পারে নাই। উচ্চবর্ণের হিন্দু যেখানে স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়াছে, সেখানে তাহারা ইসলামকে সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু নিম্নস্তরের হিন্দু অনেক সময় বাধ্য হইয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, মুসলিম নারী বিবাহ করিয়াছে, অথবা মুসলমানদের সঙ্গে কন্যার বিবাহ প্রদান করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এই বিবাহগুলি হিন্দু নারীর পক্ষে মর্মান্তিক। অর্থের প্রয়োজনে অথবা অত্যাচারের ভয়ে মুসলমান হইলেও তাহারা পূর্বপুরুষের ধর্মীয় সংস্কার ও রীতিনীতি ত্যাগ করে নাই। দীর্ঘদিন পর্যন্ত হিন্দু নারীর সন্তান তাহাদের পূর্ব রীতিনীতি বহুল পরিমাণে সংরক্ষণ করিয়াছিল। অদ্যাপিও বহু মুসলিম পরিবারে হিন্দু আচার-ব্যবহার বিদ্যমান রহিয়াছে।

পরিশিষ্ট (৬)

তুর্ক-আফঘান যুগে বঙ্গদেশে মুসলিম শাসনের সার্থকতা

তুর্ক-আফঘান যুগে হিন্দু জ্ঞান ও জ্ঞানানুশীলন

বঙ্গে মুসলিম অধিকার বিস্তারের আদিপর্বে হিন্দুর জ্ঞানানুশীলন

তুর্ক-আফঘান যুগের বঙ্গদেশ সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদের ভিত্তি মুসলমানের বর্ণনা ও বিবরণ। পরবর্তী কালে পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য মনীষিগণ ঐ সকল বিবরণের অনুবাদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া অনেক তথ্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা এই যে, তুর্ক-আফঘান যুগে বাঙ্গলার ধীশক্তি ও মনীষা ছিল সম্পূর্ণভাবে শুষ্ক, অনুর্বর; কারণ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং মুসলমানের অত্যাচারে বিধর্মী হিন্দুগণ এত বেশী জর্জরিত ছিল যে, তাহাদের জ্ঞানানুশীলনের উপযুক্ত মানসিক ধৈর্য ছিল না। সুতরাং মুসলিম আগমনের অব্যবহিত পূর্বে কোন কোন রাজসভায় বহু পণ্ডিত, কবি এবং মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছিল সত্য (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য), কিন্তু মুসলিম আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গলার মনীষা স্তিমিত হইয়া গেল; একটি বিরাট শূন্যতা সমগ্র বঙ্গদেশকে আচ্ছন্ন করিল।

মুসলিম আক্রমণের জন্য সাধারণ বাঙালীসমাজ প্রস্তুত ছিল না। ইবন বখতিয়ারের প্রথম আক্রমণেই বাঙ্গালীর ক্ষাত্রশক্তি বিপর্যস্ত হইয়া গেল। এই আক্রমণের কোন প্রতিক্রিয়া বঙ্গদেশে হয় নাই। কারণ, বাঙালীর মন ছিল রাজনির্ভর। রাজাকে কর প্রদান করিয়া, রাজার হস্তে স্বীয় স্বার্থ সমর্পণ করিয়া বাঙালী জাতি নিশ্চিন্ত ছিল। পরলোকের জন্য ব্রাহ্মণ ছিলেন জাতির প্রতিনিধি—রাজা ছিলেন ইহলোকের আশ্রয়। ব্রাহ্মণ এবং রাজা ছিলেন সম্মিলিত-ভাবে সমাজ ও রাজ্যের রক্ষক এবং পরস্পর পরিপূরক। নদীয়া জয়ের পরে রাজা পরাজিত অথচ জনসাধরণ রাজ্যরক্ষার কোন প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। রাজার অভাবে ব্রাহ্মণগণ আশ্রয়হীন হইয়া পড়িল। রাজা লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, রাজধানীর ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গলার প্রত্যন্তদেশ উড়িষ্যা, মিথিলা, কাশী, নেপাল এবং সুদূর পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে নিরাপত্তার সন্ধান করিল।* এই সুদূর অঞ্চলে মুসলমানের আক্রমণাত্মক হস্ত হইতে বহু দূরে

---

* বিশারদ সুত সার্বভৌম ভট্টাচার্য।
সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড় রাজ্য॥
তার ভ্রাতা বিদ্যা বাচস্পতি গৌড়ে বসি।
বিশারদ নিবাস করিল বারাণসী॥—চৈতন্য মঙ্গল (জয়ানন্দ)।

বাস করিয়া হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই ন্যূনাধিক পরিমাণে আত্মরক্ষা ও ধর্মরক্ষা করিয়াছিল।

বাংলায় ও উত্তর ভারতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাল্পতার অন্যতম কারণ এই যে, তুর্ক-আফঘান জাতি মধ্য-এশিয়াতে মুণ্ডিত মস্তক, রক্ত-কষায় বস্ত্র পরিহিত, দণ্ডহস্ত বৌদ্ধ শ্রমণ ও সন্ন্যাসীদিগকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিত। পূর্ব-ভারতে, বিহারে এবং বঙ্গদেশে তুর্ক-আফঘানগণ প্রথমতই বৌদ্ধ বিহার আক্রমণ করিয়াছিল। বৌদ্ধগণ প্রাণভয়ে কোথাও দেশত্যাগ করিল, কোথাও বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধবেশ ত্যাগ করিয়া হিন্দু সমাজের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। অচিরে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মুসলিম রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ ধর্ম ও জনতা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গেল।

তুর্ক-আফঘান জাতি কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজয়ের পর একশত বৎসর পর্যন্ত হিন্দুসমাজ ছিল বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত। উচ্চ শ্রেণীর বহু হিন্দু ছিল উদ্বাস্তু। এই উদ্বাস্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং পুরোহিতগণের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। রাজার পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাহারা কেন্দ্রচ্যুত হইয়া গেল। প্রথম আঘাতের প্রচণ্ডতায় হিন্দুসমাজ স্থাণুবৎ জড় হইয়া গেল।

বাঙলা দেশ ও সমাজের সংস্কৃতির বাহন সংস্কৃত ভাষা ছিল রাজা এবং রাজসভার অনুগ্রহপুষ্ট। কিন্তু মুসলিম আগমনের পরে কোন হিন্দু রাজসভা ছিল না। পূর্বে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর ভূমি লাভ করিত; এই সময়ে হিন্দু ব্রাহ্মণগণ রাজার পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অন্নহীন, আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন হইয়া পড়িল। রাজা স্বয়ং উদ্বাস্তু—পলাতক; তাঁহার পক্ষে ব্রাহ্মণকে কোন প্রকার সাহায্য করা সম্ভবপর ছিল না। পূর্বের ন্যায় রাজসভায় মিলিত হইয়া পণ্ডিতগণও আর পরস্পর আলোচনা বা ভাববিনিময় করিতে পারিত না। মুসলিম সুলতানগণ সংস্কৃত ভাষা বুঝিতেন না, জানিতেন না; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে বিধর্মীর ধর্মের ভাষা সংস্কৃতকে এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে সাহায্য করিবার কোন প্রশ্নই ছিল না। তার উপর সংস্কৃত ছিল বিধর্মীর দেবতার ভাষা সুতরাং উহা ছিল মুসলমানের অস্পৃশ্য।

হিন্দুমন এক অদ্ভুত উপাদানে গঠিত। আঘাত আসিলে তাঁহা বিমূঢ় হইয়া যায়। শীতের প্রারম্ভে কুজ্ঝটিকার মতন দ্রব হইয়া যায়, আবার সামান্য সূর্যকর-স্পর্শে সেই দ্রবীভূত মন পুষ্পকোরকের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। মুসলিম আগমনের পর একশত বৎসর পর্যন্ত বাঙলার পণ্ডিতসমাজ ছিল বিমূঢ়, জড়—তারপরেই বাঙালীমন সচেতন হইয়া উঠিল। বাঙালী ক্রমশঃ আত্মস্থ হইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের চিন্তাধারা, কল্পনা ও আদর্শ বিভিন্ন বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। বাঙলার মনীষা দুইশত

বৎসরের মধ্যে এক নূতন রূপ ধারণ করিল। পর্যায়ক্রমে এইরূপ জড়তা ও সচেতনতা হিন্দুমনের বৈশিষ্ট্য। এই যুগে বাঙালীর রচিত কাব্য-সাহিত্য আলোচনা করিলে তুর্ক-আফঘান যুগে বাঙালীর মানসিক পরিস্থিতির একটি সুন্দর আলেখ্য রচিত হইতে পারে।

মুসলিম আগমনের প্রথম একশত বৎসরের মধ্যে (১২০০-১৩০০খ্রীঃ) বাঙ্গলা দেশে কোন কাব্য বা উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য রচিত হয় নাই। এই সময়ে একমাত্র কানা হরিদাস মনসার ভাসান রচনা করিয়াছিলেন—অবশ্য এই রচনা উচ্চাঙ্গের নহে। বাঙ্গলার পক্ষে সৌভাগ্য এই যে বঙ্গদেশ-বিজয়ী মুসলিমগণ আরব জাতীয় ছিল না। তুর্ক-আফঘান অভিযাত্রিদল ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বেই পারস্যের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ভাষার সহিত পরিচিত হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইল। পারসিক এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাষা ছিল আর্য —তাহাদের ভিত্তির মধ্যে ঐক্য ছিল। তুর্ক-আফঘানদের পক্ষে ভারতবর্ষে বাস করিয়া ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করা সহজ ছিল। দিল্লীর তুর্ক-আফঘান সুলতানগণ দিল্লীতে পারসিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। দিল্লীর সুলতানগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বঙ্গদেশে খালজী, তুঘলক, ইলিয়াসশাহী ও হুসেনশাহী বংশ ফারসী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করে। আরবী মুসলমানগণের ধর্মের ভাষা হইলেও তুর্ক-আফঘানগণ ভারতের কোন অঞ্চলে আরবী ভাষা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন নাই। বরং বঙ্গদেশে ইলিয়াসশাহী ও হুসেনশাহী বংশ স্থানীয় বাংলা ভাষারই পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন—বাংলা ভাষার কবি এবং পণ্ডিতদিগকে উপাধি ও বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। এমন কি বঙ্গদেশে আরবী অক্ষরে লিখিত উর্দু ভাষা প্রচলন করাও সম্ভবপর হয় নাই। ভারতের প্রায় সর্বত্র মুসলমান সমাজে ভাব বিনিময়ের বাহন ছিল উচ্চস্তরে পারসিক ভাষা এবং সর্বস্তরে উর্দু ভাষা। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে বাংলা ভাষাই ছিল হিন্দু-মুসলমানের আত্মপ্রকাশের ভাষা। তুর্ক-আফঘান সুলতানগণ তাঁহাদের আইন-আদালতেও রাজকীয় দলিলপত্রে পারসিক ভাষা ব্যবহার করিতেন। আরবী শব্দ ধর্মের ব্যাপারে ব্যবহার করা হইত। কিন্তু জনসাধারণের ভাষা ছিল সম্পূর্ণ বাংলা ভাষা।

তুর্ক-আফঘান শাসনের প্রথম ভাগে বাঙালী হিন্দুর পক্ষে মুসলমান সুলতানের অধীনে রাজকার্যে অংশ গ্রহণের সুযোগ ছিল না। একমাত্র রাজস্ববিভাগে জিজিয়া কর নির্ধারণের জন্য হিন্দুর সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছিল, কারণ হিন্দুগণই হিন্দুর সম্পত্তির মূল্য এবং আয় সম্বন্ধে অবহিত ছিল। তাহাদের প্রদত্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াই সুলতানগণ জিজিয়া কর নির্ধারণ করিতেন। সুতরাং রাজস্ব আদায়ের জন্য হিন্দুর প্রয়োজন ছিল। আকবরের পূর্ব পর্যন্ত দিল্লীর সুলতানগণ হিন্দী সংখ্যা ও ভাষায় আয়ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আকবর হিন্দুসচিব টোডরমল্লের পরামর্শে দিল্লীর রাজদরবারে হিন্দী এবং ফারসী

ভাষায় হিসাবপত্র সংরক্ষণের রীতি প্রবর্তন করেন। কিন্তু বঙ্গদেশে হিসাবপত্র বাংলা অক্ষরে ও সংখ্যায় লিখিত হইত।

মুসলমান আগমনের প্রথম পর্বে বাঙ্গলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা ছিল অতি অল্প। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সহিত আলাপ-আলোচনা এবং ভাবের আদান-প্রদানে স্থানীয় ভাষাই ব্যবহৃত হইত। বঙ্গদেশীয় মুসলমানগণ প্রায়ই ছিল হিন্দু মাতার সন্তান। সুতরাং তাহারা সহজভাবেই মাতৃভাষায় আলাপ-আলোচনা করিত। মুসলমান রাজবংশের মধ্যেও অনেকে ছিলেন হিন্দুমাতার সন্তান—রাজা গণেশের পুত্র জালালউদ্দীন (যদুমল্ল) ছিলেন হিন্দু পিতামাতার সন্তান। বাঙ্গলার একটি প্রাচীনতম গ্রন্থ শেখ শুভোদয় ছিল একজন মুসলমানের রচনা। ইলিয়াসশাহী বংশের শেষভাগে এবং হুসেনশাহী বংশের রাজত্বকালে রাজদরবারের অনুগ্রহপুষ্ট হইয়া বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয়। হুসেন শাহ স্বয়ং সুবুদ্ধি রায় নামক একজন হিন্দু ব্রাহ্মণের গৃহে প্রতিপালিত হন। এই সময়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বহু হিন্দুর সহিত পরিচিত হন। তিনি তাঁহার একাদশটি কন্যাকে বরেন্দ্র-ব্রাহ্মণ পরিবারে বিবাহ প্রদান করেন। এই সমস্ত মহিলা নিশ্চয়ই বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলিতেন। নসরৎ শাহ এবং আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ ছিলেন বঙ্গদেশজাত। তাঁহাদের ভাষাও ছিল বাংলা। হুসেন শাহী বংশ মুসলমান আগমনের তিনশত বৎসর পরে বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছেন সুতরাং সময়ের দূরত্বে তাহাদের উষ্মা স্তিমিত হইয়া গিয়াছিল।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মুসলমান কর্তৃক পরাজিত হইয়া বাঙালী জাতি কেন্দ্রচ্যুত হইয়াছিল। বাঙালী বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, বাঙ্গলার মনীষা শুষ্ক হইয়াছিল, কিন্তু একশত বৎসরের মধ্যে বাঙালী মনীষার পুনরুত্থান হইয়াছিল।

বাঙ্গলার স্মার্ত পণ্ডিত, বাঙ্গলার কবি, জীবনীকার প্রভৃতির জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, মুসলমান আগমনের প্রথম একশত বৎসর সত্যই বাঙালী বিভ্রান্ত হইয়াছিল, কানা হরিদাস ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম। মুসলিম-বিজয়ের দ্বিতীয় শতাব্দীতে বঙ্গদেশে এক নূতন জ্ঞান-চঞ্চলতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কবি বিদ্যাপতি একখানি অপূর্ব পদাবলী ও নয়খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

মুসলমান আগমনের তৃতীয় শতকে শুক্রেশ্বর এবং কামেশ্বর নামে দুই ভ্রাতা ত্রিপুরার রাজমালা রচনা করেন (১৪০৭-৩৯খ্রীঃ)। ইহার পরেই চণ্ডীদাস (১৪১৭-৭৭ খ্রীঃ) তাঁহার অপূর্ব ললিতকাব্য পদাবলী এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করিয়া বাঙালী জাতিকে এক অপূর্ব রস-উৎসের সন্ধান দিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের সমসাময়িক কবি কৃত্তিবাস বাল্মীকি-রচিত রামায়ণকে বাঙালী মনের উপযু করিয়া নূতন ভাবে প্রণয়ন করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যা-রাজপরিবারের ঘটনাগুলি যেন গৃহস্থ জীবনের প্রতিচ্ছবি।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাঙ্গলা দেশ এবং বাঙালী জাতির জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী, বৈষ্ণব পদাবলী এবং করচা সাহিত্যের দ্বারা বাংলা ভাষা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বাঙালী মনীষী ছিলেন চৈতন্যশিষ্য সনাতন (জন্ম, ১৪৮২ খ্রীঃ) এবং রূপ (জন্ম, ১৪৮০ খ্রীঃ), চৈতন্য লীলা সহচর অদ্বৈত (১৪৬০-১৫৫৮ খ্রীঃ), চৈতন্যভক্ত হরিদাস (১৪৫০-১৫৩০ খ্রীঃ), শীতলামঙ্গল ও অদ্ভুত রামায়ণ রচয়িতা চৈতন্যশিষ্য নিত্যানন্দ (১৬৭১-১৫৫৫ খ্রীঃ), ভক্ত-অমৃতাষ্টক ও ভক্তিচন্দ্রিকাপটল রচয়িতা নরহরি সরকার (১৪৯৫-১৫৮০ খ্রীঃ), শ্রীচৈতন্যের শিক্ষক ও ন্যায়ের পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম, করচা রচয়িতা স্বরূপ দামোদর (১৪৬৫-১৫৪০ খ্রীঃ), নব্যস্মৃতি রচয়িতা রঘুনন্দন (১৫০০-১৫৮০ খ্রীঃ), শত সন্দর্ভ, ক্রম সন্দর্ভ, মাধব মহোৎসব প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা জীব গোস্বামী (১৫১৮-১৬১০ খ্রীঃ), শ্রীচৈতন্য শব্দ কল্পবৃক্ষ, গুণলেশ শেখর, মহাশিক্ষা রচয়িতা রঘুনাথ দাস (১৪৯৫-১৫৮৫ খ্রীঃ), হরিভক্তিবিলাস, বৃন্দাবন-কৃষ্ণ কর্পূরামৃত প্রণেতা গোপালভট্ট (১৫০০-১৫৬৫ খ্রীঃ) ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক এবং চৈতন্য-চবণামৃত প্রণেতা পরমানন্দ সেন বা কবি কর্ণপুর (১৫১৮- ৫৭৭ খ্রীঃ)।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া রচিত চরণামৃত, জীবনী-গ্রন্থ এবং করচা এই যুগে বাংলা সাহিত্যকে স.দ্ধ করিয়াছিল। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—গোবিন্দদাসের করচা, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত, নরহরিদাসের ভক্তিরত্নাকর এবং নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাস।

ইসলাম প্রবর্তনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এবং নূতন জ্ঞানানুশীলন ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে বাঙালী জাতি শ্রীচৈতন্যদেবকে দেবতার আসন প্রদান করিল এবং ভগবানের অবতাররূপে প্রতিষ্ঠা করিল। অচিরকাল মধ্যে বহু দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইল। স্থানীয় দেবতার স্তুতি-সূচক নানাপ্রকার কাব্য, পাঁচালী, গাথা ও সংগীত রচিত হইল। এই সমস্ত রচনার মধ্যে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। মাধবাচার্য, মুকুন্দরাম, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, কেতকাচার্য, ঘনরাম প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ বিভিন্ন প্রকার দেবতার স্তবস্তুতি এবং পূজা-পদ্ধতি প্রবর্তন করিলেন। এই সমস্ত নূতন দেবতার মধ্যে মনসা, চণ্ডী, শিব, কালিকা, শীতলা, কমলা, গঙ্গা এবং ধর্মঠাকুর বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল।

মনসাদেবীর প্রশস্তি মনসামঙ্গল নামে বাংলা সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে। মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(১) হরিহর দত্তের মনসামঙ্গল—রচনাকাল চতুর্দশ শতাব্দী—কবির জন্মস্থান পূর্ববঙ্গ।

(২) নারায়ণ রচিত মনসামঙ্গল – রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দী—কবির জন্মস্থান ময়মনসিংহ জেলা।

(৩) নারায়ণ দাসের পদ্মপুরাণ—রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দী—কবির জন্মস্থান মোহনশাল, ত্রিপুরা জেলা।

(৪) বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল—রচনাকাল ১৪৮৪ খ্রীঃ—কবির জন্মস্থান ফুল্লশ্রী, বরিশাল জেলা।

(৫) বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল—রচনাকাল ১৪৭৫ খ্রীঃ—কবির জন্মস্থান বীরভূম।

(৬) দ্বিজ বংশীধরের মনসামঙ্গল—রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দী—কবির জন্মস্থান পটুয়ারী, ময়মনসিংহ জেলা।

(৭) কেতকাচার্যের (ক্ষেমানন্দ) মনসামঙ্গল—রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দী—কবির জন্মস্থান বর্ধমান জেলা।

মনসামঙ্গল ঃ চতুর্দশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী—এই দুই শতকের মধ্যে বাঙ্গলা দেশের সর্বত্র মনসাদেবীর স্তুতি বা মনসামঙ্গল রচিত হইয়াছিল। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক গ্রন্থে ৬২ জন মনসামঙ্গল রচয়িতাব নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত রচয়িতাদের স্থান বাঙ্গলা-দেশের সর্বত্র এবং কাল মুসলিম কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের একশত বৎসর পর .হইতে মুঘল আগমনের পূর্ব পর্যন্ত দুই শত বৎসর। প্রশ্ন হইতে পারে যে, মনসাদেবী এই সময়ে এত জনপ্রিয় হইয়াছিলেন কেন? মনসা ছিলেন সর্পদেবতা, বিষ ছিল তাঁহার শক্তির প্রতীক। তিনি ছিলেন ভীষণ ক্রুদ্ধা, ক্ষমাহীনা, শত্রুর প্রতি অত্যন্ত নির্মম। মুসলিম আগমনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মনসার সৃষ্টি সম্ভব—মনসাদেবীর পরিকল্পনা রূপক। বাঙ্গলা দেশে তখন হিন্দু রাজশক্তি ছিল না, ব্রাহ্মণের প্রাধান্যও ছিল না, সমাজরক্ষার কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানও ছিল না। সুতরাং বহুস্থলে অব্রাহ্মণগণ মুসলমানের বিরুদ্ধে মনসার ন্যায় ক্রুদ্ধা, ক্ষমাহীনা, হিংস্র স্বভাবা দেবীর সৃষ্টি করিয়াছিল। পরিশেষে এই লৌকিক দেবতার পূজা বঙ্গদেশের সর্বত্র কিংবদন্তী, গাঁথা, স্তবস্তুতির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইল।

বাঙ্গলা দেশে ও সমাজে রাজশক্তির বিবর্তন এবং পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন দেবতার সৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়, বিশেষতঃ মুসলিম ও বৃটিশ যুগে। বৈষ্ণবধর্মের প্লাবনের যুগেও অনেক পৌরাণিক দেবতার সৃষ্টি হইয়াছিল। মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুগণ দেখিল যে শান্ত, শুদ্ধ, সংযত দেবতার দ্বারা ধর্ম এবং সমাজ রক্ষা সম্ভবপর নহে। সুতরাং হিন্দুগণ এমন একটি দেবতা বা দেবতাগোষ্ঠীর সৃষ্টি করিল—যিনি বা যাঁহারা আহত হইলে আঘাত করিতে পারেন। স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে-কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দু রাজা এবং ব্রাহ্মণগণের অভাবে অব্রাহ্মণগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সহজ ভাবেই বিধর্মী বিরোধী

দেবতার সৃষ্টি করিল। এই সমস্ত দেবতার পরিকল্পনা, পূজাপদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে সমসাময়িক বাঙালী মনের চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

চণ্ডীমঙ্গল : এই সময়ে চণ্ডীদেবীর স্তুতিবাচক কয়েকখানি কাব্য রচিত হইয়াছিল ; কালকেতু ব্যাধ এবং ধনপতি বণিকের কাহিনীর প্রচ্ছদপটে চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রণেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—

(১) মাণিকদত্ত—জন্মস্থান গৌড়, সময় চতুর্দশ শতাব্দী।

(২) দ্বিজমাধব—জন্মস্থান চট্টগ্রাম, সময় ষোড়শ শতাব্দী।

(৩) মুকুন্দরাম—জন্মস্থান দামোনিয়া, বর্ধমান, সময় ষোড়শ শতাব্দী।

এতদ্ব্যতীত শিব, কালী, শীতলা এবং গঙ্গাদেবীর সম্বন্ধেও মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন ; কিন্তু এই কাব্য রচনার পশ্চাতে বাঙালী মনোধারার বিশ্লেষণ করেন নাই। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন কাব্যের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন কিন্তু রচনার পশ্চাতের যবনিকা উত্তোলন করেন নাই।

কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্য বাঙালী মানস, ইতিহাস এবং চিন্তাধারার প্রচ্ছদপটে আলোচিত হইতে পারে এবং ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় তাঁহার Obscure Religious Cults নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই সমস্ত ধর্মের উত্থান ও তিরোধানের সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণ আলোচনা করেন নাই।

ধর্মমঙ্গল : ধর্মমঙ্গল ধর্মঠাকুর নামে একজন বৌদ্ধ দেবতার কাহিনী ও স্তবস্তুতি। ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত।

ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় প্রথম কাব্য রচনা করেন ময়ূরভট্ট - জন্মস্থান বীরভূম (রাঢ়), সময় পঞ্চদশ শতাব্দী। ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে রূপরাম, খেলারাম, প্রভুরাম, সীতারাম, গোবিন্দরাম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঘনারাম ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন যে, ধর্মঠাকুর বৌদ্ধদের প্রতি ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছিল (নারায়ণ পত্রিকা, ১৩২২ সাল, মাঘ সংখ্যা)।

ডঃ শহিদুল্লা "শূন্য পুরাণের" ভূমিকায় (৩৫ পৃঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ধর্মঠাকুরের পূজক বৌদ্ধগণ এবং মুসলমানগণ ব্রাহ্মণদের হস্তে একই প্রকার ব্যবহার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মতে ধর্মঠাকুর ছিলেন বৌদ্ধ এবং মুসলমানগণের ব্রাহ্মণবিরোধী সমবেত প্রতিবাদ।

রামাই পণ্ডিত তাঁহার শূন্য পুরাণে দেবতা নিরঞ্জনকে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ধর্মঠাকুরের পূজক সংধর্মীদিগের রক্ষকরূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন। দেবতা নিরঞ্জন ছিলেন ধর্মঠাকুর গোষ্ঠীর দেবতা। সংধর্মী বা ধর্মঠাকুরের পূজকদের প্রতি অত্যাচার

সহ্য করিতে না পারিয়া নিরঞ্জন মুসলমানের খোদারূপে অবতীর্ণ হইলেন। মুসলমানের খোদার রূপ বর্ণনায় দেখা যায় যে, খোদা অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়, হস্তে তীর-ধনুক, শিরে কৃষ্ণবর্ণ শিরস্ত্রাণ, তিনি যোদ্ধবেশে মর্তে অবতীর্ণ হইয়াছেন। খোদাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ম হিন্দুর সমস্ত দেব-দেবী মুসলমান সৈনিকের বেশ পরিধান করিয়া খোদার প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু খোদা তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না—হিন্দুর মন্দির বিচূর্ণ হইল। হিন্দুর বাসগৃহ লুণ্ঠিত হইল—হিন্দুর দেবতা প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। শেষ পর্যন্ত খোদা মুসলমান এবং সৎধর্মীদিগের রক্ষা করিলেন; এই ছিল ধর্মঠাকুর কাব্যের মূল বক্তব্য এবং শূন্য পুরাণের আলোচ্য বিষয়। দেবতা ধর্মঠাকুর মুসলমান আগমনের পরে হিন্দুর মনোভাবের বিচিত্র প্রকাশ মাত্র।

ধর্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতির মধ্যে মুসলিম সমাজের বহু নিয়ম-ব্যবস্থা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। সৎধর্মিগণ ধর্মঠাকুরের পূজার উদ্দেশ্যে হাঁস কিংবা কবুতর জবাহ্ অর্থাৎ কণ্ঠনালী ছেদন করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করে—মুসলমানের মুরূপ সৎধর্মিগণও পশ্চিমমুখী হইয়া (মক্কার অভিমুখী) পশু জবাহ্ করে। লাউসেনের ধর্মঠাকুরের বন্দনার মধ্যে উল্লেখ আছে যে, ধর্মঠাকুরের অলৌকিক ক্ষমতার বলে সূর্য পশ্চিম আকাশে উদিত হইত।

—(পাণ্ডুলিপি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৪৭০ পৃঃ ১—ধর্মের বর্ণনা)

এই সম্বন্ধে নাথপন্থী ধর্মগ্রন্থেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার আরম্ভ পালযুগে। নাথ সাহিত্যের মধ্যে "গোরক্ষ বিজয়" এবং মীনকেতন সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। মানিকচন্দ্র রাজার গান, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, ময়নামতীর গান নাথ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। নাথ সাহিত্যের মধ্যে অসংখ্য মুসলিম শব্দ ও উপমা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। স্নতরাং নাথ সাহিত্যের উপর মুসলিম ভাব ও ভাষার প্রভাব সহজে অনুমান করা যায়।

রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুর তথা বাঙালীর পরম সম্পদ। এই দুইখানি মহাকাব্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, হিন্দু জীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য তিল তিল করিয়া সংগ্রহীত ও সঞ্চিত হইয়া এই দুইখানি মহাকাব্যে নিবদ্ধ হইয়াছে। তুর্ক-আফঘান যুগের কৃতিত্ব এই যে, রামায়ণ ও মহাভারত দুইখানি গ্রন্থই বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং বাঙালী জীবনের ভাবধারায় সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত হইয়া রহিয়াছে। পূর্বে রামায়ণ পাঠ ছিল উচ্চবর্ণের একাধিকার। মুসলিম যুগে উহা হইল জনসাধারণের সম্পদ।

রামায়ণঃ কবি কৃত্তিবাস সর্বপ্রথম রামায়ণ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি ছিলেন রাজা গণেশের রাজসভার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং ইলিয়াস শাহী বংশের সমসাময়িক। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মধ্যে বাঙালীর জীবন ছন্দে, তালে ও সুরে মিশিয়া রহিয়াছে। বাঙালী জাতি কৃত্তিবাসের মাধ্যমে রামায়ণকে আপনায়িত

করিয়া লইয়াছিল। দ্বিজ অনন্ত পঞ্চাশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা ভাষায় একখানি রামায়ণ রচনা করেন।

মহাভারত ঃ মহাভারত মহাকবি ব্যাসের রচনা। সংস্কৃত ভাষায় আর্যসভ্যতা, সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি যেন এই মহাভারতে গ্রন্থিবদ্ধ রহিয়াছে। রামায়ণের ন্যায় মহাভারতও বাঙালী আপন ছন্দে গাঁথিয়া লইয়াছিল। সঞ্জয় নামক একজন পূর্ববঙ্গীয় কবি পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহাভারতের আদিপর্ব হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব পর্যন্ত বাংলায় অনুদিত করেন। চট্টগ্রামের কবি শ্রীকর নন্দী পরাগল খানের আদেশে মহাভারত অনুবাদ আরম্ভ করেন। পরাগল খান ছিলেন হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের সেনাপতি।

আরাকানের অধিবাসী এই পরাগল খান ছিলেন মগধের বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানের নায়ক। চট্টগ্রামে ছিল মুসলিমদের সেনাশিবির। পরাগল খানের অনুগ্রহ এবং উৎসাহ সম্বন্ধে শ্রীকর নন্দী লিখিয়াছেন—

ক্ষৌণী কল্পতরু শ্রীমান দীন দুর্গতিবারণ।
পুণ্যকীর্তি গুণস্বাদী পরাগল খান ॥
(বাংলা সরকারী পুঁথি—৮৮ পৃঃ)

শ্রীকর নন্দী তাঁহার রচিত মহাভারতের ভুমিকায় তাঁহার "প্রভুর প্রভু "অর্থাৎ হুসেন শাহের একটি প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন—

নৃপতি হুসেন শাহ্ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যাঁর পরম সুখ্যাতি ॥
অস্ত্র শস্ত্রে সুপণ্ডিত, মহিমা অপার।
কলিকালে হইল যেন কৃষ্ণ অবতার ॥
(বাংলা সরকারী পুঁথি—১ পৃঃ)

পরাগলী মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা সপ্তদশ সহস্র—ইহা বিরাট গ্রন্থ।

পরাগল খানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ছুটি খান সেনাপতি-পদ লাভ করেন। তিনিও পিতার দৃষ্টান্তে শ্রীকর নন্দীকে উৎসাহিত করেন এবং তাঁহারই প্রেরণায় শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ সমাপ্ত করেন।

সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি, কলেবর এবং অন্তর্নিহিত শক্তিবৃদ্ধি তুর্ক-আফঘান সুলতানগণের সহায়তাতেই সহজ হইয়াছিল। বাঙলার হিন্দুগণ মুসলিম শাসন বহুক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত হইলেও সমর্থন করিয়াছিল এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানও চলিয়াছিল। উহার ফলে মোটের উপর দেশে শান্তি বিরাজিত ছিল—অন্ততঃ সুদূর গ্রামাঞ্চলে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিদ্যমান ছিল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে দিল্লীর দরবারে উলেমাগণ ফারসী ভাষায় দিল্লীর বাদশাহদিগের প্রশস্তি পাঠ করিয়াছেন। তাঁহারা বাঙলার

সুলতানগণের সম্বন্ধে কোন শ্রুতিমধুর বিশেষণ উল্লেখ করেন নাই। বাঙ্গলা ছিল বিদ্রোহ-নগরী (বুঘলকপুর)—বাঙ্গলা দেশের সবই অস্পৃশ্য। সুতরাং বাঙ্গলার সুলতানগণ বাংলা ভাষায় স্বীয় প্রশস্তিপাঠ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইতেন এবং বঙ্গভাষার কবিকুলকে উৎসাহিত করিতেন, পারিতোষিক প্রদান করিতেন, উপাধি-ভূষিত করিতেন। শ্রীকর নন্দী রচিত মহাভারত পরাগলী মহাভারত নামে বিখ্যাত, অন্যদিকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রণেতার নামানুসারেই পরিচিত। কিন্তু শ্রীকর নন্দীর মহাভারত তাঁহার পৃষ্ঠপোষক পরাগল খানের নামানুসারে নামাঙ্কিত।

তুর্ক-আফঘান বিজয়ের দ্বিতীয় পর্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন তুর্ক-আফঘান যুগে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এই যুগে রচিত বাংলা সাহিত্যকে তিনি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—

(১) সংগীত, কাব্য, প্রশস্তি, অনুবাদ, জীবনী এবং মুসলমানরচিত কেচ্ছা-কাহিনী। অবশ্য এই যুগে সংস্কৃত ভাষার চর্চা এবং রচনার পরিমাণ নিতান্ত কম নহে।

এই প্রসঙ্গে মুসলিম যুগে হিন্দু মনীষার দীপ্তি ও প্রকাশের পশ্চাতে মুসলমানের দানের পরিমাণ আলোচনা করা প্রয়োজন। এই যুগে বাংলা ভাষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল নিঃসন্দেহ, কিন্তু মুসলমান ও আমীরগণ এই মনীষা বিকাশে কতদূর সহায়তা করিয়াছিলেন? তাহাদের মধ্যে কেহ কি স্বয়ং বাংলা ভাষা রচনা করিয়াছেন অথবা তাঁহারা কি বাঙালী কবিদিগকে অর্থ, উপাধি এবং ভূমিদান করিয়া কিংবা সভাকবি কিংবা সভাপণ্ডিত করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন কিংবা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন? দিল্লীর সুলতানগণ দরবারি ঐতিহাসিক, দরবারী কবি, দরবারী আলিম (পণ্ডিত) নিযুক্ত করিয়াছেন। মুঘল যুগে বিধর্মী হিন্দুও রাজ-দরবারে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। তুর্ক-আফঘান যুগে দিল্লীর দরবারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য হিন্দুর সন্ধান পাওয়া যায় না। বাঙ্গলা দেশে ইলিয়াস শাহী এবং হুসেন শাহী বংশের রাজত্বকালে বহু বাঙালী কবির উল্লেখ পাওয়া যায়। অথবা ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে, পাল ও সেনযুগে বাঙালী মনীষার স্ফুরণ আরম্ভ হইয়াছিল—মুসলমান আগমনের প্রথম এক শত বৎসর হিন্দু মনীষার স্ফুরণ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অচিরকালমধ্যে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক উষ্মা অনেকখানি হ্রাস পাইয়াছিল। দেশে ন্যূনাধিক পরিমাণে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নির্বিরোধী বাঙালী হিন্দু মুসলিম-শাসনকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিল। এই গ্রহণের সুযোগে হিন্দু মনীষা পুনরায় আপন গতিতে, আপন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল।

ব্যক্তিগতভাবে হুসেন শাহ, নসরৎ শাহ প্রভৃতি সুলতান বাংলা সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা বাঙালীর মনে যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিল। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, জাতীয় সাহিত্যই জাতীয় মনের বিকাশ। মন শান্ত, স্বচ্ছ এবং স্বচ্ছন্দ না হইলে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিলে অনুমান করা যায় যে, এই বিরাট সাহিত্যে সংগীত, কাব্য, প্রশস্তি, অনুবাদ বাঙালী মনেরই ছায়ামাত্র। দেশে এমন একটি মানসিক পরিস্থিতি ছিল যে, বাঙালী জাতি পুনরায় কাব্য, সাহিত্য এবং সংগীতের মাধ্যমে নিজস্ব সম্পদের সন্ধান লাভ করিয়াছিল। তুর্ক-আফঘান যুগে বাঙলা দেশের পক্ষে এই অপবাদ ছিল যে, সেই সময়ে হিন্দু মনীষার গতি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই অপবাদ সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। ঘন মেঘের অন্তরালেও বিদ্যুতের আভা দেখা যায়।

তুর্ক-আফঘান যুগে সাহিত্যিক রচনা
(শতাব্দী অনুসারে)

(১) **ত্রয়োদশ শতাব্দী ঃ**

কানা হরিদাস রচনা করেন মনসাদেবীর ভাসান।

(২) **চতুর্দশ শতাব্দী ঃ**

কবি বিদ্যাপতি (১৩৭০-১৪৬০ খ্রীঃ) রচনা করেন পদাবলী, পুরুষ পরীক্ষা, শৈবসর্বস্বসার, দানবাক্যাবলী, বিবাদসার, গঙ্গা-বাক্যাবলী, দুর্গাভক্তি, তরঙ্গিনী, কীর্তিলতা ও রুক্মিণী-স্বয়ম্বর। পদাবলী ব্যতিরেকে বিদ্যাপতির সমগ্র রচনা সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

উদয়নাচার্য ভাদুরী রচনা করেন কিরণাবলী, আত্মতত্ত্ব, বিবেক, কণাদসূত্র টীকা এবং মনুসংহিতা টীকা।

নারায়ণদেব রচনা করেন পদ্মপুরাণ।

(৩) **পঞ্চদশ শতাব্দী ঃ**

শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর ভ্রাতৃদ্বয় (১৪০৭-১৪৩৯ খ্রীঃ) রচনা করেন রাজমালা—ত্রিপুরার ইতিহাস।

চণ্ডীদাস (১৪১৭-১৪৫৭ খ্রীঃ) রচনা করেন পদাবলী ও কৃষ্ণকীর্তন।

শেখর রায় (১৪৪১-১৫০৮ খ্রীঃ) রচনা করেন পদাবলী।

মালাধর বসু (১৪৯৩ খ্রীঃ—মৃত্যুকাল) রচনা করেন শ্রীকৃষ্ণবিজয় এবং লক্ষ্মীচরিত্র।

রঘুনাথ শিরোমণি (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ) রচনা করেন লীলাবতীর টীকা ও ব্রহ্মসূত্র বৃত্তি।

কৃত্তিবাস (১৪৬০-১৪৯০ খ্রীঃ) রচনা করেন রামায়ণ, শ্রীরামের যুদ্ধ, যোগদ্যার বন্দনা ও রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী।

বিপ্রদাস পিপলাই (রচনাকাল ১৪৮৪ খ্রীঃ) রচনা করেন মনসা-বিজয়।

বিজয়গুপ্ত ১৪৮৪ খ্রীঃ—রচনা আরম্ভ) রচনা করেন মনসামঙ্গল।

শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩খ্রীঃ) রচনা করেন ব্যাকরণ ও অলংকার (বিনষ্ট)।

কবিশেখর (১৪৯৫-১৫৬০ খ্রীঃ) রচনা করেন পদকল্পতরু এবং গোপালবিজয়।

শ্রীচৈতন্যের পরবর্তিকালে বঙ্গের অসংখ্য মনীষী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অনেক রচয়িতার নাম এবং গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়—কিন্তু তাঁহাদের রচনা বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

(৪) **ষোড়শ শতাব্দী ঃ**

রঘুনাথ পণ্ডিত (১৫১৪ খ্রীঃ) রচনা করেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ (১৫১১-১৬১৬ খ্রীঃ) রচনা করেন চৈতন্য-চরিতামৃত।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৫১৭-১৫৯৪ খ্রীঃ) রচনা করেন নিমাই সন্ন্যাস ও রাই কুমুদিনী।

জ্ঞানদাস (১৫০২-১৬০০ খ্রীঃ) রচনা করেন পদাবলী।

গোবিন্দদাস কবিরাজ (১৫৩০-১৬০০ খ্রীঃ) রচনা করেন সংগীত মাধব পদাবলী ও কর্ণামৃত কাব্য।

মুরারি গুপ্ত (১৫৩৩ খ্রীঃ—রচনাকাল) রচনা করেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃত (সংস্কৃত)।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বহু ঘটক রচিত কুলপঞ্জীর সন্ধান পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে দেবীবর ঘটক বিখ্যাত।

আউলিয়া সাহিত্যের মধ্যে কয়েকজন পদকর্তার নামোল্লেখ আছে। তাঁহাদের মধ্যে মনোহর দাস আউলিয়া বিখ্যাত।

এই যুগে কয়েকজন মুসলিম কবিও বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেন। তাঁহাদের মধ্যে—

উদ্ধরণ শেখ রচনা করেন মৃগাবতী।

আবদুল গফুর রচনা করেন কালু গাজী ও চম্পাবতীর কাহিনী।

দাসর (১৫১৬ খ্রীঃ) রচনা করেন লক্ষ্মণসেন ও পদ্মাবতীর কথা।

আরীফ (ষোড়শ শতাব্দী) রচনা করেন সাথীসেনা, মাণিক পীরের গান।

কয়েজউল্লা। ষোড়শ শতাব্দী) রচনা করেন সত্যপীরের পাঁচালী।

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর কয়েকজন মুসলিম কবির নাম ও তাঁহাদের রচনার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সময় নির্দিষ্ট করিতে পারেন নাই।

মুন্সী মুহম্মদ আবেদ—চন্দ্রাবলীর পুঁথি।
খন্দকার আবেদালী—মধুমালার কেচ্ছা।
মুন্সী আইজউদ্দীন—মালঞ্চ কন্যার কেচ্ছা।
মুন্সী এনায়েতউল্লা সরকার—জরাসুরের পুঁথি।
মুন্সী আইজউদ্দীন—সতীবিবির কেচ্ছা।
মুন্সী মুহম্মদ আবেদ—কাঞ্চনমালার কেচ্ছা।
মুহম্মদ কোরবান আলী—সাথীসেনা।
মুন্সী আমানত—ইন্দ্রের সভা।
মুন্সী গোলাম কাদের—শীত-বসন্তের পুঁথি।
মীব খোররাম আলী—সাপের মন্তর।